# হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) : ধর্মীয় সংস্কার ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর অবদান

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ


**তত্ত্বাবধায়ক**
ড. এ.বি.এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী
অনারারি অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক**
ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**গবেষক**
**মোঃ মাসুদুজ্জামান**
পিএইচ.ডি গবেষক
পুনঃ রেজিঃ নং ২১৬/২০১২-১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

জুন - ২০১৪

# উৎসর্গ

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সীমাহীন
উৎসাহ-উদ্দীপনা আর অফুরন্ত দু'আকে
পাথেয় করে এ স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে
সক্ষম হয়েছি সে পরম শ্রদ্ধাভাজন
আব্বা ও মমতাময়ী মা এবং আমার
শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের প্রতি।

Dhaka University Institutional Repository

# ঘোষণাপত্র

আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করছি যে, **হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) : ধর্মীয় সংস্কার ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর অবদান** শীর্ষক শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে রচিত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার শিক্ষক মহোদয় ড. এ. বি. এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী, অনারারি অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্যারদ্বয়ের প্রত্যক্ষ ও যৌথ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা লাভের জন্য বা প্রকাশের উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক উপস্থাপিত হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এ গবেষণাকর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে অন্য কেউ এ শিরোনামে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করেননি।

তারিখ, ঢাকা
১১ জুন ২০১৪

**(মোঃ মাসুদুজ্জামান)**
পিএইচ.ডি গবেষক
পুনঃ রেজিঃ নং- ২১৬/২০১২-১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

*Dhaka University Institutional Repository*

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. Md. Akhteruzzaman
Professor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka

সূত্র :

তারিখ : ১১ জুন ২০১৪

# প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক মোঃ মাসুদুজ্জামান কর্তৃক পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) : ধর্মীয় সংস্কার ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর অবদান** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমাদের প্রত্যক্ষ ও সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে প্রণীত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটা সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক গবেষণাকর্ম; কোন যুগ্মকর্ম নয়। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের উদ্দেশ্যে বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক উপস্থাপিত হয়নি।

আমাদের জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই উক্ত শিরোনামে ডিগ্রি লাভের জন্য কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমরা এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. এ.বি.এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী)
তত্ত্বাবধায়ক ও
অনারারি অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(ড. মোঃ আখতারুজ্জামান)
যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা ও শুকরিয়া সে মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, জীবন মৃত্যুর মালিক এবং পারলৌকিক জীবনে শান্তি ও পুরস্কার দাতা। অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি যিনি বিশ্ব মানবতার জন্য আশির্বাদ ও অনুপম আদর্শ।

এ গবেষণা কর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম আন্তরিক ও গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অত্র গবেষণা কর্মের স্বনামধন্য তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালরেয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী স্যার ও যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের সমীপে। যারা তাদের মূল্যবান সময় ব্যয়ের মাধ্যমে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে অভিসন্দর্ভটি সার্বিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন। তারা আমার গবেষণা পত্রের প্রতিটি শব্দ পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন-বিয়োজন করেছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এক কথায় এ গবেষণা কর্মের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ছত্র, তাদের অবদানের সাক্ষ্য বহন করছে। এর প্রতিদান স্বরূপ মহান আল্লাহ্ পাক তাদের উত্তম পুরস্কার দান করুন।

আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী ও একাডেমিক কমিটির সদস্যবৃন্দকে যারা পিএইচ.ডি গবেষণার জন্য নির্ধারিত দু'টি সেমিনারে আমার উপস্থাপিত প্রবন্ধদ্বয় সম্বন্ধে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে আমাকে এ গবেষণা কর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। আমি তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ড. শামীম আরা চৌধুরীকে। যিনি সার্বিকভাবে গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদান ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন।

আরও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মাওলানা কে এম আব্দুস সোবহান ও স্নেহের ছোট ভাই মাওলানা মোঃ শফিকুল ইসলামকে যারা সবসময় গবেষণা কর্মের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন এবং সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন।

আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব জনাব আব্দুস সবুর ফকির, জনাব এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর হোসাইন ও ড. আ ই ম নেসার উদ্দীনকে। যাদের

*Dhaka University Institutional Repository*

অনুপ্রেরণা এ পথকে আরও সহজ ও সুগম করেছে। তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আরও গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার সহকর্মীগণকে যারা আন্তরিক সহযোগিতা ও সার্বিক পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে জনাব মোঃ উসমান গণী, মোঃ আব্দুল আলীম, মোঃ আকরাম হোসাইন, মোঃ আবু সুফিয়ান, মোঃ নাজমুল হুদা, মোঃ নেসার উদ্দীন, মোঃ সাইফুল ইসলাম, মোঃ দিদার হোসাইন, মোঃ কামরুজ্জামান প্রমুখ।

গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা-আম্মাকে যাদের অনুপ্রেরণা ও দু'আর বরকতে মহান আল্লাহ্ আমার এ উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত করেছেন। তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার সহধর্মিণী এ্যাডভোকেট জোবায়দা নাহার ও আমার একমাত্র স্নেহের পুত্র আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদকে। যাদের অনুপ্রেরণা, ত্যাগ ও অকৃত্রিম ভালবাসা আমার উচ্চ শিক্ষার পথকে সুগম করেছে।

জনাব এ. বি. এম নূরুল্লাহ অভিসন্দর্ভটি দক্ষতা ও আন্তরিকতাসহ কম্পিউটার কম্পোজ, মুদ্রণ ও সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করে গবেষণাকর্মে অনেক সহযোগিতা করেছেন। এজন্য তার কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিবেদন করছি, তিনি যেন তাঁর এ বান্দার ক্ষুদ্র সাধনা কবুল করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি দান করেন।

**(মোঃ মাসুদুজ্জামান)**
পিএইচ.ডি গবেষক

*Dhaka University Institutional Repository*

# শব্দ সংক্ষেপ

(ক) বিভিন্ন গ্রন্থের নাম, গ্রন্থাকারের নাম, ব্যক্তির নাম, গ্রন্থাকারের রচিত বা ব্যবহৃত শব্দকে যথাযথভাবে রাখা হয়েছে। তবে আল কুরআনের শব্দের ক্ষেত্রে সর্বত্র আল কুরআন বা কুরআন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব বইয়ে এসলাম বা এছলাম ব্যবহার করা হয়েছে তার স্থলে ইসলাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(খ) বিদেশি শব্দাবলির ক্ষেত্রে বাংলা আধুনিক বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। আমার লেখা এ অভিসন্দর্ভে আরবি, ফারসি ও ইংরেজি শব্দের অনুলিখন বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে শব্দগুলো বাংলায় যেভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সেভাবেই প্রচলিত বানান গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, কতিপয় শব্দ : আইন, আদালত, আখিরাত ইত্যাদি।

গবেষণা পত্রে ব্যবহৃত পাঠ সংকেত বা অনুলিখনের ক্ষেত্রে অনুসৃত রীতি হলো :

| | | |
|---|---|---|
| অনুঃ | : | অনুবাদ |
| অনূঃ | : | অনূদিত |
| ইফাবা | : | ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ |
| ইং | : | ইংরেজি |
| ১ম | : | প্রথম |
| ২য় | : | দ্বিতীয় |
| ৩য় | : | তৃতীয় |
| ৪র্থ | : | চতুর্থ |
| ৫ম | : | পঞ্চম |
| ৬ষ্ঠ | : | ষষ্ঠ |
| ৭ম | : | সপ্তম |
| ৮ম | : | অষ্টম |
| ৯ম | : | নবম |
| ১০ম | : | দশম |
| প্রাগুক্ত | : | পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি |
| বি. | : | বিশেষ |
| দ্র. | : | দ্রষ্টব্য |
| তাং | : | তারিখ |
| তা.বি. | : | তারিখ বিহীন |
| পাণ্ডু | : | পাণ্ডুলিপি |
| মু. | : | মুদ্রণ |
| মূ.পা. | : | মূল পাঠ (উদ্ধৃতি মূলের অবিকল অনুরূপ) |
| পরি. | : | পরিশিষ্ট |
| স. | : | সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম |

*Dhaka University Institutional Repository*

| | | |
|---|---|---|
| রা. | : | রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু/'আনহা |
| র./রহ. | : | রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি |
| দঃ/দ. | : | দরূদ |
| আ. | : | 'আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম |
| আঃ | : | আয়াত |
| হি. | : | হিজরি সাল |
| খ. | : | খণ্ড |
| খ্রি. | : | খ্রিষ্টাব্দ/খৃষ্টাব্দ |
| খৃ. | : | খৃষ্টাব্দ/খ্রিষ্টাব্দ |
| খৃ.পূ. | : | খৃষ্টপূর্ব |
| ড. | : | ডক্টর (পিএইচ.ডি./ Doctor of Philosophy) |
| পৃ. | : | পৃষ্ঠা |
| মৃ. | : | মৃত্যু |
| লিঃ | : | লিমিটেড |
| সং. | : | সংস্করণ |
| AD | : | After death of Christ |
| C. | : | Christ |
| Cf. | : | Confer/Compare |
| ed. | : | edition |
| eds. | : | edited |
| H. | : | Hijrah |
| HTTP | : | Hyper Text Transfer Protocol |
| N.B. | : | Note Bane |
| IBBL | : | Islami Bank Bangladesh Limited |
| IFB | : | Islamic Foundation Bangladesh |
| Ibid | : | ibidem, which means 'in the same place' |
| M.Phil | : | Master of Philosophy |
| p. | : | Page |
| Ph.D | : | Doctor of Philosophy |
| pp. | : | Pages |
| PEN | : | Poets, Essayists, Novelists, (International Association of Writers) |
| vol. | : | Volume |
| روح المعاني | : | روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني |

Dhaka University Institutional Repository

# প্রতিবর্ণায়ন

## গবেষণা পত্রে ব্যবহৃত আরবি বর্ণমালার বাংলা প্রতিবর্ণায়নের ব্যাপারে অনুসৃত নিয়ম

| ব্যঞ্জনবর্ণ | | ব্যঞ্জনবর্ণ | | স্বরবর্ণ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ء | উর্ধ্বকমা | ط | ত্ব | ـــَـــ | অ, আ- া |
| ب | ব | ظ | য | ـــِـــ | ই- ি |
| ت | ত | ع | ‘ (উল্টো কমা) | ـــُـــ | উ- ু |
| ث | স | غ | গ/ঘ | ـــَا | আ-া |
| ج | জ | ف | ফ | ـــِيْ | ঈ-ী |
| ح | হ | ق | ক | ـــُوْ | ঊ- ূ |
| خ | খ | ك | ক | أَ | আন্ |
| د | দ | ل | ল | إِ | ইন্ |
| ذ | য | م | ম | أُ | উন্ |
| ر | র | ن | ন | ـــْـــ | হস্ চিহ্ন |
| ز | য | و | ও/ভ | ـــّـــ | বর্ণ দ্বিত্ব চিহ্ন |
| س | স | ه | হ | | |
| ش | শ | ة | হ/ঃ | | |
| ص | স/স্ব | ي | য় | | |
| ض | দ/দ্ব | | | | |

ء (হামযা) আলিফের মত। তবে সাকিন হলে (’) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন, مَأْثُوْرٌ = মা’ছূর, تَأْمِيْرٌ = তা’মীর, تَأْمُرُ = তা’মুরু প্রভৃতি।
ع হরফের উচ্চারণে (‘) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন, مَعْبُوْدٌ = মা‘বূদ, جَامِعَةٌ = জামি‘আহ্, رَعْدٌরা‘দ প্রভৃতি।

বহুল প্রচলিত বাংলা শব্দের বানানগুলো অনেক ক্ষেত্রে যথা অবস্থায় রাখা হয়েছে। যেমন- ওয়াজ, নসিহত, বায়াত, হায়াত, আলেম, ফরজ, মাজহাব, সুন্নাত প্রভৃতি।

*Dhaka University Institutional Repository*

# সূচিপত্র


- উৎসর্গ ii
- ঘোষণা পত্র iii
- প্রত্যয়ন পত্র iv
- কৃতজ্ঞতা স্বীকার v
- শব্দ সংক্ষেপ vii
- প্রতিবর্ণায়ন ix
- সূচিপত্র x

## প্রথম অধ্যায়
## গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা ১-১১

১.১ গবেষণা প্রস্তাবনা ২

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব ৩

১.৩ গবেষণার কর্মের উদ্দেশ্য ৩

১.৪ গবেষণা কর্মের পদ্ধতি ৪

১.৫ গবেষণা কর্মের পরিধি ৫

১.৬ গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্তের উৎস ৫

১.৭ গবেষণা কর্মের সময়কাল ৬

১.৮ গবেষণা কর্ম পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা ৬

১.৯ তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ৭

১.১০ অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা ৯

১.১১ উপসংহার ১১


*Dhaka University Institutional Repository*

# দ্বিতীয় অধ্যায়


## হাজী শরী'অতুল্লাহর জীবন পরিক্রমা ১২-৩৯

**২.১ হাজী শরী'অতুল্লাহর বাল্য ও শিক্ষা জীবন ১৩**
২.১.১ জন্ম ও শৈশব কাল ১৩
২.১.২ বাল্যকালের স্মরণীয় ঘটনা ১৪
২.১.৩ শিক্ষা জীবন ১৬
২.১.৪ জ্ঞানের সন্ধানে হুগলি গমন ১৭
২.১.৫ বিচারপতি চাচার সাথে সাক্ষাত ১৭

**২.২ হাজী শরী'অতুল্লাহর অন্যান্য সফর ১৯**
২.২.১ পবিত্র মক্কা নগরীতে সফর ১৯
২.২.২ শরী'অতুল্লাহর মদীনায় গমন ২১
২.২.৩ দ্বিতীয় বার মক্কা সফর ২২
২.২.৪ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ২৪
২.২.৫ মক্কায় ও আল-আযহারে অবস্থান ২৬
২.২.৬ তাহির সোম্বলের শিষ্যত্ব গ্রহণ ২৭

**২.৩ হাজী শরী'অতুল্লাহর জীবন প্রবাহ ও ইন্তিকাল ২৯**
২.৩.১ হাজী শরী'অতুল্লাহর মাদারিপুর প্রত্যাবর্তন ২৯
২.৩.২ গঙ্গা নদীতে দুর্ঘটনা ৩০
২.৩.৩ সফল সংগঠক ও বক্তা ৩১
২.৩.৪ বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি ৩৩
২.৩.৫ হাজী শরী'অতুল্লাহর চরিত্র ৩৪
২.৩.৬ হাজী শরী'অতুল্লাহর ইন্তিকাল ও সমাধি ৩৪


# তৃতীয় অধ্যায়


## ফরায়েযী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ৪০-৭৫

**৩.১ ফরায়েযী আন্দোলনের সময় বৃটিশ ও জমিদার শ্রেণির অবস্থা ৪১**
৩.১.১ ফরায়েযী আন্দোলনের উৎস ৪১
৩.১.২ ফরায়েযী আন্দোনের পরিচয় ৪৮
৩.১.৩ ফরায়েযীদের পরিচয় ৫০
৩.১.৪ বৃটিশ শাসনের পূর্বে এবং সমসাময়িক বাংলার জমিদার শ্রেণির অবস্থা ৫১

**৩.২ ফরায়েযী আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি** ৫৬

৩.২.১ সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ৫৬
৩.২.২ ফরায়েযী আন্দোলনের তাৎক্ষণিক সাফল্য ৬০
৩.২.৩ ফরায়েযী আন্দোলনের প্রভাব ৬৩

**৩.৩ ফরায়েযী আন্দোলন ও অন্যান্য অনুষঙ্গ** ৭০

৩.৩.১ ফরায়েযীদের সাথে আহলুল হাদীস এর সম্পর্ক ৭০
৩.৩.২ ফরায়েযীদের সাথে তা'আয়্যুনি সম্প্রদায়ের যোগাযোগ ৭০
৩.৩.৩ ফরায়েযী আন্দোলনের সাথে পাটনা স্কুলের সম্পর্ক ৭২
৩.৩.৪ তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়া আন্দোলন ও ফরায়েযী আন্দোলনের সম্পর্ক ৭৪


## চতুর্থ অধ্যায়


## হাজী শরী'অতুল্লাহর জীবন সংগ্রাম ও ধর্মীয় সংস্কার ৭৬-১২০

**৪.১ ফরায়েযী আন্দোলনের বিভিন্ন দিক** ৭৭

৪.১.১ হাজী শরী'অতুল্লাহর সংগ্রাম ৭৭
৪.১.২ হাজী শরী'অতুল্লাহর সমাজ সংস্কার ৭৯
৪.১.৩ ফরায়েযী বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য ৮১
৪.১.৪ ফরায়েযী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ৮২
৪.১.৫ ফরায়েযী আন্দোলনের প্রসার ৮৪
৪.১.৬ ফরায়েযীদের ধর্মীয় মতাদর্শ ৮৬

**৪.২ ফরায়েযীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন** ৯৯

৪.২.১ ফরায়েযী আন্দোলনের ভৌগোলিক এলাকা ৯৯
৪.২.২ ফরায়েযীদের সামাজিক সংগঠন ১০৩
৪.২.৩ সিয়াসী বা রাজনৈতিক অংশ ১০৪
৪.২.৪ গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিট খলিফাদের কার্যাবলি ১০৫
৪.২.৫ তত্ত্বাবধায়ক খলিফার কার্যাবলি ১০৭
৪.২.৬ সমন্বয়কারী টিম ১০৮
৪.২.৭ খিলাফত প্রতিষ্ঠায় বাধা ১০৮
৪.২.৮ সশস্ত্র আন্দোলন শুরু ১১০
৪.২.৯ বাংলাদেশকে দারুল হারব ঘোষণা ১১১


*Dhaka University Institutional Repository*

| | | |
|---|---|---|
| **৪.৩** | **হাজী শরী'অতুল্লাহর সমাজ গঠন** | ১১৩ |
| ৪.৩.১ | শরী'অতুল্লাহর বৈপ্লবিক সংস্কার | ১১৩ |
| ৪.৩.২ | সূচিত আন্দোলনের প্রকৃতি | ১১৪ |
| ৪.৩.৩ | হাজী শরী'অতুল্লাহর পুনর্বার কলকাতায় গমন | ১১৫ |
| ৪.৩.৪ | স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা | ১১৫ |
| ৪.৩.৫ | বিশিষ্ট কয়েকজন ফরায়েযী নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা | ১১৬ |


## পঞ্চম অধ্যায়


**ফরায়েযী আন্দোলনে হাজী শরী'অতুল্লাহর উত্তরসূরিগণের ভূমিকা** ১২১-১৬০

| | | |
|---|---|---|
| **৫.১** | **দুদু মিয়ার জন্ম, বংশ পরিচয় ও সংগ্রামী জীবন** | ১২২ |
| ৫.১.১ | মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া | ১২২ |
| ৫.১.২ | দুদু মিয়ার শিক্ষা জীবন | ১২৩ |
| ৫.১.৩ | দুদু মিয়ার পারিবারিক জীবন | ১২৩ |
| ৫.১.৪ | সংগ্রামী বাহিনীর সংগঠক | ১২৩ |
| ৫.১.৫ | ফরায়েযী আন্দোলনের প্রধান হিসেবে দুদু মিয়ার ভূমিকা | ১২৪ |
| ৫.১.৬ | কানাইপুরের সিকদার ও ঘোষ পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযান | ১২৫ |
| ৫.১.৭ | জমিদারগণের প্রতিক্রিয়া | ১২৭ |
| ৫.১.৮ | দুদু মিয়ার কারাবরণ | ১৩৪ |
| ৫.১.৯ | দুদু মিয়া কর্তৃক সূচিত সংগ্রামের প্রকৃতি | ১৩৫ |
| ৫.১.১০ | দুদু মিয়ার মৃত্যু | ১৩৭ |
| **৫.২** | **হাজী শরী'অতুল্লাহর উত্তরসূরি** | ১৩৯ |
| ৫.২.১ | দুদু মিয়ার পরবর্তী নেতৃবৃন্দ | ১৩৯ |
| ৫.২.২ | আব্দুল গফুর ওরফে নয়া মিয়া | ১৩৯ |
| ৫.২.৩ | খান বাহাদুর সাইদ উদ্দীন আহমদ | ১৪১ |
| ৫.২.৪ | হযরত পীর বাদশা মিয়া | ১৪১ |
| ৫.২.৫ | মাওলানা পীর মোহসীন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (২য়) | ১৪৫ |
| ৫.২.৬ | পীর মুহিউদ্দীন আহমদ দাদন মিয়া | ১৫০ |
| ৫.২.৭ | শহীদ মাওলানা প্রিন্সিপাল আবুবকর মিয়া | ১৫০ |
| ৫.২.৮ | হাজী শরফ উদ্দীন আহমদ জুনায়েদ মিয়া | ১৫১ |
| ৫.২.৯ | মাওলানা মঈন উদ্ দীন আহমদ জোবায়ের মিয়া | ১৫৩ |
| ৫.২.১০ | মাওলানা আবদুল্লাহ মোহাম্মাদ হাসান (জীবিত) | ১৫৩ |


*Dhaka University Institutional Repository*

**৫.৩ হাজী শরী‘অতুল্লাহর উত্তরসূরিদের দায়িত্ব গ্রহণ** ১৫৫
৫.৩.১ হাজী শরী‘অতুল্লাহর চিন্তা ও দুদু মিয়ার আত্মীকরণ ১৫৫
৫.৩.২ দুদু মিয়ার সংগ্রামে নৈর্ব্যক্তিক সহায়ক প্রতিফলন ১৫৬
৫.৩.৩ অন্যান্য উত্তরসূরিবৃন্দের বুদ্ধিবৃত্তিক সমন্বয় ১৫৭

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## ফরায়েযী আন্দোলনের সমসাময়িক সংস্কার আন্দোলনসমূহ ১৬১-১৮১

**৬.১ ফরায়েযী ও সমসাময়িক বিশ্ব আন্দোলন** ১৬২
৬.১.১ হাজী শরী‘অতুল্লাহর সমসাময়িক বিশ্ব ইসলামি আন্দোলনসমূহ ১৬২
৬.১.২ ওয়াহাবি আন্দোলন ১৬৪
৬.১.৩ অন্যান্য ইসলামি আন্দোলন ১৬৫
**৬.২ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য ধর্মীয় আন্দোলনসমূহ** ১৬৭
৬.২.১ সানুসি আন্দোলন ১৬৭
৬.২.২ ফুলানি আন্দোলন ১৬৮
৬.২.৩ ফাদুরি আন্দোলন ১৬৮
৬.২.৪ মুহাম্মাদিয়া আন্দোলন ১৬৯
৬.২.৫ মাহদি আন্দোলন ১৭০
৬.২.৬ তীজানিয়া আন্দোলন ১৭০
৬.২.৭ তরীকা-ই-মুহাম্মাদিয়া তথা মুজাহিদুন আন্দোলন ১৭২
৬.২.৮ জিহাদ ও ইসলামি আন্দোলন ১৭৩
৬.২.৯ তা‘আয়্যুনি আন্দোলন ১৭৪
৬.২.১০ আহলুল হাদিস আন্দোলন ১৭৫
**৬.৩ এতদঞ্চলে সমসাময়িক সংস্কারসমূহ** ১৭৮
৬.৩.১ সমসাময়িক আন্দোলনের সাথে ফরায়েযী আন্দোলনের সাদৃশ্য ১৭৮
৬.৩.২ চলমান ধর্মীয় সংস্কারের সাথে ফরায়েযী আন্দোলনের বৈসাদৃশ্য ১৭৯
৬.৩.৩ তৎকালীন বাংলার ধর্মীয় সংস্কারের উপর ফরায়েযী আন্দোলনের প্রভাব ও ফলাফল ১৭৯

*Dhaka University Institutional Repository*

# সপ্তম অধ্যায়


## হাজী শরী'অতুল্লাহর বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের মূল্যায়ন ১৮২-২৬৯

**৭.১ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের বহুমাত্রিকতা** ১৮৩

৭.১.১ বাংলায় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ১৮৩

৭.১.২ ফরায়েযী আন্দোলনের তৃণমূল রূপ ১৮৫

৭.১.৩ হাজী শরী'অতুল্লাহর বহুমাত্রিক মুক্তি সংগ্রাম ২০৭

**৭.২ ফরায়েযী আন্দোলনের মূল্যায়ন** ২১২

৭.২.১ হাজী শরী'অতুল্লাহর বহুমাত্রিক সংস্কারের আহ্বান ২১২

৭.২.২ হাজী শরী'অতুল্লাহ একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক মূল্যায়ন ২১৫

৭.২.৩ ফরায়েযী আন্দোলন প্রসঙ্গে জেম্‌স ওয়াইজের মূল্যায়ন ২১৯

**৭.৩ বর্তমান প্রেক্ষাপট ও হাজী শরী'অতুল্লাহ** ২৩৮

৭.৩.১ হাজী শরী'অতুল্লাহর লড়াই ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা ২৩৮

৭.৩.২ ফরায়েযী আন্দোলনের অবিস্মরণীয় নেতা হাজী শরী'অতুল্লাহ্ (রহ.) ২৫৯

৭.৩.৩ মজলুম জনতার বিপ্লবী নায়ক হাজী শরী'অতুল্লাহ্ (রহ.) ২৬৮

- উপসংহার ২৭১
- পরিশিষ্ট ২৭৬
- গ্রন্থপঞ্জি ২৮৮


*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রথম অধ্যায়

## গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

১.১ গবেষণা প্রস্তাবনা

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব

১.৩ গবেষণার কর্মের উদ্দেশ্য

১.৪ গবেষণা কর্মের পদ্ধতি

১.৫ গবেষণা কর্মের পরিধি

১.৬ গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্তের উৎস

১.৭ গবেষণা কর্মের সময়কাল

১.৮ গবেষণা কর্ম পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা

১.৯ তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা

১.১০ অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা

১.১১ উপসংহার

*Dhaka University Institutional Repository*

# দ্বিতীয় অধ্যায়
## হাজী শরী‘অতুল্লাহর জীবন পরিক্রমা

**২.১ হাজী শরী‘অতুল্লাহর বাল্য ও শিক্ষা জীবন**

২.১.১ জন্ম ও শৈশব কাল

২.১.২ বাল্যকালের স্মরণীয় ঘটনা

২.১.৩ শিক্ষা জীবন

২.১.৪ জ্ঞানের সন্ধানে হুগলি গমন

২.১.৫ বিচারপতি চাচার সাথে সাক্ষাত

**২.২ হাজী শরী‘অতুল্লাহর অন্যান্য সফর**

২.২.১ পবিত্র মক্কা নগরীতে সফর

২.২.২ শরী‘অতুল্লাহর মদীনায় গমন

২.২.৩ দ্বিতীয়বার মক্কা সফর

২.২.৪ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

২.২.৫ মক্কায় ও আল-আযহারে অবস্থান

২.২.৬ তাহির সোম্বলের শিষ্যত্ব গ্রহণ

**২.৩ হাজী শরী‘অতুল্লাহর জীবন প্রবাহ ও ইন্তিকাল**

২.৩ হাজী শরী‘অতুল্লাহর মাদারিপুর প্রত্যাবর্তন

২.৩.১ গঙ্গা নদীতে দুর্ঘটনা

২.৩.২ সফল সংগঠক ও বক্তা

২.৩.৩ বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি

২.৩.৪ হাজী শরী‘অতুল্লাহর চরিত্র

২.৩.৫ হাজী শরী‘অতুল্লাহর ইন্তিকাল ও সমাধি

*Dhaka University Institutional Repository*

# তৃতীয় অধ্যায়
## ফরায়েযী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট


**৩.১ ফরায়েযী আন্দোলনের সময় বৃটিশ ও জমিদার শ্রেণির অবস্থা**

৩.১.১ ফরায়েযী আন্দোলনের উৎস

৩.১.২ ফরায়েযী আন্দোনের পরিচয়

৩.১.৩ ফরায়েযীদের পরিচয়

৩.১.৪ বৃটিশ শাসনের পূর্বে এবং সমসাময়িক বাংলার জমিদার শ্রেণির অবস্থা

**৩.২ ফরায়েযী আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি**

৩.২.১ সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

৩.২.২ ফরায়েযী আন্দোলনের তাৎক্ষণিক সাফল্য

৩.২.৩ ফরায়েযী আন্দোলনের প্রভাব

**৩.৩ ফরায়েযী আন্দোলন ও অন্যান্য অনুষঙ্গ**

৩.৩.১ ফরায়েযীদের সাথে আহলুল হাদীস এর সম্পর্ক

৩.৩.২ ফরায়েযীদের সাথে তা‘আয়্যুনি সম্প্রদায়ের যোগাযোগ

৩.৩.৩ ফরায়েযী আন্দোলনের সাথে পাটনা স্কুলের সম্পর্ক

৩.৩.৪ তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়া আন্দোলন ও ফরায়েযী আন্দোলনের সম্পর্ক


*Dhaka University Institutional Repository*

# চতুর্থ অধ্যায়
## হাজী শরী'অতুল্লাহর জীবন সংগ্রাম ও ধর্মীয় সংস্কার

**৪.১ ফরায়েযী আন্দোলনের বিভিন্ন দিক**

৪.১.১ হাজী শরী'অতুল্লাহর সংগ্রাম

৪.১.২ হাজী শরী'অতুল্লাহর সমাজ সংস্কার

৪.১.৩ ফরায়েযী বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য

৪.১.৪ ফরায়েযী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

৪.১.৫ ফরায়েযী আন্দোলনের প্রসার

৪.১.৬ ফরায়েযীদের ধর্মীয় মতাদর্শ

**৪.২ ফরায়েযীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন**

৪.২.১ ফরায়েযী আন্দোলনের ভৌগোলিক এলাকা

৪.২.২ ফরায়েযীদের সামাজিক সংগঠন

৪.২.৩ সিয়াসী বা রাজনৈতিক অংশ

৪.২.৪ গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিট খলিফাদের কার্যাবলি

৪.২.৫ তত্ত্বাবধায়ক খলিফার কার্যাবলি

৪.২.৬ সমন্বয়কারী টিম

৪.২.৭ খিলাফত প্রতিষ্ঠায় বাধা

৪.২.৮ সশস্ত্র আন্দোলন শুরু

৪.২.৯ বাংলাদেশকে দারুল হারব ঘোষণা

**৪.৩ হাজী শরী'অতুল্লাহর সমাজ গঠন**

৪.৩.১ শরী'অতুল্লাহর বৈপ্লবিক সংস্কার

৪.৩.২ সূচিত আন্দোলনের প্রকৃতি

৪.৩.৩ হাজী শরী'অতুল্লাহর পুনর্বার কলকাতায় গমন

৪.৩.৪ স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা

৪.৩.৫ বিশিষ্ট কয়েকজন ফরায়েযী নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা

Dhaka University Institutional Repository

# পঞ্চম অধ্যায়
# ফরায়েযী আন্দোলনে হাজী শরী'অতুল্লাহর উত্তরসূরিগণের ভূমিকা

**৫.১ দুদু মিয়ার জন্ম, বংশ পরিচয় ও সংগ্রামী জীবন**

৫.১.১ মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া
৫.১.২ দুদু মিয়ার শিক্ষা জীবন
৫.১.৩ দুদু মিয়ার পারিবারিক জীবন
৫.১.৪ সংগ্রামী বাহিনীর সংগঠক
৫.১.৫ ফরায়েযী আন্দোলনের প্রধান হিসেবে দুদু মিয়ার ভূমিকা
৫.১.৬ কানাইপুরের সিকদার ও ঘোষ পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযান
৫.১.৭ জমিদারগণের প্রতিক্রিয়া
৫.১.৮ দুদু মিয়ার কারাবরণ
৫.১.৯ দুদু মিয়া কর্তৃক সূচিত সংগ্রামের প্রকৃতি
৫.১.১০ দুদু মিয়ার মৃত্যু

**৫.২ হাজী শরী'অতুল্লাহর উত্তরসূরি**

৫.২.১ দুদু মিয়ার পরবর্তী নেতৃবৃন্দ
৫.২.২ আব্দুল গফুর ওরফে নয়া মিয়া
৫.২.৩ খান বাহাদুর সাইদ উদ্দীন আহমদ
৫.২.৪ হযরত পীর বাদশা মিয়া
৫.২.৫ মাওলানা পীর মোহসীন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (২য়)
৫.২.৬ পীর মুহিউদ্দীন আহমদ দাদন মিয়া
৫.২.৭ শহীদ মাওলানা প্রিন্সিপাল আবুবকর মিয়া
৫.২.৮ হাজী শরফ উদ্দীন আহমদ জুনায়েদ মিয়া
৫.২.৯ মাওলানা মঈন উদ্ দীন আহমদ জোবায়ের মিয়া
৫.২.১০ মাওলানা আবদুল্লাহ মোহাম্মাদ হাসান (জীবিত)

**৫.৩ হাজী শরী'অতুল্লাহর উত্তরসূরিদের দায়িত্ব গ্রহণ**

৫.৩.১ হাজী শরী'অতুল্লাহর চিন্তা ও দুদু মিয়ার আত্মীকরণ
৫.৩.২ দুদু মিয়ার সংগ্রামে নৈর্ব্যক্তিক সহায়ক প্রতিফলন
৫.৩.৩ অন্যান্য উত্তরসূরিবৃন্দের বুদ্ধিবৃত্তিক সমন্বয়

*Dhaka University Institutional Repository*

# ষষ্ঠ অধ্যায়
# ফরায়েযী আন্দোলনের সমসাময়িক সংস্কার আন্দোলনসমূহ


**৬.১ ফরায়েযী ও সমসাময়িক বিশ্ব আন্দোলন**
৬.১.১ হাজী শরী'অতুল্লাহর সমসাময়িক বিশ্ব ইসলামি আন্দোলনসমূহ
৬.১.২ ওয়াহাবি আন্দোলন
৬.১.৩ অন্যান্য ইসলামি আন্দোলন

**৬.২ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য ধর্মীয় আন্দোলনসমূহ**
৬.২.১ সানুসি আন্দোলন
৬.২.২ ফুলানি আন্দোলন
৬.২.৩ ফাদুরি আন্দোলন
৬.২.৪ মুহাম্মাদিয়া আন্দোলন
৬.২.৫ মাহদি আন্দোলন
৬.২.৬ তীজানিয়া আন্দোলন
৬.২.৭ তরীকা-ই-মুহাম্মাদিয়া তথা মুজাহিদুন আন্দোলন
৬.২.৮ জিহাদ ও ইসলামি আন্দোলন
৬.২.৯ তা'আয়্যুনি আন্দোলন
৬.২.১০ আহলুল হাদিস আন্দোলন

**৬.৩ এতদঞ্চলে সমসাময়িক সংস্কারসমূহ**
৬.৩.১ সমসাময়িক আন্দোলনের সাথে ফরায়েযী আন্দোলনের সাদৃশ্য
৬.৩.২ চলমান ধর্মীয় সংস্কারের সাথে ফরায়েযী আন্দোলনের বৈসাদৃশ্য
৬.৩.৩ তৎকালীন বাংলার ধর্মীয় সংস্কারের উপর ফরায়েযী আন্দোলনের প্রভাব ও ফলাফল


*Dhaka University Institutional Repository*

# সপ্তম অধ্যায়

# হাজী শরী'অতুল্লাহর বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের মূল্যায়ন

**৭.১ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের বহুমাত্রিকতা**

৭.১.১ বাংলায় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন

৭.১.২ ফরায়েযী আন্দোলনের তৃণমূল রূপ

৭.১.৩ হাজী শরী'অতুল্লাহর বহুমাত্রিক মুক্তি সংগ্রাম

**৭.২ ফরায়েযী আন্দোলনের মূল্যায়ন**

৭.২.১ হাজী শরী'অতুল্লাহর বহুমাত্রিক সংস্কারের আহ্বান

৭.২.২ হাজী শরী'অতুল্লাহ একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক মূল্যায়ন

৭.২.৩ ফরায়েযী আন্দোলন প্রসঙ্গে জেম্স ওয়াইজের মূল্যায়ন

**৭.৩ বর্তমান প্রেক্ষাপট ও হাজী শরী'অতুল্লাহ**

৭.৩.১ হাজী শরী'অতুল্লাহর লড়াই ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা

৭.৩.২ ফরায়েযী আন্দোলনের অবিস্মরণীয় নেতা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)

৭.৩.৩ মজলুম জনতার বিপ্লবী নায়ক হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)

*Dhaka University Institutional Repository*

# উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

# পরিশিষ্ট

*Dhaka University Institutional Repository*

# গ্রন্থপঞ্জি

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রথম অধ্যায়
# গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

## ১.১ গবেষণা প্রস্তাবনা (Research Proposal)

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত আলিম, সংস্কারক, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রনায়ক, ফরায়েযী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। বৃটিশ শাসিত ভারতে ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়ে কৃষক, মেহনতি শ্রমিক মানুষকে সামাজিক শোষণ নিপীড়নের কবল হতে মুক্ত করতে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ১৭৮১ খ্রি. ফরিদপুর জেলার তৎকালীন মাদারিপুর মহকুমার শিবচর থানার অন্তর্গত বন্দরখোলা পরগনার বাহাদুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আট বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। পিতার ইন্তিকালের পর তিনি চাচার নিকট লালিত পালিত হন। বার বছর বয়সে তিনি গ্রাম ছেড়ে চলে যান কলকাতায় এবং সেখানে মাওলানা বাশারত আলীর নিকট আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি কুরআন মাজীদ শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ফারসি ভাষা শেখার জন্য হুগলির ফুরফুরায় দু'বছর অতিবাহিত করেন। আঠার বছর বয়সে মাওলানা বাশারত আলীর সাথে হজ্বব্রত পালন করতে মক্কায় গমন করেন।

প্রায় ত্রিশ বছর হাজী শরী'অতুল্লাহ্ (রহ.) মক্কা ও আল-আযহার তথা মিশরে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত তাহির সোম্বলের সংস্পর্শে অবস্থান করে ধর্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ সময় তিনি আরব দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ফিরে দেখার সুযোগ পান এবং আরবীয় জনগণের আচার অনুষ্ঠানের সাথে পরিচিত হন। ১৮১৮ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এ সময় তাঁর চাচা মৃত্যুপথে। চাচার মৃত্যুর পর হাজী শরী'অতুল্লাহ্ (রহ.) ফরিদপুর থেকে ঢাকা জেলার নয়াবাড়িতে চলে আসেন। এ নয়াবাড়িতে অবস্থান করেই তিনি 'ফরায়েযী আন্দোলন' শুরু করেন। হাজী শরী'অতুল্লাহ্ (রহ.) মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ ও কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের অত্যাচার উৎপীড়ন প্রতিরোধ কল্পে ফরায়েযী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি মুসলিমগণের শুদ্ধভাবে ধর্মকর্ম সম্পাদন করার উপর জোর দেন। তিনি ফরায়েযীদের সকল অনৈসলামি কাজ করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি মুসলিমগণকে ইসলামের একত্ববাদ ও সাম্যবাদের মহান আদর্শ গ্রহণের আহ্বান জানান। সমাধি সৌধ নির্মাণ, মহররমে তাজিয়া বানানো, উরশ, শিশুর জন্ম দিবসের উৎসব, বিবাহ, মৃত্যু উপলক্ষে অধিক ব্যয়, সমাধিতে পুষ্পমাল্য প্রদান, আলোকসজ্জা, মুরিদ ও আশরাফ-আতরাফ সম্পর্ক পরিহারের জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মধ্যে তার প্রধান শর্ত ছিল দুই 'ঈদের এবং শুক্রবারের নামায না পড়া। কারণ তিনি মনে করতেন এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান কেবল মুসলিম শাসিত দেশসমূহতেই উদ্‌যাপিত হতে পারে। তিনি হিন্দু জমিদারদের পূজার সময় মুসলিমগণের নিকট থেকে কর আদায়ের অন্যায় ব্যবস্থাও বন্ধ করেন। আবার যেসব জমিদার মুসলিমগণের কুরবানি করতে নিষেধ করত তাদের এলাকায় কুরবানিরও ব্যবস্থা করতেন। হাজী শরী'অতুল্লাহ্ (রহ.) সহজেই তাঁর মতাদর্শে গরীব কৃষক, মেহনতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার লক্ষ লক্ষ কৃষক জনসাধারণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর মতাদর্শে সকল অনুগামী সমমর্যাদা সম্পন্ন বলে স্বীকৃত হয়। তিনি সাম্যের আদর্শ ভিত্তিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং

*Dhaka University Institutional Repository*

অনুসারীরাও এক মহাপরিবার বন্ধনে আবদ্ধ হন। হাজী শরী'অতুল্লাহ্ (রহ.) তাঁর আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে প্রাচীন পন্থী মোল্লা-মৌলভী ও জমিদার শ্রেণির সাথে বিরোধের সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি অতি সপ্তর্পণে তাঁর আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান। ১৮৪০ সালে তিনি নিজ গ্রামে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র ও একমাত্র সন্তান মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দিন আহমেদ ওরফে দুদু মিয়া (রহ.) ফরায়েযী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৪০ সালে যদিও হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে তথাপি ভারতের ইতিহাসে মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের যে বীজ তিনি বপন করেন এর জের বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে বহুদূর পর্যন্ত গড়ায়। সে জন্যই তাঁকে বলা হয় বাঙালি মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত।

## ১.২ গবেষণা কর্মের যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব (Rationality and Improtance of Research)

অবিভক্ত পাক-ভারতে ইসলামের আবির্ভাব হলেও এখানকার মানুষ তাদের ধর্ম-কর্ম সম্পর্কে ছিল উদাসীন। ধর্মীয় নীতি যথাযথ মানা হত না। ব্রিটিশদের শাসনে এদেশের মানুষ পিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনভাবে এদেশের মানুষ চলাফেরা করতে পারত না। যদিও ধর্মীয় অনুশাসন পালন করত তাতেও চাপিয়ে দেয়া হত অপসংস্কৃতি। যার মধ্যে শিরক বিদ'আত ছিল ভরপুর। মানুষের অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ ও কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের অত্যাচার উৎপীড়ন প্রতিরোধকল্পে ফরায়েযী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি মুসলিমগণের শুদ্ধভাবে ধর্ম-কর্ম সম্পাদন করার উপর জোর দেন। তিনি একটি আন্দোলন গড়ে তোলেন যার নাম ফরায়েযী আন্দোলন। তিনি ফরায়েযীদের সকল অনৈসলামি কাজ করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি মুসলিমগণের ইসলামের একত্ববাদ ও সাম্যবাদের মহান আদর্শ গ্রহণের আহ্বান জানান। সমাধি, সৌধ নির্মাণ, মুহররমে তাজিয়া বানানো, উরশ, শিশুর জন্ম দিবসের উৎসব, বিবাহ, মৃত্যু উপলক্ষে অধিক ব্যয় করা, সমাধিতে পুস্পমাল্য অর্পন, আলোকসজ্জা, মুরিদ ও আশরাফ-আতরাফ সম্পর্ক পরিহারের জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান। হাজী শরী'অতুল্লাহ্ (রহ.) ছিলেন এ উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রদূত। এমন অনেকে আছেন যারা তাঁর সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। কিন্তু প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক ও আনুষঙ্গিক গবেষণা তথ্যের অভাববোধ করেছেন, সে কারণে এ বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব অত্যাধিক। আর এ প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য বিষয়টিকে **হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) : ধর্মীয় সংস্কার ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর অবদান** শীর্ষক গবেষণার শিরোনাম গ্রহণ করা হয়েছে।

## ১.৩ গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য (Objective of the Research)

মেধা ও প্রতিভা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর আবিস্কার করাই হলো গবেষণার কাজ। গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হলো লুক্কায়িত সত্যের আবিস্কার। যুগ যুগ ধরে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বিভিন্ন মনীষীদের প্রেরণ করেছেন, আর এ মনীষীগণই আল্লাহ তা'আলার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর কাজ আঞ্জাম দিয়ে যান। এমনি এক ব্যক্তি হলেন উপমহাদেশের বিখ্যাত আলিম, সংস্কারক, বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রবক্তা ফরায়েযী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরী'অতুল্লাহ্ (রহ.)। তিনি দা'ওয়াতি কাজ, অপসংস্কৃতি বিরোধ, বৃটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং ফরায়েযীদের ব্যাপারে জোর আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাই এ গবেষণার

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্য হল এ মহামানবের পরিশ্রম, মেধা, বুদ্ধিমত্তা, আন্দোলন ইত্যাদির ব্যাপারে জানা এবং ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কে অবগত হওয়া।

নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যাবলিকে সামনে রেখে প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে :

- হাজী শরী'অতুল্লাহ্ (রহ.) এর জীবন ও চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা।
- তাঁর জন্ম সমসাময়িক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা এবং এ প্রেক্ষাপটে তাঁর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ও সমাজ জীবনের প্রভাব ও কার্যকারিতা তুলে ধরা।
- তাঁর নেতৃত্বে প্রণীত ও পরিচালিত ফরায়েযী আন্দোলনের পটভূমি তুলে ধরা। ফরায়েযী আন্দোলনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা ও সমকালীন পরিস্থিতিতে তাঁর মূল্যায়ন ও উপযোগিতা পরীক্ষা করা।
- সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার নির্মূলে তাঁর গৃহীত পদ্ধতি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনধারার কার্যকারিতা ও উপযোগিতা পর্যালোচনা করা। সাথে সাথে তাঁর কৃতিত্ব ও সাফল্য মূল্যায়ন করা।
- বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও বৃটিশ শাসকদের সাথে তাঁর সম্পর্ক পর্যালোচনা করা। এদেশে বৃটিশ শাসন ব্যবস্থায় তাঁর চিন্তাধারার প্রভাব তুলে ধরা।
- বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা ও এদেশের মুসলিমগণের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা। এদেশে বৃটিশ শাসনের খতিয়ান তথা এর সাফল্য-ব্যর্থতা পর্যালোচনা করা।
- এদেশে বৃটিশ শাসকদের জুলুম-নির্যাতন ও শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ও প্রভাব পর্যালোচনা করা। বৃটিশ শাসনের অবসানে তাঁর অবদান মূল্যায়ন করা।

## ১.৪ গবেষণা কর্মের পদ্ধতি (Research Methodology)

সাধারণ অর্থে গবেষণা হলো সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে যুক্তিপূর্ণ নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান লাভের বা জ্ঞান অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাকে গবেষণা বলা হয়।[১] গবেষণার আলোচ্য বিষয় প্রচলিত জ্ঞানের সাথে নতুন জ্ঞান সংযোজন করে। গবেষণার উদ্দেশ্য ও নীতিমালাকে ঠিক রেখে প্রথমে গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। বিষয় নির্বাচনের পর ধারাবাহিকভাবে গবেষণার পরিধি, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, ও উপস্থাপন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আদর্শ ও উপযুক্ত আর্ত-সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ গবেষণা অভিসর্ন্দভ প্রণয়নে কার্যোপযোগী গবেষণার ঐতিহাসিক (Historical) বর্ণনামূলক (Descriptive) বিশ্লেষণমূলক ও পর্যবেক্ষণমূলক (Observational) ধাপসমূহ অনুসরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি কার্যোপযোগী গবেষণা ধারার মাধ্যমে (Action Research Paradigm) সম্পন্ন করা হয়েছে। উপরোক্ত পদ্ধতি

১. মানসম্পন্ন গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ৪টি ধাপ হলো, ১. ঐতিহাসিক (Historical) ২. বর্ণনামূলক (Descriptive) ৩. বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) এবং ৪. পর্যবেক্ষণমূলক (Observational)। একটি গবেষণার জন্য উল্লিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করলে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর খুব গভীরে প্রবেশ করা যায় এবং একটি মানসম্পন্ন সিদ্ধান্ত দাঁড় করানো সম্ভব হয়। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে ইতিহাস, বর্ণনা, বিশ্লেষণ এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ এ ৪টি দিক যথাযথভাবে সমন্বয় করতে পারলে লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত হয়। এ গবেষণার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত ধাপসমূহ সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার অর্জিত ফলাফল যাতে টেকসই কৌশলে পরাজিত কিংবা অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত না হয় সে বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অনুসরণ করতে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ, আলোচনা ভিত্তিক বিবৃতি, যেখানে যেটা উপযোগী সেখানে সেটা প্রয়োগ করা হয়েছে।

গবেষণা বিষয়বস্তুর গভীরতা ও জনস্বার্থে সর্বজনীন প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে কখনো একক বিশ্লেষণ আবার কখনো গ্রুপভিত্তিক মতামতের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। এ গবেষণার মাধ্যম হলো বাংলা। তবে তথ্য উপাত্ত, তথ্য ও বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিক সহযোগিতার জন্য ইংরেজি, আরবী, উর্দু ও ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিও সংযুক্ত হয়েছে। এটি বাংলা ভাষায় রচিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম।

## ১.৫ গবেষণা কর্মের পরিধি (Scope of Research)

বৃটিশ শাসিত অবিভক্ত বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে জমিদার, মহাজন, আমলা ও নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার এবং ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামির হাত হতে মুসলিমগণের রক্ষা করার জন্য হাজী শরী'অতুল্লাহ্ (রহ.) ১৮১৮ সালে ফরয ভিত্তিক যে আন্দোলন শুরু করেন এদেশের ইতিহাসে তা 'ফরায়েযী আন্দোলন' নামে পরিচিত। এ আন্দোলনের মূল দার্শনিক ভিত্তি ছিল কুরআনের আদেশ- নিষেধ নিখুঁতভাবে পালন করা এবং কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী সকল কার্যক্রম বর্জন করা। এ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি মুসলিমগণের প্রতি ইসলামের একত্ববাদ ও সাম্যবাদের মহান আদর্শ গ্রহণের আহ্বান জানান। সমাধি সৌধ নির্মাণ, মুহররমে তাজিয়া নির্মাণ, উরশ, শিশুর জন্ম দিনের উৎসব, বিয়েতে অহেতুক অর্থ ব্যয়, হিন্দুদের পূজা পার্বনে মুসলিমদের অংশগ্রহণ প্রভৃতি কার্যাবলি ইসলাম বিরোধী বলে ঘোষণা করেন। মুসলিম সমাজের প্রচলিত আশরাফ-আতরাফ প্রথার বিলোপ সাধন করেন। তিনি বৃটিশ শাসিত ভারতকে 'দারুল হারব' বা শত্রু কবলিত দেশ বলে ঘোষণা করেন। তিনি 'ঈদ ও জুমু'আর নামায আদায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি বৃটিশ শাসকদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুসলিমগণের আপোষহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব অসীম সাহস এবং কৃষক শ্রমিক মজুরদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'ফরায়েযী আন্দোলন' অচিরেই সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনে পরিণত হয়ে সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলনের ফলে বাংলার কৃষক, শ্রমিক, জেলে, তাঁতী ও কারিগরদের জীবন জাগরণের স্পন্দন সৃষ্টি হয়। মুসলিমগণের জমিদার, আমলা ও নীলকরদের অত্যাচার ও নিপীড়ণের হাত থেকে উদ্ধার পেতে আত্মপ্রত্যয়ী হতে সাহায্য করে। বাংলার উদাসীন মুসলিমগণের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে তাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। সুতরাং এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনাই হবে এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুর পরিধিভুক্ত।

## ১.৬ গবেষণা কর্মের তথ্য উপাত্তের উৎস (Source of Data)

এ গবেষণা কর্মের অভিসন্দর্ভটা প্রাথমিক উৎস (Primary Source) এবং দ্বৈতীয়িক উৎসের (Secondary Source) ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। উভয়বিধ উৎস অনুসারে গবেষণা রীতির প্রতি যথেষ্ট যত্নবান থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সাথে উৎসসমূহ ব্যবহারের সময় যথাস্থানে পূর্ণ সূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে।

### প্রাথমিক উৎস (Primary Source)

প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে গবেষণার বিষয় সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি, স্কলারগণ, ইসলামী চিন্তাবিদগণ, প্রাক্তন গবেষকবৃন্দ, লেখকগণ, তাদের জীবনীমূলক রচনাবলি, পত্র-পত্রিকার সূত্র, সরাসরি সাক্ষাৎকার ইত্যাদি গবেষণা কর্মের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

### দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Source)

দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে হাজী শরী‘অতুল্লাহ্ (রহ.) ও তাঁর জীবনধারা, ফরায়েযী আন্দোলন এবং ধর্মীয় সংস্কার সম্পর্কিত দেশে বিদেশে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত ও লিখিত বই পুস্তক, থিসিস, গবেষণা, পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলিসহ রাবিতা-এ আলম আল-ইসলামি, ইউএনডিপি, ইউনেস্কো অফিস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

## ১.৭ গবেষণার কর্মের সময়কাল (Research Time Frame)

এ গবেষণার সময়কাল ৫ বছর ৬ মাস। এ সময় কালকে বিভিন্ন ভাগে বিন্যস্ত করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন ভাষায় লিখিত দেশি-বিদেশি বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন, সাময়িকী, জার্নাল, অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট, ওয়েবসাইট, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল, বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক ও হাজী শরী‘অতুল্লাহ্ (রহ.) এর নিজ বাড়ি, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাসমূহ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে হাজী শরী‘অতুল্লাহ্ (রহ.) এর উত্তরসূরিদের কাছ থেকে জেনে, তাঁর নিজ বাড়ি মাদারিপুরের শিবচরে গিয়ে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিদের সক্ষাৎকার নিয়ে জনসাধারণের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহের ভিত্তিতে যাঁচাই-বাছাই ও পুনর্মূল্যায়ন করে গবেষণা কর্মটির মানদণ্ড বজায় রেখে এটি অতি যত্নসহকারে সম্পাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম খসড়া (ড্রাফটিং), সম্পাদনা, পুন:সম্পাদনা, চূড়ান্ত প্রুফসহ থিসিসটি উপস্থাপনযোগ্য করতে সময় লেগেছে মোট ৫ বছর ৬ মাস। গবেষণা কাজে ব্যবহৃত ও ব্যয়িত মোট সময়কে নিম্নের ছকের মাধ্যমে দেখানো হল।

**ব্যয়িত সময়ের তালিকা (২০০৮ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত) :**

| কাজের ধরন | ব্যয়িত সময় |
|---|---|
| প্রথম পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ | ১৮ মাস |
| দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ | ০৯ মাস |
| ১ম ও ২য় পর্যায়ের উৎসসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন | ০৬ মাস |
| লেখা তৈরি ও সম্পাদনা | ০৬ মাস |
| জরিপ (হাজী শরী‘অতুল্লাহ্ (রহ.) বাড়ি, সাধারণ মানুষ) | ০৬ মাস |
| তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ | ০৭ মাস |
| কম্পিউটার কম্পোজ | ০৬ মাস |
| প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রুফ | ০৫ মাস |
| চূড়ান্ত প্রিন্ট, সম্পাদনা এবং বাঁধাই | ০৩ মাস |

## ১.৮ গবেষণাকর্ম পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Research)

গবেষণা কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে গবেষণা কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতার দায়ভার সম্পূর্ণ গবেষকের নিজের। গবেষণাকর্ম পরিচালনায় যে সব সীমাবদ্ধতা ছিল তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ :

Dhaka University Institutional Repository

**তথ্য ভাণ্ডারের অপর্যাপ্ততা :** বাংলাদেশের দু'একটি ছাড়া অন্যান্য লাইব্রেরিতে আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয় তথ্য ভাণ্ডারের অপ্রতুলতা। বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তির (Information Technology) ক্ষেত্রে বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটলেও বাংলাদেশের লাইব্রেরিগুলো এখনও এ প্রযুক্তিতে দুঃখজনকভাবে অনেকটাই পিছিয়ে। অনেক প্রতিষ্ঠানের MIS (Management Information Technology) অত্যন্ত দুর্বল ও অসম্পূর্ণ। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি।

**সীমিত সময়:** পিএইচ.ডি একটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ গবেষণামূলক উচ্চ শিক্ষার স্তর যা সামাজিক ক্ষেত্র ছাড়াও জাতীয় ও বৈশ্বিক পেক্ষাপটে অর্থবহ ও শক্তিশালী অবদান রাখতে সক্ষম। কিন্তু পিএইচ.ডি গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। গবেষণার জন্য বরাদ্ধকৃত সময়সীমা বেশি হলে এ ধরনের নিবিড় (Indepth) গবেষণাকর্ম আরো সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা এবং অধিক অর্থবহ করা সম্ভব হত।

**বইয়ের অপ্রতুলতাঃ হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.): ধর্মীয় সংস্কার ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর অবদান** এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ বিষয়ে বইয়ের অপ্রতুলতা রয়েছে। বিভিন্ন লাইব্রেরিতে এ বিষয়ের বই পাওয়া খুবই দুস্কর এবং ভাল মানের বই পাওয়া সম্ভব হয়নি।

## ১.৯ তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা (Literature Review)

ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান রচিত ও ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া অনূদিত 'বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস' (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০৭)। এ গ্রন্থে লেখক হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও ফরায়েযী আন্দোলনের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর জীবন চরিত্র ও তাঁর আন্দোলনের রূপরেখা তুলে ধরেছেন। যেমন- উনিশ শতকে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা, ফরায়েযী আন্দোলন, মোহসনি উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া, দুদু মিয়ার উত্তরসূরিগণ, ফরায়েযীদের ধর্মীয় মতাদর্শ, ফরায়েযী আন্দোলনের প্রতি তাইউনী বিরোধিতা, ফরায়েযীদের সামাজিক সংগঠন ও ফরায়েযী আন্দোলনের ভৌগোলিক এলাকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

মাওলানা আবদুল বাতেন নো'মান প্রণীত 'হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন' (বরিশাল : শরীয়াতীয়া লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫) গ্রন্থে লেখক হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও ফরায়েযী আন্দোলনের রূপরেখা ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখক এ বইতে গৌরবের 'শেষ প্রান্তে, মেঘে ঢাকা সূর্য, হায়রে স্বাধীনতা, বণিক যখন শাসক, অভাবক্লিষ্ট বাংলার কৃষক, রক্তচোষা জমিদার, তাঁতীরা পড়ল বিপাকে, শিক্ষা ও চাকরী বঞ্চিত মুসলিম, বেদনার নীল, যেভাবে নীল প্রস্তুত হয়, হাজী শরীয়ত উল্লাহ (রহ.)' ইত্যাদি শিরোনামে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও ফরায়েযী আন্দোলনের বিভিন্ন দিক খুব সহজ ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন যা পাঠকদের জন্য বুঝতে সহজ হয়েছে।

মোঃ আনোয়ার হোসেন বিরচিত 'ইতিহাসের ইতিহাস' (ঢাকা : মৌলি প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, একুশে গ্রন্থমেলা, ২০১১) বইখানা বারোটা প্রবন্ধের সমাহার। এ বইতে লেখক বিভিন্ন মহৎ ব্যক্তিদের নাম ও জীবনী লিখেছেন। প্রবন্ধগুলো হলো হাজী শরীয়তউল্লাহ ও সমকালীন বাস্তবতা, বঙ্গভঙ্গ ঃ আজকের বাংলাদেশ, নওয়াব সলিমুল্লাহর জীবন ও কর্ম, এ ঢাকা সেই ঢাকা, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, পৃথিবীর সব মায়েরাই সেরা, দলিত জনগোষ্ঠির অধিকার, জাতি আরেকজন জিয়ার অপেক্ষায়, গণপাঠাগার উন্নয়নে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন, ইতিহাসের পাতায় নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ, পলাশী যুদ্ধোত্তর বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রাম যুগে যুগে। এগুলোর মধ্য থেকে 'হাজী শরীয়তউল্লাহ ও সমকালীন বাস্তবতা' গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন করা হয়েছে। এতে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও সমকালীন বাস্তবতা সম্পর্কে নানাবিধ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এটা আরও বিস্তারিত হলে ভাল হত।

ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত 'ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি' (ঢাকা : বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১) বইখানিতে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কে মোট পঁয়ত্রিশটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যাতে তাঁর জীবনী ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

ঐতিহ্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত মোঃ আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত ও উপস্থাপিত 'হাজী শরী'য়তউল্লাহ (রহ.) স্বর্ণপদক-২০০৮' (ঢাকা : ঐতিহ্য ফাউন্ডেশন, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮) বইখানিতে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর উপর রচিত একটি অভূতপূর্ণ প্রবন্ধমালা সংগ্রহ। তবে এটি আকারে খুবই ছোট।

মোশাররফ হোসেন খান বিরচিত 'হাজী শরীয়তুল্লাহ' (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৯৫) বইখানাতে লেখক হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর জীবনী ও ফরায়েযী আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেছেন।

ড. আহসান উল্লাহ ফয়সাল প্রণীত 'হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম' (ঢাকা : শরীয়তিয়া প্রকাশনী, জানুয়ারি, ২০১০) গ্রন্থখানার প্রকাশক হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর ৬ষ্ঠ বংশধর ও ফরায়েযী নেতা পীরজাদা হাজী মবিন উদ্দীন আহমদ (নওশিন মিয়া)। গ্রন্থকার তাঁর এ গ্রন্থে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর জীবনী, তাঁর বংশধর, ফরায়েযীদের ইতিহাস, সমসাময়িক বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনসমূহ, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আদর্শ, দাওয়াতি কার্যক্রম ও ফরায়েযী আন্দোলনের রাজনৈতিক সংগ্রামের বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যদি বিস্তারিত লেখা হত তাহলে আরও বেশি ফলপ্রসূ হত।

ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সল লিখিত 'ঊনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দোলন' (কুষ্টিয়া : সেন্টার ফর ইসলামিক দা'ওয়াহ্ এন্ড কালচার, ফেব্রুয়ারি ২০১১) শীর্ষক গ্রন্থে বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও ফরায়েযী আন্দোলন সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

মোঃ আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত 'আলোর দিশারী হাজী শরীয়ত উল্লাহ স্মারক সম্মাননা-২০০৭' (ঢাকা : ভূমিকা প্রকাশ এ্যান্ড এ্যাডমিডিয়া, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮) বইখানাতে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর উপর একটি মনোরম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন, তবে এটা আকারে খুবই ছোট।

ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী রচিত 'বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও মতাদর্শ' (ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, আগস্ট ২০০৯) গ্রন্থে লেখক হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সংগঠিত ফারায়িযী সম্প্রদায় ও তাদের ধর্মীয় মতবাদ সংক্ষিপ্ত অথচ সৃস্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি এ গ্রন্থ আরও যেসব বিষয় উল্লেখ করেছেন তাহলো- শীআ সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত এবং তাদের মতবাদ, সুন্নী সম্প্রদায় এবং তাদের মতাদর্শ, আহলে হাদীস সম্প্রদায় ও তাদের মতাদর্শ, চারটি মাযহাবপন্থি ও তাদের ভাবধারা, সূফী তরীকাপন্থি ও তাদের কার্যাবলি, দেওবন্দী উলামা এবং অদেওবন্দী উলামা ও তাদের ধ্যান-ধারণা,

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশাগত উলামা শ্রেণি ও তাদের ভাবধারা ও কার্যাবলি, বাহাই সম্প্রদায় এবং তাদের মূলনীতি এবং আহমদিয়া সম্প্রদায় এবং তাদের চিন্তাধারা।

ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত 'ফরায়েজী আন্দোলন এক বহুমাত্রিক মুক্তি সংগ্রাম' (ঢাকা : বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ২০১২) বইখানিতে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও ফরায়েযী আন্দোলন ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ্ মোহাম্মদ হাসান রচিত 'তরীকুল জান্নাহ্ বা জান্নাতের পথ' (বাহাদুরপুর : শারিয়াতীয়া আস্তানা, জুলাই, ২০০৫) শীর্ষক ছোট্ট পুস্তিকায় হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক প্রচারিত ইসলামের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ও আমলমূলক বিষয়াদির আলোচনা স্থান পেয়েছে।

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার রচিত এম. আনিসুজ্জামান অনূদিত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, পুনর্মুদ্রণ ২০১৪) শীর্ষক গ্রন্থে লেখক চারটা পরিচ্ছেদে বৃটিশ শাসন আমলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থে লেখক সীমান্তে বিদ্রোহী শিবির, সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অবিরাম ষড়যন্ত্র, শাহ নিয়ামত উল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী, তিনটি শর্ত– যার ফলে একটা ইসলামি দেশ দারুল হারব বা শত্রুদেশে পরিণত হয়, বৃটিশ শাসনে ভারতীয় মুসলিমদের অন্যায়, বাংলায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বন্টনের খতিয়ান : এপ্রিল ১৮৭১ শীর্ষক শিরোনামে বৃটিশ শাসনে বাংলার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

আব্বাস আলী খান রচিত 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৭ম প্রকাশ, জুন ২০১১) শীর্ষক গ্রন্থে ৭১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ের বাংলার মুসলিমদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে প্রায় দু'শ বছর যাবত মুসলিমদের প্রতি বৃটিশ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার-নিপীড়নের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৩) গ্রন্থখানা সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ-এর দীর্ঘজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণীত। এ গ্রন্থ থেকে রাজনীতির ক খ, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, বেংগল প্যাক্ট, ময়মনসিংহে সংগঠন, পুলিশ সুপার টেইলারের সাথে সাক্ষাৎকারসহ বৃটিশ শাসন আমলের অনেক মৌলিক প্রশাসনিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মাহবুবুর রহমান, 'বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৯৭১ খ্রি.)' (২০০৯) অত্র বইতে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) সহ অন্যান্য মনীষীগণের জীবনী ও ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

## ১.১০ অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা (Structure of the Study)

গবেষণার সুবিধার্থে **হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.): ধর্মীয় সংস্কার ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর অবদান** শীর্ষক এ পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভকে ৭টি অধ্যায় এবং প্রত্যেক অধ্যায়কে কয়েকটি করে পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। তবে 'পরিচ্ছেদ' শব্দটা না লিখে সেখানে ক্রম সংখ্যার মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার শিরোনাম এবং অনুচ্ছেদের বর্ণনা নিম্নরূপ :

### প্রথম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে মূলত 'গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা'র বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণার অবতরণিকা এ অধ্যায়ে প্রস্তুত

*Dhaka University Institutional Repository*

করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। যার মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য, গবেষণা কর্মের পদ্ধতি, গবেষণা কর্মের পরিধি, গবেষণা কর্মের তথ্য উপাত্তের উৎস, গবেষণা কর্মের সময়কাল, গবেষণাকর্ম পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা, তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা, অভিসর্ন্দভ গঠন পরিকল্পনা, উপসংহার ইত্যাদি ধারাবাহিক পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায় 'হাজী শরী'অতুল্লাহর জীবন পরিক্রমা' বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে পরিচ্ছেদ হলো- হাজী শরী'অতুল্লাহর বাল্য ও শিক্ষা জীবন, হাজী শরী'অতুল্লাহর অন্যান্য সফর, হাজী শরী'অতুল্লাহর জীবন প্রবাহ ও ইন্তিকাল। এর যেসব শিরোনাম দেয়া হয়েছে তাহলো– জন্ম ও শৈশব কাল, বাল্যকালের স্মরণীয় ঘটনা, শিক্ষা জীবন, জ্ঞানের সন্ধানে হুগলি গমন, বিচারপতি চাচার সাথে সাক্ষাত, পবিত্র মক্কা নগরিতে সফর, শরী'অতুল্লাহ এর মদীনায় গমন, দ্বিতীয় বার মক্কা সফর, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, মক্কায় ও আল-আযহারে অবস্থান, তাহির সোম্বলের শিষ্যত্ব গ্রহণ, হাজী শরী'অতুল্লাহর মাদারিপুর প্রত্যাবর্তন, গঙ্গা নদীতে দুর্ঘটনা, সফল সংগঠক ও বক্তা, বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি, হাজী শরী'অতুল্লাহর চরিত্র, হাজী শরী'অতুল্লাহর ইন্তিকাল, হাজী শরী'অতুল্লাহর সমাধি। উল্লিখিত বিষয়বস্তু ও আলোচনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

## তৃতীয় অধ্যায়

অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে 'ফরায়েযী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট' সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। বিষয়টি বিশ্লেষণের জন্য আরও যেসব পরিচ্ছেদ নেয়া হয়েছে তাহলো- ফরায়েযী আন্দোলনের সময় বৃটিশ ও জমিদার শ্রেণির অবস্থা, ফরায়েযী আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি, ফরায়েযী আন্দোলন ও অন্যান্য অনুষঙ্গ। উক্ত বিষয়ের শিরোনামে যেসব আলোচনা এসেছে সেগুলো হলো- ফরায়েযী আন্দোলনের উৎস, ফরায়েযী আন্দোলনের পরিচয়, ফরায়েযীদের পরিচয়, ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এবং সমসাময়িক বাংলার জমিদার শ্রেণির অবস্থান, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ফরায়েযী আন্দোলনের তাৎক্ষনিক সাফল্য, ফরায়েযী আন্দোলনের প্রভাব, ফরায়েযীদের সাথে আহলুল হাদিস এর সম্পর্ক ফরায়েযীদের সাথে তা'আয়্যুনি সম্প্রদায়ের যোগাযোগ, ফরায়েযী আন্দোলনের সাথে পাটনা স্কুলের সম্পর্ক, তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের ও ফরায়েযী আন্দোলনের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নেয়া হয়েছে।

## চতুর্থ অধ্যায়

বিজাতিদের সংস্কৃতির প্রতিবাদই ছিল তাঁর সংগ্রাম। এ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো 'হাজী শরী'অতুল্লাহর জীবন সংগ্রাম ও ধর্মীয় সংস্কার' এতে আরও যেসব পরিচ্ছেদে স্থান পেয়েছে তাহলো- ফরায়েযী আন্দোলনের বিভিন্ন দিক, ফরায়েযীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন, হাজী শরী'অতুল্লাহর সমাজ গঠন। এ বিষয়ের শিরোনামে যা এসেছে তাহলো- হাজী শরী'অতুল্লাহর সংগ্রাম, হাজী শরী'অতুল্লাহর সমাজ সংস্কার, ফরায়েযী বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য, ফরায়েযী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য, ফরায়েযী আন্দোলনের প্রসার, ফরায়েযীদের ধর্মীয় মতাদর্শ, ফরায়েযী আন্দোলনের ভৌগোলিক এলাকা, ফরায়েযীদের সামাজিক সংগঠন, সিয়াসী বা রাজনৈতিক অংশ, গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিট খলিফাদের কার্যাবলি, তত্ত্বাবধায়ক খলিফার কার্যাবলি, সমন্বয়কারী টিম, খিলাফত প্রতিষ্ঠায় বাঁধা, সশস্ত্র আন্দোলন শুরু, বাংলাদেশকে দারুল হারব ঘোষণা, শরী'অতুল্লাহর বৈপ্লবিক সংস্কার, সূচিত আন্দোলনের

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রকৃতি, হাজী শরী'অতুল্লাহ'র পুনর্বার কলকাতায় গমন, স্বাধীন রাজ্য স্থাপন পরিকল্পনা, বিশিষ্ট কয়েকজন ফরায়েযী নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা এসেছে।

**পঞ্চম অধ্যায়**

অভিসন্দর্ভের এ অধ্যায়ে 'ফরায়েযী আন্দোলনে হাজী শরী'অতুল্লাহর উত্তরসূরিগণের ভূমিকা' শীর্ষক শিরোনামে যা স্থান পেয়েছে তাহলো- দুদু মিয়ার জন্ম, বংশ পরিচয় ও সংগ্রামী জীবন, হাজী শরী'অতুল্লাহর উত্তরসূরি, হাজী শরী'অতুল্লাহর উত্তরসূরিদের দায়িত্ব গ্রহণ। উক্ত অধ্যায়ের শিরোনামে তাঁর উত্তরসূরিদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া, দুদু মিয়ার শিক্ষা জীবন, দুদু মিয়ার পারিবারিক জীবন, সংগ্রামী বাহিনীর সংগঠক, ফরায়েযী আন্দোলনের প্রধান হিসেবে দুদু মিয়ার ভূমিকা, কানাইপুরের সিকদার ও ঘোষ পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযান, জমিদারগণের প্রতিক্রিয়া, দুদু মিয়ার কারাবরণ, দুদু মিয়া কর্তৃক সূচিত সংগ্রামের প্রকৃতি, দুদু মিয়ার মৃত্যু, দুদু মিয়ার পরবর্তী নেতৃবৃন্দ, আব্দুল গফুর ওরফে নয়া মিয়া, খান বাহাদুর সাইদ উদ্দীন আহমদ, হযরত পীর বাদশা মিয়া, মাওলানা পীর মোহসীন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (২য়), পীর মুহিউদ্দীন আহমদ দাদন মিয়া, শহীদ মাওলানা প্রিন্সিপাল আবুবকর মিয়া, হাজী শরফ উদ্দীন আহমদ জুনায়েদ মিয়া, মাওলানা জুবায়ের মিয়া, মাওলানা আবদুল্লাহ মোহাম্মাদ হাসান (জীবিত), হাজী শরী'অতুল্লাহর চিন্তা ও দুদু মিয়ার আত্মীকরণ, দুদুমিয়ার সংগ্রামে নৈর্ব্যক্তিক সহায়ক প্রতিফলন, অন্যান্য উত্তরসূরিবৃন্দের বুদ্ধিবৃত্তিক সমন্বয় প্রমূখ।

**ষষ্ঠ অধ্যায়**

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর অন্যতম অবদান হল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। এ অধ্যায়ের শীর্ষ লাইন হল 'ফরায়েযী আন্দোলনের সমসাময়িক সংস্কার আন্দোলনসমূহ'। অত্র অধ্যায়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে যা স্থান পেয়েছে তাহলো- ফরায়েযী ও সমসাময়িক বিশ্ব আন্দোলন, মুসলিম বিশ্বে অন্যান্য ধর্মীয় আন্দোলনসমূহ, এতদঞ্চলে সমসাময়িক সংস্কারসমূহ। যার মধ্যে শিরোনাম হিসেবে আরও আছে- হাজী শরী'অতুল্লাহ সমসাময়িক বিশ্ব ইসলামি আন্দোলনসমূহ, ওয়াহাবি আন্দোলন, অন্যান্য ইসলামি আন্দোলন, সানুসি আন্দোলন, ফুলানি আন্দোলন, ফাদুরি আন্দোলন, মুহাম্মাদিয়া আন্দোলন, মাহদি আন্দোলন, তীজানিয়া আন্দোলন, তরীকা-ই-মুহাম্মাদিয়া তথা মুজাহিদুন আন্দোলন, জিহাদ ও ইসলামি আন্দোলন, তা'আয়্যুনি আন্দোলন, আহলে হাদিস আন্দোলন, সমসাময়িক আন্দোলনের সাথে ফারায়েযী আন্দোলনের সাদৃশ্য, চলমান ধর্মীয় সংস্কারের সাথে ফারায়েযী আন্দোলনের বৈসাদৃশ্য, তৎকালীন বাংলার ধর্মীয় সংস্কারের উপর ফারায়েযী আন্দোলনের প্রভাব ও ফলাফল প্রভৃতি।

**সপ্তম অধ্যায়**

উক্ত অধ্যায়ের শিরোনাম হলো- 'হাজী শরী'অতুল্লাহর বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের মূল্যায়ন'। এ অধ্যায়ের মধ্যে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে যা উল্লেখ রয়েছে তাহলো- বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের বহুমাত্রিকতা, ফরায়েযী আন্দোলনের মূল্যায়ন, বর্তমান প্রেক্ষাপট ও হাজী শরী'অতুল্লাহ। আরও যে শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে তাহলো- বাংলায় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, ফরায়েযী আন্দোলনের তৃণমূল রূপ, হাজী শরী'অতুল্লাহর বহুমাত্রিক মুক্তি সংগ্রাম, হাজী শরী'অতুল্লাহর বহুমাত্রিক সংস্কারের আহ্বান, হাজী শরী'অতুল্লাহ একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক মূল্যায়ন, ফরায়েযী আন্দোলন প্রসঙ্গে জেম্স ওয়াইজের মূল্যায়ন, হাজী শরী'অতুল্লাহর লড়াই ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা, ফরায়েযী আন্দোলনের অবিস্মরণীয় নেতা

*Dhaka University Institutional Repository*

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.), মজলুম জনতার বিপ্লবী নায়ক হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) উল্লেখযোগ্য।

## ১.১১ উপসংহার (Conclusion)

অভিসন্দর্ভের শেষ পর্যায়ে উপসংহার (Conclusion) লেখা হয়েছে। উপসংহার হিসেবে এতে সমগ্র অভিসন্দর্ভের সার-নির্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে যে অনুভূতিতে এর উপাত্ত প্রস্তত করা হয়েছে সে বিষয়ে নিজের একান্ত অভিব্যক্তি প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর পরিশিষ্টে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও তাঁর বংশধরগণের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু প্রামাণ্য আলোকচিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। সবশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযোগ করা হয়েছে যা দ্বারা শিক্ষার্থী, গবেষকবৃন্দ ও সাধারণ জনগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়। এ অভিসন্দর্ভ থেকে জাতি কিংবা কোন ব্যক্তি যদি সামান্যতম উপকৃত হন তাহলে গবেষকের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# হাজী শরী‘অতুল্লাহর জীবন পরিক্রমা

## ২.১ হাজী শরী‘অতুল্লাহর বাল্য ও শিক্ষা জীবন

### ২.১.১ জন্ম ও শৈশব কাল

বাংলায় ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় সংস্কারক ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের মহানায়ক হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) ১৭৮১ সালের ১০ মার্চ বর্তমান মাদারিপুর জেলার শিবচর থানার বাহাদুরপুর গ্রামে বিখ্যাত তালুকদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতা আব্দুল জলিল তালুকদার স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রজাবৎসল তালুকদার হিসেবে অন্যান্য তালুকদারের ন্যায় প্রজাদের উপর জুলুম নির্যাতন করেননি। তিনি অতি ভদ্র, বিনয়ী ও দয়ালু ছিলেন। জনাব আব্দুল জলিল তালুকদারের আরও দুই ভাই যথাক্রমে আব্দুল আজিম তালুকদার ও মোহাম্মদ আশিক তালুকদার। হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর ছোট চাচা আলিমে দ্বীন ও মুফতি আশিক তালুকদার মুর্শিদাবাদের প্রধান বিচারপতি ছিলেন।[২] তৎকালীন সময়ের এক শিক্ষিত পরিবারের সন্তান হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.)। ১৭৮৯ সালে তাঁর বয়স যখন ৮ বছর তখনই পুত্র হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) ও কন্যা ফাতেমা বেগমকে রেখে আব্দুল জলিল তালুকদার ইন্তিকাল করেন এবং হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) খুব ছোট বয়সেই মাতৃহারা হন। চাচা আজিম তালুকদার নিঃসন্তান ছিলেন বিধায় তিনি হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) ও ফাতেমার লালন-পালনের দায়িত্ব আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করেন। চাচা-চাচীর অসীম স্নেহ-মমতা ও ভালবাসার মধ্যে হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) বাংলা শিক্ষাসহ দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করেন।

হাজী শরী‘অতুল্লাহর প্রাথমিক শিক্ষার জ্ঞান শুরু হয় নিজ বাড়ির মক্তবে।[৩] তিনি উস্তাদের কাছে আরবি বর্ণমালা রপ্ত করেন। সে সময় মুসলিম ছাত্রদের অধিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল না। কেননা বৃটিশ বেনিয়া ও হিন্দু জমিদারগণের ষড়যন্ত্রের ফলে মক্তবে কোনো ইসলামি শিক্ষা বা মুসলিম শিক্ষকের স্থান ছিল না। এমনকি পাঠ্য পুস্তকে ইসলামি ধ্যান বা ভাবধারা সম্পন্ন কোনো গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতা ছিলনা। যা ছিল তা শুধু হিন্দু ধর্মের আলোকে দেব-দেবীর কাহিনী সম্বলিত। হিন্দুয়ানী পরিবেশে লেখাপড়া না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) একাকী নিজ গৃহে চাচার কাছে শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন।

---

১ গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া কর্তৃক সম্পাদিত, *আলোর দিশারী*(ঢাকা : ভূমিকা প্রকাশ এন্ড এ্যাড মিডিয়া, ২০০৭), পৃ. ৯; সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ(২)*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃ. ৭৮

২ মোশাররফ হোসেন খাঁন, *হাজী শরীয়তুল্লাহ*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫), পৃ. ১২

৩ মক্তব বলতে গ্রামের সকাল বেলার পাঠশালাকে বুঝানো হয়েছে। যেখানে আল-কুরআন পঠন ও প্রয়োজনীয় দু‘আ দরূদ শেখানো হয়।

## ২.১.২ বাল্যকালের স্মরণীয় ঘটনা

শরী'অতুল্লাহ (রহ.) প্রতিদিন সকালে চাচার সাথে মসজিদে ফজর নামায আদায়ের পর মসজিদের মক্তবে ছেপারা (আমপারা) পড়তেন। পড়ার শেষে নাস্তা খাবার পর প্রতিবেশি ছেলেদের সাথে খেলায় মেতে উঠতেন। হা-ডু-ডু, কানামাছি, গোল্লাছুট খেলা ছিল সে কালের ছেলেদের প্রিয় খেলা।

একদিনের একটা ঘটনা এরূপ ছিল, জৈষ্ঠ্য মাসে গাছে-গাছে পাকা আম ঝুলছে। বালক শরী'অতুল্লাহ চাচীর অনুমতি নিয়ে প্রতিবেশি সমবয়সী সাথীদের সঙ্গে বাড়ি হতে কিছু দূরের আম বাগানে যান।[৪] সকলের হাতে আম কাটার জন্য ছোট ছুরি ছিল। সাথীদের মধ্যে কেউবা গাছে উঠে, কেউবা ঢিল ছুড়ে আম পেড়ে নিজ নিজ ছুরি দ্বারা আম কেটে খাচ্ছিল। বাগানের মধ্যে বিশাল বেঁত ঝাড়ের মধ্যে যে আম গাছটি ছিল তার ডাল ভরা ছিল পাঁকা আম। কিন্তু বেঁত-কাটা জড়ানো গাছটিতে উঠার সাধ্য কারও ছিল না। সাথীরা ঢিল ছুড়ে আম পাড়তে ব্যস্ত। এক সাথী নিজ হাতের ছুরি নিক্ষেপ করল মনকাড়া একটা পাকা আম লক্ষ্য করে। ছুরিটা আমের গায়ে না লেগে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা শান্ত স্বভাবের শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর মাথায় গিয়ে পড়ে এবং ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। চিৎকার করে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। গায়ের জামা ও লুঙ্গিটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেল। সাথী ছেলেরা ভাবল প্রভাবশালী আজিম তালুকদার জানলে অবশ্যই তাদের কঠিন শাস্তি হতে পারে। তাই ছেলেরা তাঁকে একাকি বাগানে রেখে সকলেই পালিয়ে গেল।[৫]

কিছু সময় পর ক্ষত হতে রক্ত ঝরা বন্ধ হলে তিনি নিজ জামা ও লুঙ্গির রক্ত বাগানের ডোবার পানিতে পরিস্কার করে নিলেন। মাথার ক্ষত যেন কেউ না দেখে এজন্য সাথে থাকা গামছা দিয়ে সুন্দর করে পাগড়ি বেঁধে বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে চাচা-চাচীর নজর এড়িয়ে খাওয়া দাওয়া করে সন্ধ্যার সাথে সাথেই নিজ বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লেন। সকলকে এড়িয়ে চলার অষ্টম দিনে চাচা আজিম তালুকদার শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে সাথে করে দুপুরের আহারে বসেছেন। চাচী আম্মা খানা পরিবেশন ও তাল পাখার বাতাস দিচ্ছিলেন। চাচী আম্মা তাকে বললেন যে, জৈষ্ঠ্যের প্রচণ্ড গরমে সপ্তাহ খানেক ধরে সে পাগড়ি পরে আছ কেন? তিনি তাকে বুঝালেন, পাগড়ি খুলে ফেললে মাথায় বাতাস লাগবে। এ বলে চাচী আম্মা মাথার পাগড়ি টান দিয়ে খুলে ফেলতেই তাঁর মাথায় বিরাট এক ক্ষত দেখতে পেলেন। প্রচণ্ড গরমে ছুরির কাটাক্ষত পুঁজে ভরা। তা দেখে চাচী চিৎকার করে উঠলেন এবং চাচা এতে নির্বাক। শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর

---

৪ মাওলানা আব্দুল বাতেন নোমান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*(বরিশাল : শরীয়াতিয়া লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ২০০৫), পৃ. ৬১

৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

*Dhaka University Institutional Repository*

একমাত্র বোন[৬] চাচীর কান্নার আওয়াজে কাছে এসে ভাই এর মাথায় ক্ষত দেখে হত-বিহ্বল হয়ে পড়ল। জৈষ্ঠ্যের আম পাঁকানো গরমে শরী'অতুল্লাহ (রহ.) গামছা দিয়ে যে পাগড়ি বেঁধেছিলেন তাতে সুন্দর ফর্সা গোলগাল চেহারার বালক শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। গ্রামের সমবয়সী বন্ধুরা বিদ্রুপ করে তাকে 'হাজী' বলে ডাকত। কেননা সেকালে শুধুমাত্র হজ্জ সম্পাদনকারী ব্যক্তিরাই মাথায় পাগড়ি বাঁধত।

সাথীদের বিদ্রুপের খেতাব 'হাজী' শব্দটি আল্লাহ কবুল করেন। তিনি তার পরবর্তীকালে শুধু হজ্জই করেননি পূণ্যভূমি মক্কায় দীর্ঘ বিশ বছর ছাত্র ও শিক্ষকতায় জীবন অতিবাহিত করেন। প্রতিবছর সারা বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ পবিত্র হজ্জ পালন করে থাকেন। কিন্তু কোনো হাজীই তার নামকে ইতিহাসের পাতায় 'হাজী' হিসেবে স্থান করিয়ে নিতে পারেননি। গোটা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একজন মাত্র হাজীই শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে থাকলেন। তিনি হচ্ছেন বিজ্ঞ আলিমে দ্বীন, বিশিষ্ট ফক্বিহ, মা'রিফাতের চেরাগ, সংগ্রামী ও সংস্কারক হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। হুগলিতে অবস্থানকালে তিনি জানতে পারেন যে, মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারের প্রধান কাযী তথা প্রধান বিচারপতি তাঁর আপন ছোট চাচা মুফতি মোহাম্মদ আশিক। চাচার সাথে সাক্ষাতের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। মাদরাসায় একাধারে দু'বছর অধ্যয়নের পর অভিভাবক মাওলানা বাশারাত আলীর সাথে দেখা করার জন্য কলকাতায় ফিরে গেলেন। স্নেহের শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে দু'বছর পর পেয়ে ভরে গেল মাওলানা বাশারাত আলীর বুক। সপ্তাহ খানেক অবস্থানের পর অভিভাবকের নিকট বিনীতভাবে জানালেন, লোক মুখে জানতে পেরেছি আমার আপন ছোট চাচা মুফতি মোহাম্মদ আশিক মুর্শিদাবাদ নবাব আদালতের প্রধান কাযীর পদ অলংকৃত করে আছেন।

বহুদিন হয় আপনজনকে ছেড়ে রাতের আঁধারে কাউকে না বলেই তিনি ইলম অন্বেষণে বাড়ি ছেড়েছেন। হুগলিতে বসে বার-বার আপনজনকে দেখার জন্য মন কাঁদলেও লেখাপড়ার ক্ষতি চিন্তা করে সেদিকে তিনি পা বাড়াননি। সম্মানিত উস্তাদের অনুমতি নিয়ে তিনি মুর্শিদাবাদ গিয়ে চাচার সাথে দেখা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। মাওলানা বাশারাত আলী প্রিয়ছাত্র শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর মনবেদনা বুঝলেন। অনুমতি দিয়ে বললেন, 'প্রিয় শরীয়ত! মুর্শিদাবাদের প্রধান কাযী মুফতি মোহাম্মদ আশিক তোমার আপন চাচা জেনে খুশি হলাম। তার সাথে দেখা করার জন্য যেতে চাও এটা খুশির বিষয়। তাকে আমার সালাম দিও। যেখানেই তুমি থাক না কেন, ইলম অর্জনের বিষয় অমনোযোগী হয়ো না। তোমাকে একদিন বিজ্ঞ আলিম হতে হবে। আমার কাছে আসার কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে অবশ্যই বিনা দ্বিধায় আসবে। আমি তোমাকে সর্বাবস্থায় সহায়তা করব।'[৭]

---

৬ হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর একটি বোন ছিল তার নাম ফাতিমা। দ্র. মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

৭ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*(ঢাকা : বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১), পৃ. ১৭৭

*Dhaka University Institutional Repository*

## ২.১.৩ শিক্ষা জীবন

শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কলিকাতা এবং হুগলিতে যে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন তা-ই মক্কায় উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। মক্কায় প্রাপ্ত শিক্ষাই তাঁকে পরবর্তীকালে মহান নেতৃত্ব দেয়ার প্রেরণা দেয়। গবেষকগণ হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর জীবনের কালপঞ্জি সম্পর্কে একমত নন। তবে সমসাময়িক ও পরবর্তী লেখকদের মতে তিনি ১৮ বছর বয়সে মক্কা যান এবং ২০ বছর পর বাংলায় ফিরে আসেন।[৮] তার সমাধিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুযায়ী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর জীবনের কালপঞ্জিতে দেখা যায়, তিনি ১৭৯৯ থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে মক্কায় অবস্থান করেন। তাঁর পরবর্তী জীবন অর্থাৎ প্রচারক হিসেবে তাঁর ভূমিকা মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে, আরব দেশে অবস্থান করে তিনি যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তা-ই তাঁর দিশারি হিসেবে কাজ করেছিল। জেমস্ ওয়াইজ এবং হিদায়েত হোসেনের মতে তিনি আরব থেকে একজন উত্তম আরবি পণ্ডিত ও তার্কিক হিসেবে ফিরে আসেন। তাঁর সমাধি শিলালিপিতে তাঁকে সকল জ্ঞানীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী, সুমধুর ও সুশ্রাব্য ধ্বণিতে ঐশীবাণী প্রচারক, হিন্দুস্তান ও বাংলায় সকল কিছুর প্রদর্শক, শিয়া এবং অন্যান্য অবিশ্বাসীদের থেকে ধর্ম রক্ষাকারী, সকল মিথ্যাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাহসী যোদ্ধা, তমসাচ্ছন্ন ইসলামি আকাশে সত্যের প্রচারক বিশেষণে ভূষিত করা হয়।[৯] শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর আরব দেশে অবস্থানের সময়টিকে দু'টি ধাপে বিভক্ত করা যায়।

(১) প্রথম ধাপে শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর প্রাথমিক বছরগুলোতে মক্কায় বসবাসকারী বাঙালি মওলানা মুরাদের বাসগৃহে অবস্থান করে আরবি সাহিত্য এবং ইসলামি আইনশাস্ত্র শিক্ষা করেন। মক্কায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর এ শিক্ষা সহায়তা দিয়েছিল।

(২) দ্বিতীয় ধাপটি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে তিনি ১৪ বছর সময় ধরে হানাফি আইনজ্ঞ তাহির সোম্বলের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ফরায়েযীদের মতে তাহির সোম্বল ছোট আবু হানিফা নামে খ্যাত একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।[১০] এ জ্ঞানী ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে হাজী শরীয়তুল্লাহ (রহ.) ধর্মীয় বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে তিনি সুফিবাদের রহস্যসমূহ সম্পর্কে অবগত হন। ফরায়েযীগণ সে সময় থেকে অদ্যাবধি উক্ত তরীকার অনুসারী হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করে।

---

৮ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ জুন ২০০৭), পৃ. ৭২

৯ Jemes Wise, *Notes on the Races, custes and trades of Eastern Bengal*(Calcutta : Bisha Bengal Publishers, 1884), p. 22

১০ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া(৬)*(ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

## ২.১.৪ জ্ঞানের সন্ধানে হুগলি গমন

অভিভাবক ও উস্তাদ  মাওলানা বাশারাত আলীর অনুপ্রেরণায় শরী'অতুল্লাহ (রহ.) রওয়ানা হন হুগলির বিখ্যাত ফুরফুরা মাদরাসায় ইলম হাসিলের জন্য।[১১] প্রয়োজনীয় জামা-কাপড়, বিছানা-পত্র এবং নগদ কিছু টাকা দিলেন শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর হাতে মাওলানা বাশারাত আলী। পুত্র সমতুল্য ছাত্রকে দু'আ করে বিদায় করার সময় কিছু নসিহতও করে দিলেন। তিনি হুগলির বিখ্যাত ফুরফুরা মাদরাসায় পৌঁছে তথায় ভর্তি হয়ে মনোযোগের সাথে লেখাপড়া করতে লাগলেন। মাত্র দু'বছরের মধ্যেই তিনি ইলমে দ্বীনের অনেক কিতাব আয়ত্ব করেন। উর্দু ও ফারসি ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেন।[১২] হুগলি মাদরাসায় অধ্যয়নকালে তিনি তাঁর কলকাতার অভিভাবক মাওলানা বাশারাত আলীর[১৩] সাথে পত্র যোগাযোগ রাখতেন। মাদরাসার বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য খরচের টাকা মাওলানা বাশারাত আলী পাঠিয়ে দিতেন তার প্রিয়ছাত্র শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর কাছে। হুগলি মাদরাসায় অধ্যয়নকালে তিনি তাঁর বাড়ির কথা ভাবতেন। মনে হত চাচা আব্দুল আজিম তালুকদার ও মায়ের আদর স্নেহের পরশ দেয়া চাচী আম্মার কথা। ব্যাকুল হতেন পিতা-মাতা হারানো বোনটির কথা স্মরণ করে। যে বোনটিকে ছোট রেখে তিনি বাড়ি থেকে চলে এসেছেন, সে বোনটি এখন কার কাছে কীভাবে আছে সে কথা মনে করে তিনি তার জন্য  চিন্তা করতেন। কিন্তু লেখাপড়ার ক্ষতি হবে চিন্তা করে আবার নিজেকে সামলিয়ে নিতেন।

## ২.১.৫ বিচারপতি চাচার সাথে সাক্ষাত

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মনের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ নিয়ে, রক্তের টানে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে কলকাতা হতে মুর্শিদাবাদ গেলেন এমন এক আপনজনের সাথে সাক্ষাত করতে যাকে তিনি কোনোদিনও চোখে দেখেননি। কেবল মুখেই শুনেছেন তিনি তার আপন চাচা।[১৪] তিনি মুর্শিদাবাদ নবাব আদালতের প্রধান কাযী।[১৫] ভাবছেন আর পথ চলছেন, লোক মুখে শোনা কথা, প্রধান কাযী তার চাচা। শোনা কথা যদি সত্য না হয় অবশ্যই তাকে লজ্জা পেতে হবে। আইন যখন তাঁর হাতেই শাস্তি দিলেও করার কিছু থাকবে না। মুর্শিদাবাদ নবাব আদালতের এজলাসে প্রধান বিচারপতি মামলার শুনানি কার্য পরিচালনা করছেন। আদালত চত্বরে বিচার প্রার্থীদের প্রচণ্ড ভীড়। সে ভীড় ঠেলে শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এজলাসের সামনে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন প্রধান কাযীকে। কাযীর চেহারায় তার চাচা আব্দুল আজিম

১১ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

১২ মোশাররফ হোসেন খাঁন, *হাজী শরীয়তুল্লাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১৩ মাওলানা বাশারত আলী দেওবন্দ মাদরাসার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, আলিমে দ্বীন, ফকীহ ও আধ্যাত্মিক পণ্ডিত ছিলেন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কলকাতায় গিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১৪ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

১৫ মোশাররফ হোসেন খাঁন, *হাজী শরীয়তুল্লাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

*Dhaka University Institutional Repository*

তালুকদারের কিছু মিল রয়েছে। বাল্যকালেই পিতৃহারা হওয়ার কারণে পিতার চেহারা তার স্মৃতিতে ভাসমান ছিল না।

মামলার শুনানি শেষ করে প্রধান কাযী মুফতি মোহাম্মদ আশিক খাস কামরায় চলে গেলে যুবক শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এক টুকরো কাগজে নিজের নাম, পিতার নাম ও গ্রামের ঠিকানা লিখে খাস কামরার আর্দালির নিকট দিলেন প্রধান কাযীর কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য। প্রধান কাযী[১৬] ডাকলেন সাক্ষাৎ প্রার্থী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে। সমস্ত পরিচয় পাওয়ার পর জড়িয়ে ধরলেন প্রধান কাযী মুফতি মোহাম্মদ আশিক আপন বড় ভাই এর ছেলে শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে। অচেনাকে চেনার, অদেখাকে দেখার আনন্দে চাচা ভাতিজা আবেগ আপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। চাচার কাছে খুলে বললেন তার বাড়ি হতে বের হওয়ার ঘটনাসহ মুর্শিদাবাদ আদালতে আসার কথা। তাঁকে সাথে করে চললেন প্রধান কাযীর বাসভবনে। যে ভবনটি মুর্শিদাবাদ নবাব তাঁর জন্য স্থায়ী বাড়ি হিসেবে বরাদ্দ দিয়েছেন। বাসভবনে ঢুকেই প্রধান কাযী তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন যে, তিনি তাঁর হারানো ধন ফিরে পেয়েছেন। তিনি ভাবলেন, কিছুদিন পূর্বে তাদের একটা ছেলে ইন্তিকাল করেছিল তার স্থানে একে নিজ ছেলে মনে করে আদর স্নেহের দ্বারা লালন-পালন করতে লাগলেন। ইয়াতীমকে আদর যত্ন করলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন। আর বালক শরী'অতুল্লাহও চাচা-চাচীকে পিতামাতার মত শ্রদ্ধা করতেন। নিয়মিত অধ্যয়ন ও ইবাদত করে নিজকে আদর্শ মানুষ করে গড়ে তোলার একটা পরম সুযোগ তিনি পেয়ে গেলেন। তাঁকে পেয়ে মুফতি মোহাম্মদ আশিক এবং তার স্ত্রীর ছেলে হারানোর ব্যাথা দূর হল।

তিনি চাচার কাছে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় বিশেষ করে ইসলামি আইনশাস্ত্র পড়তে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যে মুফতি সাহেবের তত্ত্বাবধানে আরবি, ফারসি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় পাণ্ডিত্ব অর্জন করেন। তাঁর আচার-ব্যবহার, নম্রতা-ভদ্রতা, অধ্যবসায় ও ইবাদত বন্দেগি দেখে চাচা মুফতি মোহাম্মদ আশিক ও চাচী আম্মার মন ভরে গেল। মুর্শিদাবাদ থাকাকালীন সকলেই জানত শরী'অতুল্লাহ (রহ.) প্রধান কাযী মুফতি মোহাম্মদ আশিকেরই ছেলে।

পরিশেষে বলা যায় যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ বিখ্যাত তালুকদার বংশে জন্মগ্রহণ করলেও খুব অল্প বয়সে মাতাপিতাকে হারিয়ে চাচার কাছে লালিত-পালিত হন। ভবিষ্যতে তিনি যে একজন বড় মাপের মানুষ হবেন তা বাল্যকালেই তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছিল।

---

১৬ আরবি قاضي শব্দটা একবচন, বহুবচনে قضاة - এর আভিধানিক অর্থ- বিচারক, বিচারপতি, হাকিম, কাযী। দ্র. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, সং.১৩, সেপ্টেম্বর ২০১৩), পৃ. ৭৭৫; ইসলামি ব্যবহারিক অর্থে, "القاضي بكسر الضاد جمعه قضاة، من نصبه ولي الأمر لفصل الخصومات." د. محمد رواس قلعه جي، *معجم لغة الفقهاء*(بيروت : دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ১৪০৮هـ)، صـ ২৬৩

Dhaka University Institutional Repository

# ২.২ হাজী শরী'অতুল্লাহর অন্যান্য সফর

## ২.২.১ পবিত্র মক্কা নগরীতে সফর

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মাওলানা বাশারাত আলীর সাথে মক্কায় আসার পর তাঁর বুকটা আনন্দে ভরে উঠল। মক্কার ঐতিহাসিক জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে তার মনে প্রশান্তি আসল। নিজ বাড়ি-ঘরের কথা ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন গঙ্গায় চাচা-চাচী হারানোর বেদনা।[১৭] মাওলানা বাশারাত আলী বাল্যবন্ধু মাওলানা মুরাদের কাছে তার প্রিয়ছাত্র শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর জীবন বৃত্তান্ত খুলে বললেন। আরও বললেন গঙ্গার বুকে মুর্শিদাবাদ দরবারের প্রধান কাযী মুফতি মোহাম্মাদ আশিকের ইন্তিকালের কথা এবং শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ার কথা। তিনি বললেন, প্রিয়ছাত্র শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর উচ্চতর শিক্ষা দানে তাকে সহায়তার কথা। সব শুনে মাওলানা মুরাদের মন আবেগে ভরে উঠল।[১৮] তিনি ছিলেন আরবি ভাষার একজন বিজ্ঞপণ্ডিত। তাঁর কাছে তিনি আরবি সাহিত্য পড়তে লাগলেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরবি সাহিত্য আয়ত্ব করে ফেলেন। শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর অসম্ভব আগ্রহ। কিতাবি শিক্ষার পাশাপাশি তিনি ইসলামের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান লাভ করেন।[১৯]

শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মাত্র ১৮ বছর বয়সে উস্তাদ মাওলানা মুরাদের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং সম্মানিত উস্তাদের অনুমতি নিয়ে তিনি পূর্ণাঙ্গ একটি হজ্জ আদায় করার জন্য মক্কায় গেলেন। তিনি ছোট বেলায় আম বাগানের খেলার সাথীর নিক্ষিপ্ত ছুরি মাথায় পড়ে কেটে গিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ ঠেকাতে নিজের গামছা দিয়ে সুন্দরভাবে পাগড়ি পরার কারণে খেলার সাথীদের মুখ থেকে হাজী সাহেব বিদ্রুপমূলক সম্বোধন পেয়েছিলেন। আজ সে সাথীদের হাজী সম্বোধন বাস্তবরূপ লাভ করল। তিনি এখন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) নামেই সবার কাছে পরিচিত। মক্কায় অবস্থান কালে তিনি সন্ধান পান এক বুযুর্গ আলিমের। নাম তার মাওলানা তাহের সোম্বল। গোটা আরব জাহানে তিনি ছোট 'আবু হানিফা' নামে খ্যাত। তিনি ছিলেন হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ শাস্ত্রের বিজ্ঞ পণ্ডিত। হানাফি মাযহাবের অবিচল অনুসারী। মক্কার মানুষের ধারণা ইমাম আবু হানিফার পর এত বড় হানাফি আলিম গোটা বিশ্বে দ্বিতীয় জন আর জন্মগ্রহণ করেননি। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ভরপুর। ইলমে তাসাওউফে[২০] মক্কায় তার সমকক্ষ আর কেউ ছিল না।

---

১৭ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

১৮ মোশাররফ হোসেন খাঁন, *হাজী শরীয়তুল্লাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১৯ গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া কর্তৃক সম্পাদিত, *আলোর দিশারী*(ঢাকা : ভূমিকা প্রকাশ এন্ড এ্যাড মিডিয়া, ২০০৭), পৃ. ৯

২০ মুসলিম দর্শনে 'তাসাওউফ' সুফীবাদ নামে খ্যাত। সুফি শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে চিন্তাবিদদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে, সুফী শব্দটি আহলুস সুফ্‌ফা হতে উদ্ভূত হয়েছে। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে সুফী শব্দটি সুফ বা পশম শব্দ হতে উৎপন্ন। কেননা, পশমী বস্ত্র সাধারণ ও আড়ম্বর হীনতার প্রতীক। রসূলুল্লাহ সা. এবং তাঁর সাহাবীগণ বিলাস-ব্যাসনের পরিবর্তে সাদাসিধা পোশাক পরিধান করতেন, তাই এ পশমী পোশাক পরিধানকারীগণ মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে সুফী নামে পরিচিত। মুসলিম জাতির চিন্তাধারা অন্যান্য দিকের মত তাসাউফ ও কুরআন হাদীসের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লামা শামী

*Dhaka University Institutional Repository*

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মাওলানা তাহের সোম্বলের কাছে হাজির হয়ে তার শিক্ষায়তনে পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করায় তিনি খুশি হয়ে তাকে পড়াতে লাগলেন। হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে অল্প দিনের মধ্যে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। পীর ও বুযুর্গ মাওলানা তাহের সোম্বলের চরিত্র মাধুর্যে এবং তার শিক্ষা ও সংস্কারে মুগ্ধ হয়ে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তার কাছে বাই'আত গ্রহণ করেন। তিনি মক্কায় এক টানা বিশ বছর অতিবাহিত করেন। একটা ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাদান পদ্ধতিগত পরিবেশে। তারপরও মক্কার চারদিকে তাঁর খ্যাতি। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা সবার মুখে মুখে। তার জ্ঞানের বহরের কথা মক্কার শিক্ষিত মানুষ মাত্রই জেনে যায়। সেখানকার জ্ঞানীগণ হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। তিনি মক্কার নামী-দামী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। এতে করে তার সময়টা বেশ ভালই কাটে এবং তার সাথে তাঁর জ্ঞানের বহরও বৃদ্ধি পায়।

মক্কার নামকরা মাদরাসাগুলোতে তিনি যখন ক্লাস নিতেন তখন নিরব হয়ে ছাত্ররা বিজ্ঞ শিক্ষকের মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন। একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে গোটা হিজাযে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর নাম ছড়িয়ে পড়ে। মক্কায় অবস্থান কালে তিনি বার বার ছুটে যেতেন তার বিজ্ঞ শিক্ষক ও মা'রিফাতের পীর মাওলানা তাহের সোম্বলের কাছে। সম্মানিত পীর তার প্রিয়ছাত্র ও মুরিদকে ইলমে জাহির ও ইলমে বাতিনের ফায়েয দিয়ে কামালিয়াতের দরজায় পৌঁছে দেন। মক্কা থেকে মদীনা অনেক দূর। যেথায় শুয়ে আছেন মানবতার মুক্তির দিশারি রহমাতুল্লিল 'আলামীন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সা.।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অনেকবার নবীর রওযা জিয়ারতে পায়ে হেঁটে মদীনা মুনাওয়ায় যেতেন। প্রিয়নবী সা. এর রওযা জিয়ারত শেষে ফিরে আসতেন আবার মক্কায়। তিনি বেশ কয়েকবার হজ্জ করার সুযোগ লাভ করেন মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে। মক্কায় একটানা প্রায় বিশ বছর সময় অতিবাহিত করার পর স্বদেশে ফেরার জন্য তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠে। তখন তাঁর শুধুই মাতৃভূমি, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয় চাচা-চাচী আর ছোট বোনটির কথা মনে হত। ইতোমধ্যে চাচা আজিম তালুকদারের অসুস্থতার সংবাদও তিনি পেয়ে গেছেন। এসব কথা ভাবতে গিয়ে প্রবাস জীবনে অস্থির হয়ে উঠেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন মক্কা থেকে স্বদেশে ফিরে আসার। সম্মানিত উস্তাদ ও পীর মাওলানা তাহের সোম্বলের কাছে মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করায় তিনি

---

রহ. বলেছেন, ইলমে তাসাউফ হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ, যে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সদগুণ এর শ্রেণি বিভাগ এবং তা অর্জনের পন্থা ও অসৎ স্বভাবসমূহের শ্রেণি বিভাগ এবং তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় অবগত হওয়া যায় তাকে তাসাউফ বলে। শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আল-আনসারী রহ. ইলমে তাসউফের সংজ্ঞা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, যে ইলমের দ্বারা অন্তর সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়া এবং মানুষের যাহির ও বাতিন গঠন করা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় তাকে ইলমে তাসাউফ বলা হয়। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*(ঢাকা : ইফাবা, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০০), পৃ. ৬৮৬

*Dhaka University Institutional Repository*

অনুমতি দিয়ে বললেন, প্রিয় শরীয়ত! তুমি ইলমে জাহির ও ইলমে বাতিনে কামালিয়াত অর্জন করেছ, নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে গিয়ে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে থাক, মানুষের কল্যাণে নিজকে নিয়োজিত কর, আল্লাহ তোমার সহায় হবেন।

### ২.২.২ শরী'অতুল্লাহর রহ. এর মদীনায় গমন

মক্কা মুহাররমা থেকে স্বদেশ ফিরে তিনি মানুষদেরকে সত্যের পথে আহ্বান জানান। পথভোলা আপন মানুষদেরকে সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে ডেকে যখন তাদের কাছ থেকে কোনো সাড়া পেলেন না তখন মনে ব্যাথা নিয়ে আবারও মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। ভাবলেন, তাকে আরও সাধনা করতে হবে। মানুষ কেন তাওহীদকে গ্রহণ করতে চায় না? নিশ্চয় আমার মধ্যে এমন কোনো বিষয় অনুপস্থিত আছে যে কারণে মানুষ আমার কথা শোনে না। আমার আধ্যাত্মিক শক্তি আরও বাড়াতে হবে। এবার মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.), তবে কোনো যানবাহনে নয়, সম্পূর্ণ পায়ে হেঁটে।[২১] যাবার আগে স্ত্রীকে মক্কা যাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করায় স্ত্রী আনন্দের সাথে রাযি হন। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, কবে ফিরবেন? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ যখন ফিরিয়ে আনেন। বাড়ি থেকে রওয়ানা হয়ে যার নামানুসারে ফরিদপুর, সে বিখ্যাত দরবেশ ফরিদশাহ্ এর বাড়িতে উঠেন। কয়েকদিন সেখানে থাকার পর ফরিদশাহ্ দু'আ করে বিদায় দিলেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এবার মক্কা যাওয়ার আগে বাগদাদ হয়ে মদীনা যাবেন, তারপর মক্কায় যাবেন। মক্কায় যাবার পথে প্রথমে তিনি বাগদাদ যান।[২২] এখানে ঘুমিয়ে আছেন বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি রহ., ইমামে আযম আবু হানিফা রহ., ইমাম জা'ফর সাদিক রহ.।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) পূণ্যবান সকল ব্যক্তির কবর যিয়ারত করেন, যারা সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে ঘুমিয়ে আছেন গহীন কবরে। তিনি ইমাম হুসাইন রা. এর কারবালাস্থ শাহাদতস্থান যিয়ারত করেন। প্রত্যক্ষ করেন সে ফোরাত নদী। বাগদাদ সফর শেষে তিনি পৌঁছেন প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশর। ঘুরে দেখেন তুরে সাইনা, নীল নদ ও বেথেলহেম। প্রথম কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাসে নামায আদায় করেন। মসজিদের চারপাশে চির নিদ্রায় শায়িত অগণিত আম্বিয়ায়ে কিরামগণের আ. কবর জিয়ারত করেন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মিশরকে ভালভাবে ঘুরে দেখে অবশেষে ভর্তি হন বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষায়তন জামেয়ায়ে আল-আযহারে। শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ সব সময়ের। এক বছরকাল আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন হাদিস, তাফসির, ফিক্বাহ ও দর্শন শাস্ত্র নিয়ে। মাঝে

২১. মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
২২. মোশাররফ হোসেন খান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

মাঝে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি পাঠদানও করতেন। অল্প দিনের মধ্যে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে তার মেধা ও শিক্ষার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

ইতোমধ্যে তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠে মদীনা মুনাওয়ারা যাওয়ার জন্য। মদীনায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজা মুবারক অবস্থিত। মদীনার দিকে বার বার তাঁর মন ছুটে যাচ্ছিল। তিনি মদীনায় চলে গেলেন এবং বার বার রওযা শরীফ জিয়ারত করেন। রওযা শরীফ জিয়ারত করার পর স্বদেশের মুসলিমগণের বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করে তাদের মুক্তি ও হিদায়াতের জন্য বিশেষভাবে আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। মদীনা মুনাওয়ারা অবস্থান কালে তিনি ঐতিহাসিক বদর, উহুদ ও খন্দকের ময়দান পরিদর্শনে বের হতেন। উহুদ প্রান্তরে ৭০ জন শুহাদার কবর জিয়ারত করেন। রসুলুল্লাহ সা. এর রওযা জিয়ারত করা তাঁর প্রাত্যহিক কাজের তালিকাভুক্ত ছিল। তিনি রওযা শরীফের কাছে মুরাকাবায় বসে থাকতেন। পরপর তিনবার স্বপ্নে রসুলুল্লাহ সা. এর নির্দেশ পেয়ে তিনি দেশে ফিরে ইসলাম প্রচার করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন।[২৩]

মদীনা যিয়ারত শেষে তিনি মক্কায় ফিরে আসলেন। আশ্চার্যজনক স্বপ্নের কথা তার উস্তাদ মাওলানা তাহের সোম্বলের কাছে খুলে বলতেই তিনি হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বলে অভিহিত করেন। উস্তাদ মাওলানা তাহের সোম্বল রওযা থেকে যে আদেশ পেয়েছেন তা পালন করার নির্দেশ তাঁকে দিলেন। তিনি মক্কা থেকে জিদ্দা হয়ে বোম্বে বন্দর পৌঁছেন। এরপর বোম্বে থেকে স্বদেশের দিকে রওয়ানা হন। জন্মস্থান শামাইল পৌঁছে দেখেন তিনি তার বাড়ির কোনো চিহ্নই খুঁজে পাননি। প্রমত্তা আড়িয়াল খাঁ বয়ে চলছে তার বাড়ির উপর দিয়ে। তিনি কিছুদিন শ্বশুর বাড়ি অবস্থান করলেন এবং নদীতে বিলীন বাড়িটির একটু দূরে ব্যঙ্গচরায় একখানা নতুন বাড়ি নির্মাণ করেন।

### ২.২.৩ দ্বিতীয় বার মক্কা সফর

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) দ্বিতীয়বার মক্কা সফর করেছেন।[২৪] একথা স্পষ্ট বলেছেন তাঁর সমসাময়িক জেমস্ টেইলর। এ সময় জাহাজে তিনি ওয়াহাবিদের মাঝে ছিলেন।[২৫] এ বিষয়টি ওয়াজির আলী এবং আব্দুল হালিমও উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ফরায়েযীদের মাঝে এ বিষয়ে উপকথা চালু আছে। এর দ্বারা আমরা ধারণা করতে পারি যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর

---

২৩ পীর মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া, *ফারায়িযী জামা'আতের আদর্শ*(বরিশাল : শারীয়াতিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৪), ৩২

২৪ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

২৫ James Taylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*(Calcutta : G.H. Huttmann, Military Orphan Press, 1840), p. 270

*Dhaka University Institutional Repository*

সফরের সময়কাল ছিল ১৮১৮ থেকে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এ সময়টি ছিল তাঁর প্রচার কার্যের প্রথম পর্যায়। ব্যর্থতার কারণেই মক্কায় তাঁর দ্বিতীয়বার সফর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন যে তাঁর এ ব্যর্থতার পেছনে একটি বিষয় কাজ করছিল। এটি ছিল তাঁর শিক্ষকের কাছ থেকে অনুমতি ছাড়াই সংস্কার আন্দোলন শুরু করা। বলা হয়ে থাকে যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) দ্বিতীয়বার মক্কা সফরের সময়ে একটি স্বপ্নে নবীজি সা. তাঁকে বাংলার প্রকৃত ইসলাম প্রচার করার জন্য আদেশ করেন। তাঁর মক্কা গমনের কারণটি সত্য বা অসত্য যা-ই হোক না কেন অথবা স্বপ্নের বিষয়টি স্থানীয়ভাবে তৈরি এ ধারণা মনে রেখেও বলা যায় যে, প্রথম পর্যায়ের ফরায়েযীগণ এবং তাদের বংশধর এখনও 'সাতাশ সনী' ফরায়েযী হিসেবে পরিচিত (অর্থাৎ বাংলা সন ১২২৭ বা ১৮২০-২১ খ্রি. এর ফরায়েযী)।[২৬] এ বিষয়টি থেকে তাঁর দু'বার মক্কা গমনের মধ্যবর্তী সময়টি পাওয়া যায়। প্রথমবার তিনি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ফিরে আসেন এবং দ্বিতীয় বার ১৮২০-২১ খ্রিস্টাব্দে ফিরে আসেন। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয়বারের মক্কা গমনকে ফরায়েযীগণ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকলেও কারও কাছে তা শুধু সাধারণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হবে।[২৭]

কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) দ্বিতীয়বার ফিরে এসে অনেক বেশি উৎসাহ সহকারে তাঁর প্রচার কার্য শুরু করেছিলেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক নেতা তাহির সোম্বলের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত একারণেই সাধারণভাবে বলা হয় যে, ফরায়েযী আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১২২৭ বাংলা মোতাবিক ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। যদিও আমরা লক্ষ্য করেছি যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) প্রথমবার অর্থাৎ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে যখন মক্কা থেকে আসেন তখন থেকেই প্রচার শুরু হয়। মাওলানা বাশারাত আলী সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর জন্য কলকাতা থাকা ঠিক হবে না, চারিদিকে অনৈসলামিক কার্যকলাপে ভরপুর। এখানে থাকার অর্থ ঈমান ধবংস করা। তাঁর জন্য হিজরত করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। তিনি মক্কায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেখানে গিয়ে রক্ষা করবেন তিনি তাঁর ঈমানকে। মাওলানা বাশারাত আলী রহ. কলকাতা থেকে মক্কা মুকাররমায় হিজরত করার ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর প্রিয়ছাত্র হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কেও তাঁর সাথে সফরসঙ্গী হতে বলেন।

উস্তাদের সাথে হিজরত করার প্রস্তাবে শরী'অতুল্লাহ (রহ.) আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করেন। মক্কা যাওয়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর অনেক আগ থেকেই। এক অলৌকিকভাবে অতি সহজে তার মক্কা যাওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে ভেবে তিনি আনন্দিত হন। সে সময় জেদ্দা যাওয়ার একমাত্র বাহন ছিল পালের জাহাজ। মাওলানা বাশারাত আলী তাঁকে সঙ্গে করে রওয়ানা হলেন বোম্বাইর পথে। বোম্বে হতে পালের জাহাজ যাওয়া-আসা করে জেদ্দা বন্দরে। সে জাহাজেই

২৬ আব্দুল হালিম, *হাজী শরীয়তুল্লাহ*(অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি), পৃ. ১০

২৭ মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

যেতে হবে তাদের। বোম্বে পৌঁছে হিজরতকারী দলটির বেশ কিছু দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে জাহাজের জন্য। বোম্বে অবস্থানকালীন সময়টা যেন তাঁর অবহেলায় না কাটে সেজন্য মাওলানা বাশারাত আলী তাঁর প্রিয়ছাত্রটিকে বোম্বের প্রসিদ্ধ একজন ক্বারী সাহেবের নিকট ভর্তি করে দেন কাওয়ায়েদে কুরআন শিক্ষার জন্য। অল্পদিনের মধ্যে তিনি বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

মাওলানা বাশারাত আলী, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও মুহাজিরগণ নির্ধারিত তারিখে পালের জাহাজে চড়ে বোম্বে হতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে জেদ্দা পৌঁছেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রমকালীন সময় তিনি তার উস্তাদের নিকট পড়াশোনা করতে থাকেন। পালের জাহাজ জেদ্দা বন্দরে ভিড়লে যাত্রীদল জেদ্দা হতে পায়ে হেঁটে পবিত্র মক্কা নগরীতে পৌঁছে বাইতুল্লাহ তাওয়াফসহ উমরা পালন করেন। মাওলানা বাশারাত আলীর বাল্য বন্ধু, ফরিদপুরের মাওলানা মোঃ মুরাদ অনেক আগে থেকেই মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। মাওলানা বাশারাত আলী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও তাঁর সাথের মুহাজিরদেরকে নিয়ে উঠলেন মক্কায় মাওলানা মুরাদের বাড়িতে। বহুদিন পর বন্ধুকে পেয়ে তিনি দারুন খুশি। সুন্দর থাকা-খাওয়াসহ যাবতীয় ব্যবস্থা করলেন মাওলানা মুরাদ। তাঁর আদর যত্নে মুহাজিররা খুশি হলেন।

### ২.২.৪ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ১৮১৮ সালে জেদ্দা বন্দর হতে প্রিয়জনদের উদ্দেশ্য মাতৃভূমির দিকে রওয়ানা হলেন পালের জাহাজে করে। পৌঁছলেন ভারতের সুরাট বন্দর। সুরাটে কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে পায়ে হেঁটে বিহার প্রদেশের মুঙ্গের পৌঁছলেন তিনি।[২৮] মক্কায় শিক্ষকতাকালীন কিছু বেতন পেতেন তা ব্যয় নির্বাহের পর অতিরিক্ত অর্থ এবং নিজ হাতে লেখা 'সমাজ ও রাষ্ট্র' নামক গবেষণাপত্র (থিসিস) সাথে করে নিয়ে আসছিলেন দেশে। এক রাতে ডাকাত দল তার পথরোধ করে সাথে থাকা নগদ অর্থ ও তাঁর মূল্যবান গবেষণাটি ছিনিয়ে নেয়।[২৯] হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) শত বুঝিয়ে বলার পরও রাখতে পারলেন না নিজের পরিশ্রমের অর্থ ও মূল্যবান গবেষণাপত্রটি। ডাকাত দল চলে যাওয়ার সময় তিনি প্রস্তাব দিলেন তাদের দলের সদস্য হওয়ার। সুঠাম দেহের অধিকারী হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর প্রস্তাবে তারা রাযি হয়ে তাঁকে দলভূক্ত করে নিল। সাথী ডাকাতদের ধীরে ধীরে বুঝালেন অন্যায়ভাবে কারও সঞ্চিত সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া মহা অপরাধ। প্রতিটি মানুষকে মরতে হবে এবং পরকালে অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ সম্পদের হিসেব দিতে হবে আল্লাহর দরবারে।[৩০] তাঁর ব্যবহার, চরিত্র মাধুর্য এবং সুন্দর বক্তব্যে ডাকাত দল মোহিত হয়ে তার কাছে তাওবা করলেন। ভবিষ্যৎ

---

২৮ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

২৯ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ(২)*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮০), পৃ. ৭৮

৩০ ড. আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম*(ঢাকা : শরীয়তিয়া প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১০), পৃ. ৪৫

*Dhaka University Institutional Repository*

জীবনে আর ডাকাতি করবেনা বলে তারা ওয়াদাবদ্ধ হয়ে লুণ্ঠিত টাকা গবেষণাপত্র ফেরৎ দিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে দস্যুরা। পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে স্বদেশের দিকে রওয়ানা হলেন। এ সে-ই শামাইল গ্রামের তালুকদার বাড়ি। মসজিদের মিনার আছে আযান দেয়ার মানুষ নেই। মসজিদ আছে নামাযী নেই। বাড়ি পৌঁছতে মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে যায়। বেলালি দরাজ কণ্ঠে তিনি আযান[৩১] দিলেন। অনেক দিন পর তালুকদার বাড়ির মসজিদের মিনার থেকে সুললিত কণ্ঠের আযানের ধ্বনি শুনে চারদিক থেকে ছুটে আসলেন অগণিত মানুষ। জামা‘আতে নামায পড়ার আশায় ছুটে আসা মানুষদের ডাকলেন, কিন্তু তারা নির্বাক। জিজ্ঞাসা করলেন উপস্থিত সকলের নাম এক এক করে। কারো নাম রহীম বখ্শ, বয়স ৬০, আর একজন মোহন, বয়স ৫০, আর একজন সাত্তার মোড়ল, বয়স ৭০। সবার নাম জেনে নিলেন তিনি। উপস্থিত সবাই মুসলিম, মুসলিম হয়েও তাঁর সাথে নামায পড়তে না আসার কারণ জানতে চাইলে সবাই একই কথা বলেন, আমরা নামায পড়তে জানি না। হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) মনে ব্যাথা পেলেন, আফসোস করলেন সবার জন্য। যে মানুষগুলো নামায পড়তে জানে না বললেন এরা সবাই মুসলিম, বয়সের ভারে অনেকেই নূয়ে গেছেন। অথচ নামায পড়তে জানে না? তিনি একা তালুকদার বাড়ির মসজিদে মাগরিবের নামায আদায় করে বসে থাকলেন। আব্দুল আজিম তালুকদার বিছানায় শোয়া অবস্থায় তার বাড়ির মসজিদে দীর্ঘ দিন পর আযানের ধ্বনি শুনে হতবাক। এতদিন পরে কে আমাকে আযানের ধ্বনি শোনালো, ডেকে পাঠালেন মুয়াজ্জিনকে বাড়ির বৈঠক খানায়। মুয়াজ্জিন এবং উৎসুক জনতা বাড়ির বৈঠকখানায় বসে আছেন। কিন্তু আজিম তালুকদার পায়ে হেঁটে আসতে পারছেন না তথায়। কারণ একটাই, বড় ভাইয়ের একমাত্র ছেলে শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) হারানো বেদনায় তিনি শয্যাশায়ী।

আব্দুল আজিম তালুকদার বিদেশী মেহমান হাজী সাহেবকে ডেকে পাঠালেন তার শয়ন কক্ষে। হাজী সাহেব কাছে গিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করেন কি রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি বিছানায় পরে আছেন? দু’চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আজিম তালুকদার বললেন। আজ থেকে ২৫ বৎসর আগে তার বড় ভাই আব্দুল জলিল তালুকদার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রেখে ইন্তিকাল করেন। তার আর এক ভাই মুফতি মোহাম্মদ আশিক মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারের প্রধান কাযী হিসেবে তখনো কর্মরত। তার কোনো সন্তানাদি না থাকায় বড় ভাইয়ের ইয়াতিম পুত্র ও কন্যাকে আপন সন্তানের মত তিনি এবং তার স্ত্রী প্রতিপালন করেন। কোনো দিন আদর যত্নে

---

৩১ আযান শব্দের আভিধানিক অর্থ- الإعلام আহ্বান করা, ডাকা। "الأذان هو النداء للصلوة" الدكتور شوقي ضيف، *المعجم الوسيط*(القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، المطبعة الرابعة، 1425هـ)، ص. ١١؛ "الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، بألفاظ مخصوصة." السيد سابق، *فقه السنة*(القاهرة : دار الحديث، الطبعة الأولى، ١٤٢٥)، صـ ٧٧ আর ইসলামি পরিভাষায়, ‘শারী‘আহ্ নির্ধারিত আরবি বাক্যসমূহের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে উচ্চকণ্ঠে ছলাতে আহ্বান করাকে আযান বলা হয়।’ প্রথম হিজরি সনে আযানের প্রচলন হয়। দ্র. মিরক্বাত, অধ্যায়-৪ (ছলাত), অনুচ্ছেদ-৪ (আযান), খ.২, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫

Dhaka University Institutional Repository

তারা ত্রুটি করেনি। ছেলে-মেয়ে দু'টি তাদেরকে পিতা-মাতার মত সম্মান দেখাত। হঠাৎ একরাতে শরী'অতুল্লাহ (রহ.) নামের ভ্রাতুষ্পুত্র তার শোবার ঘর থেকে উধাও হয়ে যায়। নিজ গ্রামসহ আশ-পাশের গ্রামে খোঁজাখুজি করতে লাগলেন। ঝোপ-ঝাড় কোথাও বাদ রাখেননি খুঁজতে গিয়ে। কাছের আর দূরের সকল আত্মীয় স্বজনের বাড়ি খোঁজ নিয়েও তাকে আর পাওয়া যায়নি। গ্রামের মানুষের পরামর্শে গাযীর শিন্নী, গণকের দ্বারা গণানো, হাট-বাজারে ঢোল-শোহরত করেও ফিরে পাননি তার কলিজার টুকরো শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে। আদরের মানিকটির ছিল চাঁদের মত চেহারা। মানুষ বলছে সুন্দর ছেলেদের নাকি জ্বিনে পাহাড়ে নিয়ে যায়। কোন্ পাহাড়ে মানিক শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে নিয়ে গেছে, তা আর কেউ জানতে পারেনি।

### ২.২.৫ মক্কায় ও আল-আযহারে অবস্থান

মক্কা শরীফে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) প্রায় ষোল বছর এবং এরপর মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো দুই বছর ছিলেন।[৩২] তাঁর ভবিষ্যত সংগ্রামের এ ছিল প্রস্তুতিকাল। তার জীবনের প্রস্তুতির এ সময়কে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায় :

ক) প্রথম পর্যায়ে মক্কায় প্রথম দুই বছর তিনি মাওলানা মুরাদ নামে একজন বাঙালী আলিমের কাছে আরবি সাহিত্য ও ইসলামি আইন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন।

খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি আরবের বিখ্যাত আলিম তাহির সোম্বলের কাছে ১৪ বছর অধ্যয়ন করেন। তাহির সোম্বলকে সে সময় তার জ্ঞানের পরাক্রমের জন্য ইমাম আবু হানিফার সাথে তুলনা করে 'আবু হানিফা আছগর' বা 'ছোট আবু হানিফা' বলা হত।

গ) তৃতীয় পর্যায়ে মক্কা-মদিনায় অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা আহরণের প্রায় ষোলটি দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ বছর শেষ করে শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং সেখানে লাইব্রেরিতে দুই বছর কাটান।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) দীর্ঘ দেড় যুগ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মক্কা-মদিনায় এবং আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে[৩৩] কাটিয়ে দুনিয়ার অধঃপতিত মুসলিমগণের তখনকার অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভের সুযোগে হজ্জ উপলক্ষে দুনিয়ার নানা এলাকার মুসলিম নেতৃবৃন্দ মক্কা-মদিনায় সমবেত হতেন। বাগদাদ, কর্ডোভা, ইস্তাম্বুল ও দিল্লিসহ মুসলিম সভ্যতার বড় বড় কেন্দ্রের

৩২ মাওলানা আব্দুল বাতেন নোমান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৩৩ 'আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় মিশরের রাজধানী কায়রোতে অবস্থিত। এটি ৯৭০ বা ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মাদরাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে এখানে কুরআন এবং ইসলামিক আইন বিষয়ে পড়ানো হত, সাথে সাথে যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, চন্দ্র বিবর্তন বিষয় পড়ানো হত। পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়গুলো পাঠ্যসূচিতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। বর্তমান বিশ্বের আরবি সাহিত্য এবং ইসলামি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬১ সাল থেকে পাঠ্যসূচিতে সাধারণ বিষয় (Non-Religious) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৬১ সালে মিশরের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের এর সময়ে বিস্তৃত পরিসরে সেক্যুলার ফেকালটিস যুক্ত হয়। যেমন- ব্যবসায় শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ফার্মেসি, ঔষধ, প্রকৌশল, কৃষি ইত্যাদি। মাদরাসা থেকে বিশ্বাবদ্যালয়ে রূপান্তরের সময়ই জেবুননিসা হামিদুল্লাহকে প্রথম মহিলা ফ্যাকাল্টি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।' Cf. www.alazhar.gov.eg, visited on 24.12. 2013

*Dhaka University Institutional Repository*

পতনের পটভূমিতে লোভী ও হিংস্র বস্তুবাদী এক বিকট সভ্যতা তখন পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। এ অবস্থা থেকে বিশ্ব মানবতাকে রক্ষার উপায়ে তিনি হিজায ও মিশরে থাকার সুবাদে এ সম্পর্কে দুনিয়ার নানা এলাকার নেতৃবৃন্দের ভাবনা-চিন্তা ও সমাজ পরিবর্তনে তাদের কর্মসূচি ও কর্মকৌশলের সাথে পরিচিত হন। রসূল সা. এর মাক্কি জীবন ও মাদানি জীবনের কর্মধারা ও কর্মসূচি তিনি এ সময় বিশদভাবে পর্যালোচনা করেন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দাসত্বের কাছে বন্দী তৎকালীন বাংলার অধঃপতিত হীনবল মুসলিমগণের অবস্থা পরিবর্তন ও তাদের মুক্তির উপায় গভীর অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে খুঁজে পান।

## ২.২.৬ তাহির সোম্বলের শিষ্যত্ব গ্রহণ

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর আধ্যাত্মিক শিক্ষক (মুর্শিদ) এবং শিক্ষক (উস্তাদ) হিসেবে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন। বাংলার ফরায়েযীদের কাছে তিনি তাহির সোম্বল নামে পরিচিত।[৩৪] এখানে উল্লেখ্য যে, ফরায়েযীগণ কাদেরিয়া তরীকার অনুসারী হিসেবে তাহির সোম্বলের মাধ্যমে তাদের সিলসিলাত মুর্শিদিন বা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক আব্দুল কাদির জিলানি রহ. পর্যন্ত দাবি করে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফরায়েযীগণ তাহির সোম্বলকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। তাছাড়া শারী'আ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ফরায়েযী ব্যাখ্যা তাহির সোম্বলের ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অল্পই জানা যায়। তাহির সোম্বল সম্পর্কে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর জীবনী থেকে পরোক্ষভাবে কিছু জানা যায়। দেশের বাইরের কোনো উপাদান না থাকায় এবং বহু পূর্বের বিষয় হওয়ায় তাহির সোম্বলের পরিচিতি জানা খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে।

ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কিত উপাদান থেকে জানা যায় যে, তাহির সোম্বল মক্কায় একটি ধর্মীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।[৩৫] পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তাঁর কাছে ১৪ বছর সময় ধরে ধর্মীয় বিজ্ঞান শিক্ষা অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি যখন দ্বিতীয়বার মক্কা ভ্রমণ করেন, তখন তাহির সোম্বলের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং বাংলায় বিশুদ্ধ ইসলাম প্রচারের অনুমতি গ্রহণ করেন। সুতরাং ১৮০১ থেকে কমপক্ষে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে তাহির সোম্বল তাঁর খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছিলেন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর শিক্ষক 'শেখ তাহির সোম্বল আল মাক্কি' যিনি মক্কার শাফি'ঈ সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন বলে অনেকে ধারণা করেন। তবে কয়েকটি কারণে এ তথ্যটি সঠিক নয়। যথা :

প্রথমত: ফরায়েযী মতবাদসমূহ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এ সম্প্রদায়ের সকল অনুসারীগণ ছিল হানাফি মাযহাবের অন্তর্গত। এদের ধারণাসমূহে শাফি'ঈ মতবাদের কোনো চিহ্ন লক্ষ্য

৩৪ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৩৫ আব্দুল হালিম, *হাজী শরী'অতুল্লাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

করা যায় না। উপরন্তু শাফি‘ঈ মাযহাবের অন্তর্গত ‘আহলুল হাদিস’ সম্প্রদায়ের সঙ্গে ফরায়েযীদের লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর সমাধিতে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন হানাফি মতবাদের অনুসারী যা ছিল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্গত।

যদি হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর শিক্ষক তাহির সোম্বল শাফি‘ঈ মতবাদের অনুসারী হতেন, তাহলে শাফি‘ঈ মতবাদের প্রভাব হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে থাকা বিচিত্র ছিল না।[৩৬] উপরন্তু ফরায়েযী উপাত্তসমূহ তাহির সোম্বলকে ‘আবু হানিফা রহ. এর সঙ্গে যে তুলনা করা হয়েছে এদের মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাহির সোম্বল সম্পর্কে ফরায়েযী পুঁথিসমূহে সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয়েছে। পুঁথিতে তাকে সাধারণভাবে ‘তাহির সোম্বল বা মোহাম্মদ তাহির সোম্বল’ বলা হয়েছে। এ বিষয়টি ফরায়েযীদের মধ্যে প্রচলিত ঐতিহ্যগত বিবরণ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। উপরন্তু পুঁথিতে মন্তব্য করা হয়েছে ‘সোম্বল’ হল পদবি যা ফরায়েযীগণ তাঁকে রোহিলা খণ্ডের মুরাদাবাদ জেলার সোম্বল শহর থেকে এসেছে।[৩৭] বর্তমানে এটি রোহিলা খণ্ডের গঙ্গাতীরে অবস্থিত।

তৃতীয় ধাপে দেখা যায় যে, হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) কায়রো শহরের বিখ্যাত আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। মক্কায় ধর্মীয় বিজ্ঞানে শিক্ষা শেষ করার পর হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) ইসলামি আদর্শের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করেন। প্রচলিত বিবরণে দেখা যায় যে, তিনি যখন ‘দর্শন শাস্ত্র’ শিক্ষা করার জন্য কায়রো যাওয়ার অনুমতি চান তখন তাহির সোম্বল তাঁকে অনুমতি দেন। সম্ভবত যুক্তিবাদী দর্শন তাঁকে পরিবর্তন করে ফেলতে পারে এ ধারণায় তাহির সোম্বল প্রথমত দ্বিধা করেছিলেন। বিখ্যাত আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কোনো কোর্স অধ্যয়ন করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তবে আল-আযহারের গ্রন্থাগারে তিনি দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এরপর হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) মক্কায় ফিরে যান। মক্কা থেকে তিনি মদীনায় সংক্ষিপ্ত সফরে যান। অতঃপর ইসলামি মতাদর্শ প্রচারের জন্য বাংলায় ফিরে আসেন।[৩৮] তিনি বাংলায় ফিরে আসার সময়ও তাহির সোম্বল আপত্তি জানান। তাঁকে আরও কিছুদিন তাঁর সঙ্গে থেকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ নেয়ার উপদেশ দেন। তা সত্ত্বেও দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর প্রবাস জীবন কাটানোর পর ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন।

৩৬ ওয়াজির আলী, *মুসলিম রত্নহার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৫

৩৭ মোঃ আনোয়ার হোসেন, *ইতিহাসের ইতিহাস*(ঢাকা : মৌলি প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ২০১১), পৃ. ১৮

৩৮ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো‘মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

*Dhaka University Institutional Repository*

# ২.৩ হাজী শরী'অতুল্লাহর জীবন প্রবাহ ও ইন্তিকাল

## ২.৩.১ হাজী শরী'অতুল্লাহর মাদারিপুর প্রত্যাবর্তন

আরবে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) আঠারো অথবা বিশ বছর অতিবাহিত করেন। তিনি ১৮১৮ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইংরেজদের তৎকালীন রাজধানী কলকাতায় না গিয়ে তিনি গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের মাঝে তাঁর কর্মস্থল হিসেবে চিহ্নিত করেন। এরপর তিনি কিছু সাথীকে নিয়ে হজ্জে যান। ১৮২০ সালে তিনি হাজ্জ থেকে ফিরে আসেন। সে ঘটনাকে অবলম্বন করে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর স্বদেশে ফেরা সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে :

'হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) আঠারো বছর বয়সে মক্কায় গমন করেন। সেখানে প্রায় বিশ বছর থাকার পর আনুমানিক ১৮২০ সালে তিনি একজন সুকৌশলী তার্কিক, বক্তা ও আরবি ভাষার পণ্ডিত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। দীর্ঘ আঠারো বছর মক্কায় অবস্থান করার পর আটত্রিশ বছর বয়সে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[৩৯]

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর ঘরে ফেরা সম্পর্কে তার জীবনী লেখক আব্দুল হালিম-এর পাণ্ডুলিপি থেকে ড. মঈন উদ-দীন আহমদ খান যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে মুসলিম সমাজের তখনকার অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) বিহারের মুঙ্গের জেলা পাড়ি দেয়ার সময় সেখানকার মুসলিমগণের বিশ্বাস ও আচরণের নানা ভ্রান্তি তাকে কষ্ট দেয়। তিনি এসব বিদ'আতমূলক পাপাচার বন্ধ করতে সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে তাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন। এরপর তিনি বাংলায় চলে আসেন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তার চাচা আজিম উদ্দীনের বাড়িতে ফিরলেন। তার মুখে তখন লম্বা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি, কেউই তাঁকে চিনতে পারেনি।

মক্কা থেকে একজন হাজী এসেছেন। এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন দলে দলে লোক তাঁকে দেখতে আসল। এরই মধ্যে নামাযের সময় হল। অবস্থা বুঝে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) নিজেই উচ্চস্বরে আযান দিলেন। কিন্তু কেউই তাঁর সাথে নামাজে শরিক হলেন না। এতে তিনি অবাক হলেন। দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে একাই নামায আদায় করলেন। মাগরিবের নামায আদায় করে তিনি বাড়ির ভিতরে ঢুকেন। তার চাচা আজিম উদ্দীন তখন মৃত্যুশয্যায়। তিনি চাচার কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। চাচা আজিম উদ্দীন জীবনের শেষ মুহূর্তে ভাতিজাকে কাছে পেয়ে চিন্তামুক্ত হলেন। চাচা আজিম উদ্দীনের কোনো ছেলে-সন্তান ছিল না। তিনি হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে তার পরিবারের দেখাশুনার দায়িত্ব দিলেন।[৪০] সে রাতেই তাঁর চাচা আজিম উদ্দীন ইন্তিকাল করেন। চাচার জানাজা ও দাফনের সময় গ্রামবাসী এমন কিছু অনৈসলামি রীতিনীতি পালন করতে চায় যা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) সমর্থন করতে পারলেন

---

৩৯ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, *তিতুমীর এন্ড হিজ ফলোয়ার্স*(ঢাকা : অনন্য প্রকাশনী, ১৯৮০), পৃ. ৮০

৪০ মোঃ আনোয়ার হোসেন, *ইতিহাসের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

*Dhaka University Institutional Repository*

না। ফলে গ্রামের লোকেরা দাফন অনুষ্ঠানে সহযোহিতা করা থেকে বিরত থাকে।[৪১] হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) দেশে ফিরে বাংলার মুসলিমগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের অবক্ষয়ের বাস্তব রূপের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। এ উপলব্ধি তার কর্মপন্থা নির্ধারণে অনেক সাহায্য করেছিল। এ সম্পর্কে ড. মঈন উদ-দীন আহমদ খান অন্যত্র লিখেছেন,

> 'ফরিদপুর উপস্থিত হয়ে দিনের শেষভাগে যখন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) পিতৃগৃহে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর চাচা আজিম উদ্দীন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এদিকে একজন হাজীর আগমণের কথা প্রচারিত হলে হাজী দর্শনের জন্য বহু লোকের সমাগম হয়। সকলেই তাকে অভিবাদন করে ও তাঁর দু'আপ্রার্থী হয়। অতঃপর তিনি যেদিকেই যান মানুষের সামাজিক, ধর্মীয় ও আর্থিক দূরাবস্থা দেখতে পান। জনসমাজে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও স্পর্শকাতরতার বিপুল বিস্তার ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তাকে ব্যথিত করে।[৪২]

### ২.৩.২ গঙ্গা নদীতে দূর্ঘটনা

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর চাচা মুর্শিদাবাদ নবাব আদালতের প্রধান কাযি মুফতি মোহাম্মদ আশিক সারাদিন গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি ও রায় সংক্রান্ত বিচারিক কার্যক্রম নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। তারপরও সময় পেলেই তিনি ভাতিজা শরী'অতুল্লাহকে নিয়ে পড়াতে বসতেন। এক মুহূর্ত বিশ্রাম নিতে পারতেন না। বহুদিন আপন মাতৃভূমিতে আসার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। এমনকি বড় ভাই আব্দুল জলিল তালুকদারের মৃত্যুর সময়ও তিনি কাছে ছিলেন না। তাই গ্রামে গিয়ে বড় ভাইয়ের কবর জিয়ারত ও আপনজনদের সাথে সাক্ষাত করার নিয়ত করে মানসিক প্রস্তুতি নিলেন মুফতি মুহাম্মদ আশিক। তাই চাচা একদিন শরী'অতুল্লাহর কাছে তার চাচীসহ গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন।[৪৩] তিনিও অনেকদিন যাবত গ্রামে যাননি, গ্রামের সাথে তাঁর যোগাযোগও নেই। তাই গ্রামে ফেরার জন্য তারও মনটা ব্যাকুল ছিল।

চাচার প্রস্তাব শোনার সাথে সাথে তাঁর চোখে আপন বাস্তুভিটার ছবিটা ভেসে উঠে। তাঁর হৃদয়টা মুহূর্তেই দুলে উঠে। তিনি চাচার প্রস্তাবে রাযি হলেন।[৪৪] তখন মুর্শিদাবাদ থেকে শিবচরের শামাইল গ্রামে আসার জন্য কোনো রেলগাড়ি বা বাসের ব্যবস্থা ছিল না। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম হলো নৌকা। নির্ধারিত দিন সফরের প্রস্তুতি নিয়ে মুর্শিদাবাদ হতে চাচা মুফতি মুহাম্মদ আশিক, চাচী আম্মা ও শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কয়েকজন

---

৪১ আব্দুল হালিম, *হাজী শরীয়তুল্লাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৪২ মুসলিম ধর্ম সংস্কার আন্দোলন কর্তৃক সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস*(ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮০), খ.৩, পৃ. ১৩৮

৪৩ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৪৪ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ(২)*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮০), পৃ. ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

কর্মচারি সাথে নিয়ে বাস্তুভিটা শামাইলের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করেন। গঙ্গার বুক দিয়ে পানি কেটে কেটে যখন নৌকা চলছিল তখন আকাশে মেঘ এবং ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা দেয়। তার সাথে ওলোট-পালোট বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। হঠাৎ ঝড় শুরু হয়ে যায় এবং ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। সাথী কর্মচারিরা পানি সেচে সকলকে রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। অন্যরা দু'আ-দরূদ ও কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। কুরআনের কপিটি ছিল চাচা মুফতি মুহাম্মদ আশিকের নিজ হাতে লেখা। মুহূর্তের মধ্যেই যাত্রী বোঝাই নৌকাটি ঝড়ের ঝাপটায় নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। এতে নদীর মধ্যে হারিয়ে গেলেন তাঁর চাচা, চাচী ও কর্মচারিরা।[৪৫] তখনো গঙ্গায় বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। ক্রমাগত গঙ্গার সে ভয়াল ঝড় আর ঢেউকে উপেক্ষা করে নৌকার খাবার পানির কলসটি ধরে সাতরিয়ে কুলে উঠে দাঁড়ালেন শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। তাঁর বাঁচার ব্যাপারটা অবশ্যই একটা অলৌকিক ঘটনা। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়ে বারবার শুকরিয়া জানাতে লাগলেন মহান আল্লাহর দরবারে।

কুলে উঠে তিনি গঙ্গার দিকে তাকিয়ে হতাশ হলেন। তাঁর বুক কেঁপে উঠল। শূন্যতায় ভরে গেলো তাঁর কোমল হৃদয়। কুলে দাঁড়িয়ে গঙ্গা নদীর দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন এবং গঙ্গার তীর ধরে নিখোঁজ চাচা ও চাচীকে খুঁজতে লাগলেন। দিন-রাত গঙ্গার তীর ধরে খোজা-খুঁজির সপ্তম দিনে পেয়ে গেলেন চাচার নিজ হাতের লেখা কুরআনের গেলাপটি।[৪৬] তিনি গেলাপটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে কুলে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু গঙ্গার বুকে কোথাও খুঁজে পেলেন না চাচা, চাচী, কর্মচারি এবং সে নৌকা। তাঁর আর সে সময়ে মাতৃভূমি শিবচর থানার শামাইলে আসা হল না এবং তাঁর সাথে চাচা আজিম তালুকদার, চাচী আম্মা ও একমাত্র বোনের সাথে সাক্ষাতও হল না। বেদনা আর স্বজন হারানো কষ্ট নিয়ে তিনি আবারও ফিরে গেলেন কলকাতায় ওস্তাদ ও অভিভাবক মাওলানা বাশারাত আলীর কাছে।

### ২.৩.৩ সফল সংগঠক ও বক্তা

ইসলামি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) নিজের দেশে তা প্রচারের জন্য এগিয়ে আসেন। ২০ বছর পূর্বে তিনি যখন মক্কায় যান তখন সমাজে প্রচলিত বেশ কিছু ধর্মীয় সামাজিক আচার তাঁর কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। কিন্তু মক্কা থেকে ফিরে আসার পর এ সকল আচার অনুষ্ঠান তাঁর কাছে কুসংস্কার ও অনৈসলামিক বলে মনে হয়েছে। এ সকল আচার সম্পর্কে সমসাময়িক কালের লেখা থেকে ধারণা পাওয়া যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর থেকে পূর্ব বাংলার মুসলিমগণের কোনো অভিভাবক ছিল না। এর ফলে

---

৪৫ মোঃ আনোয়ার হোসেন, *ইতিহাসের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৪৬ পবিত্র কুরআন শরীফকে জড়িয়ে বা আটকিয়ে রাখার জন্য কাপড় দিয়ে যে জুযদান তৈরি করা হয় তাকে গেলাপ বলা হয়। দ্র. ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ, *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১৪), পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

এলাকার মুসলিম সমাজ তাদের জাতীয় বিশ্বাস থেকে ক্রমশ দূরে চলে যায় এবং তাদের আচার-অনুষ্ঠানসমূহ হিন্দুদের কুসংস্কারসমৃদ্ধ আচারের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখা যায়। ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ জেলার মুসলিম সমাজে 'ছুটিপট্টি' এবং 'চিল্লা' প্রচলিত ছিল। যেগুলো শিশুর জন্ম, খৎনা এবং দাফনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। এসব কুসংস্কার তিনি বিলুপ্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কোনো সাধারণ ব্যক্তি যদি ১৮৭২ খ্রি. মোতাবিক ১৩৮৯ হিজরী সময়ে দক্ষিণ বাংলা সফর করে, তাহলে সে ধর্মীয় ক্ষেত্রে কুসংস্কার, অলসতা এবং অবহেলা দেখতে পাবে, যা অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি। দুরর-ই মোহাম্মদ তাঁর পুঁথিতে বলেন যে, তিনি যখন বাংলায় আসেন তখন নৈতিকতা বিবর্জিত মোল্লাদেরকে থামানো, ফাতিহা প্রথা এবং সমাধিতে প্রার্থনা করার রেওয়াজকে বিলুপ্ত করার ঘোষণা দেন। যখন তিনি বাংলায় বুকে পা রাখেন তখন থেকেই সকল শিরক এবং বিদ'আত বিদূরিত হতে শুরু করে।[৪৭]

তারপর তিনি শিরক এবং বিদ'আতের একটি তালিকা তৈরি করেন এবং সেগুলো তিনি আস্তে আস্তে বিদূরিত করেন। এগুলোর মধ্যে ছিল বিবি ফাতিমার সমাধিসৌধ পূজা করা, গাজী কালু, পাঁচ পীর, ভেলা ভাসানো, জারি অনুষ্ঠান, অথবা হাসান এবং হোসেনের শাহাদত বরণ স্মরণ অনুষ্ঠান। এছাড়া অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন, সঙ্গীত এবং ফাতিহা, মেয়েদের প্রথম মাসিক উপলক্ষে ঘরের চারদিকে কলাগাছ রোপন করা, 'রথযাত্রা'য় অংশগ্রহণ এবং হিন্দু সমাজের অনেক পৌত্তলিক আচার উক্ত তালিকায় অন্তর্ভূক্ত ছিল। দুরর-ই মোহাম্মদ এ সম্পর্কে বলেন যে, এসব বিদ'আত দূর করা হয় এবং ইসলামের সূর্য আকাশে উদিত হতে শুরু করে। বাংলায় আগমনের পর তিনি সত্য প্রচারে ব্রতী হন।[৪৮] ইসলামি বিজ্ঞানের একজন প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ইসলামের জন্মভূমি এবং কেন্দ্রে অবস্থান করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সে আলোকে তিনি বাংলার ইসলামি সমাজের করুণ অবস্থা অবলোকন করেন। তাই পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজকে সংস্কার করার জন্য তিনি নিজকে উৎসর্গ করেন। তাঁর অবদানকে এভাবে মূল্যায়ন করা যায় যে, ফরায়েযী আন্দোলনের প্রবক্তা হাজী শরী'অতুল্লাহর পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দিপনাসহ যে দা'ওয়াতি কাজ করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁরই জীবদ্দশায় এ আন্দোলনের দ্রুত প্রসার ঘটার মধ্যে। বাংলায় আগমনের পথেই তিনি তাঁর প্রচারকার্য শুরু করেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই তিনি গ্রামের ভিতরে এবং বাইরে মুসলিমগণের জমায়েতে তাঁর সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। পরবর্তীতে আলোচনা ক্রমে তা তিনি তাঁর নিজের জেলা ও প্রতিবেশি জেলাগুলোতেও প্রচার করতে থাকেন। এ সময়ের মধ্যেই তিনি সংস্কারের রূপরেখা তৈরি করেন যা তিনি পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজে প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ইসলাম নির্দেশিত 'ফরয' বা আবশ্যকীয় বিষয়ক নীতিসমূহ পালন করার

৪৭ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৪৮ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে জোর দেন। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর সূচিত আন্দোলন ‘ফরায়েযী আন্দোলন’ হিসেবে পরিচিত। শুরুতে তাঁর আন্দোলন সফলতা অর্জন করতে পারেনি। এ ব্যর্থতাই সম্ভবত তাঁকে দ্বিতীয়বার মক্কায় যাওয়ার জন্য বাধ্য করেছিল।[৪৯]

পুনরায় মক্কা থেকে ফিরে আসার পর এ সকল আচার-অনুষ্ঠান তাঁর কাছে কুসংস্কার ও অনৈসলামিক বলে মনে হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর থেকে পূর্ব বাংলার মুসলিমগণের কোনো অভিভাবক ছিল না। এর ফলে এলাকার মুসলিম সমাজ তাদের জাতীয় বিশ্বাস থেকে ক্রমশ দূরে সরে যায় এবং তাদের আচারসমূহ হিন্দুদের কুসংস্কারসমৃদ্ধ আচারের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়।

হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর সমসাময়িক কালে যে সকল কুসংস্কারপূর্ণ আচার এবং সামাজিক প্রথাসমূহ প্রচলিত ছিল, সেগুলো হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) বিলুপ্ত করার ঘোষণা দেন। এগুলোর যথার্থতা সম্পর্কে কেউ কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করলেও বাস্তবিকপক্ষে বলা যায় যে, ফরায়েযীগণ এগুলোর মধ্যে অতিমানবীয় কোনো বিষয় যুক্ত করেননি।

### ২.৩.৪ বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি

হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর চাচা আজিম উদ্দিনের ইন্তিকালের পর সংসার ও তালুকদারি স্টেটের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। চাচীমা এবং বোন ফাতিমা চিন্তা করলেন হয়ত তিনি আবার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারেন। তাই যদি তাঁকে বিবাহ করানো হয় তাহলে স্ত্রীর দায়িত্বের খাতিরে হয়ত বাড়ি ছেড়ে যেতে পারবেন না। আত্মীয়-স্বজনেরা একটি স্বতী-স্বাধ্বী পূণ্যবতী কন্যার সন্ধান করতে লাগলেন।[৫০] অনেক প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য পরিবারের কন্যার সন্ধান পেলেও তাদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি না থাকায় অগ্রসর হতে পারছিলেন না। এছাড়া হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) অর্থের মোহ ও ক্ষমতার দম্ভ আদৌ পছন্দ করতেন না। তাঁর ইচ্ছা এমন একজন স্ত্রী তাঁর হবেন যার মধ্যে থাকবে পর্দা, ইসলামি আক্বিদা ও সহনশীলতা। বহু খোঁজা-খুঁজির পর পেয়ে গেলেন নিজ গ্রাম শামাইলের নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলিম পরিবারের এক কন্যা। যিনি ছিলেন পর্দানশীন, স্বতী-স্বাধ্বী এবং তাঁর নাম নিয়ামত বিবি।[৫১] নিয়ামত বিবির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.)।

বিবাহের পর তিনি স্ত্রীকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতা করে তোলেন। তার ইবাদত বন্দেগি, খোদা-ভীরুতা, আমানতদারিতা ও আনুগত্যের ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.)। তিনি ভাবতেন নিয়ামত বিবি আসলেই তার জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া এক নিয়ামত। আল্লাহ

---

৪৯ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত *ইসলামী বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮০), খ.২, পৃ. ১৬৫

৫০ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো‘মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৫১ হাজী শরী’অতুল্লাহ(রহ.) এর স্ত্রীর নাম ছিল নিয়ামত বিবি। তিনি মাদারিপুর মহাকুমার অন্তর্গত শিবচর থানার নিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বতী-স্বাধ্বী, পরহেজগার মহিলা। তিনি ইসলামের প্রতি নিবেদিত এক রমণী। পরে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন হাজী শরী’অতুল্লাহ (রহ.) এর সাথে। দ্র. আব্দুল হালিম, *হাজী শরী‘অতুল্লাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

তা'আলা এ নিয়ামত বিবির গর্ভেই দান করেছিলেন পরবর্তী সমাজ সংস্কারক ও বীরপুরুষ মোহসীন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়াকে।

## ২.৩.৫ হাজী শরী'অতুল্লাহর চরিত্র

তিতুমীরের মতই হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মুসলিম সমাজের সাধারণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। কিন্তু তিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিতুমীরের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এ কারণেই তিনি তাঁর সংস্কার আন্দোলনকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে পেরেছিলেন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর জীবন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল। তাই তিনি জানতেন কিভাবে তাঁর আন্দোলনকে ষড়যন্ত্র এবং উত্তেজনার ভিতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমান কাল পর্যন্ত ফরায়েযী আন্দোলনের উত্তরণের অন্যতম কারণ ছিল তাঁর অভিজ্ঞতা যা এ আন্দোলনকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে পেরেছিল। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ছিলেন দৃঢ় এবং বিনম্র ব্যক্তিত্ব।[৫২] তাঁর শারীরিক গঠন ছিল মাঝারি উচ্চতা, গৌরবর্ণ ও লম্বা বিস্তৃত শ্মশ্রু। তাঁর শক্তিশালী ও ঋজু দেহ ছিল। তাছাড়া তিনি তাঁর মাথায় লম্বা একটি পাগড়ি ব্যবহার করতেন।

জনশ্রুতি অনুযায়ী হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর অবয়ব ছিল সুন্দর এবং ভিন্নধর্মী, যা তাঁর অন্তরের নম্রতা এবং ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করত। ইসলামি সমাজ তাঁর মধ্যে একজন সহানুভূতিশীল এবং নিষ্ঠাবান প্রচারকের হৃদয় খুঁজে পেয়েছিল, যার মাধ্যমে বাংলার কৃষক শ্রেণি উৎসাহিত হয়েছিল। শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর মত অন্য কেউই কৃষকদের নিকট দৃঢ়ভাবে আবেদন করতে পারেনি। তাঁর জীবন নির্দোষ এবং অনুকরণীয় ছিল। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) নিজের উত্থানের চেয়ে বাংলার মুসলিমগণকেই জাগিয়ে তোলা ছিল অধিক আশ্চর্যজনক ব্যাপার। তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের নিচু এলাকায় ইসলামের শুদ্ধবাদী মতাদর্শ প্রথম প্রচারক। এটি এশিয়াটিক সোসাইটিতে (ঢাকা) সংরক্ষিত তাঁর সমাধি শিলালিপিটিই শুধু প্রমাণ করেছে।

## ২.৩.৬ হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর ইন্তিকাল ও সমাধি

সুদূর মক্কা ও মদীনায় বিশ বছর জীবন অতিবাহিত করেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। হায়াতুন্নবী (সা.) এর রওযা শরীফ থেকে স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে বাংলার ভাগ্যাহত মুসলিমগণকে সত্যের দা'ওয়াত, দ্বীনের দা'ওয়াত দিতে ১৮১৮ সালে স্বদেশে আসেন। অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের নিকট সত্যের দা'ওয়াত দেয়া ছিল না তার জন্য সহজ ও কন্টকমুক্ত। একদিকে স্বার্থবাদী হিন্দু জমিদার অন্যদিকে তাদের পৃষ্ঠপোষক ইংরেজ সরকার বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় হাজী

৫২ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর কর্মসূচিতে।[৫৩] তাদেরকে দ্বীনের পথে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কখনও নিজ পকেটের পয়সায় মজুর দিয়ে কালিমা পড়ানো,[৫৪] কখনও দা'ওয়াত নিয়ে। তিনি বঞ্চিত বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য চেষ্টা করেছেন সারা জীবন। ইংরেজ সরকারের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন অকুতোভয় সংগ্রামী হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। ফরায়েযী আন্দোলনের কর্মসূচিকে প্রচার ও প্রসার করেছেন তিনি। ইংরেজদের মনোপূত কথা না বলার কারণে জেলখানার লোহার শিকের মধ্যে আটক রেখে দমাতে পারেনি ইংরেজ শাহী হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে।

দীর্ঘ ২২টি বছর ইসলামি পুর্ণজাগরণের আন্দোলন করে তিনি সফলতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। মনের দিক দিয়ে সবল থাকলেও অত্যাধিক পরিশ্রমে তাঁর শারীরিক দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়। নিজ বাড়ি হাজীপুর হতে দা'ওয়াতি কাজে বের হতে পারেননি কয়েক মাস। অবশেষে বার্ধক্য ও দুর্বলতার কারণে ৫৯ বছর বয়সে ১৮৪০ সালে ইন্তিকাল করেন বাংলার সফল ইসলামি পূর্ণজাগরণকারী, সংস্কারক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা, সংগ্রামী দেশপ্রেমিক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের অবসান ঘটিয়ে তাঁর জন্মভূমি বর্তমান মাদারিপুর জেলার শিবচর উপজেলার হাজীপুরে ঘুমিয়ে আছেন ক্লান্ত বীর শহীদ হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। আমাদের অনুভবে, আমাদের সংগ্রামে, আমাদের জাগরণে চলার পথে তিনি আছেন আলো ও সাহসের মশাল নিয়ে সর্বাগ্রে। তিনি যেন আমাদের বলে চলেছেন- 'বাংলার মুসলমানরা জেগে ওঠো, ঘুমিয়ে থেকো না। বিলালি হৃদয়ে দরাজ কণ্ঠে মিনার থেকে আযানের ধ্বনি তোলো। হায়দারী হাকে বাতিলের সামনে সোজাভাবে দাঁড়াও আর ভেঙ্গে দাও অন্যায় আর জুলুমের দূর্গ। গড়ে তোলো খিলাফতি শাসন ব্যবস্থা এবং কায়েম কর আল্লাহর যমিনে আল্লাহ্‌র শাশ্বত বিধান।'

## ২.৩.৭ হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর সমাধি

ফরায়েযী আন্দোলনের কর্মসূচিকে সারা বাংলা ও আসামের কিছু অংশে ছড়িয়ে দিতে অত্যাধিক পরিশ্রম করার ফলে দুর্বলতার কারণে ১৮৪০ সাল, বাংলা ১২৪৫ সনের ১৪ই মাঘ রোজ শুক্রবার একমাত্র সন্তান মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়াকে রেখে ইন্তিকাল করেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। শামাইল গ্রামের পৈতৃক ভিটা আড়িয়াল খাঁ নদীতে বিলীন হবার পর নিজ

৫৩ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৫৪ কালিমা পড়ানো বলতে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কৃষক সাধারণ মানুষদেরকে ডাকতেন। তাদেরকে সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত বাড়িতে রাখতেন, সারাদিন কালিমার তা'লিম দিতেন এবং দুপুরে খাবার দিতেন। সারাদিন থাকা এর পারিশ্রমিক বাবদ তাদের প্রত্যেককে যাওয়ার সময় নগদ টাকা-পয়সা প্রদান করতেন। এভাবেই তিনি কালিমার দা'ওয়াত দিতেন। দ্র. মোঃ আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত *হাজী শরীয়তউল্লাহ স্বর্ণপদক-২০০৮*(ঢাকা : ঐতিহ্য ফাউন্ডেশন, ২০০৮), পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

অর্থে শামাইলের পার্শ্ববর্তী গ্রাম ব্যঙ্গচরায় বাড়ি নির্মাণ করায় গ্রামবাসী উক্ত গ্রামের নাম হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর নামানুসারে হাজীপুর রাখেন। হাজীপুরের নিজ বাড়িতে দাফন করা হয় মহাবিপ্লবী ও আল্লাহর অলি হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) কে।[৫৫] তাঁর কবর সমস্ত রকম শিরক ও বিদ‘আত মুক্ত রাখেন তার ভক্তরা। সারা বাংলার অগণিত ভক্তরা কবর জিয়ারত করতে হাজীপুরে আসত। কিন্তু শারী‘আহ্র কোনো খেলাপ করতে পারত না। যে আড়িয়াল খাঁ একদিন হাজী শরী‘অতুল্লাহর (রহ.) এর পূর্ব পুরুষের শামাইল গ্রামের বাস্তুভিটা গ্রাস করেছিল। সে আড়িয়াল খাঁ-ই আবার হাজীপুরের দিকে অগ্রসর হয়ে হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর কবর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বাহাদুরপুরের প্রবীণ মানুষেরা হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর কবর সম্পর্কে বলতে গিয়ে মরহুম হাজী রহিম উদ্দীনের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। হাজী রহিম উদ্দীন ১২৫ বছর জীবিত ছিলেন। হাজী রহিম উদ্দীন খাঁ কান্দীর এক বৃদ্ধের বরাতে বলেন আমার কাছে খাঁ কান্দীর একজন লোক বলেছেন, যিনি আড়িয়াল খাঁর স্রোতে হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর কবর ভাঙ্গতে দেখেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন,

> ‘আমি তাহাজ্জুদের নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে অযু করার জন্য ঘাটে গেলে হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর কবরের দিকে তাকালেই দেখতে পাই বেশ কয়েকজন মানুষ সাদা জুব্বা ও পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর শবদেহ কোলে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। এর কিছুক্ষণ পর তাঁর কবরটি আড়িয়াল খাঁ নদীতে বিলীন হয়ে যায়।’[৫৬]

হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) ছিলেন আল্লাহ্ তা‘আলার একজন অলি। আল্লাহর অলি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা ঘোষণা করেন, ‘মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোনো ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তিত হবেন’।[৫৭]

অলির মর্যাদা সম্পর্কে একটা হাদীসে কুদসিতে এরূপ বর্ণিত রয়েছে,

‘আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, যে আমার অলির সাথে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার সবচেয়ে প্রিয় হলো, আমার বান্দারা আমার ফরয করা বিধানসমূহ পালনের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করবে। আর যখন তারা আমার নৈকট্য লাভের জন্য নফলও আদায় করতে থাকবে, তখন আমি তার শ্রবণেন্দ্রিয় হয়ে যাই। যা দিয়ে সে শুনে। আমি তার দৃষ্টি শক্তি হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে স্পর্শ করে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে চলে। সে যখন আমার কাছে কিছু চায়, আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। সে যখন আমার কাছে আশ্রয়

---

৫৫ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো’মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৫৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৫৭ আল কুরআন, ১০ : ৬২

Dhaka University Institutional Repository

চায়, আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি। আমি কোনো কাজ করতে চাইলে নির্দ্বিধায় করে ফেলি, কিন্তু আমার বান্দা মু'মিনের জীবন সম্পর্কে কিছু করার ক্ষেত্রে আমার মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থাকে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে। অথচ আমি তার কষ্ট অপছন্দ করি।'[৫৮]

এ হাদিসে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অলি বলতে কাদের বুঝিয়েছেন, তা একটু পরিস্কার হওয়া দরকার। কারণ প্রচলিত অর্থে শব্দটা শুধুমাত্র একটা বিশেষ শ্রেণির লোকদের জন্য প্রজোয্য মনে করা হয়। আসলে এরূপ ধারণা পোষণ করা সঠিক নয়। অলি অর্থ, আল্লাহওয়ালা, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী, বন্ধু, সুহৃদ, কর্তা, মালিক, কর্তৃত্বশীল, ও প্রিয়জন।[৫৯] পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ মু'মিনদের অলি।'[৬০]

পক্ষান্তরে আলোচ্য হাদিসে ও কুরআনেও মু'মিনদেরকে আল্লাহর অলি বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

'শোনো! যারা আল্লাহর অলি, যারা ঈমান এনেছে, তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের কোনো ভয় এবং দুশ্চিন্তার কারণ নেই। পার্থিব ও পরকাল উভয় জীবনে তাদের জন্য রয়েছে পরম সুসংবাদ। আল্লাহর বাণী অপরিবর্তনীয়। এ সাফল্যই সবচেয়ে বড় সাফল্য।'[৬১]

আলোচ্য হাদিস ও কুরআনের এ আয়াতটা থেকে আল্লাহ্র ' অলি'র যে গুণাবলি পাওয়া যায়, তাহলো :

১. তাকে মু'মিন হতে হবে।
২. তাকওয়ার নীতি অবলম্বনকারী হতে হবে। অর্থাৎ তিনি আল্লাহর ভয়ে তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকবেন এবং তাকে ভালবেসে তাঁর আদেশ পালন করবেন। তিনি বিবেকবান হবেন। আল্লাহ্র কোনো হুকুম লংঘন করতে গেলেই তার বিবেক তাকে দংশন করতে শুরু করবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র হুকুম পালন করলে তার মনে প্রশান্তিবোধ করবেন।

---

৫৮ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل قال: من عادى لي ولياً، فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءته." দ্র. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, সং.৩, জুন ২০০৩), খ.১০, পৃ. ৭৩, হাদিস নং ৬০৫৮

৫৯ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, সং.১৩, সেপ্টেম্বর, ২০১৩), পৃ. ১১৪০

৬০ اَللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا দ্র. আল কুরআন, ২ : ২৫৭

৬১ اَلاَ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ. اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرى فِى الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَفِى الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيْلَ لِكَلِمتِ اللهِ ذٌلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. দ্র. আল কুরআন, ১০ : ৬২-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

৩. আল্লাহ্‌র ধার্যকৃত ফরয বিধান ও হুকুমসমূহ পুরোপুরি এবং যথাযথ পালন করবেন। কোন্‌টি ত্যাগ করে কোন্‌টির প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করবেন, এক্ষেত্রে রসূল সা. কে অনুসরণ করবেন।

৪. অধিক নফল আদায়কারী হবেন।

৫. উপরোক্ত সকল কাজ করবেন কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য। কেবলমাত্র মহামনিব আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য।

এ হলো আল্লাহর অলির পরিচয়। কোনো মু'মিনের আল্লাহ্‌র অলি হওয়ার অর্থ, আল্লাহ্‌র প্রিয়জন, প্রিয়ভাজন হওয়া। আল্লাহ্‌কেই নিজের একমাত্র অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, কর্তৃত্বশীল ও বন্ধু বানিয়ে নেয়া। সকলের চেয়ে আল্লাহ্‌কে অধিক ভালবাসা। পরকালের জবাবদিহী ও শাস্তির ভয়ে ব্যাকুল থাকা। আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন বিধানকে পরিপূর্ণভাবে নিজে মানা এবং সমাজে তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাওয়া।

'অলি' সম্পর্কে তফসীরে রুহুল মা'আনীতে আল্লামা আলুসী (রহ.) বলেছেন, 'পার্থিব জীবনে ওলীআল্লাহ্‌গণের ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ থাকা হল এ হিসেবে যে, পৃথিবীবাসী সাধারণত যে সব ভয় ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হয় পার্থিব উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে, আরাম-আয়েশ, মান-সম্মান ও ধন-সম্পদের সামান্য ক্ষতিতেই যে তারা মুচকে পড়ে এবং সামান্য কষ্ট ও অস্থিরতার ভয়ে তা থেকে বাঁচার তদবীরে রাত-দিন মগ্ন থাকে। আল্লাহর ওলীগণের স্থান হয়ে থাকে এ সবের বহু উর্ধ্বে। তাঁদের দৃষ্টিতে না পার্থিব ক্ষণস্থায়ী মান-সম্মান ও আরাম-আয়েশের কোনো গুরুত্ব আছে যা অর্জন করার জন্য সদা ব্যস্ত থাকতে হবে। আর না এখানকার দুঃখ-কষ্ট পরিশ্রম কোনো লক্ষ্য করার মত বিষয় যা প্রতিরোধ করতে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠতে হবে।[৬২]

কোনো ব্যক্তি যদি সত্যিই এ পর্যায়ে পৌঁছতে পারেন, তবেই আল্লাহ তার চোখ, কান, হাত, পা হয়ে যান। এর অর্থ সে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয় নিচয় দ্বারা কেবল আল্লাহকেই অনুভব করবে। কেবল আল্লাহর চিন্তাই করবে। কেবল আল্লাহর কাজই করবে। কেবল আল্লাহর পথেই চলবে।[৬৩]

উপরোল্লিখিত কুরআনের আয়াত, হাদীসে কুদসিতে উল্লিখিত 'অলি'র ব্যাখ্যার আলোকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) একজন আল্লাহর অলি ছিলেন। কেননা, তিনি পার্থিব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে ইক্বামাতে দ্বীনের সংগ্রাম করেননি এবং আয়েশী জীবন যাপনও করেন নি। তিনি তার আমরণ সংগ্রাম করেছেন ইসলামের জন্য, দ্বীনের জন্য। তার সংগ্রামী জীবনে দুঃখ-কষ্ট, পরিশ্রমে তিনি কাতর ছিলেন না। ছিলেন ধৈর্যশীল ও

৬২ আল্লামা আলুসী (রহ.), *তাফসীরে রূহুল মা'আনী*(ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০০), পৃ. ৮৮
৬৩ কাযী বদরউদ্দিন আদ দামামিনি, *মাসাবিল জামি' লি শরহিল বুখারি*(বৈরুত : দারুন নাওয়াদির, ১ম মুদ্রণ, ১৪৩০ হি.), খ.৯, পৃ. ৪৪৬-৪৪৭

Dhaka University Institutional Repository

সাহসী। নফল ইবাদতে থাকতেন মশগুল। তার সমস্ত জীবনই ছিল আল্লাহ ও তার প্রিয়তম রসূলের আদর্শে ভরপুর। তাই হাজী আব্দুর রহিমের বর্ণনার প্রত্যক্ষদর্শী যদি দেখে থাকেন যে, ইন্তিকালের বহু পরও কবর হতে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর মরদেহ কোনো রকম পচন না হয়ে দাফনের পূর্বাবস্থার মত অক্ষত ছিল এবং পাগড়ি ও জুব্বা পরিহিত কয়েকজন লোক তাকে কোলে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাহলে এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, আল্লাহর অলি হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর প্রাণহীন দেহ আল্লাহ সব রকমের পচন থেকে অক্ষত রেখেছেন।

*Dhaka University Institutional Repository*

# তৃতীয় অধ্যায়

# ফরায়েযী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

## ৩.১ ফরায়েযী আন্দোলনের সময় বৃটিশ ও জমিদার শ্রেণির অবস্থা

### ৩.১.১ ফরায়েযী আন্দোলনের উৎস

আরবি ফারায়িয (فرائض) শব্দটি ফারিযাহ (فريضة) শব্দের বহুবচন।[১] ফারিযাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- নির্ধারিত বিধান, অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, অপরিহার্য দায়িত্ব, ফরয, নির্দিষ্ট অংশ, সম্পত্তির অংশ[২] ইত্যাদি।[৩] ইসলামের ব্যবহারিক ও পরিভাষিক অর্থে- মহান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত অবশ্য কর্তব্যকে ফারিযাহ বলা হয়। আর ফরায়িয শব্দ থেকে গঠিত সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য ফরায়েযী (فرائضي)। যারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত অবশ্য কর্তব্যসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারাই ফরায়েযী।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অশান্ত পৃথিবী, ভুলুণ্ঠিত মানবতা, খোদাদ্রোহী শাসকদের বিরুদ্ধে যে কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন, সে কর্মসূচিই গ্রহণ করেছিলেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)।[৪] তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সা. নির্দেশিত অপরিহার্য কর্তব্য ইসলামের মৌলিক পাঁচটি বিষয়কে ফরায়েযী আন্দোলনের মূল কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ফরায়েয বা অবশ্য কর্তব্যসমূহের পালন ফরায়েযী সংস্কার আন্দোলনের মৌলিক নীতি ছিল। একারণেই এ আন্দোলনকে 'ফরায়েযী' নামে নামকরণ করা হয়েছিল। ফরায়েয দ্বারা সে সব কার্যকেই বুঝায় যা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্র নির্দেশিত মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ইসলামের[৫] পাঁচটি বিধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সেগুলো হল:

---

১ "فريضة واحد وجمعه فرائض." انظر: مجد الدين الفروزابادي، *القاموس المحيط*(القاهرة: دار الحديث، ১৪২৯هـ، ২০০৮م)، ص ১২৩৬

২ فريضة من الله দ্র. আল কুরআন, ৪ : ১১

৩ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, সং.১৩, সেপ্টেম্বর ২০১৩), পৃ. ৭৫৬

৪ মাওলানা আব্দুল বাতেন নোমান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*(বরিশাল : শারীয়াতিয়া লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ ২০০৫), পৃ. ১০৩

৫ ইসলাম আরবি শব্দ, যা বাবে ইফ'আলের ক্রিয়ামূল। এর আভিধানিক অর্থ- ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা, সমর্পণ করা, সপে দেয়া, আত্মসমর্পন করা, বশ্যতা স্বীকার করা, অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা, শান্তির পথে চলা, নির্দেশ মানা ও মুসলমান হওয়া। দ্র. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯; শারী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ্র অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা ও তাঁর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। বিনা দ্বিধায় তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেয়া বিধান

- কালিমা-ই-তাওহীদ এর স্বীকারোক্তি;
- দৈনিক পাঁচবার নামায আদায়;
- যাকাত প্রদান;
- রমজান মাসের রোজা পালন ও
- কা’বা শরীফের হজ্জ পালন করা।[৬]

ইসলামের[৭] এ পাঁচটি বিধানকে ইসলামি বাগানের ফুলের সাথে তুলনা করা যায়। হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) মনে করতেন বাকি কর্তব্যসমূহের স্থান বৃক্ষের অসংখ্য ছোট ছোট ডাল-পালা এবং পাতার মত যা কেবল বাগানের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না, বাগানের পরিপূর্ণতাও আণয়ন করে। ইসলামের আক্বিদা বা বিশ্বাস অনুযায়ী ইসলামের প্রথম তিনটি বিধান কালিমা, নামায ও রমজান মাসের রোযা ধনী-গরীব সকলের জন্য অবশ্যই পালনীয়। শেষ বিধি দু’টি শুধুমাত্র বিত্তবান শ্রেণির জন্য পালনীয়। ১৮১৮ সালে হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) ফরায়েযী আন্দোলন নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে মুসলিমগণের প্রতি ঘোষিত কর্মসূচি ইসলামের যাবতীয় ফরযসমূহ পালনে গুরুত্ব আরোপ করেন। কেননা মুসলিমগণ দীর্ঘদিন স্থানীয় হিন্দুদের সাথে চলতে গিয়ে নিজেদের তাহযীব ও তমুদ্দুন হারিয়ে ফেলে হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাসমূহ হতে দূরে সরে পড়েছিল।

১৮২০ সালে হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) দ্বিতীয় বার মক্কা থেকে দেশে ফিরে আসার পর জনগণের মাঝে তার কর্মসূচি ইসলামের পাঁচটি মৌল বিধি এবং বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মপন্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ফরায়েযী আন্দোলন পূর্ব বাংলার সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে এবং বিপুল জনগোষ্ঠি তাদের মুক্তির আন্দোলন ‘ফরায়েযী আন্দোলন’ এর

---

অনুসারে জীবন পরিচালনা করা। আর যিনি ইসলামের বিধান অনুসারে জীবন যাপন করেন, তিনি হলেন মুসলিম বা মুসলমান।
ইসলাম আল্লাহ তা‘আলার মনোনীত একমাত্র দ্বীন- একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ‘ইসলামই আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা।’ দ্র. আল কুরআন, ৩ : ১৯; আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, ‘কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না।’ দ্র. আল কুরআন, ৩ : ৮৫; সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*(ঢাকা : ইফাবা, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০০), পৃ. ৫

৬ "عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلوة، وإيتاء الزكوة والحج وصوم رمضان. দ্র. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, সং.৫, এপ্রিল ২০০৪), খ.১, পৃ. ১৬, হাদীস নং.৭

৭ "الإسلام هو الاستسلام والانقياد والإسلام من الشريعة إظهار الخضوع وإظهار الشريعة التزام لِما أتى به النبى صلى الله عليه وسلم." انظر: لابن منظور، *لسان العرب*(الكويت: شركة دار النوادر الكويتية، الطبعة الخاصة، ১৪৩১هـ، ২০১০م)، المجلد ২৫، ص ১৮৫-১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

পতাকা তলে সমবেত হন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। মক্কায় তাঁর উস্তাদ 'ছোট আবু হানিফা' খ্যাত মাওলানা তাহের সোম্বলের শিক্ষা-দীক্ষায় তার অন্তর পরিপূর্ণ ছিল। সমকালীন মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদী ও সংস্কারক ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয, সৈয়দ আহমাদ বেরলভী ও মাওলানা নিসার আলী তিতুমীর এর ন্যায় তাওহীদ বা একত্ববাদের নিরঙ্কুশতার উপর তিনি জোর দেন। তাওহীদের যে কোন ধরনের বিচ্যুতিকে শিরক এবং বিদ'আত বলে অভিহিত করতেন তিনি। জন্ম, বিবাহ বা মৃত্যু ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠান যেমন- ঢাক-ঢোল পিটানো, মুহররমের দশ তারিখ মর্সিয়া গাওয়া ও শোভাযাত্রা করা, মৃত্যুর মাগরিফাতের জন্য ফাহিতা ও ওরস অনুষ্ঠান করা থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলিমগণকে তিনি আহ্বান জানান। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ইসলামি ভ্রাতৃত্ব, সর্বজনীন ন্যায়বিচার ও সাম্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বর্ণ এবং ধর্মগত বিভেদের স্পষ্ট বিরোধিতা করেন।

তিনি হিন্দু জমিদারদের আরোপিত অনেক অবৈধ কর প্রদানে মুসলিমগণকে নিষেধ করেন। হিন্দুদের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে তিনি নিজেই গরু কুরবানি করেন। অন্যান্য মুসলিমগণকেও গরু কুরবানি করতে নির্দেশ দেন। হিন্দু জমিদারদের আরোপিত মুসলিমগণের দাড়ির উপর ট্যাক্স দিতে মুসলিমগণকে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। আর শক্তভাবে নিষেধ করলেন হিন্দুদের পূজাঁ পার্বণে চাঁদা বা পশু-পাখি দিতে। তিনি হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। বাংলাদেশে চিরদিনই গরু জবাই হত এবং গরুর গোশত মুসলিমগণের প্রিয়খাদ্য ছিল। সমগ্র বাংলায় গরুর গোশত অত্যন্ত সস্তায় পাওয়া যেত। এ কারণেই হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) হিন্দু জমিদারদের এ অত্যাচারমূলক গরু জবাই নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করেন। তিনি আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি শিরক ও বিদ'আত হতে সকলকে দূরে থাকতে আহ্বান জানান। ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকে নিজেদের জীবনযাত্রা পরিচালনা, আচার-অনুষ্ঠান পালন করার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। রক্ষণশীল মুসলিমগণের একটা অংশ প্রথম থেকেই হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর বিরোধিতা করে। তাছাড়া তার নেতৃত্বে মুসলিম কৃষকদের ক্রমবর্ধমান ঐক্য হিন্দু জমিদার শ্রেণিকেও ভাবিয়ে তোলে। এবার তারা (হিন্দু জমিদার শ্রেণি) তিতুমীরের বিরুদ্ধে যেভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর বিরুদ্ধেও সে একই পন্থায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা ফরায়েযী এবং রক্ষণশীল মুসলিমগণের মধ্যকার বিরোধকেও কাজে লাগায়। ঢাকার জমিদার শ্রেণি রক্ষণশীল মুসলিমগণের সহযোগিতায় এবং ইংরেজ

Dhaka University Institutional Repository

সরকার তার পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে ১৮৩১ সালে বর্তমান মানিকগঞ্জ[৮] জেলাধীন সিঙ্গাইর থানার রামনগর বা নয়াবাড়ি ফরায়েযী আস্তানা আক্রমণ করে।[৯] এ নয়াবাড়িতেই হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ফরায়েযীদের ট্রেনিং দিতেন।[১০] সামরিক বিদ্যাসহ যুদ্ধ কৌশলের প্রশিক্ষণ দিতেন। বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের গোড়ামি বা রক্ষণশীলতার পূর্ণ সুযোগ পরবর্তী সময়ে জৌনপুরের মাওলানা কেরামত আলীও গ্রহণ করেন। হিন্দু জমিদার শ্রেণি ও ইউরোপীয় নীলকর সাহেবদের কঠোর অত্যাচারমূলক প্রতিরোধের মুখে ধীরে ধীরে ফরায়েযী আন্দোলন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করে।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) রাজনৈতিকভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন। অপর দিকে সামাজিকভাবে তিনি অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। তাঁর সংগ্রামে যুক্ত হয়েছিলো প্রধানত সমাজের দরিদ্র কৃষক শ্রেণি। যারা হিন্দু জমিদার ও ইংরেজদের অত্যাচার আর শোষণের শিকার ছিল। তিনি ঐক্যবদ্ধ করলেন অসহায়, নিঃস্ব ভাগ্যহত মানুষকে। ১৮৩৭ সালে ফরায়েযী আন্দোলনের সদস্য সংখ্যা বার হাজারের উপরে উন্নিত হয়। এ বিপুল সংখ্যক সদস্যের বাইরে ছিল একটি বিশাল জনশক্তি। যারা তার আন্দোলনকে সকল সময় সমর্থন ও সহযোগিতা করত।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) সমসাময়িক পণ্ডিত জেম্‌স টেইলর বলেন,

> 'ফরায়েযী আন্দোলন অসাধারণ দ্রুততার সঙ্গে বিস্তার লাভ করে এবং তিনি খুব শীঘ্রই কৃতিত্বের সঙ্গে ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসীদের এক-ষষ্ঠাংশকে আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত করে ফেলেন। আন্দোলনের প্রথম দিকে ত্রিপুরা বা কুমিল্লা জেলার অধিবাসীদেরও এক বিরাট অংশ এ আন্দোলনে যোগ দেয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এর ঢেউ চট্টগ্রাম, নোয়াখালি তথা আসাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।'[১১]

তিনি ইসলামের রজ্জুকে দৃঢ়রূপে ধারণ ও সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করণে যে উদাত্ত আহ্বান জানান এবং তিনি মুসলিমগণকে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের উপর বারবার যে গুরুত্ব আরোপ করেন তাতে তার স্ব-ধর্মীয়রা দ্বিধাহীন চিত্তে সাড়া যোগান এবং হতভাগ্য বাঙালি কৃষককুল

---

৮ কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের জেলা পুলিশ অবকাঠামো এবং ব্যবস্থাপনা উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৮৬১-১৯৪৭*(ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪), পৃ. ৬৫

৯ কাবেদুল ইসলাম, *অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ*(ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২), পৃ. ১৩৯-১৪১

১০ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০০), পৃ. ৭০

১১ James Taylor, *A sketch of the Topography and Statistics of Dacca*(Calcutta : G.H. Huttmann, Military Orphan Press, 1840), p. 250

*Dhaka University Institutional Repository*

যারা এতদিন নেতৃত্বহীন ছিল, তারা তাঁকে আল্লাহ্ প্রদত্ত মুক্তিদূত হিসেবে গ্রহণ করে। তবে যে সব এলাকায় হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার চরমে উঠে গিয়েছিল এবং যে সব এলাকায় মুসলিম কৃষকের সংখ্যা হিন্দু কৃষকদের চেয়ে বেশি ছিল, ফরায়েযী আন্দোলন সেসব এলাকায়ই বেশি জোরদার হয়ে উঠে। ইউরোপীয় লেখকগণ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর প্রতি দোষারোপ করেন যে, তিনি এবং তার অনুসারীরা হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে তুলছে এবং তাদেরকে খাজনা দেয়া থেকে বিরত রাখছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এটা ছিল না। তিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বৈধ খাজনা দেয়ার ব্যাপারে এতটুকু বিরোধিতা করেননি, বরং হিন্দু জমিদার শ্রেণি ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম কৃষকদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এমন অনেক বে-আইনি কর তাদের উপর চাপিয়ে দেয় যা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ছিল না। ১৮৭২ সালে ফরিদপুরের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট যখন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করেন, তখন দেখা গেল যে, এ অত্যাচারি হিন্দু জমিদাররা মুসলিম কৃষকদের কাছ থেকে তেইশ প্রকারের অবৈধ কর আদায় করত।[১২] তার মধ্যে কালিপূজা ও দূর্গাপূজার করও ছিল। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) শুধু সে অবৈধ করেরই বিরোধিতা করতেন। হিন্দু জমিদাররা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা তাঁর বিরুদ্ধে কলকাতার হিন্দু পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম কুৎসা প্রচার করতে শুরু করে। ১৮৩৭ সালের ২২ এপ্রিল কলকাতা হতে প্রকাশিত পত্রিকা 'সমাচার দর্পণে' একটি পত্র ছাপা হয়। যার কিছু কথা এ রকম ছিল-

> 'ইদানিং জেলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুরপুর গ্রামে সরিতুল্লা নামক একজন বাদশাহী লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক বার হাজার জোলা ও মুসলমান দলবদ্ধ করিয়া নতুন এক সরা জারি করিয়া নিজ মতাবলম্বী লোকদিগের মুখে দাড়ি, কাছা খোলা, কটি দেশে ধর্মের রুজ্জুভৈল করিয়া তৎচতুর্দিগস্থ হিন্দুদিগের বাটি চড়াও হইয়া দেবদেবী পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে- এই জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মতলবগঞ্জ থানার রাজনগর নিবাসী দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোড়াগাছা গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাটিতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্বস্ব হরণ করিয়া তাহার

---

১২ '১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর কালেক্টরেটের রেকর্ডরুম থেকে সংগ্রহকৃত। ফরিদপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতিক্রমে চিঠি নং ১৬৯, ১৬ মে, ১৮৭২, ফাইল : ১৮৭২-৭৩ ফরিদপুর ক্যালেক্টরেট রেকর্ডস।' দ্র. ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬-১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে টুকু ছিল ভস্ম রাশি করিলে একজন যবন মৃত হইয়া ঢাকায় দওরায় অর্পিত হইয়াছে।'[১৩]

'আর শ্রুত হওয়া গেল, সরিতুল্লার দলভুক্ত দুষ্ট যবনেরা ঐ ফরিদপুরের অন্ত:পাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিণী চরণ মজুমদারের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাহার বাটিতে দেব-দেবীর পূজায় আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম উপস্থিত করিয়ে মজুমদার বাবু যবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া-ঐ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুজুরের জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্বক কয়েকজন যবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। হে সম্পাদক মহাশয়, দুষ্ট যবনেরা মফঃস্বলে এ সকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচারগৃহে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুত হওয়া গেল, ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুজুরে যে সকল আমলা ও মোক্তার-কারেরা নিযুক্ত আছে, তাহারা সকলেই সরিতুল্লা যবনের মতাবলম্বী-তাহাদের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয়, তবে কেহ ফরিয়াদী কেহবা সাক্ষী হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে সুতরাং ১২০০০ লোক দলবদ্ধ। ইহাতে ফরিয়াদীর সাক্ষীর ত্রুটি কি আছে.... আমি বোধ করি, সরিতুল্লা যবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর উত্তর প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দুধর্ম লোপ পাইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লার চোটপাটের শত অংশের এক অংশ তিতুমীর করিয়াছিল না।'[১৪]

এছাড়া হিন্দু জমিদার হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করে। অভিযোগে তারা ফরায়েযীদের বিদ্রোহী বলে অভিহিত করে এবং এর প্রতিরোধ কামনা করে। ১৮৩৭ সালে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনিও তিতুমীরের মত বাংলায় একটি ইসলামি সরকার গঠনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এ ব্যাপারে হিন্দুরা ইউরোপিয় নীলকরদের সহযোগিতা লাভ করে। কিন্তু তাদের বানোয়াট অভিযোগ আদালতে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ১৮৩৯ সালে ফরিদপুরে হাঙ্গামার অভিযোগে পুলিশ শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার করে। ইংরেজ সরকার বাংলার মুসলিম জাগরণ আন্দোলন ও বিদ্রোহের গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য একজন ভাল

---

১৩ চিঠিপত্রের কলাম, *সমাচার দর্পণ*, ১২৪৩ বঙ্গাব্দ, ২৪ চৈত্র। উদ্ধৃত: ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০৭), পৃ. ১৫; মোশাররফ হোসেন খান, *হাজী শরীয়তুল্লাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

১৪ চিঠিপত্রের কলাম, *সমাচার দর্পণ*, ১২৪৩ বঙ্গাব্দ, ২৪ চৈত্র। উদ্ধৃত: ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫; মোশাররফ হোসেন খান, *হাজী শরীয়তুল্লাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

*Dhaka University Institutional Repository*

লেখক ও গবেষক হিসেবে পদস্থ সরকারি কর্মচারী, চরম মুসলিম বিদ্বেষী ডব্লিউ, ডব্লিউ, হান্টারকে নিয়োগ করেন। ইংরেজদের দেয়া এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হান্টার তখনকার মুসলিমগণকে আন্দোলন ও বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তারিত একটি রিপোর্ট তৈরি করেন।

মুসলিম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর লিখতে গিয়ে হান্টার 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' নামক একখানা বই লেখেন। এ বইখানার বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমগণের আন্দোলন ও বিদ্রোহ সম্পর্কে তীর্যক তীক্ষ্ণ ভাষায় অনেক কিছুর উল্লেখ করেন। হান্টার মুসলিমগণের বন্ধু ছিলেন না। তিনি ইংরেজ সরকারের দেয়া দায়িত্ব পালনের জন্য মুসলিম ও তাদের বিদ্রোহ সম্পর্কে যা আলোচনা করেছেন তা মুসলিমগণের কোন উপকার বা কল্যাণের জন্য করেননি। অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন ইংরেজদের স্বার্থের জন্য। তবুও তার পর্যালোচনা রিপোর্টে এবং প্রদত্ত মতামতের মধ্যে মুসলিমগণের দৃঢ় চেতনা, সাহস ও স্বাধীনতা আন্দোলনের তৎপরতা সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন মুসলিমগণের জন্য অবশ্যই বিস্ময়ের ব্যাপার। হান্টারের কয়েকটি অভিমত উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সে দিনকার আন্দোলন-বিদ্রোহ সম্পর্কে আমরা কিছুটা ধারণা লাভ করতে সক্ষম হব। ইংরেজ তাবেদার হান্টার তার 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' বইতে অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে,

> 'গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এলাকায় ধর্মান্ধ মুসলিমগণ নিজেদেরকে ওহাবী না বলে ফরায়েযী অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের অনাবশ্যকীয় আচারানুষ্ঠাদি বর্জনকারী হিসেবে পরিচিত করে। কলকাতার পূর্বদিকের জেলাসমূহে এদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮৪৩ সালে এ সম্প্রদায়টি এতদূর বিপদজ্জনক হয়ে ওঠে যে, তাদের সম্পর্কে তদন্তের জন্য সরকারকে বিশেষ তথ্যানুসন্ধান কমিশন নিয়োগ করতে হয়। বাংলার পুলিশ প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হয় যে, মাত্র একজন প্রচারক প্রায় ৮০ হাজার অনুগামীর এক বিরাট দল গড়ে তুলছে এবং তারা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থকে গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থ বলে বিবেচনা করে থাকে। পাঞ্জাবের উত্তরে অবস্থিত জনহীন পর্বতরাজীর সঙ্গে উষ্ণ মণ্ডলীয় গঙ্গা অববাহিকার জলাভূমি অঞ্চলের (বাংলার) যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে রাজবিদ্রোহীদের নিরবিচ্ছিন্ন সমাবেশের মাধ্যমে।'[১৫]

হান্টার আরও লেখেন,

> 'সু-সংগঠিত প্রচেষ্টায় তারা ব-দ্বীপ অঞ্চল বাংলা থেকে অর্থ ও লোক সংগ্রহ করে এবং দুই হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্রোহী শিবিরে তা চালান করে দেয়। বাংলার এমন কোন জনপদ ছিল না যেখানকার মুসলিমগণের মধ্যে সৈয়দ সাহেবের সংস্কার বাণী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। প্রতিটি ধার্মিক পরিবারের যুবকরা সিমান্তে গিয়ে

১৫ Sir William Wilson Hunter, *The Indian Musalmans*(London : Trubner and Company, 1876), p. 49

Dhaka University Institutional Repository

জিহাদ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে একদিন তারা হঠাৎ করে সীমান্তের মুজাহিদ কাফেলায় যোগ দেবার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে। জমির খাজনা পরিশোধ করতে অসমর্থ কৃষকেরাও জিহাদের জন্য নিয়মিত অর্থ প্রদানে কুণ্ঠিত হত না।'[১৬]

হান্টার আরও লেখেন,

'সারা ভারতে তারা তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইতিহাসের এক বৃহত্তম ধর্মীয় পুনরুত্থান সাধিত করে। তাদের অসংখ্য ছোট ছোট মিশনারি দল ছিল। দক্ষ সংগঠনের মাধ্যমে তারা মুরিদগণের তাগিদে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই আস্তানা স্থাপন করতে পারত। প্রত্যেক জেলাতেই একজন করে প্রচারক নিযুক্ত হয়। ভ্রাম্যমান মিশনারিরা মাঝে মাঝে এসব জেলা সফর করে সেখানকার স্থায়ী প্রচারকদের উদ্যমকে জাগ্রত করতে থাকে। এসব প্রচারকদের অশুভ প্রভাব ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।'[১৭]

এরা এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল যে স্ত্রী লোকেরা তাদের গহনা পত্র স্বেচ্ছায় ধর্মান্ধদের তহবিলে দান করেছিল। দলের পর দল সংগ্রহ করে ধর্মান্ধ শিবিরে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছিল। দেশের সর্বত্র মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে তারা গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অজস্র রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য, পাটনায় অবস্থিত কেন্দ্রিয় প্রচারকেন্দ্র এবং সারা বাংলার আনাচে-কানাচে প্রচারকদের আনাগোনা ছাড়াও জনগণের মধ্যে রাজদ্রোহমূলক কাজে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য ওহাবীরা (ফরায়েযীরা) একটি চতুর্থ সংগঠন গড়ে তুলেছে। এভাবে পল্লী বাংলার বিভিন্ন স্থানে এক ধরনের বিদ্রোহী কলোনী গড়ে উঠে। অর্থ সংগ্রহ ব্যবস্থাটা সহজ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। গ্রামগুলোকে বিভিন্ন আর্থিক এলাকায় বিভক্ত করে প্রত্যেক এলাকার জন্য একজন করে প্রধান ট্যাক্স আদায়কারী নিয়োগ করা হয় এবং তার মধ্যে একজন মৌলভী থাকতেন যিনি সমাজে ইমামতি করতেন। একজন জেনারেল ম্যানেজার রাখা হয় যিনি মুসলমানদের দুনিয়াবী কাজের তদারকি করতেন। এছাড়াও একজন অফিসার থাকতেন, তার কাজ ছিল বিপদজনক চিঠি বিলি বণ্টন ও রাজদ্রোহমূলক খবরা-খবর আদান প্রদান করা।'[১৮]

হান্টার 'ওয়াহাবি' বলে যে সংগঠনের কথা বলেছেন তা সঠিক নয়। 'ওয়াহাবি' বলতে বিশ্বে কোন সংগঠন ছিল না। 'ওয়াহাবি' পারিভাষাটি ইংরেজদের কল্পনা রাজ্যের সৃষ্টি এবং ইসলামি আন্দোলনের জন্য একটি গালি মাত্র। বর্তমান শতাব্দী শুরুর লগ্নে সারা বিশ্বের মুসলিমগণ

---

১৬ Ibid.

১৭ Ibid, p. 50

১৮ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

যখন তাদের হারানো গৌরব ও আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচার ইচ্ছায় অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামরিক শক্তি প্রদর্শন করছে, তখন মুসলিম বিশ্বের আদর্শবান ব্যক্তিবর্গকে মৌলবাদী বলে গালি দিয়ে ইয়াহুদি ও তাদের মিত্ররা আত্মতুষ্টিতে মেতে উঠেছেন। প্রকৃত পক্ষে মৌলবাদ বলে পৃথিবীতে কোন মতবাদ এবং মৌলবাদী বলে কোন সংগঠন নেই। 'ওহাবী' যেমনি ইংরেজদের কল্পনার ফসল, তেমনি মৌলবাদী ইয়াহুদিদের উর্বর মস্তিষ্কের তৈরি একটা গালি মাত্র।

### ৩.১.২ ফরায়েযী আন্দোলনের পরিচয়

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং তার পূর্বে মুসলিম অভিজাত শ্রেণির বিলুপ্তির ফলে বাংলার মুসলিমগণ নেতৃত্ব হারা হয়ে পড়ে। অথচ এ সময়টা ছিল তাদের জন্য খুবই দুর্যোগপূর্ণ। অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। কারণ, এ সময়ে গোমস্তা, জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার নিপীড়নে মুসলিম কৃষক ও জনসাধারণের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিল। যেহেতু দারিদ্র্যপীড়িত এবং অবলুপ্ত মুসলিম অভিজাত শ্রেণির পক্ষে সাধারণ মুসলিমগণের নেতৃত্ব প্রদান সম্ভব ছিল না। তাই সাধারণ মুসলিমগণ তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছিল। ঠিক সে সময়ই আর্বিভাব হয়েছিল হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর।[১৯] ১৮৭২ সালের ভারতীয় আদম শুমারির পরিচালক ড. জেমস ওয়াইজের মতে, প্রথম যে ব্যক্তি মুসলিম ধর্মের সংস্কার সাধন করে সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। জেমস ওয়াইজ বলেন, তিনিই প্রথম প্রচারক যিনি পূর্ব বাংলার পল্লী অঞ্চলে বহু দেব-দেবীবাদী হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে দীর্ঘকাল সংশ্রবে থাকার ফলে মুসলিমগণের মধ্যে যে কু-সংস্কার ও কুপ্রথা স্থান করে নিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তিনি বলেন, নির্জীব ও উদাসীন বাঙ্গালী কৃষকদের মধ্যে জাগরণ আনয়নের জন্য একজন অকপট ও দরদি নেতার প্রয়োজন ছিল তিনি সে অভাব পূরণ করেন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ছাড়া আর কোন নেতাই নিজের আদর্শের প্রতি জনসাধারণকে এত আকৃষ্ট করতে পারেননি।[২০]

বহু সাগর পাড়ি দিয়ে বাংলায় আসা ইংরেজরা মুসলিমগণকে সকল দিক দিয়ে ধ্বংস এবং নির্মূল করার জন্য নানা ধরনের অপকৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা ঘৃণ্য-কুটিল ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। ইংরেজরা আক্রমণ করে মুসলিমগণের ধর্মের উপর, তাদের অর্থনীতির উপর। মুসলিমগণের দীর্ঘ দিনের আয়মা, লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করে দেয়। মুসলিমগণের হাত থেকে খাজনা আদায়ের ভার ছিনিয়ে নিয়ে তা দিয়ে দেয়া হয় অনুগত হিন্দুদের হাতে। আর এ সুযোগ পেয়ে চরম সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা আনন্দে লাফিয়ে উঠে। মনে হয় বহুদিন যাবত ওৎ পেতে ছিল

---

১৯ মাওলানা আব্দুল বাতেন নোমান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

২০ Dr. James Wise, *Article on Shariatullah & the Farszis*(Dacca : The Royal Asiatic Society of Bengal, 1894), p. 28

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুরা এ সুযোগের অপেক্ষায়। এমনি একটা মাধ্যম খোঁজ করছিল তারা যা দিয়ে বহুকালের শত্রু মুসলিমগণকে বেশি করে শায়েস্তা করতে পারে।

খাজনা আদায়ের সুযোগ পেয়ে হিন্দুরা চড়াও হল মুসলিমগণের উপর। তাদের সাহসের মাত্রা বেড়ে গেল হাজার হাজার গুণ। মুসলিমগণের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের অজুহাতে কারণে অকারণে তারা তাদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ণ চালাতে থাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে। মুসলিমগণের অর্থ-সম্পদ, জমি-জায়গা ছলে বলে দখল করেও তৃপ্ত হত না হিন্দুরা। শারীরিকভাবে তারা নির্যাতন চালাত মুসলিমগণের উপর। হিন্দুদের প্রধান কাজ ছিল মুসলিমগণের ধর্মীয় কাজে বাধা সৃষ্টি করা। অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের এলাকায় কোন মুসলিম গরু কুরবানি দিতে পারত না, মসজিদে আযান দিতে পারত না। এমনকি ইসলামের ফরয-ওয়াজিব কাজগুলো পালন করতে পারত না স্বাধীনভাবে। জমিদাররা বেতন দিয়ে পুষত পশু স্বভাবের লাঠিয়াল বাহিনী। তারা যখন তখন মুসলিমগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত বাঘের মত। হিন্দু জমিদাররা মুসলিমগণের দাড়ির ওপর ট্যাক্স বসায়। মুসলিমগণকে হিন্দুদের মত ধুতি পরতে এবং দাড়ি মুণ্ডন করে বড় গোঁফ রাখতে বাধ্য করে। পূজার সময় মুসলিমগণের কাছ থেকে জোর পূর্বক আদায় করত নগদ অর্থ, ছাগল, হাঁস-মুরগি। পূজার আয়োজনে বিনা পারিশ্রমিকে খাটিয়ে নিত তাদেরকে। যারা হিন্দু জমিদারদের আদেশ মানত না তাদের উপর চালাত অমানবিক নির্যাতন। হাজী শরী'অতুল্লাহ রহ. চারদিকে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখলেন হিন্দু-মুসলিমদের আচার-আচরণ। তাদের আচার-আচরণের মধ্যে খুঁজে পেলেন না হিন্দু-মুসলিমদের আদর্শগত পার্থক্য। হতভাগ্য মুসলিমগণের অন্ধকার গুহা থেকে টেনে তোলার জন্য তিনি কঠিনভাবে সংকল্পবদ্ধ হলেন। তিনি হিন্দু ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেন। শুরু করেন দেশ, জাতি ও ইসলামি আদর্শ ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের দুর্বার সংগ্রাম। যা 'ফরায়েযী আন্দোলন' নামে পরিচিতি লাভ করে।[২১]

## ৩.১.৩ ফরায়েযীদের পরিচয়

ফরায়েযীগণ ফরিদপুরের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। ওয়াহাবীদের ধর্মমতের সাথে এদের ধর্মমতের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও আবার যথেষ্ট পার্থক্যও ছিল। ফরায়েযীরা 'ওয়াহাবী' নামটিরও বিরোধিতা করত। 'ফরায়েযী' কথাটির অর্থ 'ফরয' অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ অনুসরণকারী। ফরিদপুরের শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও দুদু মিঞা ছিলেন এ ধর্মমতের প্রবর্তক। তাঁরা প্রচলিত ইসলাম ধর্মের মৌলিক সংস্কার সাধন করে 'ফরায়েযী মতবাদ' নামে ইহা

২১ ড. আহসান উল্লাহ ফয়সল, *হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলন*(ঢাকা : শরীয়তিয়া প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১০), পৃ. ৬; ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত, *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার* রাজনীনি(ঢাকা : বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১), পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। তাঁদের এ ধর্মমত অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকা-ফরিদপুর অঞ্চলের দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণের ধর্মীয় আদর্শে পরিণত হয়। ধর্মীয় মত ও ধর্মাচরণের সরলতাই তাঁদের এ সাফল্যের কারণ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম জাহানের সর্বত্র ইসলামি পুনরুজ্জীবনের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। আরবের মুওয়াহহিদুন তথা ওয়াহাবী আন্দোলন, সিরিয়া এবং মিশরে সালাফিয়া আন্দোলন, লিবিয়ার সানুসি আন্দোলন, নাইজেরিয়ায় 'ফুলানি' আন্দোলন, ইন্দোনেশিয়ায় 'ফাদুরি' আন্দোলন এবং ভারতবর্ষে 'তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়া' আন্দোলন ও 'আহলুল হাদিস' আন্দোলনের মাধ্যমে জেগে উঠে মজলুম জনতা।

১২০৩ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল এ ৫৫৪ বছর পর্যন্ত মুসলিমগণ বাংলার শাসন পরিচালনা করেন। অবশেষে ঘনিয়ে আসে বাংলার দীর্ঘ সময়ের শাসন আমলের সে কালো বছর ১৭৫৭ সাল। পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। এ যুদ্ধে মুসলিমগণের হাত থেকে বাংলার শাসন ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া হয়। পলাশির যুদ্ধে মুসলিমগণ পরাজয় বরণ করে কেবল রাজ্যই হারাননি, তারা হারালো তাদের সর্বস্ব। একদিন যে মুসলিমগণের হাঁক ডাকে সরব হয়ে উঠত চারদিক। মুহূর্তেই থেমে গেল তাদের তুমুল গর্জন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) সকল আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শহর থেকে শহরান্তরে ঘুরে বেড়ান তার প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের প্রচারে। ঘুরে ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেন আপন সংগঠনের জন্য সদস্য ও নিবেদিত কর্মী। আন্দোলনের নীতিমালা ছড়িয়ে দেন সারা বাংলায়। যারা ইসলামের ফরযসমূহ মানতে ও পালন করতে রাযি তারাই কেবলমাত্র ফরায়েযী আন্দোলনের সদস্য হতে পারত। খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক মুসলিম এ আন্দোলনের সদস্য পদ লাভ করেন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তাঁর সংগঠনের সদস্য ও সাধারণ মুসলিমগণকে ধর্মের সাথে কর্মের মিল রাখার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন। হান্টার তার "দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস" বইতে আরও লেখেন,[২২]

> 'বাংলার মুসলমানরা আবার বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। তারা একেক দল ধর্মান্ধকে পাঠিয়েছে, যারা শিবির আক্রমন করেছে, গ্রাম পুড়িয়েছে, আমাদের প্রজাদের হত্যা করেছে এবং আমাদের সেনাবাহিনীকে তিন-তিনটি ব্যয়বহুল যুদ্ধে লিপ্ত করেছে। আমাদের সীমান্তের ওপারে মাসের পর মাস ধরে গড়ে উঠা শত্রু বসতির লোক নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে। বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত

---

২২ Sir William Wilson Hunter, *The Indian Musalmans*, Ibid, pp. 10-16

*Dhaka University Institutional Repository*

রাজনৈতিক মোকদ্দমার বিচার থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের প্রদেশসমূহের সর্বত্র বিস্তারিত হয়েছে এক ষড়যন্ত্রের জাল।'[২৩]

## ৩.১.৪ বৃটিশ শাসনের পূর্বে এবং সমসাময়িক বাংলার জমিদার শ্রেণির অবস্থা

জমিদার শ্রেণি সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল মুসলিম শাসনাধীন বাংলা অঞ্চলে। জমিদারি ছাড়াও জমিদারগণ সরকারের রাজস্ব কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করত। এ সকল জমিদার প্রতিবেশী ভূমির মালিক এবং রায়তদের থেকে রাজস্ব আদায় ছাড়াও কম গুরুত্ব সম্পন্ন দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার করত। মামলার সাজা প্রদানের সময় অবশ্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করতে হত।[২৪] জমিদারগণের কাছে তাদের এলাকার পুলিশের দায়িত্বও ছিল। এক্ষেত্রে তাদের জমিদারির সঙ্গে গ্রামীণ পুলিশ রাখার ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়াও তাদের এলাকায় যদি কোন ডাকাতির ঘটনা ঘটত, তাহলে তাদেরকে ডাকাত ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির করতে হত। জমিদারি পাওয়ার 'সনদের' এ ধরনের শর্ত ছিল। অসামাজিক ও অপরাধীদের শনাক্ত করার ক্ষেত্রে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতকে সাহায্য করাও জমিদারগণের দায়িত্ব ছিল। সুতরাং গ্রাম বাংলার জমিদারগণ শুধু উচ্চবিত্ত শ্রেণিই ছিল না, সাথে সাথে এরা সরকারের স্বার্থও সংরক্ষণ করত।

এখানে উল্লেখ্য যে, জমিদারি সাধারণত একজন ব্যক্তিকে অস্থায়ীভাবে কয়েক বছরের জন্য অথবা সারা জীবনের জন্য দেয়া হতো। কিন্তু বাস্তবে একজন জমিদারের উত্তরাধিকারী হিসেবে জমিদারি পৈতৃক সূত্রেও লাভ করত। অবশ্য নিয়মিত রাজস্ব পরিশোধের উপর তা নির্ভর করত। কিন্তু বাংলার জমিদারগণ প্রায়ই ছিল স্বার্থান্বেষী এবং অন্তরদর্শী। তাই এরা রায়তদের প্রতি ছিল অত্যাচারী এবং সরকারের কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করত। সারাদেশকে জেলায় বা ফৌজদারিতে বিভক্ত করে প্রতিটিতে একজন ফৌজদার নিয়োগ করা হত। প্রতি ফৌজদার ১০০০ থেকে ৪০০০ অশ্বারোহী রাখতে পারত। ফৌজদারদের প্রধান দায়িত্ব ছিল জমিদারকে সার্বক্ষণিক নজরে রাখা এবং প্রয়োজনে তাদেরকে সংশোধন করা। প্রধান নির্বাহী হিসেবে ফৌজদার জেলার শান্তি শৃংখলা রক্ষক ছিল। এ উদ্দেশ্যে তাকে যে কোন ধরনের আইন অমান্য করার ঘটনার প্রতি নজর দেয়া, অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করা, রাজপথ নিরাপদ রাখা, কর প্রদানকারীদের নিরাপত্তা প্রদান এবং নির্যাতন থেকে সাধারণ জনগণকে রক্ষা করার দায়িত্বে ন্যস্ত করা হত।[২৫]

---

২৩ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

২৫ এম রেমন্ড অনূদিত, *সিয়ার আল মুতাখখেরিন*(কলিকাতা : প্রকাশন, ১৯০২), খ.৩, পৃ. ১৭৮, ২০৪-২০৫

*Dhaka University Institutional Repository*

উপরোক্ত যে কোন বিষয়ে ব্যর্থ হলে অথবা সরকারের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারালে শাস্তি হিসেবে 'জমিদারি' ছিনিয়ে নেয়া হত। সুতরাং 'জমিদারি' অধিকার অস্থায়ী হওয়াতে এবং ফৌজদারের নজরদারির ফলে জমিদারগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হত। এ কারণে জনসাধারণের উপর নির্যাতন করার অবকাশ কমই ছিল। ব্রিটিশ শাসনাধীনে জমিদারদের অবস্থান বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে।

**প্রথমত:** জমিদারদের কাছ থেকে ছোট দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা পরিচালনার ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হয় এবং এ সকল মামলা আদালতে পাশ করার ব্যবস্থা করা হয়।

**দ্বিতীয়ত:** ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে জমিদারিতে যে পুলিশ বাহিনী ছিল তা অবলুপ্ত করে, সরকারি পুলিশ বাহিনীর প্রবর্তন করা হয়।[২৬]

**তৃতীয়ত:** ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ডাকাতি এবং লুট করা দ্রব্যাদি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের যে দায়িত্ব জমিদারদের কাছে ছিল তা থেকে জমিদারগণের অব্যাহতি দেয়া হয়। ডাকাতির সঙ্গে জমিদারদের যোগাযোগ পুরোপুরি প্রমাণিত হলেই শুধু পূর্বের নিয়মানুযায়ী ডাকাতি ও লুট করা দ্রব্যাদি ফেরত দিতে হত। ইজাদার হিসেবে সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রদানকারীকে জমিদারি প্রদান করার (১৭৭২-১৭৯৩) হেস্টিংসের নীতি এবং লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) বাংলার ভূমি নির্ভর অভিজাত শ্রেণির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।[২৭] এ বিরূপ প্রতিক্রিয়া কয়েকটি কারণে সৃষ্টি করেছিল।

**প্রথমত:** ইজারাদারি প্রথার নগদ অর্থ সিকিউরিটি হিসেবে প্রদান করার নিয়ম প্রবর্তন করে, যা পুরানো জমিদারগণ দিতে ব্যর্থ হয়। সর্বোচ্চ অংকের ডাক প্রদানকারীকে জমিদারি প্রদানের নিয়মের ফলে, গোমস্তা, মহাজন এবং বেনিয়াগণ তা সহজেই অর্জন করে। এদের কাছে নগদ অর্থ থাকার কারণে জমিদারি অর্জন করতে সমর্থ হয়। উল্লেখ্য যে, এরা ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ।

**দ্বিতীয়ত:** জমিদারির এক তৃতীয়াংশ থেকে অধিকাংশ ছিল পুরনো অভিজাত শ্রেণির মালিকানাধীন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, হিন্দু নায়েব এবং শিকদারগণ (যারা জমিদারির ম্যানেজার ও খাজনা সংগ্রাহক ছিলেন) জমিদারি অর্জন করে বসে, যদিও পূর্বে এরা মুসলিম জমিদারদের কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন।

১৮৪২ সালে একজন ইংরেজ কর্মকর্তা একটি বৃটিশ দলিলের খোঁজ পান। এ দলিলে বাংলার একটি জেলার জমিদারি সম্পর্কে বলা হয় যে, এখন এ জেলার বারটি জমিদারির পুরোটাই

---

২৬ কাবেদুল ইসলাম, *অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ*(ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২), পৃ. ১২৪

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪; Henry Morris, *The Governors-General of British India*(Michigan : Discovery Pub. House, reprint, 1984), vol. l, p. 62

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বেকার জমিদারদের হাত ছাড়া হয়েছে। শুধু এদের হাতে রয়েছে খাজনামুক্ত কিছু জমি। এর মধ্যে পূর্বতন জমিদারের বংশধরদের দ্বারা দু'টি ও অবশিষ্ট জমিদারি নিম্নশ্রেণির নব্য ধনীদের দ্বারা অর্জিত হয়েছে। উক্ত নীতির ফলে হিন্দু কর আদায়কারীগণ গৌণ অবস্থান থেকে জমিদার হওয়ার সম্মান অর্জন করে।

সুতরাং বৃটিশ অনুসৃত রাজস্ব নীতির কারণে জমিদারির মালিকানাই শুধু পরিবর্তিত হয়নি, সে সঙ্গে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে পরিবর্তন আসে। ভূমি নির্ভর অভিজাত শ্রেণির স্থান দখল করে, বাণিজ্য নির্ভর হিন্দু ম্যানেজার এবং কর ও খাজনা আদায়কারীগণ। এর ফলে জমিদার কৃষক সম্পর্কে পরিবর্তন আসে। একজন অভিজ্ঞ ইংরেজ কর্মকর্তা ১৮৪২ সালে লিখেন যে, সনাতন ভূমি নির্ভর অভিজাত শ্রেণির মধ্যে নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাধারণ জনগণের জন্য এ শ্রেণিটির সহানুভূতি ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রেই এ শ্রেণিটির মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্য বিরাজ করছিল। সম্মানিত পদ হিসেবে এ শ্রেণিটি জনসাধারণের মধ্যে গৌরব, আভিজাত্য ও ভালবাসা পেয়েছিল। এর বিনিময়ে এ শ্রেণিটি কৃষক শ্রেণির কাছ থেকে পেয়েছিল সাধারণ আনুগত্য। এ ধরনের আবেগ কাজ করার ফলে ভূমিনির্ভর শ্রেণি কৃষক সমাজকে রক্ষা করত। এ শ্রেণিটি সাধারণ জনগণের স্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবনযাপনের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করত। এর বিনিময়ে জনগণ গ্রামীণ জীবনে জমিদারদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করত ও নেতারূপে বরণ করত। অন্যদিকে নবপ্রতিষ্ঠিত আধুনিক জমিদার শ্রেণি ছিল বাণিজ্যিক মনোভাবাপন্ন একটি শ্রেণি যারা অধিক মুনাফার প্রত্যাশায় মূলধন জমিদারিতে লগ্নি করেছিল। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার পুলিশ প্রধান ফরিদপুর অঞ্চলের জমিদারদের সম্পর্কে রিপোর্ট করেন। এ রিপোর্টে বলা হয় যে, এ অঞ্চলের রায়তদের থেকে অর্থ আদায় করার জন্য জমিদারগণ তাদের ক্ষমতার বাইরে যে কোন পথ অনুসরণ করত।

১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অপর এক দলিলে দেখা যায় যে, নতুন জমিদার শ্রেণির কিছু সদস্যের প্রথম কাজ ছিল ডাকাত দলকে আশ্রয় দেয়া এবং লুটের অর্ধেক ভাগ গ্রহণ করা। এ দলিলে আরও বলা হয় যে, এসব জমিদারগণ নির্দিষ্ট আয়ের উৎস হিসেবে ডাকাতিকে পৃষ্ঠপোষকতা করত।[২৮] এ বিষয়টিকে ঢাকা-জামালপুরের (বর্তমান ঢাকা ও ফরিদপুর) ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্ট সমর্থন করে। উপরন্তু ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের পর ডাকাত ও লুণ্ঠিত দ্রব্য ফেরত দানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির ফলে নতুন জমিদার শ্রেণির কাজকর্মে কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকগণ স্থানীয় আইন বিষয়ক কর্মকর্তা পুলিশ ও করণিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার ফলে তাদের পক্ষে ন্যায়-অন্যায় অনুধাবন করা

২৮ কাবেদুল ইসলাম, *অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯; W.R. Gourlay, *A Contribution Towards a History of the Police in Bengal*(Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1916), p. 38

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব ছিল না। কারণ স্থানীয় কর্মকর্তাদেরকে জমিদারগণ উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের পক্ষে টেনে নিত। জমিদারগণের ধূর্ত কাজকর্মের ফলে প্রায়শই ম্যাজিস্ট্রেটগণ জমিদারদের হাতের পুতুল হিসেবে কাজ করত।
১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার পুলিশ রিপোর্টে বলা হয় যে, ফরিদপুরের জমিদারগণ মুসলিম কৃষক শ্রেণির ধর্ম এবং তাদের নারী সমাজকেও হেয় করেছে। একজন ইংরেজ কর্মকর্তা যে পদ্ধতির মাধ্যমে সনাতন ভূমিনির্ভর অভিজাত শ্রেণিকে নতুন শ্রেণি দ্বারা স্থানচ্যুত করা হয়েছে তাকে 'ছদ্মবেশী বিপ্লব বলেছেন'। নতুন শ্রেণিতে ছিল কিছু দুষ্কৃতকারী ভাগ্যান্বেষী, যাদের অত্যাচারী হাত সামাজিক কানুনকে ছিন্নভিন্ন করেছে এবং পিতৃতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক নমনীয়তাকে অস্বীকার করে, কৃষক শ্রেণিকে অরক্ষিত করেছে। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার পুলিশ প্রধান লিখেছেন যে, জমিদারদের বহু কর্মকাণ্ড রয়েছে যা তাদের খারাপ আচরণের উদাহরণ হতে পারে। পুলিশের কাছে সর্বদা নির্দোষ থাকার প্রবণতা থাকায়, জমিদারগণ প্রায়শই অপরাধ এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করত।

অপর একজন ইংরেজ কর্মকর্তা মন্তব্য করেন যে, জমিদার শ্রেণিকে 'সম্পূর্ণ নির্দোষ' হিসেবে প্রশাসন বিবেচনা করায়, আইনকে উপেক্ষা করা হয়। অন্যদিকে এ শ্রেণিকে দেয়া হয় অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা, যার দ্বারা জমিদারগণ অপরাধকে বহুগুণে উস্কে দিয়েছিল। সুতরাং এটা আশ্চার্যজনক কিছু নয় যে, ঊনিশ শতকের প্রথমাংশে গ্রামীণ বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল অরাজকতাপূর্ণ। একজন ইংরেজ উক্ত অবস্থাকে ফ্রান্সের বিপ্লবোত্তর সময়ে রবোসপিয়ারের শাসনকালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, বাংলার প্রতিটি জেলার জমিদারগণ একটি সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল, যা ফরাসি বিপ্লবের রোবসপিয়ারের যুগের সঙ্গে বেশি পার্থক্য সৃষ্টি করে না। এগুলোর ভিত্তি ছিল একই ধরনের। মিথ্যা সাক্ষী প্রদানের মাধ্যমে বিচার কার্য পরিচালনার ফলে, প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে জনগণ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার অনেক প্রমাণ রয়েছে। প্রথমত নতুন জমিদার শ্রেণির হাতে জমির মালিকানা হস্তান্তর করা হয়, যা পূর্ববর্তীতে রায়ত বা সরকারের ছিল। উপরন্তু এ শ্রেণিকেই খাজনা ধার্যকারীর ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এর ফলে অবাস্তবোচিত হারে খাজনা ধার্য করার ঘটনা ঘটে। অপরদিকে জমিদারগণ তাদের জমিদারিতে কর আদায়ের ঠিকাদারি প্রদান করে 'পত্তনিদার' সৃষ্টি করে।

পরিশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাংলায় যে সময় ফরায়েযী আন্দোলন সূচিত হয় সে সময় বৃটিশ শাসকগণ তাদের শাসনব্যবস্থায় অনেক সংস্কার সাধন করে জমিদারগণের

Dhaka University Institutional Repository

হাতে প্রভূত ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিল। যার ফলে নির্যাতিত হয়েছে এ অঞ্চলের সাধারণ জনগণ। এদের মুক্তির জন্যই হাজী শরী'অতুল্লাহ গঠন করেন বাংলার ফরায়েযী আন্দোলন।

Dhaka University Institutional Repository

# ৩.২ ফরায়েযী আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি

## ৩.২.১ সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ধর্মীয় সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনের নাম দেয়া হয় ফরায়েযী আন্দোলন। উনিশ শতকের গোড়াতে শুরু হওয়া এ আন্দোলনটি বর্তমান কাল পর্যন্ত চলছে। আন্দোলনটি পূর্ব বাংলা ও আসামে, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে বিস্তার লাভ করে।[২৯] ইসলামের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে যারা আন্দোলন করে তাদেরকে 'ফরায়েযী' বলা হয়। যা হোক, ফরায়েযীগণ ফরাইয শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছে। এরা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও নবী মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সা. এর নির্দেশিত সকল ধর্মীয় কর্তব্যকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে।[৩০] যদিও ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে বেশি।

ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয় হল, কালিমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হাজ্জ। এ পাঁচটি প্রধান বিষয় পালনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করাই ছিল ফরায়েযীদের লক্ষ্য। বাংলার সাধারণ মুসলিম সমাজ, ইসলামের মূল বিষয়গুলো সর্ম্পকে উদাসীন থেকে নানা ধরনের উৎসব ও স্থানীয় আচার পালনে অভ্যস্ত থাকার কারণেই ফরায়েযী আন্দোলন সূচিত হয়। সুতরাং ইতিহাসের দৃষ্টিতে ফরায়েযী আন্দোলন বাংলার মুসলিম সমাজকে আত্মশুদ্ধি করার লক্ষ্যেই সূচিত হয়েছিল। বাংলার অন্যান্য ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা ছিল ফরায়েযী আন্দোলন। এ কৃতিত্ব হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর একক প্রাপ্য। মুসলিম সমাজের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন। তিনি বাংলার জনগণের ধর্মীয় আদর্শ 'হানাফি' মাযহাবের অনুসারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন যা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিতীয় মতবাদ সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, ফরায়েযীগণ তাওহীদ বা একত্ববাদী আদর্শ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করে।

ফরায়েযীগণ সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত সাধারণ বিশ্বাসেই সন্তুষ্ট ছিল না। তারা এ বিশ্বাসকে বাস্তবে পালনের ক্ষেত্রে প্রচলিত আচারের সঙ্গে সামান্যতম যোগসুত্র আছে এমন সব বিশ্বাসকে পরিহার করার জন্য আহ্বান জানায়। এভাবে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) সমাজে প্রচলিত সকল

---

২৯ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৩০ ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ফরীদ্বাহ অবশ্য করণীয় বিষয়। এটা কুরআনে বর্ণিত আছে। বিশ্বাস এবং পালনের মাধ্যমে তা করতে হবে। সাধারণভাবে ধর্মীয় কর্তব্যসমূহকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এগুলো শারী'আহ অনুমোদন করেছে। (ক) ফরয বা অবশ্য করণীয় (খ) ওয়াজিব বা পালন করা আবশ্যক (গ) সুন্নাহ বা নবীজির কর্মজীবন যা পালন করা প্রয়োজন (ঘ) মুস্তাহাব বা পালন করা প্রত্যাশিত। ফরায়েযীগণ শুধু প্রথমটিই নয় বরং সবগুলো পালনে গুরুত্ব প্রদান করেছে যা তাদের তাওবা সম্পর্কিত তত্ত্বে লক্ষনীয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

স্থানীয় আচার-আচরণ ও উৎসবকে অনৈসলামি বলে ঘোষণা করেন। কারণ এসকল আচার ও সামাজিক রীতিনীতি কুরআন ও সুন্নাহ্ সমর্থন করে না; বরং এগুলো শিরক ও বিদ‘আত বলে তিনি মত দেন। এভাবে হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) ফরায়েযী মতাদর্শের সমাজ থেকে অনৈসলামি সকল আচার-আচারণ বিলুপ্ত করেন। সুতরাং ‘তাওহীদ’ সম্পর্কে ফরায়েযীদের ধারণা শুধু সাধারণভাবে একত্ববাদে ফিরে যাওয়া নয়; বরং যেসব বিশ্বাস ও আচার-আচারণ ইসলামি রীতিনীতিকে ঘিরে রেখেছিল সেগুলোকে পরিহার করা।

এভাবে ফরায়েযী আন্দোলনকে শুদ্ধিবাদী পুনর্জাগরণ আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল একদিকে প্রকৃত ইসলামে ফিরে যাওয়া এবং অন্যদিকে মুসলিম সমাজকে পরিশুদ্ধ করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য শুদ্ধিবাদী অন্দোলনগুলোর সাথে ফরায়েযী আন্দোলনের কতটুকু সাদৃশ্য রয়েছে তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। একই সময়ে আরবের ওয়াহাবী আন্দোলন এবং তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়া আন্দোলনও কাজ করছিল। তৃতীয়ত হাজী শরী’অতুল্লাহ (রহ.) মুসলিম সমাজের সামাজিক কাঠামোর নিম্নাংশ থেকে আগত কৃষক, তাঁতী এবং তেলীদেরকে তাঁর অনুসারী হিসেবে পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রধানত একজন ধর্মীয় সংস্কারক। জনসাধারণের অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর সামান্যতমও অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ফরায়েযী কৃষকদের প্রতি হিন্দু জমিদারগণ ভাল আচারণ করেননি। হিন্দু জমিদারগণের তীব্র বিরোধিতা শুরু করে হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর পুত্র দুদু মিয়া ফরায়েযী সমাজের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি প্রবর্তন করেন। ১৮৪০-৬২ সাল পর্যন্ত সময়ে দুদু মিয়া ফরায়েযীদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।[৩১] এ ব্যবস্থাকে খিলাফত ব্যবস্থা বলা হত। এ ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যায় :

ফরায়েযীদেরকে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা এবং নিজেদের মধ্যে সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করা। ফরায়েযী আন্দোলনের এ আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য পরবর্তীতে অত্যাচারী নীলকর, তাদের এজেন্ট ও জমিদারগণের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের সূচনা করে। সুতরাং ফরায়েযী আন্দোলনকে সে সময়ের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি আন্দোলন রূপে চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে আন্দোলনের সঙ্গে সূচিত তিতুমীরের আর্থ-সামাজিক আন্দোলনের (১৮২৭-৩১) সাদৃশ্য রয়েছে। উল্লেখ্য যে ফরায়েযী আন্দোলন শুধু পূর্ববঙ্গ ও আসামেই বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লার মত শহরগুলোতে এ আন্দোলন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এ

---

৩১ মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

শহরগুলোতে উচ্চবিত্ত মুসলিমগণের প্রভাব ছিল বেশি। উপরন্তু ফরায়েযী আন্দোলন হিন্দু জমিদার প্রভাবিত আঞ্চলগুলোতে বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলিম কৃষক শ্রেণির উপর হিন্দু জমিদারদের নিয়ন্ত্রণের কারণে এ আন্দোলন বাকেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, ও ত্রিপুরা জেলায় বেশি বিস্তার লাভ করে। তা সত্ত্বেও কিছু বিত্ত-বৈভবের অধিকারী বা স্বচ্ছল মুসলিম ফরায়েযী মতাদর্শের অনুসারী হয়েছে বলে জানা যায় না। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায় যে ফরায়েযী আন্দোলন নিম্ন স্তরের মুসলিমদের মধ্যেই বেশি প্রভাব ফেলেছিল। কারণ পূর্ববঙ্গে এ স্তরের অধিকাংশ লোকেরা ছিল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠি স্পষ্টতই সামাজিক সাম্যতা নিশ্চিত করার জন্য নতুন আন্দোলনে যোগ দেয়। সাথে সাথে ভূ-স্বামীদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও মুসলিম সমাজ ফরায়েযী আন্দোলনে যোগ দেয়। দুদু মিয়ার নেতৃত্বে এ আন্দোলনে ধর্মীয়-সামাজিক বৈশিষ্ট্য পূর্ববঙ্গে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দুদু মিয়ার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে। দুদু মিয়া নীলকর ও জমিদারগণের নির্যাতনের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ করেন। ফলে নির্যাতিত মুসলিম কৃষক সম্প্রদায় তাঁর পতাকাতলে জমায়েত হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, উক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে শহরের লোকেরা এ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি।

সুতরাং শহর কেন্দ্রিক লোকেরা ফরায়েযী আন্দোলনের প্রতি ছিল নিস্পৃহ। তাছাড়া তাদের শহুরে জীবনের নিজস্ব সমস্যা সমাধান নিয়েই শহরবাসীরা মনোযোগী ছিল বেশি। ফরায়েযী নেতৃবৃন্দ যতদিন পর্যন্ত তাদের আন্দোলনে আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত রাখতে পেরেছিলেন ততদিন পর্যন্ত এ আন্দোলনের প্রতি ব্যাপক সাড়া দেখা যায়। দুদু মিয়ার পর এ বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে লোপ পায় এবং বর্তমানে ফরায়েযীগণ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবেই টিকে আছে মাত্র। সুতরাং ফরায়েযী আন্দোলন ছিল একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন। এ আন্দোলনের কিছু জটিল বৈশিষ্ট্য ছিল। এক দিকে ছিল সে সময়ের ইসলামি পুনর্জাগরণের বৈশিষ্ট্য, অন্যদিকে ছিল এ আন্দোলন গ্রাম বাংলার নিম্নস্তরের লোকদের আর্থ-সামাজিক আশা-আকাঙ্খার প্রতিনিধিত্বকারী। ঊনিশ শতকে ইসলামি পুনরুজ্জীবনবাদ সমসাময়িক কিছু ধর্মীয় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ফরায়েযী আন্দোলনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এগুলো ছিল নিম্নরূপ :

- দিল্লীর তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়া[৩২] এবং
- আরবের ওয়াহাবী আন্দোলন।

এ দু'টি ছিল ঊনিশ শতকের ইসলাম পুনরুজ্জীবনবাদের প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলন। অন্য দু'টি আন্দোলনের মতাদর্শের সাথে ফরায়েযী মতাদর্শের কিছু সাদৃশ্য থাকায় গবেষকবৃন্দ

৩২ 'তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়ার অপর নাম মুজাহিদুন আন্দোলন। এ আন্দোলন শুরু করেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ (১৮১৮-১৮২০ সালে)।' দ্র. ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সল, *ঊনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রায়শই এ আন্দোলন সম্পর্কে ভুল মন্তব্য করে থাকেন। একইভাবে তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়াকে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করেন। দিল্লীর সৈয়দ আহম্মদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রি.) এবং শাহ্ ইসমাইল শহীদ (১৭৮২-১৮৩১ খ্রি.) তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়া নামক ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেন (১৮১৮ খ্রি.)। ইউরোপীয় লেখকবৃন্দ এ আন্দোলনকে 'ভারতীয় ওয়াহাবীবাদ' বলে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে হান্টারের লিখিত 'The Indian Musalmans' ও Encyclopdia of Islam এবং অন্যান্য গ্রন্থসমূহ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সমসাময়িক ও পরবর্তী সময়ের উপাত্তসমূহ দ্বারা এ ধারণা সমর্থিত হয়নি।

(ক) সৈয়দ আহমদ শহীদ বলেছেন, আমার তরীকা (পথ) হল আমার পূর্বপুরুষের তরীকা বা নবীজির পথ। একইভাবে আমি একদিন একটি শুষ্ক রুটি দিয়ে একবেলা আহার করি ও ধৈর্যধারণ করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। অন্যদিন আমি ক্ষুধার্ত থেকে রোযা পালন করি ও ধৈর্যধারণ করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

(খ) ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহম্মদ শহীদের একজন বিরোধী তাকে তাঁর সংস্কার আন্দেলনের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জবাবে তাঁর তরীকাকে 'তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়া' বলে আখ্যায়িত করেন। উক্ত প্রশ্নের একটি দীর্ঘ প্রতিউত্তর দিয়েছেন সৈয়দ শহীদের অনুসারী মওলানা ইরতিজা আলী। এর উত্তরে তিনি বলেন যে, 'তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়া' হল একটি সাধারণ পরিচয় যার মধ্যে সুফিদের অন্যান্য তরীকাগুলোও রয়েছে।

(গ) ১৮৩৭ সালে মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরি সৈয়দ আহমদ শহীদের কিছু অনুসারী সম্পর্কে বলেন যে, এরা কুরআন এবং সুন্নাহ পালনের ব্যাপারে ইজতিহাদ করে ব্যবহার করার জন্য প্রচার করে। এরা নিজেদেরকে মুহাম্মদি হিসেবে পরিচয় দেয়। মুহাম্মদি হল তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ। পাটনার মওলানা বিলায়েত আলীর মাধ্যমে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে জানা যায়। তা সত্ত্বেও বিলায়েত আলী নিজেকে মুহাম্মদি হিসেবে পরিচয় দিতেন। তিনি এ মর্মে ব্যাখ্যা দেন যে সৈয়দ আহম্মদ শহীদ তাঁর আন্দোলনকে মুহাম্মদি বলতে চান না; বরং এটাকে সকল তরীকা যেমন কাদিরিয়া, চিশতিয়া, নকশাবন্দ এবং মুজাদ্দেদি ইত্যাদি সুফি মতানুসারীদের সম্মিলিত নাম বলেছেন। তাঁর মতে মুহাম্মদিয়া ইসলামের পঞ্চম কোন তরীকা নয়; বরং এটি উক্ত সুফি মতবাদসমূহের সর্বোচ্চ আমল করার

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়।[৩৩] সুতরাং মাওলানা কেরামত আলী সুফি আদর্শে নিজেকে মুহাম্মদিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

(ঘ) মৌলভী ইসায়েত আলীর (১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের পর তিনি সৈয়দ আহমদের মতাদর্শ বাংলা অঞ্চলে প্রচারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন) পারিবারিক নথিতে দেখা যায় যে, বাংলা অঞ্চলে সৈয়দ আহমদের অনুসারীদেরকে মুহাম্মদি বলা হত।

(ঙ) এ আন্দোলনের একটি উত্তরাধিকারী আন্দোলন হিসেবে আহলে হাদিস বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকে আছে। এ মতের অনুসারীগণ নিজেদেরকে মুহাম্মদি হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। এরা অন্য কোন মতাদর্শ নয়; বরং নবীজির পথকেই অনুসরণ করে থাকে বলে দাবি করেন।

(চ) কলিকাতা হাইকোর্টে ১৮৭০ সালে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত ওয়াহবী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ছিলেন, সৈয়দ আহমদ শহীদের অনুসারী। এদেরকে 'ওয়াহাবী' হিসেবে আখ্যায়িত করলে এরা প্রতিবাদ করে এবং বলে যে, আমরা মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহাবের অনুসারী নই। এদেরকে সুন্নি হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য কোর্টের কাছে আপিল করা হয়।

(ছ) বিভান জোনস্ বলেছেন যে, সেরা মৌলবীগণ ব্যাপক সংস্কারের বিরোধিতা করে সৈয়দ আহমদ শহীদের অনুসারীদের ওয়াহাবী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

(জ) গবেষণায় দেখা যায় যে, সৈয়দ আহমদ শহীদের আন্দোলন দিল্লির শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর রহ. ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

### ৩.২.২ ফরায়েযী আন্দোলনের তাৎক্ষণিক সাফল্য

ফরায়েযী আন্দোলনের তাৎক্ষণিক অনেক সফলতা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যগুলো হলো :

**ফরয কায়েম ও শিরক বর্জনের কর্মসূচি :** হাজী শরীঅ'তুল্লাহ (রহ.) হজ্জ সফর শেষে ১৮২০ সালে দেশে ফিরে পূর্ণ উদ্যমে তার কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেন। তিনি রসূল সা. এর মাক্কী জীবনের আদলে জনগণের মাঝে প্রাথমিক সংস্কারের কর্মসূচি নেন। তিনি মানুষের কাছে দ্বীনকে সহজভাবে তুলে ধরেন।[৩৪] হাজী শরীঅ'তুল্লাহ (রহ.) প্রচার করেন, গরীবদের ধর্মীয় কাজ মাত্র তিনটি। কালিমা, নামায ও রোযা। আর বিত্তশালীদের বেলায় আরো দু'টি কর্তব্য রয়েছে। তাদের জন্য যাকাত আদায় ও হজ্জ সমাপন করা ফরয। এ পাঁচটি ফরয কাজ ইসলামের মূলভিত্তি যা মুসলিমগণের অবশ্য পালনীয়। ফরায়েযী আন্দোলনের প্রধান মূলনীতি

---

৩৩ আব্দুল্লাহ ইবন সৈয়দ বাহাদুর আলী সম্পাদিত *জওয়াব-ই-ইসতিফতা মীর মোহাম্মদ আলী*(কলিকাতা : মাতবা ই আহম্মদী, ১২৪৫ হি.), পৃ. ৯

৩৪ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্নসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

*Dhaka University Institutional Repository*

ও কাজ হল ফরয প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ ইসলামের অবশ্য কর্তব্যসমূহ সমাজে কায়েম করা। 'ফরয' থেকেই ফরায়েযী নামের উদ্ভব হয়েছে। হাজী শরীঅ'তুল্লাহ (রহ.) প্রচার করেন, ফরয শুধু ধর্মে সীমিত নয়; ধর্মীয় কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করা যেমন ফরয, তেমনি দুনিয়াবী কাজগুলিও অবশ্য পালনীয়। হাজী শরীঅ'তুল্লাহ (রহ.) ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং তার আলোকে অবশ্য পালনীয় বিষয়গুলোকে জনগণের কছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। সেগুলো হলো :

**ক.** আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।

**খ.** আল কুরআনের বিধান এবং রসূলের জীবন পথই একমাত্র অনুসরণীয়।

**গ.** আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরিক করা যাবে না।

**ঘ.** ইবাদাতে কোন বিদ'আত বা নতুন কিছু সংযোগ করা থেকে বিরত হয়ে ফরয ইবাদত সতর্ক ও সচেতনভাবে পালন করতে হবে।

**ঙ.** পরস্পর সহযোগিতা ও বিরামহীন চেষ্টার মাধ্যমে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের মূলনীতিকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

স্বাধীন সুলতানি আমলের বাংলায় ইসলাম প্রচারের কাজ চলত স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে। সুলতানি যুগের পুঁথি সাহিত্য ইসলাম প্রচারের সহজ ও সরল ধারার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বহন করে। কিন্তু মুঘল আমলের শেষ দিকে এদেশে ফারসি ও উর্দু ভাষার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের ধারা চালু হয়। দুনিয়ার বিস্তীর্ণ পাঠশালা থেকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণকারী মনীষী হাজী শরীঅ'তুল্লাহ (রহ.) জনগণের ভাষায় সহজভাবে ইসলামের মূল দা'ওয়াত তুলে ধরেন।

**তাওহীদ ও তওবা :** সমাজ থেকে শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার ও জুলুম-নির্যাতন দূর করতে হাজী শরীঅ'তুল্লাহ (রহ.) নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তার মধ্যে 'তাওবা' ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ফরায়েযীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলিমগণ অতীত জীবনের শিরক ও বিদ'আতসহ সকল পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ইস্তিগফার বা ক্ষমা চাইতেন। ভবিষ্যতে পাপ কাজ না করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করতেন।[৩৫] এ 'ইস্তিগফার'কে 'ইকরারি বাই'আত' বা অঙ্গীকারমূলক শপথ বলা হত। এ তাওবার তাৎপর্য হলো মন্দ বা অন্যায় পথ ছেড়ে সঠিকপথে ফিরে আসা। তাওবার আন্দোলন মুসলিমগণ সার্বিকভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে মন্দ কাজ ছেড়ে ভালো কাজ করার ব্যাপারে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। এ কর্মসূচি সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ লিখেছেন,

'According to Haji Shariat Ullah, Tawbah means penitence for the past sin and a resolve to abstain form sinful act in future.'[৩৬]

---

৩৫ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত, *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

৩৬ James Wise, *Eastern Benal*, Ibid, p. 22

*Dhaka University Institutional Repository*

**সামাজিক সংস্কার :** হাজী শরীঅ'তুল্লাহ (রহ.) নবজতকের নাড়ি কাটা দাই পেশা বেছে নেয়াকে একটি অস্বাভাবিক কাজ বিবেচনা করেন। তিনি বলেন, এভাবে আলাদা পেশাদার কাউকে দিয়ে নাড়ি কাটার কোনো নিয়ম বা বিধান ইসলামে নেই। পরিবারের বা গ্রামের বয়স্ক মহিলারা নবজাতকের নাড়ি কাটবেন কিংবা নবজাতকের পিতা এ কাজটি করবেন। হাজী শরীঅ'তুল্লাহ (রহ.) এ নির্দেশ দীর্ঘদিন যাবত প্রচলিত কুসংস্কারের বিরোধী ছিল। বিরুদ্ধবাদীরা এ কারণে ফরায়েযীদেরকে 'নাড়ি কাটা' বলে বিদ্রুপ করত। হাজী শরীঅ'তুল্লাহ (রহ.) মুসলিম সমাজে প্রচলিত 'ছটি ঘর' তথা প্রসূতির ঘরে চল্লিশ দিন অনবরত আগুন ও বাতি জ্বালিয়ে রাখার মতো কুসংস্কারগুলি নিষিদ্ধ করেন। তিনি মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে আক্বিকার প্রচলন করেন। জেমস টেইলর এ সম্পর্কে লিখেছেন,

> 'The faraidis rejected the rules of puttee, Chuttee and Chilla, which were performed between the first and the fourteith day after the birth of a baby, and observed only the rite of Aqiqah or the naming ceremony which is in conformity with Islamic injunction, and which consists of sacrificing two he-goats for a male baby and one for a female baby for the entertainment of friend and relatives.'[৩৭]

**সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা :** হাজী শরীঅ'তুল্লাহ (রহ.) মুসলিম সমাজে উঁচু-নিচু, জাতিভেদ ও বর্ণভেদের প্রশ্রয় দেয়া এবং পেশার ভিত্তিতে কোন মুসলিমকে হিন্দু-কুলীন এর আদলে ঘৃণার চোখে দেখা এবং নিচ জাত মনে করা ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নীতির বরখেলাপ বলে ঘোষণা করেন। তিনি মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর জোর দেন এবং সর্বপ্রকার ভেদাভেদনীতি দূর করতে যত্নবান হন। তিনি ঘোষণা করেন, সব মানুষ এক আদমের সন্তান। তারা সকলে ভাই ভাই; পার্থক্য তাদের কর্মে। যিনি যত বেশি ভাল কাজ করবেন তিনি বেশি সম্মানিত হবেন। যিনি কাজ করেন না তিনি পরজীবী, তার মর্যাদা কর্মীর সমান নয়।

**চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবৈধ ঘোষণা ও জমির ফসলে চাষীর অধিকার :** হাজী শরীঅ'তুল্লাহ (রহ.) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামক প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাকে ইসলামি মূলনীতির আলোকে অবৈধ ঘোষণা করেন। তিনি কৃষকদের উপর সকল প্রকার অনৈতিক ও অত্যাচারমূলক কর আরোপ এবং সকল জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন। তিনি মুসলিম প্রজাদের মূর্তিপূজার জন্য কর দেয়া বন্ধ করার নির্দেশ দেন। 'ঈদুল আযহার সময় গরু কুরবানি করতে উৎসাহিত করেন। হাজী শরীঅ'তুল্লাহ (রহ.) বলেন, জমির প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ্। প্রচেষ্টার (উদ্দেশ্য ও

৩৭ Dr. Muhammad Ahsanullah Faisal, *Haji Shariatullah's Faraizi Movement History-Da'wah and Political Ideology*, Ibid, p. 99

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমের) ফলাফল ছাড়া মানুষের কিছুই প্রাপ্য নেই। এটা আল কুরআনের বিধান। কুরআনের এ নির্দেশের আলোকে জমির ফসল আবাদকারীর। এ ফসলে জমিদারের কোন অধিকার নেই। হাজী শরীঅ'তুল্লাহ (রহ.) জমিদার ও জোতদারদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য কৃষকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। ভূমিকরের বাইরে অবৈধ চাঁদা দিতে তিনি চাষীদেরকে নিষেধ করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে চালু শোষণ ও নিপীড়নমূলক জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হাজী শরীঅ'তুল্লাহ (রহ.) ব্যাপক প্রচার ও সক্রিয় সংগ্রাম পরিচালনা করে প্রজা ও চাষীদেরকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ফরায়েযী আন্দোলনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করে।

**দারুল হারব হিসেবে ভারতবর্ষে জুমু'আ ও 'ঈদের নামায বর্জন :** হাজী শরীঅ'তুল্লাহ (রহ.) বলেন, ইংরেজ শাসিত এদেশ হলো 'দারুল হারব'। শত্রু মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এ দেশে জুমু'আ ও 'ঈদের নামায অত্যাবশ্যকীয় নয়। এ সম্পর্কে ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান লিখেছেন, ইংরেজ সরকার বা যে কোনো অমুসলিম সরকারের অধীনে মুসলিমগণের 'ঈদ ও জুমু'আর নামায পড়া অত্যাবশ্যকীয় নয় বলে হাজী শরীঅ'তুল্লাহ (রহ.) মনে করেন।[৩৮] তাঁর মতে, এ নামায আদায় করার জন্য প্রয়োজনীয় ছয়টি শর্তের প্রধান দু'টি শর্ত ইসলামি শাসন এবং মুসলিম শাসকের অথবা তার প্রতিনিধিদের শাসন কোথাও বিদ্যমান ছিল না। তাই তিনি জুমু'আ ও 'ঈদের নামায বর্জন করেন। এসব ক্ষেত্রে ফরায়েযী আন্দোলনের সফলতা লক্ষ্য করা যায়।

## ৩.২.৩ ফরায়েযী আন্দোলনের প্রভাব

১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের প্রথমভাগে গ্রামের কৃষক ও কারিগরদেরকে সংঘবদ্ধ করে দুদু মিয়া ও তাঁর সহকর্মীগণ জমিদার, নীলকর ও রক্ষণশীল মুসলিম নায়কগণের ঐক্যবদ্ধ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। শত্রুর লাঠিয়াল দলের বিরুদ্ধে তাঁরাও লাঠিয়াল দল প্রস্তুত করেন। জমিদারদের বে-আইনি কর আদায়ের বিরুদ্ধে দুদু মিয়া সর্বশক্তি নিয়ে দণ্ডায়মান হন। হিন্দু জমিদারের বাড়ির দূর্গা প্রতিমার সাজ-সজ্জার ব্যয় অথবা কোন পৌত্তলিক ধর্মানুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য মুসলিম প্রজাদের নিকট হতে বলপূর্বক কর আদায় করা যে অসহ্য উৎপীড়ন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর সমর্থনে একমাত্র অজুহাত ছিল এ যে, ইহা প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে এবং জনসাধারণ এটা দিতে অভ্যস্ত ছিল। ফলে এর বিরোধিতা করা দুদু মিয়ার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয়েছে।[৩৯] দুদু মিয়ার নির্দেশে মুসলিম প্রজাগণ এ সকল বে-আইনি কর দেয়া বন্ধ করে দেয়। দুদু মিয়া এটা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েই ক্ষ্যান্ত হননি। এরপর তিনি ঘোষণা করলেন যে, ভূমি আল্লাহ্‌র দান। সুতরাং এটা ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বংশ পরম্পরায়

৩৮ Sir William Wilson Hunter, *The Indian Musalmans*, Ibid, p. 143

৩৯ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

Dhaka University Institutional Repository

দখল করে রাখার এবং এর উপর কর ধার্য করার অধিকার কারও নেই। জমিদার ও নীলকরগণকে যাতে কর না দিতে হয় সেজন্য তিনি কৃষকগণকে জমিদারের জমি ত্যাগ করে সরকারি খাস জমিতে গিয়ে বসতি স্থাপন করার পরামর্শ দেন। ফরিদপুর জেলার কৃষকগণ সমবেতভাবে জমিদার ও নীলকরগণের খাজনা বন্ধ করে দিলে জমিদার ও নীলকরগণ ক্ষিপ্ত হয়ে কৃষকদের উপর অমানুষিক উৎপীড়ন শুরু করে। তাদের লাঠিয়াল-বাহিনী কৃষকদের ঘর-বাড়ী ভস্মিভূত ও সকল সম্পদ লুণ্ঠন করতে থাকে। লাঠিয়ালদের লাঠির আঘাতে বহু কৃষক হতাহত হয়।

এ অমানুষিক উৎপীড়ন হতে কৃষকদেরকে রক্ষা করার জন্য দুদু মিয়ার নির্দেশে কৃষক লাঠিয়াল দল জমিদার-নীলকরগণের লাঠিয়াল দলকে উচিত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে। সংখ্যাধিক কৃষক-লাঠিয়ালদের আক্রমণে বহু নীলকুঠির এবং জমিদারদের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন স্থানে দু'দল লাঠিয়ালের প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটতে থাকে। এসব সংঘর্ষে বিভিন্ন জমিদার-নীলকরগোষ্ঠির বহু লাঠিয়াল হতাহত হয়। জমিদার-নীলকরগোষ্ঠির এ দুর্দশা দেখে ইংরেজ সরকার আর নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারলেন না।[৪০] সরকার প্রকাশ্যে এ কৃষক অভ্যুত্থান দমনের সংকল্প ঘোষণা করেন এবং বহু সংখ্যক পুলিশ জমিদার-নীলকরগণের লাঠিয়াল-বাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে কৃষকবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সংগ্রাম ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। ইংরেজ সরকার কেবলমাত্র পুলিশের উপর নির্ভর করতে না পেরে সামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে দাঙ্গা এরূপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছিল যে, এটা দমনের জন্য ঢাকা হতে একটি সিপাহী দল প্রেরিত হয়েছিল। এভাবে দীর্ঘকাল ধরে জমিদার, নীলকর ও ইংরেজ শাসকগণের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দুদু মিয়ার নেতৃত্বে কৃষকদের সংগ্রাম চলতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে উভয় পক্ষে অজস্র ধারায় রক্তপাত ও প্রাণহানি ঘটতে থাকে। ফরিদপুর জেলাব্যাপী কৃষক বিদ্রোহীদের এ সংগ্রাম দমন করতে ব্যর্থ হয়ে ইংরেজ সরকার অবশেষে নতুন কৌশলে এ বিদ্রোহ দমনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বিদ্রোহী কৃষকদের প্রধান নায়ক দুদু মিয়াকে গ্রেফতার করে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখলে বিদ্রোহী কৃষকগণ নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে- এটা ভেবে ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগে বহু গৃহ লুণ্ঠনের অভিযোগে দুদু মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। সরকার কোন অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারায় দুদু মিয়া মুক্তি লাভ করেন। ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু কোন অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারায় সরকার এবারও তাঁকে কয়েকদিন পরেই মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

---

৪০ Dr. James Wise, *Artical on Sariatullah and the Faraizis*(Dacca : The Royal Asiatic Society of Bengle, 1894), vol. III, p. 26

*Dhaka University Institutional Repository*

ইতোমধ্যে দুদু মিয়ার স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার কার্য বহুদূর অগ্রসর হয়। দুদু মিয়া বাহাদুরপুর নামক গ্রামে বাস করতেন। এ গ্রামকে কেন্দ্র করে তাঁর শাসনব্যবস্থা বহু অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি সর্বত্র নির্দেশ পাঠিয়ে জমিদার ও নীলকরগণকে খাজনা দেয়া বন্ধ করে দেন। মহাজনগণের ঋণশোধ করাও নিষিদ্ধ করা হয়। গ্রামে গ্রামে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে আদালত স্থাপন করেন। জনসাধারণ সরকারি আদালত বর্জন করে দুদু মিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গ্রামের আদালতে আপন আপন অভিযোগ পেশ করত। আদালতের বৃদ্ধ বিচারকগণ যে রায় দান করতেন তা সকলে মেনে নিত। একদল গুপ্তচর পূর্ববঙ্গের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করত এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যে স্থান হতে জনসাধারণের দুর্দশার সংবাদ আসত সে স্থানেই দুদু মিয়া সাহায্য দানের ব্যবস্থা করতেন।

এদিকে জমিদার ও নীলকরদের সাথে দুদু মিয়ার সংগ্রাম সমানভাবে চলে আসছিল। জমিদার ও নীলকরদের উৎপীড়ন হতে কৃষকদেরকে রক্ষা করার জন্য দুদু মিয়া যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুরের পাঁচচর নামক স্থানের নীলকুঠির কুখ্যাত ম্যানেজার ডানলপ সাহেবের উৎপীড়ন চরম আকার ধারণ করলে দুদু মিয়া তাকে উচিত শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। নীলকর ডানলপ ছিলেন দুদু মিয়ার এক আপোসহীন শত্রু। তারই তাগিদে দুদু মিয়াকে কয়েকবার গ্রেফতার ও আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর প্রায় পাঁচশত সশস্ত্র কৃষকের এক বাহিনী পাঁচচরের নীলকুঠির আক্রমণ করে এটা ধূলিসাৎ করে দেয়। এরপর কৃষক-বাহিনী নীলকর ডানলপের সহযোগী পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমিদারের বাড়ি আক্রমণ করে বহু মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট করে। জমিদারের এক ব্রাহ্মণ গোমস্তা ছিল জমিদারের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ। কৃষক বাহিনী শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে তাকে ধরে নিয়ে যায়। এ গোমস্তাটি বিদ্রোহী কৃষকের ক্রোধের আগুনে জীবন বলি দিয়ে তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে। এ ঘটনার পর এক বিশাল সামরিক বাহিনী এসে সমগ্র অঞ্চলটিকে বেষ্টন করে। এরপর ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার, খানাতল্লাসি, প্রহার এবং কৃষকদের উপর নানা প্রকারের শারীরিক লাঞ্ছনা কয়েক মাস ধরে চলতে থাকে। দুদু মিয়াকেও গ্রেফতার করে কারাগারে আবদ্ধ রাখা হয়।

অবশেষে ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফরিদপুরের দায়রা আদালতে দুদু মিয়া ও তাঁর বাষট্টিজন সহকর্মীর বিচার শুরু হয়। দুদু মিয়াও আদালতে কতিপয় জমিদার ও নীলকর ডানলপের বিরুদ্ধে কৃষক-হত্যা, কৃষকের সম্পত্তি লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি বহু অভিযোগ উপস্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজ বিচারকগণ সেসব অভিযোগ অগ্রাহ্য করেন। দীর্ঘকাল বিচারের

Dhaka University Institutional Repository

পর অবশেষে দুদু মিয়া ও তাঁর সকল সহকর্মীকে বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডাদেশ দেয়া হয়। কিন্তু উচ্চতর আদালতে আপীলের ফলে সকলেই মুক্তি লাভ করেন।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের সময় দুদু মিয়াকে শেষবাবের মত গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু এবারেও দুদু মিয়াকে সরকার প্রমাণ অভাবে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। সমগ্র জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও দীর্ঘ কারাবাসের ফলে দুদু মিয়ার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। অবশেষে নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলার কৃষকের প্রিয়তম সন্তান, শোষণ-উৎপীড়ন বিরোধী কৃষক-সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক দুদু মিয়া শেষ নিঃশ্বাষ ত্যাগ করেন।[৪১] তাঁর জন্মস্থান বাহাদুরপুর গ্রামেই তিনি ইন্তিকাল করেন এবং বাহাদুরপুর গ্রামেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর কবর ও বসতবাড়ি আড়িয়াল খাঁ নদের ভাঙনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তিনি ছিলেন বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু সকল সম্পত্তিই তাঁর নিজের ও অন্যান্য মোকদ্দমা পরিচালনায় এবং সংগঠনের ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যয়িত হওয়ায় তাঁর পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর জমিদার ও নীলকর, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর উৎপীড়নে কৃষকের সংগ্রাম-শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং আতঙ্কগ্রস্ত মুসলিম কৃষকগণ ফরায়েযী আন্দোলন ত্যাগ করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যোগদান করে। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চলে দুদু মিয়া ও তাঁর ফরায়েযী মতবাদের প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল। দুদু মিয়া ফরিদপুর জেলার পল্লী অঞ্চলের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে প্রচার করতে লাগলেন যে, সকল মানুষই সমান এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এ পৃথিবীতে কর ধার্য করার অধিকার কারও নেই। দুদু মিয়ার এ বাণী মুসলিম কৃষক ও শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তারা এ বাণীর মধ্যে খুঁজে পায় শত প্রকারের কর আদায়কারী জমিদার-গোষ্ঠির বিরুদ্ধে, জমিদার-নীলকর-মহাজন গোষ্ঠির পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক ইংরেজ শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার শত্রু বিদেশী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার অসীম সাহস ও অনমনীয় শক্তি।

এ সাহস ও শক্তির বলেই তারা দুদু মিয়ার নেতৃত্বে জমিদার গোষ্ঠি আর ইংরেজ শাসনকে অগ্রাহ্য করে চলতে শুরু করে। দুদু মিয়া তাঁর অনুচরগণের নিকট একাধারে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জ্বলন্ত প্রতীকরূপে দেখা দেন। তিনিই তাদের ধর্মীয় সমস্যার সমাধান করেন, জমি-জমার বিরোধের নিস্পত্তি করেন তাতে গ্রামের ফরায়েযী মতাবলম্বী বৃদ্ধ কৃষকের অধীনে বিচারালয় বসত, কেউ এ বিচালয়কে অগ্রাহ্য করে ইংরেজের বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হলে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হত। এ বিচার ব্যবস্থা শীঘ্রই বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

---

৪১ মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারের 'পূজাকর' নামক অন্যায় কর আদায়ের কবল হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন কৃষক দুদু মিয়ার সাহায্য প্রার্থী হলে দুদু মিয়া তাকে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করতেন। তিনি জমিদারের বিরুদ্ধে মামলার অর্থ সংগ্রহ করে দিতেন। আর প্রয়োজন হলে জমিদারের বিরুদ্ধে লাঠিয়াল দলও পাঠাতেন। এভাবে দুদু মিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় জমিদারগণের (নীলকর সাহেবদের) বিরুদ্ধে এক প্রবল শক্তিরূপে দেখা দেয়। দুদু মিয়া সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন জমিদার ও নীলকরগণের বিরুদ্ধে। এরা কেবল মুসলিম কৃষকের নয়, হিন্দু কৃষকেরও শত্রু। তাই হিন্দু কৃষকও দুদু মিয়ার নেতৃত্বে এ সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন।[৪২]

এ সংগ্রাম ক্রমশ ফরিদপুর, বিক্রমপুর, খুলনা, ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলায় বিস্তার লাভ করে। দুদু মিয়ার নেতৃত্বে অন্তত পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-মুসলিম কৃষক যে কোন সময় জমিদার ও নীলকরগণের বিরুদ্ধে লাঠি হাতে নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইতস্তত বোধ করত না। দুদু মিয়া তাঁর পরিকল্পিত স্বাধীন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে এক অপূর্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বৈষ্ণব মতালম্বীদের অনুকরণে সমগ্র পূর্ববঙ্গকে কতিপয় অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রত্যেক অঞ্চলে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে একজন 'খলিফা' নিযুক্ত করেন। এ 'খলিফা'গণ নিজ নিজ অঞ্চলের সকল ফরায়েযী মতাবলম্বীদিগকে একতাবদ্ধ করে রাখতেন, তাদের উপর যাতে কোন উৎপীড়ন না হয় তার ব্যবস্থা করতেন এবং তাদের নিকট হতে নিয়মিতভাবে অর্থ সংগ্রহ করতেন। এ 'খলিফা'[৪৩] বা প্রতিনিধিগণ দুদু মিয়াকে নিয়মিতভাবে নিজ নিজ অঞ্চলের সকল সংবাদ জ্ঞাপন করতেন। যে স্থানেই জমিদারগণ ফরায়েযী সম্প্রদায়ভূক্ত কৃষকগণের উপর কর বসাতেন অথবা কোন উৎপীড়ন করতেন, সে স্থানেই কেন্দ্রিয় তহবিল হতে অর্থ সাহায্য করে ইংরেজের আদালতে জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা চালান হত এবং সম্ভব হলে লাঠিয়াল দল পাঠিয়ে সে জমিদার ও তাদের অনুচরদেরকে শাস্তি দেয়া হত এবং জমিদারগণের সম্পত্তি ধ্বংস করা হত।

দুদু মিয়ার নেতৃত্বে কৃষকদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখে এবং তাদেরকে আর পূর্বের মত দমন করতে না পেরে সকল জমিদার ও নীলকর দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন। দুদু মিয়াকে

---

৪২ ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী, *বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও মতাদর্শ*(ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, আগস্ট ২০০৯), পৃ. ৩৮

৪৩ যে ব্যক্তি কারও অধিকারের আওতাধীনে তারই অর্পিত ক্ষমতা-ইখতিয়ার ব্যবহার করে তাকে খলিফা বলে। খলিফা নিজে মালিক নয়; বরং আসল মালিকের প্রতিনিধি। সে নিজে ক্ষমতার অধিকারী নয়; বরং মালিক তাকে ক্ষমতার অধিকার দিয়েছেন। তাই সে ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন। সে নিজের ইচ্ছে মত কাজ করার অধিকার রাখে না। বরং মালিকের ইচ্ছে পূরণ করাই হল তার কাজ। যদি সে নিজেকে মালিক মনে করে বসে এবং তার উপর অর্পিত ক্ষমতাকে নিজের ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে জানে অথবা আসল মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে নিয়ে তারই ইচ্ছে পূরণ করতে থাকে এবং তার নির্দেশ পালন করতে থাকে তাহলে এখানে সবই বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে গণ্য হবে। দ্র : আল্লামা মওদূদী (রহ.), *তাফহীমুল কুরআন*(ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৮), খ.১, আল কুরআন, ১ : ৩৮, পৃ. ৬২

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রচলিত মুসলিম ধর্মের সংস্কার সাধন করতে দেখে রক্ষণশীল মুসলিমগণ পূর্ব হতেই দুদু মিয়া ও তাঁর ফরায়েযী সংগঠনের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরাও জমিদার ও নীলকর সাহেবগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে ফরায়েযীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। নতুন ফরায়েযী ধর্মমত ও দুদু মিয়ার নেতৃত্বই যে কৃষকদিগের এক প্রকার বিদ্রোহী মনোভাবের কারণ- এটা বুঝে জমিদারগণ সকলে পরামর্শ করে তাদের প্রজাগণকে দুদু মিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণে বাধা দান করতে আরম্ভ করেন। এ সম্পর্কে ফরিদপুর জেলার গেজেটিয়ারে নিম্নোক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, যে সকল প্রজা জমিদারগণের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ফরায়েযীদের দলে যোগদান করত তাদেরকে জমিদারদের হাতে শাস্তি ও নির্যাতন ভোগ করতে হত। এক প্রকারের বিশেষ নির্যাতন ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছিল। এটা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হলেও শরীরে নির্যাতনের কোন চিহ্ন থাকত না। কয়েকজন অবাধ্য কৃষকের দাড়ি একত্রে বেঁধে তাদের নাসিকায় নস্য গ্রহণের প্রণালীতে শুষ্ক লঙ্কার গুড়া প্রবেশ করিয়ে দেয়া হত। কিন্তু অবশেষে সকল প্রকার নির্যাতন ব্যবস্থাই ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। জমিদারগণের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ফরায়েযী ও কৃষক জাগরণের দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে।

বাংলার মুসলিমগণের একটা অংশ এসেছে হিন্দু সম্প্রদায় হতে ধর্মান্তরের মাধ্যমে। হিন্দু ধর্মের জাতি ভেদাভেদ ও নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের উপর উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সামাজিক উৎপীড়ন প্রভৃতি কারণে এক শ্রেণির হিন্দুরা অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। অনেকে ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। কিন্তু মুসলিম হয়েও এরা জন্মগত আচার-ব্যবহার বর্জন করে খাঁটি মুসলিম হতে পারেনি। বিশেষ করে ধর্মীয় সংস্কারের অভাবে বিধর্মীয় রীতি-নীতি তাদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় চলে এসেছিল। এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অনেক মুসলিম পরিবার মা শীতলা দেবীর পূঁজা করতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনেক। বার মাসে তের পার্বন। মুসলিমগণের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ‘ঈদুল ফিতর ও ‘ঈদুল আযহা। মুসলিমগণের মহররম এমন এক অনুষ্ঠান যাতে প্রকৃত পক্ষে আনন্দ উৎসবের কোন সুযোগ নেই। অথচ বিভাগ-পূর্ব ভারতের অনেক জায়গায় মহররম পালিত হত বিশেষ জাঁক-জমকের সাথে। বহু অর্থ ব্যয়ে ‘তাজিয়া’ সহকারে শোভাযাত্রা বের করা হত। শেষ পর্যন্ত তা বিসর্জন দিতে হত পুকুর কিংবা নদীতে। প্রকৃতপক্ষে এটা হিন্দুদের দূর্গা পূজারই অনুকরণ মাত্র। দূর্গা পূজা মূলত দশ দিনের উৎসব। দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জিত হয়। মহররমও দশ দিনের উৎসব অনুষ্ঠান। দশম দিন ‘তাজিয়া’ বিসর্জিত হয় হিন্দুদের দূর্গা বিসর্জনের অনুকরণে। হিন্দুদের দূর্গা পূজার সাথে মহররমের ‘তাজিয়া’ এবং তার বিসর্জনের বিশেষ মিল বলেই হয়ত বাংলাদেশের অনেক হিন্দু জমিদার ‘তাজিয়া’ নির্মাণে রীতিমত চাঁদা দিয়ে মুসলিমদেরকে উৎসাহিত করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম পীর এবং পীরের মাযারের প্রতি ভক্তি চরম আকার ধারণ করে। পীর মুরীদের সম্পর্ক দাঁড়ায় হিন্দু গুরু-চেলা সম্পর্ক সমতুল্য। মুসলিমগণের যা অবশ্য করণীয় ‘ফরয’ কাজ নামায-রোযার পরিবর্তে প্রবল হয়ে উঠে মাজার পূজা আর পীরের সেবা। দেশ ভরে যায় মাজার আর পীর মুরীদে। এ বিষয়ে সে সময়ের ভারতীয় আদমশুমারির পরিচালক জেমস্ ওয়াইজের উক্তি বিশেষ লক্ষণীয়। ১৭৬৫ সালে কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত এ পঞ্চাশ বছর পূর্ব বাংলার মুসলিমগণ ছিল রাখাল বিহীন মেষ পালের মত।[৪৪] নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস হতে বহু দূরে হিন্দু-ধর্মীয় বহুবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। অশিক্ষা আর কুশিক্ষা, অভাব-দারিদ্র্য আর শোষণ-নির্যাতনের স্বীকার মুসলিম পরিবারগুলো। ইংরেজের শাসন আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ শহরের মানুষ। তার চেয়েও বেশি অতিষ্ঠ গ্রামের সাধারণ মানুষ। শুধু ইংরেজ নয়; এদেশের হিন্দু জমিদাররা তাদের অত্যাচারের বিষে জর্জরিত করেছে সাধারণ মুসলিমকে। সে সময় গ্রামের অধিকাংশ মুসলিমই ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। তাদেরকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দিতনা একদিকে ইংরেজ ও অপরদিকে এদেশীয় হিন্দু ও হিন্দু জমিদাররা। অসহায় দরিদ্র মুসলিমগণের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত। একটু যারা শিক্ষিত তারাও ছিল অসচেতন।

ইংরেজরা হিন্দু ও হিন্দু জমিদারকে খুবই সুনজরে দেখত। হিন্দুদেরকে তারা খুবই কদর করত। আর মুসলিমগণ ছিল তাদের দু’চোখের বিষ। তারা এদেরকে শত্রু ভাবত। তাই তারা সু-কৌশলে হিন্দুদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলত দরিদ্র ও অশিক্ষিত মুসলিমগণের বিরুদ্ধে। হিন্দুরা ছলে-বলে-কৌশলে মুসলিমদেরকে গ্রাস করতে উদ্যত হত। তারা গ্রাস করত মুসলিমগণের অর্থ-সম্পদ জমি-জায়গা। তাতেও তারা খুশি হত না। এরপর তারা মুসলিমদের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও ধ্বংস করার চেষ্টা করত। ইসলাম থেকে তথা ইসলামি ঐতিহ্য থেকে তাদের দূরে রাখার সকল প্রকার অপকৌশল প্রয়োগ করত হিন্দুরা। তাদের হাতে ক্ষমতা আর অর্থ থাকার কারণে তারা সহজেই প্রভাবিত করতে পারত দরিদ্র ও অশিক্ষিত মুসলিমগণকে।[৪৫]

হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) দেখলেন মুসলিমদের এ করুণ অবস্থা। তিনি পথ ভোলা মানুষের কাছে নতুন করে ইসলামের দা’ওয়াত দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন। এ বোধ থেকেই তিনি শুরু করলেন দা’ওয়াতি তৎপরতা। তিনি মানুষকে সত্যের দিকে ও আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান। সাধারণ মানুষকে তিনি বোঝান ইসলামের আক্বিদা ও বিশ্বাস। বোঝান ইসলামের সুমহান আদর্শ ও ঐতিহ্য। তাদেরকে বোঝান সত্য-মিথ্যার পার্থক্য। কিন্তু আফসোস! গ্রামের

৪৪ James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 34

৪৫ James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 23

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিমগণ এতটাই অন্ধকারে ডুবে ছিল যে, হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর এতটুকু আহ্বানেও তারা সামান্যতম সাড়া দেয়নি। তারা চিনতে ভুল করল সত্য পথ। বুঝতে ভুল করল হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) কে। অন্ধ মানুষকে দ্বীনের দা’ওয়াত দিতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন তিনি। তিনি মানুষের গোমরাহিতে ভীষণ কষ্ট পেলেন। যারা ইতোমধ্যে তার কাছে শিরক বিদ‘আত হতে বাঁচার জন্য তাওবা করেছিলেন তারাই সে তাওবা তাঁর কাছে ফেরত দিতে আসলেন। ভেবেছিলেন গ্রামের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ ভোলা আপন মানুষকে তিনি পথের দিশা দেখাবেন। তাদেরকে আবার ইসলামের আলোতে আলোকিত করবেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ফরায়েযী আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তা ছিল যথার্থ। নির্যাতিত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মুসলিম জাতিতে তিনি মুক্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন। এ আন্দোলনে সুদূর প্রসারী প্রভাব কতটুকু এটা বিচার্য বিষয় নয়; কোন পটভূমিতে তিনি এ ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন সেটাই বিচার্য। এতে তিনি শতভাগ সফল হন।

*Dhaka University Institutional Repository*

# ৩.৩ ফরায়েযী আন্দোলন ও অন্যান্য অনুষঙ্গ

## ৩.৩.১ ফরায়েযীদের সাথে আহলুল হাদিস-এর সম্পর্ক

আহলুল হাদিস বা নবীজির সুন্নাহ্‌র অনুসারীগণ 'তাকলিদ' বা মাযহাব অনুসরণ করার বিষয়টি প্রত্যাখান করে। নবীজির সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের মাধ্যমে মূল উৎস যাচাই করার জন্য আহলুল হাদিস মত প্রকাশ করে। সরকারি নথি গেজেটিয়ারে এদেরকে 'রাফি ইয়াদাইন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে বার বার হাত তোলার জন্য এরা উক্ত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উপমহাদেশের সব জায়গায় আহলুল হাদিসের অনুসারীগণ ছড়িয়ে আছে।[৪৬] উনিশ শতকের শেষার্ধে বাকেরগঞ্জ এবং ফরিদপুর জেলায় আহলুল হাদিসের অনুসারীদের সক্রিয় কার্যক্রম দেখা যায়।[৪৭] আহলুল হাদিসের বুদ্ধিজীবী মতাদর্শের কারণে গ্রাম বাংলায় এ আন্দোলন কখনও জনপ্রিয়তা পায়নি। উপরন্তু ফরায়েযীগণ 'হানাফি' মাযহাবের অনুসারী হিসেবে নবীজির সুন্নাত অনুসরণের বিষয়ে কোন বিরোধিতা করেনি।[৪৮] সুতরাং ফরায়েযীদের কাছ থেকে আহলুল হাদিস সরাসরি কোনো বাঁধা পায়নি। বাংলার গ্রামাঞ্চলে জুমু'আ ও 'ঈদের নামায অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ফরায়েযীদের ফাত্ওয়া ছিল। যেখানে 'আহলুল হাদিস' এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্বোপরি 'ফরায়েযী' এবং আহলুল হাদিস আন্দোলন পরস্পরের প্রতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শীতল সম্পর্ক বিরাজমান ছিল।[৪৯]

## ৩.৩.২ ফরায়েযীদের সাথে তা'আয়্যুনি সম্প্রদায়ের যোগাযোগ

তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়া আন্দোলনের উপজাত ছিল তা'আয়্যুনি আন্দোলন। মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরি এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ' তা'আয়্যুনি' শব্দটি আরবি ' তা'আয়্যুন' থেকে এসেছে, যার অর্থ হল কোন কিছু চিহ্নিত করা, নির্ধারণ করা।[৫০] তাই একজন ব্যক্তিকে 'তা'আয়্যুনি' বলা হয় তখনই, যখন সে উক্ত বিশেষ মতাদর্শের অনুসারী হয়। আমরা পূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে মাওলানা বিলায়েত আলীর নেতৃত্বাধীন মূল তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়া আন্দোলনের সঙ্গে মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরির মতবিরোধ ঘটে।[৫১] এ মতবিরোধের কারণ ছিল 'তাকলিদ' বা মাযহাব অনুসরণ সম্পর্কিত নীতি নিয়ে। মাওলানা কেরামত আলী

---

৪৬ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৪৭ ওয়াজির আলী, *মুসলিম রত্নহার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৫,

৪৮ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৪৯ আব্দুল হালিম, *হাজী শরী'অতুল্লাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৫০ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، *القاموس المحيط*(القاهرة: دار الحديث، ١٤٢٩هـ)، صـ ١١٦٩

৫১ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

'তাকলিদ' অনুসরণের পক্ষে ছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে একজন 'তা'আয়ুনি' বলা হবে তখনই যখন তিনি সুনির্দিষ্টভাবে একটি মাযহাবের অনুসারী হবেন। ফলশ্রুতিতে মাওলানা কেরামত আলী আহলুল হাদিসের অনুসারীদের 'লা মাযহাবী' আখ্যা দেন। জেমস ওয়াইজ 'তা'আয়ুনি' শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা উক্ত প্রেক্ষপটে গ্রহণযোগ্য নয়। ওয়াইজ 'তা'আয়ুনি' বলতে 'প্রতিষ্ঠিত' বুঝিয়েছেন। এ দু'টি পথ হল রাহে নবুওয়াত এবং রাহে বিলায়াত যা সৈয়দ আহমদ শহীদ উল্লেখ করেছিলেন। অন্যান্য সংস্কারকদের মতই মাওলানা কেরামত আলী কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস এবং অনৈসলামি আচার-অনুষ্ঠানসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি তাঁর একটি পুস্তিকায় লিখেছেন যে, পূর্ব ভারতের মুসলিম সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস, অনাচার এবং উৎসবাদিতে এমনভাবে নিমজ্জিত ছিল যে, এ সমাজে অন্ধ ইসলামি মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাঁর মতে বাংলায় শুদ্ধ ইসলাম প্রচার করার এটা ছিল অন্যতম কারণ।[৫২] মাওলানা কেরামত আলী মহররম উপলক্ষে নাচ-গান, তাজিয়া, ওরশ পালন, মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে 'ফাতিহা' অনুষ্ঠান ইত্যাদি আচারের তীব্র নিন্দা করেন। অবশ্য 'ফাতিহা' পালনের অনাড়ম্বরতা থাকে বলে তিনি তা অনুমোদন করেন। মাওলানা কেরামত আলী ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন এবং অবশিষ্ট জীবনের (মৃত্যু ১৮৭৩ খ্রি.) অধিকাংশ সময় এ অঞ্চলে কাটান করেন। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, পাটনা স্কুলের অনুসারী ও ফরায়েযীগণ পারস্পরিক সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশে বাস করত। মাওলানা কেরামত আলী 'তাকলিদ' অনুসরণ অথবা 'হানাফি' মাযহাব অনুসরণ করার কথা বলে 'ফরায়েযী' মতাদর্শের আরও কাছাকাছি চলে আসেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ফরায়েযীদের সঙ্গে তাঁর মতাদর্শের সংঘাত সৃষ্টি হয়। জুমু'আ ও 'ঈদের নামায অনুষ্ঠানের বিষয়ে একদিকে ফরায়েযীদের মতাদর্শ এবং কোন সুন্নি মাযহাবের অনুসারী না হওয়ার কারণে অন্যদিকে পাটনা স্কুলকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ফরায়েযীদেরকে তিনি বাংলার 'খারিজা' এবং পাটনা স্কুলকে 'লা মাযহাবী' বলেছেন। এ দু'টো আন্দোলনকেই তিনি আরবের ওয়াহাবীদের সঙ্গে তুলনা করেন।[৫৩] মাওলানা কেরামত আলীর তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও ফরায়েযী এবং পাটনা স্কুল তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। বরং এ দু'টো আন্দোলনের ফলে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে মাওলানা কেরামত আলী বাংলা অঞ্চলে বির্তকের এক নতুন যুগ সৃষ্টি করেন। তাঁর এ প্রচারাভিযান এবং বিতর্ক (বাহাছ) অনুষ্ঠানের ফলে ধর্মীয় মতাদর্শগত পার্থক্য আরও বেশি স্পষ্ট হয়। সমআদর্শের মাধ্যমে একতা

৫২ মাওলানা কেরামত আলী, *মাকাশিফাত ই রাহমাত*(কলিকাতা : অনুপম প্রকাশনী, ১৩৪৪ হি.), পৃ. ১৩১-১৩৮
৫৩ মাওলানা কেরামত আলী, *কওল আল ছাবিত*(কলিকাতা : অনুপম প্রকাশনী, ১৩৪৪ হি.), পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি না হয়ে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। 'হানাফি' মাযহাবের অনুসারী হিসেবে ফরায়েযীগণ মাযহাব অবলম্বন এবং 'তাকলিদ' এর অনুসরণ অপরিহার্য করে।

এ বিষয়ে ফরায়েযীগণের সাথে পাটনা স্কুলের মতাদর্শের মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করে। পাটনা স্কুল 'তাকলিদ' প্রত্যাখ্যান করে 'ইজতিহাদ' ও নবীজির সুন্নাত অনুসরণের মতাদর্শ প্রচার করে। উপরন্তু পাটনা স্কুল জুমু'আ ও 'ঈদের নামায সম্পর্কিত ফরায়েযীদের মতাদর্শ অনুমোদন করে না। ফরায়েযীগণ ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলায় উক্ত নামায অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে। মাওলানা কেরামত আলী 'ঈদ ও জুমু'আর নামায অনুষ্ঠান না করার ফরায়েযী মতাদর্শকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। এক্ষেত্রে পাটনা স্কুল তাকে সমর্থন করে। কিন্তু তিনি 'তাকলিদ' অনুসরণ না করার জন্য পাটনা স্কুলকে সমালোচনা করেন। এ বিষয়ে ফরায়েযীগণ তাঁর যুক্তিসমূহ সমর্থন করে। সুতরাং উক্ত সময়ে বাংলায় ইসলামি পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে ত্রিমুখী সংঘাত চলছিল। এ ধরনের সংঘাত সংস্কারের চেয়ে সময়ের অপচয়কে নিশ্চিত করছিল। উপরোক্ত দলগুলোর অনমনীয় মনোভাবের কারণে তাদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। যখন আহলুল হাদিস আন্দোলন উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাটনা স্কুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলা অঞ্চলে তাদের প্রচার প্রসারিত করে, তখন এরাও অবশিষ্ট দলগুলোর বিরোধী দল হিসেবে পরিচিত হয়। ফলে মুসলিম সমাজে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে ফজলে হোসেন বলেন, বিতর্ক শুধু নেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং পারস্পরিক সংঘাতের সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতিতে উনিশ শতকের শেষার্ধে লক্ষ্য করা যায় যে, বাংলার ধর্মীয় জীবনে একটি বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য লাভ করে। এ বৈশিষ্ট্য 'বাহাছ' হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। তা'আয়্যুনি এবং ফরায়েযীদের মধ্যে এ ধরনের বেশ কয়েকটি 'বাহাছ' অনুষ্ঠিত হয়।

### ৩.৩.৩ ফরায়েযী আন্দোলনের সাথে পাটনা স্কুলের সম্পর্ক

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীর এবং তাঁর অনুসারীদের পরিচালিত আন্দোলনকে স্তব্ধ করার পরও কৃষক সমাজে বিরাজমান অসন্তোষ শেষ হয়ে যায়নি। সংস্কার করার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মানসিকতা নিঃসন্দেহে জাগরিত ছিল। হিংসাত্মক পথে তিতুমীরের মৃত্যু, তাঁকে জীবিত অবস্থার খ্যাতির চেয়ে মহীয়ান করে তোলে। তিতুমীর শহীদ হওয়ার ফলশ্রুতিতে তাঁর আদর্শ পরবর্তীকালে বাংলায় নীলকর এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে সূচিত আন্দোলনের পাথেয় হিসেবে কাজ করে।[৫৪] তিতুমীরের মৃত্যুর ফলে গ্রাম বাংলায় সৈয়দ আহমদ শহীদের প্রভাবের যে ছেঁদ পড়ে, তা শীঘ্রই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠে। তিতুমীরের চেয়ে অধিক যোগ্য পাটনার

---

৫৪ আব্দুর রহীম, *আল দূরার আল মানসুর ফি তারাজিম ই আহল ই সাদিকপুর*(ইলাহাবাদ : পুথিঘর প্রকাশনী, ১৮৪৫ খ্রি), পৃ. ১৩৩-১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

মওলভী ইনায়েত আলী পরবর্তী সময়ে সৈয়দ আহমদ শহীদের আদর্শ প্রচারে সক্রিয় ছিলেন। বালাকোটে ১৮৩১ সালে সৈয়দ আহমদ শহীদের মৃত্যু এবং নারকেল বাড়িয়ায় তিতুমীরের মৃত্যুর ফলে সংস্কার আন্দোলনের আপাতত সমাপ্তি হয় বলে হান্টার মন্তব্য করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'পাঞ্জাব সীমান্তে তাদের নেতার মৃত্যু তাদের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে। নিম্ন বাংলায়ও একই ধরনের পরিণতি ঘটে। কিন্তু সৈয়দ আহমদ শহীদ কর্তৃক নিযুক্ত খলিফাগণ (অর্থাৎ পাটনার মওলবী বিলায়েত আলী ও মওলবী ইনায়েত আলী) আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য এগিয়ে আসেন। প্রচারক হিসেবে তাদের প্রভূত মনোবল এবং ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, ইসলামি ঝান্ডাকে বারবার ধূলায় লুটিয়ে পড়া থেকে তুলে ধরেন। বালাকোট বিপর্যয়ের খবর যখন মওলভী বিলায়েত আলীর (বিপর্যয়ের সময় তিনি দক্ষিণ ভারতে অবস্থান করছিলেন) নিকট পৌঁছে তখন তিনি দ্রুত পাটনায় ফিরে আসেন। পাটনাতে তাকে 'তরীকা-ই-মোহাম্মদীয়া' আন্দোলনের নেতা নির্বাচিত করা হয়। তিনি নিজের উদ্যোগে অগ্রণী ব্যক্তিদেরকে গ্রহণ করে খলিফা নিযুক্ত করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মওলভী ইনায়েত আলী বাংলা অঞ্চলে আগমন করেন।[৫৫] উল্লেখ্য যে, মওলভী বিলায়েত আলী, মওলভী ইনায়েত আলীর পরিবারের সদস্য ছিলেন। সাধারণভাবে এ পরিবারটি সাদিকপুর পরিবার হিসেবে পরিচিত ছিল। পারিবারিক উপাত্ত ব্যবহার করে তিনি একটি গ্রন্থ লিখেছেন ও অন্যান্য উপাত্তের সাথে এর ধারাবাহিকতা রয়েছে। মওলভী ইনায়েত আলী কোন্ সময় বাংলায় আসেন তাঁর সঠিক তারিখ জানা যায় না। তাঁর পারিবারিক সূত্র অনুযায়ী আগমনের সময়টি ছিল ১৮৩১ বা ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ।

বাংলায় এসে মওলভী ইনায়েত আলী সৈয়দ আহমদ শহীদের বাঙ্গালী অনুসারীদের নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। এতে তিনি বুঝতে পারেন যে, শহরের মুসলিম সমাজের তুলনায় গ্রামবাসীরা কুসংস্কার এবং অজ্ঞতায় ডুবে আছে। তাই তিনি প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামের পর গ্রাম সফর করেন। এ সফরের মাধ্যমে তিনি শুদ্ধ ইসলামী মতাদর্শ প্রচার করেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মওলভী ইনায়েত আলী তাঁর সদর দফতর যশোর জেলার হাকিমপুরে স্থানান্তর করেন। এ স্থানে তিনি ৩ থেকে ৪ বছর তাঁর পরিবার নিয়ে বাস করেন। মৌলভী ইনায়েত আলীর প্রচার কার্যের বিষয়টি চারটি রাষ্ট্রীয় মামলা থেকেও জানা যায়। এগুলো ছিল-

(ক) ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের আম্বালা মামলা;
(খ) ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের পাটনা মামলা;
(গ) ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের রাজমহল মামলা এবং
(ঘ) ১৮৭০-১৮৭১বিখ্যাত ওয়াহাবী মামলাসমূহ।

---

৫৫ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত মামলাগুলো পরিচালনা করার সময় একটা সত্য বেরিয়ে এসেছে। সেটা হল এ যে, ইনায়েত আলী এবং তাঁর অনুসারীদের প্রচার বাংলার মুসলিম সমাজে সুদূর প্রসারী প্রভাব রাখে। সৈয়দ আহমদ শহীদ মুসলিম সাধারণের কাছে ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর মতাদর্শ প্রচার করেছেন। তিনি জনগণের ধর্মীয় জীবন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন এবং সে সাথে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে তাগাদা দিয়েছেন। এভাবে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হয়। বাংলা অঞ্চলে মৌলভী ইনায়েত আলী একইভাবে উক্ত মতাদর্শ প্রচার করেছেন। মুসলিম জনগোষ্ঠিকে একটি সুশৃংখল সংগঠনের মাধ্যমে এদেরকে পবিত্র যুদ্ধ বা জিহাদে অংশ নিয়ে ক্ষমতা জবর দখলকারীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে বলেছেন। তিনি এবং তাঁর অনুসারীগণ গ্রামীণ বাংলায় একটি ধর্মীয় বিপ্লব সাধনে সফল হয়েছিলেন। সুতরাং ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে মৌলভী ইনায়েত আলীর বাংলায় আগমনের পর এ বিষয়ে তিতুমীরের প্রচেষ্টা শুধু পুনরুজ্জীবনই লাভ করেনি, বরং তরীকা-ই-মোহাম্মদীয়া আন্দোলন এ অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে গেছে।

### ৩.৩.৪ তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়া আন্দোলন ও ফরায়েযী আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্ক

বাংলা অঞ্চলে ‘তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়া’ আন্দোলনের প্রভাব চারটি ধাপে বিভক্ত। যথা :
প্রথম ধাপে ব্যাপ্তি ছিল ১৮২০ থেকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময়ে সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং শাহ ইসমাইল শহীদ কলিকাতা সফর করেন। দ্বিতীয় ধাপে ‘পাটনা স্কুল’। তৃতীয় ধাপে তা‘আয়্যুনি এবং চতুর্থ ধাপে ‘আহলুল হাদিস’ আন্দোলনের মাধ্যমে এ অঞ্চল প্রভাবিত হয়। উক্ত ধাপসমূহের প্রচারকবৃন্দ পূর্ববঙ্গে তাদের মতামত প্রচার করতে গিয়ে ফরায়েযীদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন।[৫৬] এ সংযোগ কখনও বন্ধত্বপূর্ণ অথবা কখনও বিরোধিতাপূর্ণ ছিল। যেহেতু এদের সঙ্গে ফরায়েযীদের ছিল ভিন্ন ধরনের সম্পর্ক, সেহেতু উক্ত চারটি মতাদর্শের সঙ্গে ফরায়েযীদের সম্পর্ক আলাদাভাবে আলোচনা করা হল। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়া আন্দোলন সূচিত হয়। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কলিকাতা সফর করেন। এ প্রসঙ্গে হান্টার লিখেন, সৈয়দ আহমদ শহীদের চারদিকে প্রচুর লোক সমাগম হয়। এ অবস্থায় প্রথাগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিষ্য বানানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সৈয়দ আহমদের হাত ছুঁয়ে ‘বাই‘আত’ করার মাধ্যমে শিষ্য হওয়ার সুযোগ লাভ করা উপস্থিত লোকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এ অবস্থায় সৈয়দ আহমদ শহীদ তাঁর পাগড়ি খুলে লম্বা করে দেন এবং বলেন যারা তার পাগড়ি ছুঁয়ে বাই‘আত গ্রহণ করবে তারা তাঁর শিষ্য হিসেবে পরিগণিত হবে। পরের বছর তিনি

---

৫৬ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

মক্কা যাওয়ার পথে আবার কলিকাতা আসেন এবং এখানে তিনমাস অবস্থান করেন। পূর্ববঙ্গে লোকশ্রুতি রয়েছে যে তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে অনেক ব্যক্তি কলিকাতা আসে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ শহীদ যখন প্রথম কলিকাতা আসেন তখন তিনি পাটনায় যাত্রা বিরতি করেন। এ স্থানে তাঁর শিষ্যদের সংখ্যা এতবেশি সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় যে হান্টারের মতে, এদেরকে পরিচালনার জন্য একটি প্রশাসনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই তিনি কলিকাতা যাওয়ার পূর্বে মৌলভী বিলায়েত আলীকে পাটনার শিষ্যদের জন্য 'খলিফা' নিযুক্ত করেন। পাটনার শিষ্যদের জন্য তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়া সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করেছিল। তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়া আন্দোলন কলিকাতা শহরে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং সাফল্য অর্জন করে। সময়ের বিবর্তনে আন্দোলন এ শহর ছাড়িয়ে অন্য লোকালয়ে প্রসারিত হতে শুরু করে। সুতরাং ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীরের নেতৃত্বে গ্রামীণ সমাজে যে একটি গণআন্দোলন শুরু হয়েছিল তা বিস্ময়ের কিছু নয়। বাংলা অঞ্চলে তরীকা-ই-মুহাম্মদিয়া আন্দোলনের প্রথম উত্থান স্বল্প সময়ের জন্য ছিল এবং তা ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পশ্চিম বঙ্গের এ আন্দোলনটি ছিল ফরায়েযী আন্দোলনের প্রতিপক্ষ স্বরূপ।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্রিটিশ শাসিত বাংলা অঞ্চলের দিশেহারা ও কাণ্ডারী বিহীন মুসলিম জাতিকে ফরায়েযী আন্দোলন ঘন অন্ধকার রাতে পথ চলার জন্য বাতি ঘরের কাজ করেছিল। সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলো ছোট-খাটো মতভেদগুলো ভুলে যদি এর পুরোপুরি সহায়ক ভূমিকা পালন করত, তাহলে ফরায়েযী আন্দোলনের সুফল ভাগ্যাহত বাংলার মুসলিম আরও বেশি লাভে সক্ষম হত।

*Dhaka University Institutional Repository*

# চতুর্থ অধ্যায়

# হাজী শরী‘অতুল্লাহর জীবন সংগ্রাম ও ধর্মীয় সংস্কার

## ৪.১ ফরায়েযী আন্দোলনের বিভিন্ন দিক

### ৪.১.১ হাজী শরী‘অতুল্লাহর সংগ্রাম

হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) শুধু বৃটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেননি। তিনি সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও আপোষহীন সংগ্রাম করেন। সে সময় মুসলিমগণের অবশ্য করণীয় কাজ তথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এর পরিবর্তে মাজার পূজা ও পীর দর্শন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এভাবে মুসলিমগণ নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস হতে বহুদূরে সরে গিয়ে হিন্দু ধর্মীয় অনেক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। এসব কারণে ইংরেজগণ ও এদেশের নব্য হিন্দু জমিদারগণ সাধারণ মুসলিমদেরকে নিপীড়ন ও নির্যাতন চালাতে কার্পণ্য বোধ করেনি। ইংরেজ ও হিন্দু জমিদার এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মুসলিমদেরকে এদেশের শত্রু ভাবত। এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) ইসলামি দা’ওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের আক্বিদা ও বিশ্বাসকে মজবুত করার জন্য ঘরে ঘরে দা’ওয়াত দিতে থাকেন।[১] কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। অন্ধ মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে তিনি প্রায় ব্যর্থ হলেন। যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষকে আলোর পথে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হলেন তখন বেদনাহত হয়ে তিনি পুনরায় মক্কায় গমন করেন। এবার পায়ে হেঁটে তিনি মক্কার দিকে রওয়ানা হন। যাওয়ার পথে তিনি বাগদাদ, বসরা, কারবালা হয়ে বড় পীর রহ., হযরত আলী রা., ইমাম হোসেন রা., প্রমূখের কবর জিয়ারত করে মিশরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের চারপাশে আম্বিয়াগণের কবরও জিয়ারত করেন।[২]

এভাবে দীর্ঘ দিন যাত্রা শেষে তিনি মদীনায় পৌঁছে যান। বার বার হুজুর সা. এর রওজা জিয়ারত করে স্বদেশের মুসলিমগণের বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করত: তাদের মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ্ পাকের কাছে দু‘আ করেন। পরে তিনি বদর, উহুদ, খন্দকের ময়দানে শহীদ সাহাবাদের কবর জিয়ারত করেন এবং নিজের প্রাত্যহিক কাজ হিসেবে রসূল সা. এর রওজা জিয়ারত করতেন। তিনি রওজা শরীফের কাছে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এক রাতে রওজা শরীফের কাছে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন রসূল সা. তাঁকে দেশে ফিরে গিয়ে ইসলাম প্রচার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করছেন। স্বপ্ন ভাঙার পর তিনি অযু করে দুই রাক‘আত নামায

---

১ মোঃ আনোয়ার হোসেন, *ইতিহাসের ইতিহাস*(ঢাকা : মৌলি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১১), পৃ. ২১

২ আনোয়ার হোসেন কর্তৃক সম্পাদিত *দৈনিক ইত্তেফাক*(ঢাকা : ১৭ অক্টেবর ২০০৮), পৃ. ২

আদায় করে আবার ঘুমিয়ে পড়েন। এভাবে তিন বার রসূল সা. কে স্বপ্নে দেখেন। প্রতিবারই রসূল সা. তাকে দেশে ফিরে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে তিনি মদীনা ত্যাগ করে মক্কা ফিরে আসেন এবং আশ্চর্যজনক স্বপ্নের কথা তার উস্তাদ মাওলানা তাহের সোম্বলের কাছে বিবৃত করেন। হযরত তাহের সোম্বল স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে ভাগ্যবান ব্যক্তি বলে অভিহিত করেন এবং এ আদর্শ পালনের জন্য প্রিয়ছাত্রকে দেশে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন। স্বপ্নের নির্দেশ ও উস্তাদের কথা মত হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) পায়ে হেটে জিদ্দা এবং সেখান থেকে পালের নৌকা যোগে বোম্বে পৌঁছেন। বোম্বে হতে আবার পায়ে হেঁটে নিজ গ্রামে আসেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রমত্তা আড়িয়াল খাঁ নদীতে তাঁর নিজ বাড়িটি বিলীন হয়ে যায়। কিছুদিন পর ব্যঙ্গচরা নামক স্থানে একটা বাড়ি নির্মাণ করেন। পবিত্র মক্কায় দীর্ঘ প্রায় বিশ বছর যাবত হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) শুধু কুরআন, হাদিসই শিক্ষা গ্রহণ করেননি, তিনি যুক্তি বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজনীতি সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাই এদেশের অজ্ঞ মুসলিমদেরকে মাতৃভাষা বাংলায় ইসলামের সুশীতল বাণী প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কেননা অভিজাত মুসলিমগণের বিদেশী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অনুরাগই বাঙালী মুসলিমগণের অধঃপতনের কারণ। এ বিষয়টি অনুধাবন করে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে ফারসি ও উর্দ্দু ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেন। ফলে মাতৃভাষায় দ্বীনের কথা শুনে ইসলামের সুপ্রিয় বাণী গ্রহণে সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হয়।[৩]

এক মহা আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তিনি নিজের পথ আবিষ্কার করেন এবং নিজ গ্রামের মুসলিমগণকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান। কিন্তু কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া না দেয়ার কারণ তিনি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া ধর্ম-কর্ম সম্ভব নয়। তখন সূর্য উদয় হতে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত একজন মজুরের বেতন চার আনা ছিল। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) দৈনিক পারিশ্রমিক দেয়ার কথা বলে ১০০ জন মুসলিম নামধারী ক্ষেত মজুরকে তার নিজ বাড়িতে ডাকলেন। এ মজুররা সকাল বেলা বাড়িতে এসে তাদের কি কাজ তা জানতে চাইলে তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে, তাদের দ্বারা ক্ষেত বা অন্য কোনো কাজ করানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তারা শুধু তাঁর বাড়িতে সকালের নাস্তা ও দুপুরের খাবার খেত এবং দিন শেষে প্রত্যেকে চার আনা মজুরি গ্রহণ করত। শুধু একটি কাজ তাদেরকে করতে হত, তা হলো গাছের ছায়ায় বসে কালিমা তাইয়িবার অনুশীলন ও যিকির করা। কথা মত সকলে গাছের ছায়ায় বসে কালিমা অনুশীলন ও যিকির করতে থাকে। সকালের নাস্তা ও দুপুরের খাবার শেষে বাড়ি যাওয়ার সময় তিনি প্রত্যেককে চার আনা করে হাতের মুঠোয় দিলে সকলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তারা তাঁর দেয়া মজুরি

৩ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ২২৮

*Dhaka University Institutional Repository*

গ্রহণ করতে রাযি হয়নি। তারা বলছিল যে, যে শিক্ষা তাদের হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দিয়েছে সে প্রশান্তির বিনিময়ে তারা মজুরি গ্রহণ করেনি। এভাবে হাটে-মাঠে-ঘাটে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কালিমার দা'ওয়াত দিতে থাকেন। ফলে নিজ গ্রাম থেকে প্রত্যন্ত এলাকায় তাঁর দা'ওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা জেলাসহ বিভিন্ন জেলায় তাঁর এ কার্যক্রম প্রসারিত হয়।

### ৪.১.২ হাজী শরী'অতুল্লাহর সমাজ সংস্কার

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের জমে থাকা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। মুসলিম নামধারীদের পূর্ণাঙ্গ মুসলিম বানানোর জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালান। দীর্ঘদিন হিন্দুদের পাশাপাশি থাকার কারণে এবং যথারীতি ধর্মীয় জ্ঞান না থাকায় মুসলিমগণ হিন্দু কৃষ্টির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, যা ছিল মুসলিমগণের আক্বিদা ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যা দেবী স্বরস্বতী বন্দনা করত বিদ্যা অর্জনের জন্য। ঘরের মধ্যে সৌভাগ্য ও প্রাচুর্যতার জন্য লক্ষ্মী পূজা ছিল প্রতিটি মুসলিম নারীর দৈনন্দিন কাজের তালিকাভুক্ত। প্রচণ্ড খরা হলে শীতলা পূজা করত সবাই আড়ম্বরের সাথে। '১৭৬৫ সালে কোম্পানির শাসন দেওয়ানি লাভের পর থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত এ পঞ্চাশ বছর পূর্ব বাংলার মুসলিমগণ ছিল রাখালবিহীন মেষ পালের মত। নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস হতে বহুদূরে গিয়ে হিন্দু ধর্মীয় বহুবিধ কুসংস্কারে তারা আচ্ছন্ন ছিল।'[৪] ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিমগণের মধ্যে পীর এবং পীরের মাজারের প্রতি ভক্তি চরম আকার ধারণ করে। পীরকে পূঁজনীয় মনে করে পীরের পায়ের আঙ্গুল চোষন, পীরকে সিজদা করা এবং পীর গায়েব জানেন মনে করা হত। পরকালের হিসাব-নিকাশে পীরের সাহায্য পাওয়া যাবে ধারণার পাশাপাশি পীরের মাজারে গিলাফ পরানো ও মোমবাতি জ্বালানো হত। মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য পীরের মাজারের কাছে মাথা নত করে মৃত পীরের সাহায্য এবং মাজারের মাটি মাদুলিতে ভরে গলায় ধারণ করা হত। গোটা দেশ ভরে গিয়েছিল পীর পূঁজা ও মাজার পূঁজায়। মুসলিমগণের অবশ্য করণীয় ফরয কাজ নামায-রোযার পরিবর্তে প্রবল হয়ে উঠে মাজার আর পীরের সেবা। দেশ ভরে যায় মাজার আর পীর মুরীদে।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এদেশে প্রথম ব্যক্তি, যিনি শারী'আত, তরিক্বত তথা পীরের স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে মানুষকে জানান যে, পীর একজন মানুষ মাত্র। পীর শিক্ষক এবং মুরীদ ছাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। পীর আল্লাহর সমকক্ষ নয় এবং তিনি কবরে বা হাশরে কোনো উপকারে আসবেন না। কল্যাণ-অকল্যাণে

৪ মাওলানা আব্দুল বাতেন নোমান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*(বরিশাল : শরীয়াতিয়া লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ ২০০৫), পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

পীরের কোনো ভূমিকা নেই। পীরের মাজারে গিলাফ, মোমবাতি-আগরবাতি জ্বালানো বিদ‘আত ঘোষণা করেন হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.)। মৃত ব্যক্তি কারও জন্য কোনো কল্যাণ-অকল্যাণ করতে পারে না। এমনকি কবরে তার জন্য দু‘আ করা যায়, কিন্তু কবর থেকে মৃত ব্যক্তি কোনো জীবিত ব্যক্তিকে দু‘আ করতে পারে না বলে জানিয়ে দিলেন তিনি। আল-কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা- ‘কিছুতেই অপব্যয় কর না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।’[৫] একথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন এবং সবাইকে মিতব্যয়ী হতে আহ্বান জানান।

মুসলিম জাতির আর্থিক উন্নয়নের জন্য তিনি যাকাত ও উশর প্রদানে বিত্তবান মুসলিমগণকে উৎসাহিত করেন। হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) বলতেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তার মধ্যে নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ বছরান্তে একবার আল্লাহ্‌র হুকুমে যাকাত প্রদান কর। যাকাত প্রদানের দরুণ যদিও বাহ্যত সম্পদের ঘাটতি অনুভূত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাকাত দেয়ার কারণে সম্পদ পবিত্র ও বরকতপূর্ণ হয়।’ হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) সুদ গ্রহণ থেকে মুসলিমগণকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। তিনি আল কুরআনের আহ্বান মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেন- ‘হে মুমিনগণ! তোমরা সুদ খেও না।’[৬] এ ঘোষণা অনুযায়ী সকল প্রকার সুদি লেনদেন বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি মুসলিমগণকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, যাদের অর্থ সম্পদ উপার্জনে সুদের লেন-দেন হয় তাদের উপর আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এক আল্লাহ্ ছাড়া মানুষ অন্য কাউকে ভয় করবে না। বস্তুত সে ব্যক্তিই মুসলিম যার অন্তরে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ভয় কখনো বিন্দুমাত্র স্থান পায় না। যারা নির্ভীক চিত্তে দ্বীনের পথে সদা অটল-অবিচল থাকে তারাই আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা।

ধর্মীয় সংস্কাররূপে হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) প্রচার চালিয়ে ছিলেন। বিধর্মীয় আচার-আচরণ পরিহার করা, টুপি পরা, দাড়ি রাখা এবং ধুতি পরা বাদ দিয়ে লুঙ্গি বা পায়জামা পরা এগুলো ছিল সেসব সংস্কারের অন্যতম। পায়খানা-প্রস্রাবে ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা। মহিলাগণকে হাতের শাখা পরা বাদ দেয়া এবং পর্দা মেনে চলতে উৎসাহিত করেন। পুত্র-কন্যাদের নাম আল্লাহ্ ও রসূলের নামের সাথে মিল রেখে ইসলামি নাম রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সমস্ত হিন্দু-মুসলিম তথা সকল মানুষের প্রতি হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর বক্তব্য এরূপ ছিল যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। যারা অমুসলিম তাদের সাথে শুধুমাত্র ধর্মের পার্থক্যের জন্য অহেতুক বিবাদ করা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সা. পছন্দ করেন না এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূল

---

৫ আল কুরআন, ১৫: ২৮

৬ আল কুরআন, ২: ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা করেছেন, কোনো শক্তিশালী মুসলিম যদি কোনো দুর্বল অমুসলিমের প্রতি অন্যায়ভাবে অত্যাচার বা জুলুম করে, তবে মুসলিমগণের উচিত দুর্বলকে সাহায্য করা এবং মুসলিম তা করতে বাধ্য। শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে সংঘটিত বিরোধের অবসান ঘটান হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। তিনি সকল ধর্মের মানুষকে শুনিয়ে দেন সূরা কাফিরূনের ৬ষ্ঠ নম্বর আয়াতের শাশ্বত ঘোষণা! 'তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্য এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য।[৭] সুতরাং তিনি ধর্ম নিয়ে অহেতুক বিরোধ ও হানাহানি করা থেকে সবাইকে নিষেধ করেন। ফলে সাম্য ও মৈত্রির এক বন্ধন সৃষ্টি হয় সমাজ জীবনে। ধর্মভিত্তিক বিরোধ অবসানে তার প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করে। অনেক নিম্নবর্ণের হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে এবং অনেকে ইসলাম গ্রহণ না করেই মুক্তি আন্দোলন তথা 'ফরায়েযী আন্দোলন' এর সহায়ক শক্তি হিসেবে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর পাশে এসে দাঁড়ান।

### ৪.১.৩ ফরায়েযী বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য

পূর্ববঙ্গের ফরায়েযী আন্দোলন এবং পশ্চিম-ভারত ও দক্ষিণ-বঙ্গের ওয়াহাবী আন্দোলনের মধ্যে ছোট-খাটো ধর্মীয় পার্থক্য থাকলেও উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক সংস্কারের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম হতে সকল প্রকার কুসংস্কার দূর করে এটাকে সর্বসাধারণের ধর্মে পরিণত করা। জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন ও স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি সঞ্চার করতে এবং তাদেরকে কঠোর সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনতে সক্ষম হন। শিল্প-বিকাশের পরবর্তী সময়ের, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য বৃহৎ গণসংগ্রামের মত ফরায়েযী বিদ্রোহও ধর্মীয় সমস্যা নিয়ে আরম্ভ হলেও তাহা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল।[৮] ফরায়েযী আন্দোলন প্রথমে মুসলিম ধর্মের সংস্কার-আন্দোলন রূপে আরম্ভ হলেও এটা কেবল মুসলিম জনসাধারণকেই সঙ্গবদ্ধ ও সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেনি, এ আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থানীয় হিন্দু কৃষকদের একটি বৃহৎ অংশকেও সংগ্রামের দিকে টেনে আনতে পেরেছিল এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিমের আংশিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আন্দোলনের প্রধান নায়কের নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে 'স্বাধীন সরকার' গঠন, কৃষক স্বেচ্ছাসেবকগণকে নিয়ে স্বাধীন সরকারের 'সৈন্যবাহিনী' গঠন, স্বাধীন 'বিচারালয়' স্থাপন এবং বিস্তৃত অঞ্চলে জনসাধারণের নিকট হতে 'কর' আদায় প্রভৃতি কার্য ফরায়েযী আন্দোলনকে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রামের পূর্ণ বৈপ্লবিক রূপ দান করেছিল। অবশ্য ফরায়েযী আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণও এ আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল।

---

৭ আল কুরআন, ১০৯: ৬

৮ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০৭), পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

**প্রথমত:** ওয়াহাবী আন্দোলনের ন্যায় ফরায়েযী আন্দোলনও সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম কৃষক জনসাধারণের পূর্ণ ঐক্য গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল।

**দ্বিতীয়ত:** আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের অস্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনা, সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণাবশত সংগ্রাম আরও উন্নত স্তরে আরোহণ করতে পারেনি।

**তৃতীয়ত:** সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরবর্তীতে দুদু মিয়া ব্যতীত অপর কোনো যোগ্য নায়কের আবির্ভাব ঘটেনি। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ও পূর্ণ চেতনাযুক্ত কোনো দলীয় সংগঠন সে যুগে ছিল অসম্ভব। এ নেতৃত্বহীন অবস্থার সুযোগ নিয়েই ইংরেজ শাসকগণ, সৈন্য-বাহিনী, জমিদার ও নীলকরগণের তীব্র আক্রমণে শেষ পর্যন্ত এ বিদ্রোহ পরাজিত হয়। এ সকল দুর্বলতা বশত: ফরায়েযী বিদ্রোহ দীর্ঘ দশ বৎসর চলার পর ব্যর্থ হয়ে গেলেও এ দীর্ঘকালব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা এবং স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের যে আদর্শ রেখে গেছে তা আজও ভারতের কৃষক জনসাধারণকে সংগ্রামের প্রেরণা জোগায়।

## ৪.১.৪ ফরায়েযী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

ফরায়েযী আন্দোলন শুরু করার পিছনে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের মূল শিক্ষা ও আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম সমাজ থেকে যাবতীয় কুসংস্কার দূর করা। ফরায়েযী আন্দোলন তার জন্ম থেকেই সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কারণে ফরায়েযী আন্দোলন বিরাট শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং সারা বাংলাদেশ ও আসামের কতিপয় এলাকার জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন লাভে সামর্থ হয়।[৯] ফরায়েযীগণ হানাফি মতের অনুসারী ছিল। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ ও আসামের প্রায় সব মুসলিমই হানাফি মাযহাবের অনুসারী। ফরায়েযীরা সম্পূর্ণ গোড়ামি থেকে মুক্ত ছিল। ফরায়েযীরা পাঁচটি মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যা নিম্নরূপ :

- তাওবা;
- ফরায়েয;
- তাওহীদ;
- জুমু'আ ও 'ঈদের নামায পড়া হতে বিরত থাকা;
- প্রচলিত আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতা ইত্যাদি।

**তাওবা :** তাওবা অর্থ ধর্ম পথে প্রত্যাবর্তন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর মতে তাওবার অর্থ হচ্ছে অতীতের কৃত সমস্ত অপরাধসমূহের জন্য অনুশোচনা করা এবং ভবিষ্যতে সকল প্রকার অন্যায় অপরাধ

৯ মাওলানা আব্দুল বাতেন নোমান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

*Dhaka University Institutional Repository*

হতে বিরত থাকার দীপ্ত শপথ গ্রহণ করা। ফরায়েযী আন্দোলনের অনুসারীরা হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর সামনে বসে উচ্চস্বরে তাওবার শপথ বাক্য পাঠ করত।

**ফরায়েয :** ফরায়েয দ্বারা সেসব কাজকেই বুঝায় যা করতে আল্লাহ তা‘আলা সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। ফরায়েয বা অবশ্য কর্তব্যসমূহের পালন ফরায়েযী সংস্কার আন্দোলনের নীতি ছিল। অবশ্য কর্তব্যসমূহের মধ্যে হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিধির উপর বিশেষ জোর দেন। তাহলো-

ক) কলেমা-ই-তাওহীদ এর স্বীকারোক্তি;
খ) দৈনিক পাঁচ বার নামায আদায়;
গ) রমজান মাসের রোযা পালন;
ঘ) যাকাত প্রদান ও
ঙ) বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ পালন করা।[১০]

**তাওহীদ :** তাওহীদ অর্থ একত্ববাদ এ প্রচলিত ব্যাখ্যায় হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্রচলিত ব্যাখ্যায় শুধু শাব্দিকভাবে আল্লাহর একত্ববাদের উপর জোর দেয়া হয়।[১১] তিনি আল কুরআনের দর্শনের উপর জোর দেন। তিনি মনে করতেন ঈমানের বুনিয়াদ দু'টি বস্তুর উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয় এর বিশ্বাস স্থাপন করা ও অন্তরের বিশ্বাস সকল কর্মে তা প্রতিষ্ঠা করা এবং কাউকে আল্লাহ্র স্থানে দাঁড় করানো হতে বিরত রাখা। তিনি জোর দেন যে, একত্ববাদের দর্শন শুধু দর্শনের খাতিরেই নয়, বরং এ দর্শন এমন যে, তা দৈনন্দিন জীবনে গড়ে তুলতে হবে। তিনি মনে করতেন যে ধরনের বিশ্বাস বা কর্মে কুফর, শিরক বা বিদ‘আতের বিন্দুমাত্র প্রশ্রয়ের সম্ভাবনা থাকে, তা তাওহীদ ও ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী। একত্ববাদের এ ফরায়েযী দর্শনের লক্ষ্য ছিল যাবতীয় অনৈসলামি প্রভাব থেকে মুসলিম সমাজকে পবিত্র রাখা। ফরায়েযীরা অক্ষরে অক্ষরে আল-কুরআনের অনুসারী এবং আল-কুরআনের আদর্শের পরিপন্থী যাবতীয় রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিল।

**জুমু‘আ ও ‘ঈদের নামায :** ফরায়েযী এবং অন্যান্য মুসলিমগণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় যে, ফরায়েযীরা ইংরেজ শাসিত বাংলাদেশে জুমু‘আ ও ‘ঈদের নামায পড়া থেকে বিরত ছিলেন। ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করার মত ক্ষমতা হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এবং তাঁর ফরায়েযীদের

---

১০ "عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنى الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلوة، وإيتاء الزكوة والحج وصوم رمضانز" দ্র. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, সং.৫, এপ্রিল ২০০৪), খ.১, পৃ. ১৬, হাদীস নং ৭

১১ "التوحيد هو الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له، وفى الاصطلاح: تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور فى الأفهام، ويتخيل فى الأوهام والأذهان." দ্র. ড. শাওকি দায়ফ, *আল মু'জাম আল ওয়াসিত*(কায়রো : মাকতাবা আশ শুরুক আদ দুওয়ালিয়্যা, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪২৫ হি.), পৃ. ১০১৬

Dhaka University Institutional Repository

ছিল না। তাই তিনি হানাফি মাযহাবের বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী বাংলাকে দারুল হারব ঘোষণা করেন।[১২] হানাফি মাযহাব মতে জুমু'আ ও 'ঈদের নামায আদায় করার জন্য শহরের একটি নির্দিষ্ট স্থান এবং মুসলিম শাসক কর্তৃক একজন আমীর বা কাযী (বিচারপতি) নিযুক্ত হতে হবে। কিন্তু বাংলায় যেহেতু মুসলিম শাসক ও শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল না। এমতাবস্থায় হানাফি মাযহাব অনুযায়ী বাংলার সর্বত্র জুমু'আ ও 'ঈদের নামায জায়িয নয়।

**প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা :** তাওবা ও তাওহিদের যে দর্শন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) প্রদান করেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকা যা সম্পূর্ণ একত্ববাদের ধারণা পরিপন্থী। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) বর্ণ-বৈষম্য দূর করেন এবং অনৈসলামি রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান বন্ধ করেন। তিনি মুসলিম পীর-মুরিদের বাড়াবাড়ি যেমন ধর্মীয় সীমার বাইরে অতিরিক্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা, পীরের কবরে সাজদা করা, হাশরে পীর উপকারে আসবে, পীরের বাড়িতে জুতা পরা যাবে না, পীর অন্তরের খবর রাখেন এবং পীরের মাজার জিয়ারত না করলে পাপ হবে এ জাতীয় ধারণার বিরোধিতা করেন এবং দুর্নীতি পরায়ণ সুফী তত্ত্বের ভেদ রেখা টানার জন্য তিনি পীর-মুরিদ শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে উস্তাদ-শাগরিদ শব্দ ব্যবহার করেন। উপরোল্লিখিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য যে ফরায়েযীর মধ্যে পাওয়া যেত তাদেরকে তাওবাকারী মু'মিন-মুসলিম বলা হত। পূর্ববাংলা বা বর্তমান বাংলাদেশে যে বর্ণ-বৈষম্যের বিলুপ্তি ঘটেছে তার মূলে রয়েছে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর আপোষহীন মনোভাব ও সংগ্রাম।

### ৪.১.৫ ফরায়েযী আন্দোলনের প্রসার

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর সমসাময়িক জেমস টেইলর বলেন যে, ফরায়েযী আন্দোলন 'অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ' করে। তিনি মক্কা হতে ফিরে আসার পর প্রচার কাজে নিজকে নিয়োজিত করেন এবং অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সফল হন। ধারণা করা যায় যে, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ এবং ময়মনসিংহের মুসলিম জনসংখ্যার এক ষষ্ঠাংশ ফরায়েযী মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়। টেইলর আরও বলেন যে, ঢাকা শহরের মুসলিম জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ফরায়েযী ছিল। ১৮৫৬-৬২ খ্রিস্টাব্দে জে. ই. গ্যাসট্রেল ফরিদপুর, যশোর এবং বাকেরগঞ্জ জেলার জরিপকার্য পরিচালনা করেন।[১৩] এ সময়ে তিনি লক্ষ্য করেন যে, ফরিদপুর ও নিকটস্থ জেলাসমূহের মুসলিম সমাজে ফরায়েযীদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে এবং এ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। একইভাবে তাঁর জীবদ্দশায়ই ত্রিপুরা (বৃহত্তর কুমিল্লা) জেলায় ফরায়েযী আন্দোলন প্রসার লাভ করে।

---

১২ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

*Dhaka University Institutional Repository*

জেমস ওয়াইজ মনে করেন শরী'অতুল্লাহ ছিলেন ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে প্রথম যিনি পূর্ব বাংলার হাওড়, বিল এলাকায় মুসলিম সমাজে ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠা, হিন্দু পৌত্তলিকতা এবং দূর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান।[১৪] ওয়াইজ বলেন, তাঁর নিষ্কলুষ এবং অনুকরণীয় জীবনযাত্রা দেশবাসী গ্রহণ করে এবং তাকে তাদের পিতা হিসেবে অভিহিত করে। শরী'অতুল্লাহ ছিলেন তাদের বিপদের ত্রাণকর্তা এবং সবকিছুর দিশারি। কিন্তু সাধারণভাবে সকল নতুন আন্দোলনের যেমন বিভিন্ন বাধা পার হতে হয়েছে, তেমনি ফরায়েযী আন্দোলনের ভাগ্যেও একই দশা ঘটেছে। আন্দোলনের শুরুতেই রক্ষণশীল মুসলিমদের একটি অংশ হাজী শরী'অতুল্লাহ কর্তৃক প্রচারিত শুদ্ধবাদী ইসলামের বিরোধিতা করে। দীর্ঘদিনের সামাজিক আচারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচারণা এ বিরোধিতার কারণ ছিল। যতই সময় যাচ্ছিল ততই এদের বাধা শক্তিশালী হচ্ছিল। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ এপ্রিল ঢাকা-জামালপুরের ফৌজদারি আইন সম্পর্কিত রিপোর্ট (রুবকারী) অনুযায়ী দেখা যায় যে, ধর্মীয় বিষয়ে শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর অনুসারী এবং রামনগর গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে সংঘর্ষ ঘটেছে এবং সহিংসতা দেখা দিয়েছে।

উক্ত রিপোর্টে ফরায়েযীদেরকে বলা হয়েছে 'তা'আয়্যুনি হাল' এবং তাদের বিরোধীদের বলা হয়েছে 'তা'আয়্যুনি সাবিক'। এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, ফরায়েযী বিরোধীরা সাধারণত মুহাম্মদ সা. এবং একাধিক পীরের উপাসনা করত কিন্তু ফরায়েযীগণ উক্ত বিষয়ে উপাসনা করত না এবং অন্যান্য প্রচলিত বিষয়েও ভিন্নমত পোষণ করত। মুসলিম ধর্মীয় বিষয়ে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের ভুল ধারণা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, পুরনো সমাজ স্থানীয় আচার পালনে অভ্যস্ত ছিল। অন্যদিকে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) প্রচারিত শুদ্ধিবাদী নতুন ধারা সম্পর্কেও জানা যায়। সুতরাং এখানে উল্লেখ্য যে, ফরায়েযীগণ ছিল শুদ্ধিবাদী যারা ওয়াহাবীদের মত পুনরুজ্জীবনবাদী ছিল। অবশিষ্ট মুসলিমগণ ছিল কুসংস্কারে নিমজ্জিত এবং স্থানীয় আচার পালনে অভ্যস্ত যারা পীরপূজা এবং পীর বা আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শকের প্রতি ছিল গভীরভাবে অনুরক্ত। উপরোক্ত বর্ণনায়, যে সকল পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা থেকে একটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা করা যায়। 'তা'আয়্যুনি' যা সঠিকভাবে এসেছে আরবি শব্দ 'তা'আয়্যুন' থেকে, যার মানে হল নির্দিষ্ট করা।

সুতরাং 'তা'আয়্যুনি' শব্দটি একজন ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচিত করে। এটা সকলেই জানে যে, বাংলার প্রায় সব মুসলিমই 'হানাফি' মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত। ফরায়েযী বিরোধীরা যেহেতু 'তা'আয়্যুনি' হিসেবে পরিচিত ছিল তাতে বুঝা যায় যে, এ দু'পক্ষই ছিল হানাফি মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত উক্ত নামটি ফরায়েযী এবং তাদের বিরোধীদের মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। ফরায়েযীরা হানাফি মাযহাবের অনুসারী বলে মনে করে। পক্ষান্তরে ওয়াহাবীরা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী

১৪ আব্দুল হালিম, *হাজী শরী'অতুল্লাহ*(অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি), পৃ. ১৩-১৫

*Dhaka University Institutional Repository*

বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। কোনো মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তাদের 'লা-মাযহাবী' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ফরায়েযীদের জন্য ব্যবহৃত শব্দ 'তা'আয়্যুনি হাল' দ্বারা বুঝা যায় যে, ফরায়েযীগণ হানাফি মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত সাম্প্রতিক পরিচয়ে পরিচিত একটি সম্প্রদায়। অন্যদিকে 'তা'আয়্যুনি সাবিক' ছিল অবশিষ্ট মুসলিমগণ যারা পুরনো আচার আচরণে অভ্যস্ত হানাফি মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্থানীয় আচার পালনকারীগণ পরবর্তীতে সাবেকি হিসেবে পরিচিত হয়। যাহোক, ফরায়েযীগণ যে তা'আয়্যুনি হিসেবে পরিচিত ছিল এ সম্পর্কে অন্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বাংলার মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরির অনুসারীগণ সুনির্দিষ্টভাবেই 'তা'আয়্যুনি' হিসেবে পরিচিত বলে উল্লেখ আছে। ঊনিশ শতকের শেষার্ধে উক্ত নামে পরিচিত কেরামত আলীর অনুসারীগণ ফরায়েযীদের ঘোর বিরোধী ছিল। যদিও 'তা'আয়্যুনি হাল' দ্বারা অস্পষ্টভাবে ফরায়েযীদের মতাদর্শিক অবস্থান বুঝায়, তা সত্ত্বেও ফরায়েযীদের নিজস্ব ইতিহাসে উক্ত নাম সম্পর্কে সামান্যতম উল্লেখ নেই যার দ্বারা ফরায়েযীদেরকে 'তা'আয়্যুনি হাল' বলা যায়। এ বিষয়ে একমাত্র উপসংহার টানা যায় যে, ফরায়েযীগণ আন্দোলনের শুরুতে নিজেদেরকে সম্ভবত 'তা'আয়্যুনি হাল' হিসেবে পরিচয় দিত, যাতে করে এদেরকে হানাফি মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত বলা যায় এবং অন্যদিকে তাদেরকে যাতে করে 'লা মাযহাবী' বলা না হয়। এক্ষেত্রে ফরায়েযীদের ঘোর বিরোধী মাওলানা কেরামত আলী ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাংলার 'তা'আয়্যুনি' আন্দোলন শুরু করলে স্বাভাবিক কারণেই ফরায়েযীগণ 'তা'আয়্যুনি হাল' নাম ত্যাগ করে।[১৫] 'রুবকারী'তে আরও দেখা যায় যে, ফরায়েযীদেরকে একটি আদালতে অভিযুক্ত করে তাদের নেতাদেরকে দণ্ড হিসেবে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও প্রত্যেককে দুইশত টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর জেল প্রদান করা হয়। অনুসারীদেরকে একই দণ্ড দেয়া হয় এবং প্রত্যেককে একশত টাকা করে জরিমানা করা হয়। শেষে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) নিজে পুলিশের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে মুক্তি দেয়া হয় এবং শান্তি রক্ষার কবচ হিসেবে এক বছরের জন্য ২০০ টাকা আমানত হিসেবে রাখা হয়।

### ৪.১.৬ ফরায়েযীদের ধর্মীয় মতাদর্শ

ফরায়েযীদের আন্দোলনের শুরু থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময় ধরে আন্দোলনের চরিত্র প্রায় সর্বাংশে ছিল ধর্মীয়। দুদু মিয়া অনুসৃত আর্থ-সামাজিক নীতি এ আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। এ কারণে পূর্ববাংলা এবং আসামের সাধারণ কৃষকশ্রেণি এ আন্দোলনের প্রতি আগ্রাহান্বিত হয়। যদিও এ আন্দোলনের আর্থ-

---

১৫ James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal,* Ibid, p. 7

*Dhaka University Institutional Repository*

সামাজিক বৈশিষ্ট্য সাধারণ জনগোষ্ঠিকে আকর্ষণ করেছিল, তা সত্ত্বেও এর ধর্মীয় চরিত্র ফরায়েযী অনুসারীগণ উপেক্ষা করেনি। ফরায়েযীগণ নিজেদেরকে 'হানাফি' মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করে।[১৬] ফরায়েযীদের এ আলাদা ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ইতিহাসানুরাগীদের আকৃষ্ট করে। কারণ, তাদের মতাদর্শ মূল্যায়ণে–

**প্রথমত:** বাংলায় মুসলিম শক্তি পরাজিত হওয়ায় এখানকার বিভিন্ন সমস্যা যেমন সামাজিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে।

**দ্বিতীয়ত:** ফরায়েযী আন্দোলন মূল্যায়নের মাধ্যমে পূর্ববাংলাকে ঊনিশ শতকের সংস্কার মনস্ক মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। সংস্কার আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ইসলামের আদি শিক্ষা সমাজে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন এবং বাংলার মুসলিমগণকে কুসংস্কারমুক্ত করে বিশুদ্ধ সমাজ গঠন করতে প্রয়াস চালান। তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ছিল মুসলিমগণকে তাওবা করার জন্য আহ্বান করা, যার মাধ্যমে পূর্বের পাপ মোচন করে আত্মাকে বিশুদ্ধ করার পথ প্রদর্শন করা। এ নীতিকে বলা হয় 'তাওবা বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার পর তিনি মুসলিম সমাজকে আল্লাহ ও রসূল সা. নির্দেশিত অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ পালনের প্রতি আহ্বান জানানো। সুতরাং 'তাওবা' পদ্ধতির মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই 'ফরয' মতবাদ এর প্রতি মনোযোগ নিবিষ্ট হয়। 'ফরয' এর প্রতি খুব বেশি গুরুত্ব দেয়ায় এ আন্দোলনকে বলা হয় 'ফরায়েযী' আন্দোলন।

**তৃতীয়ত:** কুরআন অনুযায়ী তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলা হয় যে, এ আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন সব কিছুই পরিহার করতে হবে।

**চতুর্থত:** জুমু'আ এবং 'ঈদের নামাযের প্রশ্নে ফরায়েযীগণ বাংলার অন্যান্য মুসলিমগণের থেকে আলাদা মত পোষণ করেন এবং

**পঞ্চমত:** কুরআন এবং হাদিসে নেই এমন সব ধরনের প্রচলিত আচার এবং উৎসবাদি ফরায়েযীগণ পরিত্যাগ করার আহ্বান জানায়। বর্ণিত পাঁচটি নীতি নিম্নে আলোচনা করা হল :

**(১) তাওবা :** হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর মতে 'তাওবা' হল জীবনের বিগত পাপসমূহের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতে পাপাচার করবে না এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করা। তাওবা করার পদ্ধতি হল উস্তাদ (আধ্যাত্মিক প্রদর্শক) শাগরিদকে বা শিষ্যকে মুখোমুখি বসিয়ে নিম্নোক্ত শপথ করাবেন। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যে সমস্ত শিরক, বিদ'আত, নাফরমানি, অন্যায়, অত্যাচার করা হয়েছে সমস্ত হতে তাওবা করা এবং ওয়াদা করা যে, আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ ও নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা এবং রসূলুল্লাহ্ সা. এর সুন্নাত, তরীকা মোতাবেক চলা। ফরায়েযী সম্প্রদায় নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত

১৬ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

*Dhaka University Institutional Repository*

একজন ব্যক্তিকে ‘তাওবার মুসলিম’ বা মু’মিন বলা হয়। সে অন্যান্য ফরায়েযীদের মতই সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। ‘তাওবা’ মতবাদটি ফরায়েযী সংস্কারের প্রধান ফটক বলা যায় যা উদ্ধৃত শপথে প্রতিফলিত হয়েছে। ‘তাওবা’ করার পদ্ধতিকে ফরায়েযীগণ ‘ইস্তিগফার’ বা সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা বলে। এটাকে ‘ইকরারী বাই‘আত’ও বলা হয়। যার অর্থ উস্তাদ এবং শাগরেদ পরস্পরকে স্পর্শ না করে শপথ নেয়া। ঐতিহ্য অনুযায়ী পীরদের শপথের চেয়ে ফরায়েযীদের শপথ এ ক্ষেত্রে পৃথক। পীরগণ সাধারণত শাগরেদের হাতে নিজের হাত রেখে ‘বাই‘আত’ পরিচালনা করে থাকে। এ ধরনের শারীরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে পীরের আশীর্বাদ মুরিদের কাছে পৌঁছানো হয় বলে বিশ্বাস প্রচলিত। ফরায়েযীগণ এ ধরনের ‘বাই‘আত’ কে বিদ‘আত হিসেবে পরিত্যাগ করে এবং এ প্রক্রিয়াকে পাপ হিসেবে বিবেচনা করে। এটাকে ‘দাস্তি বাই‘আহ্’ বলে আখ্যায়িত করা হত। কুরআন অথবা সুন্নাহতে নেই বলে ফরায়েযীগণ মনে করে। অন্যদিকে ফরায়েযীগণ ‘ইকরারি বাই‘আত’ নবীজি সা. এর কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় বলে দাবী করে। তবে প্রকৃতপক্ষে নবীজি সা. এর হাতে হাত রেখেই বাই‘আত গ্রহণ করেছেন এবং পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, রসূলের হাতের উপর আল্লাহর হাত বিদ্যমান। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ বাংলা ভাষায় ‘তাওবা’ পরিচালনা করতেন। বাংলা ভাষায় শপথ পরিচালনা করার উদ্দেশ্য ছিল ‘তাওবা’ কে সহজবোধ্য করা এবং অশিক্ষিত মুসলিমগণকে আকৃষ্ট করা। সাধারণ মুসলিমগণ আরবি, ফার্সী বা উর্দু জানত না। এমন কি হান্টার বলেন, ‘প্রতি দশজনের মধ্যে একজন মাত্র ইসলামের সাধারণ বিষয় কালিমা পড়তে পারত।’

**(২) ফরায়েয :** ইসলামের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহকে পালন করা ফরায়েযী সংস্কারসমূহের কেন্দ্রিয় বৈশিষ্ট্য, যা এ আন্দোলনের নামে পরিস্ফুট। ‘ফরায়েযী’ শব্দটি দিয়ে হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) আল্লাহ এবং রসূলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশিত কর্তব্যসমূহকে বুঝাতে চেয়েছেন, যা তাওবার মধ্যে নিহিত আছে। কিন্তু তিনি ইসলামের ৫টি মৌলিক বিষয় পালনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ হলো, কালিমা, নামায, রোযা, যাকাত এবং হজ্জ।

ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী প্রথম তিনটি বিষয় ধনী গরীব নির্বিশেষে সকলের জন্য পালনীয় এবং শেষোক্ত দুটি বিষয় শুধু বিত্তশালীদের দ্বারা পালনীয়। ফরায়েযী পুঁথিগুলোতে আমরা ইসলাম সম্পর্কে ফরায়েযীদের ধারণা প্রকাশিত হতে দেখি।[১৭] নিম্নে এর আংশিক বর্ণিত হল :

‘সে পানি পাইল যাবে দরাক্ত ইমান তবে
তাজা হৈল হুকুমে আল্লাহ।

---

১৭ ওয়াজির আলী, *মুসলিম রত্নহার*, পৃ.৩২; দুরর ই মোহাম্মদ, *পুঁথি*, পৃ. ১১; উদ্ধৃত : ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

তৈয়ব কলেমা যেই ইমানের মূল সেই
দিনে দিনে হৈল ওস্তত্তার+
রোজা যে বাগানের কলি নামায তাহাতে অলি
জাকাত বুলবুল খোশ লাহান।।
হজ্ব সে গাছের ডাল শুন যে নেক হাল
মালদার যেই মোছলমান +
এই পাঁচ হৈতে যত দোশালা তেশালা কত
দীন এছলামির খুবি হৈল।'

দূরর-ই-মোহাম্মদ এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে কারণ হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) যখন মক্কা থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি বাংলায় 'ঈমানের পানি'র অভাবে মৃতপ্রায় ইসলামকে দেখেন। কৌতুহলের বিষয় হলো যে, হান্টারও এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, একশত বছর পূর্বে বাংলায় মুহাম্মদিয় ধর্ম মৃতপ্রায় ছিল। বাংলায় ইসলামের এ করুণ অবস্থা হঠাৎ করেই যেন মূল্যবান বিষয় হয়ে উঠে। এর কারণ ছিল বাংলায় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মুসলিমগণের ব্যর্থতা। কুসংস্কার এবং দুর্নীতিতে মুসলিম সমাজ ডুবে যায়। বাংলায় ইসলামের পুনর্জাগরণে তিনি চমৎকপ্রদ সাফল্যে যে অলৌকিকতা ছিল না সে ব্যাপারে দূরর-ই-মোহাম্মদ সচেতন ছিলেন।[১৮] কারণ একজন খাঁটি ফরায়েযী হিসেবে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) বিশ্ব জগতের কল্যাণ চেয়েছিলেন। আল্লাহ প্রদত্ত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করে তিনি তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর সাফল্য এসেছে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান এবং সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে। ফরায়েযীগণ নিজেদেরকে 'হানাফি' হিসেবে দাবি করে থাকে। মতাদর্শিক এবং আইনি উভয় ক্ষেত্রেই ফরায়েযীগণ 'হানাফি' মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। ধর্মীয় কর্তব্য পালনে এরা কড়াকড়ি মনোভাব পোষণ করত। উদাহরণ স্বরূপ হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর সমসাময়িক জেমস্ টেইলরের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন, ফরায়েযীগণ অন্যান্য মুসলিমগণের চেয়ে অধিক কড়াকড়ি প্রকৃতির নৈতিকতার অধিকারী ছিল। ইসলামের পাঁচটি মূলনীতি পালনে উস্তাদ এবং খলিফাগণ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। যে সকল অঞ্চলে ফরায়েযীগণ বাস করতেন সেসব স্থানে উস্তাদ ও খলিফাগণ যে কোনো ধরনের গাফিলতির জন্য তাদের অনুসারীদের সতর্ক করে দিতেন।

---

১৮ 'দুরর ই মোহাম্মদ' শিরোনামের পুঁথি (পৃ. ৯-১৩৮) বাংলা ভাষায় লিখিত। ফরায়েযী মতাদর্শ এবং ফরায়েযী নেতাদের জীবনী এ পুঁথিতে বিবৃত হয়েছে। পুঁথিটির প্রথম ৮ পৃষ্ঠা এবং শেষের কয়েক পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। পুঁথিটির ভাষা এবং গঠন প্রকৃতি দ্বারা নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায় যে, এটি ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এ সময়টা ছিল খান বাহাদুর সাইদ উদ্দীন আহমদের মৃত্যু পূর্ববর্তী সময়। দুরর ই মোহাম্মদ পুঁথিটির ভনিতায় লেখকের নাম বেশ কয়েকবার উল্লিখিত হয়েছে। সম্ভবত দুরর ই মোহাম্মদ লেখকের ছদ্মনাম। যেহেতু পুঁথিটার প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি সেহেতু এর লেখক সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়নি।' দ্র. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

*Dhaka University Institutional Repository*

**(৩) তাওহিদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদ :** ইসলামি পুনরুজ্জীবনের প্রবক্তা হিসেবে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কুরআন ভিত্তিক তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্বের ধারণাকে গুরুত্ব সহকারে দেখতেন। এ ধারণাটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্র একত্ব বিষয়ক মতবাদটি ফরায়েযী সমাজে কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং তাওহীদ এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন সব বিষয়কে বিলোপ করা হয়। আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কে ফরায়েযী মতবাদ ব্যাখ্যার দাবি রাখে। এ মতবাদ শুধু ফরায়েযীদেরকে আলাদা সম্প্রদায় হিসেবেই চিহ্নিত করেনি বরং সনাতন সমাজের সঙ্গে এর সরাসরি সংঘাত সৃষ্টি করে, যা মতবাদের ব্যাখ্যা এবং অনুসরণের মধ্যে প্রতিভাত হয়। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তাঁর স্ব-ধর্মের লোকদের মধ্যে তাওহীদের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করানোর জন্য ব্যাকুল ছিলেন। তাওবার বিভিন্ন ফর্মুলার মধ্যে তা স্পষ্ট হয়। তাওহীদ সম্পর্কে প্রচলিত ব্যাখ্যায় তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কারণ এ ব্যাখ্যায় শুধু আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কে ধারণা ছিল। তিনি 'ঈমান' অথবা ধর্ম বিশ্বাসকে দুটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করতেন। যথা :

**ক.** আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস করা এবং তার উপর দৃঢ়ভাবে আমল করা;
**খ.** অন্য কিছুর সঙ্গে আল্লাহর অংশীদারিত্ব সংযোগে বিরত থাকা।

সুতরাং তাঁর মতে তাওহীদ শুধু একটি মতবাদ নয়; বরং তার উপর বাস্তবে আমল করতে হবে। যে কোনো বিশ্বাস এবং কাজের সঙ্গে যদি নাস্তিকতা, শিরক অথবা বিদ'আতের সামান্যতমও সংশ্রব থাকে তাহলে তা হবে তাওহীদ বিরোধী। এছাড়া হিন্দুদের আচার উৎসবে চাঁদা দেয়া, পীরদের প্রতি অস্বাভাবিক ভক্তি, ফাতিহা অনুষ্ঠান এবং এমন ধরনের অন্যান্য কর্মকাণ্ডকেও তিনি তাওহীদ বিরোধী মনে করেন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কেরামত আলী বলেন যে, 'খারিজী' এবং 'ফরায়েযীগণ' 'আমল' কে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মনে করে থাকে। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গে প্রচারিত একটি প্রচারপত্রে তিনি বলেন। বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের বিশেষ করে ফরিদপুর এবং বরিশাল শহর ও ঐগুলোর আশপাশের এলাকার লোকদের অজ্ঞতার কারণে এরা খারিজীদের ফাঁদে (বাংলা অঞ্চলের খারিজী অর্থাৎ ফরায়েযীগণ) পতিত হয়েছে। এ অজ্ঞতার কারণে এরা দ্বীন, মাযহাব, আকায়িদ, ঈমান এবং আমলের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। এ সুযোগটি ফরায়েযীগণ ব্যবহার করেছে। সুতরাং 'তাওহীদ' সম্পর্কে ফরায়েযী মতবাদ মুসলিম সমাজের অনৈসলামি কার্যকলাপ শুদ্ধিকরণের বিষয়ে শুদ্ধিবাদী মতবাদ হিসেবে কাজ করেছে। সমসাময়িক এবং পরবর্তী লেখাসমূহের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়।

(ক) জেমস্ টেইলর বলেন, (ফরায়েযীগণ) কুরআনের কড়াকড়ি নিষেধ অনুযায়ী সকল উৎসবাদি যা কুরআন কর্তৃক অনুমোদিত নয় তা বাতিল বলে ঘোষণা করে।[১৯]

---

১৯ James Taylor, *A sketch of the Topography and Statistics of Dacca*(Calcutta : G.H. Huttmann, Military Orphan Press, 1840), p. 249

*Dhaka University Institutional Repository*

(খ) ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার লিখেছেন, তিনি ঈমান অনুযায়ী ‘কুফর’ এর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন অথবা সকল অনুষ্ঠানাদি ও আচার যা বিদ‘আত এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে অংশীদারিত্বের বা শিরকের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিয়েছিলেন।[২০]

(গ) এইচ. বেভারিজ বলেন যে, ফরায়েযী আন্দোলন প্রিমিটিভ চার্চ আন্দোলনের মত। মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সা. এর মৌলিক মতবাদে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছিল এবং কুসংস্কারপূর্ণ আচার, যেগুলো কালের বিবর্তনে হিন্দু বা অন্যান্য বিধর্মীদের কাছ থেকে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তা পরিহারের আহ্বান করেছিল এ আন্দোলন। তাওহীদ সম্পর্কিত মতবাদের মধ্যে আরব দেশে ওয়াহাবী এবং ফরায়েযীদের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে এটা ছিল একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা তাদেরকে পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনে শরীক করেছিল।[২১]

**(৪) জুমু‘আ এবং ‘ঈদের নামায :** বাংলার অন্যান্য মুসলিমগণের সঙ্গে ফরায়েযীদের পার্থক্য ‘ঈদ এবং জুমু‘আর নামাযের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ফরায়েযীগণ এ দুই ধরনের নামায বৃটিশ আমলে স্থগিত ঘোষণা করে। এ নামাযগুলো ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শহরগুলোতে পুনরায় শুরু করা হয়।[২২] ফরায়েযীগণ মনে করে যে হানাফী আইন অনুসারে ‘মিসর আল জামি’তেই (অর্থাৎ যেখানে প্রশাসক এবং কাজী উপস্থিত আছে ও যারা মুসলিম সুলতান দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত) শুধু এ নামাযসমূহ অনুষ্ঠিত হওয়া বৈধ। ‘মিসর আল জামি’ হল একটি নির্দিষ্ট শহর যা আইন দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। সুতরাং ফরায়েযীগণ মনে করে যে, ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় এ ধরনের কোনো শহর ছিল না। সাপ্তাহিক জুমু‘আর নামায বা ‘ঈদের নামাযের বৈধতা সম্পর্কে বিতর্ক ফরায়েযীদের আবিষ্কার নয়। এ ধরনের বিতর্ক দিল্লী সালতানাত প্রতিষ্ঠার সময়েও দেখা দিয়েছিল। ১৩৪৪ খ্রিস্টাব্দে একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয় সাপ্তাহিক জুমু‘আ এবং ‘ঈদ সম্পর্কে। এ সময়ে মোহাম্মদ বিন তুঘলক সুলতান ছিলেন এবং তিনি কায়রো থেকে সুলতান হিসেবে স্বীকৃতি গ্রহণ করেননি বলে এ বিতর্কের সূত্রপাত হয়। সমসাময়িক ইতিহাসবিদগণ এ বিষয়ে উল্লেখ করেন যে, একই বছরে সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলে এ বিতর্ক সৃষ্টি হয়। অনেক বিতর্কের পর সুলতানের শিক্ষক ‘বুতলঘ খান’ তাকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, কোনো রাজতন্ত্রই খলিফার স্বীকৃতি ছাড়া বৈধ নয়। এরপর সুলতান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, সংগঠিত ধর্মীয় এবং সামাজিক খলিফার অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়। এ কারণে তিনি ‘ঈদ এবং জুমু‘আর নামায স্থগিত রাখার

---

২০ Sir William Wilson Hunter, *The Indian Musalmans*(London : Trubner and Company, 1871), p. 399

২১ Henry Beveridge, *District of Bakergong*(London : Trubner & Co., Ludgate Hill, 1876), p. 254

২২ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পীর বাদশা মিয়া নারায়ণগঞ্জে ফরায়েযী সম্প্রদায়ের একটা সম্মেলন আহ্বান করে পাকিস্তানকে দারুল ইসলাম বলে ঘোষণা দেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকে জুমু‘আ ও ‘ঈদের জামা‘আত অনুষ্ঠান করার আহ্বান জানান। তদবধি তাঁর অনুসারীরা জুমু‘আ ও ‘ঈদের নামায আদায় করতে থাকে।’ দ্র. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া(৬)*(ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশ দেন। সুলতান যখন খলিফা থেকে একটি ফরমান বলে স্বীকৃতি পান তখন এ নামাযসমূহ পুনরায় আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। মুসলিম আইনজ্ঞদের মধ্যে জুমু'আ এবং 'ঈদ সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিতর্ক সৃষ্টি হয় মূলত দু'টি বিষয়কে কেন্দ্র করে। এগুলো হল :

ক. আমীর অর্থাৎ খলিফা এবং পরবর্তী সময়ে সুলতান বা তাঁর প্রতিনিধি;
খ. স্থানের গ্রহণযোগ্যতা বা স্থানটি মিসর আল জামি' কি না।

'আমীর' এর উপস্থিতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মিসর আল জামি' সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

পূর্বকালে আইন বিশারদগণ সাধারণভাবে এ সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন যে, জুমু'আ বা 'ঈদের নামায অনুষ্ঠানের পূর্বশর্ত হলো মিসর আল জামি' এর অস্তিত্ব। কিন্তু মিসর আল জামি'র ব্যাখ্যা নিয়ে তাদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ রহ. মনে করেন যে, 'যেখানে ৪০ বা তারও বেশি ব্যক্তি বাস করে সেখানে জুমু'আ বা 'ঈদের নামায পড়া অত্যাবশ্যকীয়। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের সঙ্গে ইমাম শাফি'ঈ সম্পূর্ণ একমত।[২৩] ইমাম মালিক চল্লিশ জনের কম বাস করে এমন স্থানেও এ সকল নামায আদায় করা অত্যাবশ্যক মনে করেছেন। হানাফি আইন বিশারদ উপরোক্ত মতকে গ্রহণ করেননি। তবে মিসর আল জামি' সম্পর্কে বলেন, যেখানে আমীর (প্রশাসক) এবং কাজী বাস করেন এবং যারা ইসলামের দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আইন বলবৎ করে থাকেন। ধারাটির অংশ 'যিনি দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন বলবৎ করেন' বিষয়ে একটি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা যায় যে, উক্ত কর্তৃপক্ষ মিসর আল জামি' ছাড়া যে সকল অঞ্চলে কর্তৃত্ব করে না সেখানে শারী'আ অথবা এর কোনো অংশ বলবৎ করতে পারে না। এ মতটি ইমাম আবু হানিফার মত বলেও বলা হয়ে থাকে।

যদিও তার কাছ থেকে ভিন্ন একটি মত বর্ণনা করা হয়েছে যা তাঁর মত বলে সাধারণভাবে গৃহীত হয়ে থাকে। শেষোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা মিসর আল জামি' বলেছেন যে সকল অঞ্চলের লোকেরা সবচেয়ে বড় মসজিদের অভাবে সুবিন্যাস্তভাবে জমায়েত হতে পারে না। অন্য কথায় তিনি একটি বড় সংখ্যার লোকদের জমায়েত প্রসঙ্গে বলেছেন। তৃতীয় একটি সূত্র মতে ইমাম আবু হানিফা 'মিসর আল জামি' সে সকল অঞ্চলকেই বলেছেন যেগুলোতে রয়েছে রাস্তাঘাট, গলি, বাজার এবং যার সঙ্গে অধিক সংখ্যক গ্রাম যুক্ত। তাছাড়া যেখানে ওয়ালি বা গভর্নর বাস করেন। যিনি ন্যায় বিচারের দ্বারা অত্যাচারী থেকে অত্যাচারিতকে রক্ষা করেন। এছাড়া গভর্নরের কাছে যে কোনো বিপর্যয়ের সময় নির্ভরশীল গ্রামের

---

২৩ আব্দুর রহমান আজ জাযিরি, *কিতাব আল ফিক্হ 'আলাল মাযাহিবিল* আরবা'(বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, ২য় মুদ্রণ, ১৪২৪ হি.), খ.১, পৃ. ৩৪৭

*Dhaka University Institutional Repository*

লোকেরা যেন আসতে পারে। উপরন্তু পূর্বকালে হানাফি আইন বিশারদগণ ‘ঈদ এবং জুমু‘আর নামায অনুষ্ঠানের বিষয়ে শর্ত আরোপ করেছেন। এগুলো হলো :

(ক) স্থানটি মিসর আল জামি‘ হতে হবে;
(খ) মুসলিম শাসক অথবা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতি;
(গ) নামাযের জন্য নির্ধারিত সময়;
(ঘ) জামা‘আত অথবা জামায়েত;
(ঙ) নামাযের স্থানে সকলের প্রবেশাধিকার থাকতে হবে।[২৪]

প্রথম দু’টি শর্ত মুসলিম শাসিত দেশ ছাড়া যেহেতু পূরণ করা সম্ভব নয় সেহেতু আইন বিশারদগণ ‘দারুল হারব’ এ বসবাসরত মুসলিমদের জন্য উক্ত নামাযসমূহ আবশ্যকীয় মনে করেননি। ঊনিশ শতকের প্রথম দশকগুলোতে যখন ব্রিটিশ শক্তি পুরোপুরি সুসংহত হয়, তখন মুসলিম আইনবিদদের সিদ্ধান্ত হান্টারের মতে অনুমানের চেয়ে বাস্তব রূপে দেখা দেয়। পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ মওলবী আব্দুল হাই তাঁর ফাত্ওয়ায় বলেন যে, দিল্লী থেকে কলিকাতা পর্যন্ত খ্রিস্টান সাম্রাজ্য এবং হিন্দুস্থান সংলগ্ন অন্যান্য প্রদেশসমূহ (অর্থাৎ ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ) ‘দার আল হারব’। কুফর এবং শিরক সর্বত্র বিরাজমান এবং কোথাও ইসলামের আইনসমূহের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নেই এবং যখনই কোনো দেশে এ ধরনের পরিস্থিতি থাকে তখন দেশটি ‘দার আল হারব’। হান্টার বলেন, উক্ত মতামত বাস্তবে ফল দেয়। ওয়াহহাবীগণ যাদের ধর্মীয় আবেগ তাদের জ্ঞানের চেয়ে বেশি ছিল, তারা দেশটিকে শত্রু দেশ হিসেবে বিবেচনা করে এবং শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে।

তিনি আরও লিখেন যে, মুসলিমগণের শিক্ষিত অংশ দুঃখজনকভাবে বিষয়টি গ্রহণ করে এবং তাদের আধ্যাত্মিক জীবন সংক্ষিপ্ত করে শুক্রবারের নামায থেকে নিজেদের বিরত রাখে। এমন কি কিছু মসজিদ এ বিষয়ে অপারগতা প্রকাশ করে। বাস্তব ঘটনা হলো যে, হান্টার ফরায়েযীদের উল্লেখ করে কিছু বলেননি, তা সত্ত্বেও তার উল্লেখিত কিছু উদাহরণ উক্ত মন্তব্যের সমর্থনে পাওয়া যায়। সুতরাং কলিকাতার সবচেয়ে খ্যাতিমান দু’জন মুসলিম, তাদের নিজেদের জীবনে অর্থাৎ মাদরাসা আলীয়ার প্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ ওয়াজিহ এবং প্রাক্তন কাযিউল কুযাত ফজলুর রহমান শুক্রবারের নামায থেকে নিজেদের বিরত রাখেন। তারা ভারতকে শত্রুদেশ হিসেবে বিবেচনা করে তাদের ধর্মীয় জীবনকে সংক্ষিপ্ত করেন। কিন্তু তারা অনুগত নাগরিক হিসেবে এবং ব্রিটিশ সরকারের সম্মানিত চাকুরে হিসেবে বসবাস করেন। সুতরাং প্রথমত জুমু‘আ এবং ‘ঈদের নামায অনুষ্ঠানের অনুমতি সম্পর্কে মুসলিম শাসনের অনুপস্থিতি ও দ্বিতীয়ত: ‘দার আল হারব’ বিবেচিত হওয়ায় শিক্ষিতদের একটি অংশ জুমু‘আ থেকে বিরত থেকেছে।

২৪ আব্দুর রহমান আজ জাযিরি, *কিতাব আল ফিক্হ ‘আলাল মাযাহিবিল* আরবা‘, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫

Dhaka University Institutional Repository

যাহোক, ফরায়েযীগণ অবশ্য দেশের রাজনৈতিক মর্যাদা সম্পর্কে তেমন গুরুত্ব দেয়নি, অর্থাৎ দেশ 'দারুল হারব' না 'দারুল ইসলাম'। কিন্তু ফরায়েযীগণ স্থান সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছে অর্থাৎ স্থানটি মিসর আল জামি' কি না? এখানে মুসলিম শাসক বা তাঁর প্রতিনিধি রয়েছে কি না? ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে অনুষ্ঠিত ফরায়েযী খলিফা আব্দুল জব্বার এবং মাওলানা কেরামত আলীর বিতর্কে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। যখন তিনি ভারতের রাজনৈতিক স্থান সম্পর্কে বিতর্ক করার আহ্বান করেন তখন খলিফা এ বিষয়ে বড় ধরনের আপত্তি করেন। এর ফলে বিষয়টি আলোচ্যসূচি থেকে বাদ দেন। ফরায়েযীদের একটি ফাতওয়া জুমু'আর নামাযের সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছে। আল্লাহ্‌র নামে যিনি ক্ষমাশীল এবং মহান। বাংলার গ্রামে নবীজির সুন্নাত এবং ফিকাহ্ অনুসারে জুমু'আর নামায সঙ্গতিপূর্ণ কি না? অনুগ্রহপূর্বক ব্যাখ্যা করুন। তাদের উত্তরে ফরায়েযী উলামায়ে কিরামগণ ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের অবস্থান সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। কিন্তু উলামাগণ পূর্বের হানাফি মতানুসারে জুমু'আর নামায গ্রামসমূহে অনুমোদনযোগ্য নয় বলে মত দেন। সহীহ বুখারীর খ্যাতনামা ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনী থেকে উলামাগণ উদ্ধৃতি গ্রহণ করে ফরায়েযী ফাত্ওয়া প্রদান করেন।[২৫]

বিজ্ঞ আইনবিদগণ জুমু'আর নামাযের স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। ইমাম মালিক বলেন, যে স্থানে একটি মসজিদ বা বাজার আছে সে স্থানের লোকদের উপর জুমু'আর নামায বাধ্যতামূলক। ইমাম শাফি'ঈ এবং ইমাম আহমদ বলেন, প্রতিটি লোকালয় যেখানে রয়েছে চল্লিশজন মুক্ত মানুষের বসতি, যাদের রয়েছে সাবালকত্ব, সুস্থ মস্তিষ্ক এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যারা শীত ও গ্রীষ্মে স্থান থেকে স্থানে যায় না (শুধুমাত্র সাময়িক প্রয়োজন ব্যতিত) যাদের বসতগৃহ পাথর, বাঁশ, কাঁদা অথবা অন্যান্য যে কোনো সামগ্রী দিয়ে তৈরি এবং বাসগৃহসমূহ একসঙ্গে কাছাকাছি অবস্থিত তাদের উপর জুমু'আ বাধ্যতামূলক। কিন্তু যদি বাসগৃহসমূহ বিক্ষিপ্ত (অন্যান্য লোকালয়ে) থাকে তাহলে আইনগতভাবে তাদের উপর জুমু'আ অনুমোদনযোগ্য নয়। ইমাম আবু হানিফা রহ. মত প্রকাশ করেন যে, মিসর আল জামি' অথবা এর সন্নিহিত অঞ্চলে (মাসালা আল মিসর) জুমু'আর নামায আইন সম্মত নয় এবং জুমু'আ গ্রামসমূহে আইনানুগ নয়।[২৬]

---

২৫ "لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع، أو فى مصلى المصر ولا تجوز فى القرى لقوله عليه السلام: لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا فى مصر جامع، والمصر الجامع كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود." দ্র. বুরহান উদ্দিন আবুল হাসান আল মারগিনানি, *আল হিদায়া*(করাচি : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়্যা, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৭ হি.), খ.১, ২য় অংশ, পৃ. ১০৮

২৬ আব্দুর রহমান আজ জাযিরি, *কিতাব আল ফিক্‌হ 'আলাল মাযাহিবিল* আরবা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮

Dhaka University Institutional Repository

সনাতন সমাজে অবশ্য জুমু‘আ আদায় করা হত। যদিও দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল। হান্টার এদের সম্পর্কে লিখেছেন যে, অনেক মুসলিম ভারতে রাজনৈতিক পরাজয় মেনে নিয়ে শুক্রবারের জুমু‘আ নামায ত্যাগ করেনি।[২৭] মাওলানা কেরামত আলী ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রচার করেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন বহাল থাকা সত্ত্বেও এটা ‘দারুল ইসলাম’। কারণ এখানে জনগণের নিরাপত্তা, বেসামরিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এমন কি ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দেও তিনি ভারতকে ‘দারুল ইসলাম’ হিসেবে বিবেচনা করেন যা পূর্ব থেকেই ছিল। এ যুক্তির ভিত্তিতে তিনি ভারতের মুসলিমগণের জন্য জুমু‘আ ফরয হিসেবে মনে করেন। উপরন্তু মাওলানা কেরামত আলী যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, জুমু‘আর নামায হল ইসলামের বৃহৎ সৌধগুলোর একটি যা যে কোনো পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। একই সাথে তদানীন্তন হারানো ভারতীয় রাজ্যকে গ্রহণ না করার কোনো উপায় ছিল না। জুমু‘আ আদায়ের বিষয়ে অনুমতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যে সন্দেহ ছিল তা দূর করাও সহজ ছিল না। তিনি এ কারণে স্বাভাবিক জুমু‘আ নামাযের সঙ্গে চার রাকাত যুহরের নামায যুক্ত করার কথা বলেন। যাতে করে জুমু‘আ নামায আদায়ে যদি কোনো ঘাটতি থাকে তাহলে তা পূরণ করা যাবে।

প্রকৃত পক্ষে, শেষের প্রস্তাবটি যা জুমু‘আর সঙ্গে যুহরের নামায যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে তা মাওলানা কিরামত আলীর প্রস্তাব নয়। এটি শাহ্ আব্দুল আজিজ এর পরামর্শ ছিল। বিধর্মী শাসনামলে জুমু‘আর নামায আদায়ে বাঁধা থাকার কারণে যুহরের নামায আদায়ে একই সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে কি না, এ বিষয়ে শাহ্ আব্দুল আজিজের (১৭৪৬-১৮২৩) মতামত জানতে চাওয়া হয়। শাহ আব্দুল আজিজ উত্তর দেন যে, পূর্বের হানাফি স্কুল সুলতান এবং তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জুমু‘আ আদায়ের শর্ত আরোপ করেছিল। চেঙ্গিস খানের সময়ে হানাফি আইনবিদগণ অবশ্য মত দেন যে যদি বিধর্মী শাসক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে এবং কোনো শহরে মুসলিম গভর্নর নিয়োজিত থাকে তাহলে মুসলিম গভর্নর সুলতানের বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করে জুমু‘আ এবং ‘ঈদের নামায আদায় করতে পারবে। নতুন পরিস্থিতিতে তারা পূর্বের শর্ত প্রয়োজনানুযায়ী সহজ করেন। এটা ‘ফাতওয়া-ই-আলমগিরী’ তে বলা হয়েছে, মন্তব্য করে তিনি আরও বলেন যে, বিধর্মীদের শাসনামলে জুমু‘আ আদায় অনুমোদনযোগ্য এবং পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে মুসলিমগণ একজন কাজী নিয়োগ করতে পারে। কিন্তু তাঁদের অবশ্যই মুসলিম শাসনের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। সতর্কতা হিসেবে মুসলিমগণের জুমু‘আ নামাযের অতিরিক্ত হিসেবে চার রাকাত যুহরের নামায আদায় করা প্রয়োজন হয়ে পড়বে। ফরায়েযীগণ জুমু‘আ এবং যুহরের নামায একত্রে আদায় করার বিষয়টি গ্রহণ করতে পারেনি। এ ধরনের নিয়মের বিরুদ্ধে ফরায়েযীগণ মত প্রকাশ করেছে যা দূরর-ই-

২৭ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সল, *উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা‘ওয়াহ ও সংস্কার আন্দোলন*(কুষ্টিয়া : সেন্টার ফর ইসলামিক দা’ওয়াহ্ এন্ড কালচার, ফেব্রুয়ারী ২০১১), পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, মাযহাবের (যুহর বা আখিরী যুহর জুমু'আর সঙ্গে আদায় করা) কোনো ভিত্তি নেই। এটি পরবর্তী সময়ের কিছু ধর্মতত্ত্ববিদের আবিষ্কার মাত্র। নিজস্ব বাসগৃহে জুমু'আ আদায়ের অনুমোদনের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে ধর্মতত্ত্ববিদগণ উক্ত মত প্রদান করেন। গ্রামাঞ্চলে জুমু'আ আদায়ের সাধারণ যে ব্যবস্থা রয়েছে এ বিষয়েও ফরায়েযীগণ ভিন্নমত পোষণ করে। আরব দেশের ক্বারয়ার সঙ্গে বাংলা অঞ্চলের গ্রামসমূহে তুলনা করে ফরায়েযীগণ জুমু'আ এবং 'ঈদকে গ্রামাঞ্চলে আইন সম্মত নয় শুধু বলেনি; বরং তা মাকরূহ তাহরিমী মনে করে।

উপরোক্ত ফরায়েযী ফাত্ওয়া সম্পর্কে আহলুল হাদিসের সমালোচনার জবাবে ফরায়েযীদের মন্তব্য হলো- 'আহলুল হাদিস' নামের নতুন সম্প্রদায় যাদের কোনো নির্দিষ্ট ইমাম নেই তারা কোনো বাছ বিচার না করে সকল স্থানে জুমু'আ আদায় করছে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট করে ধারণা নেয়া যায় যে, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণের প্রদর্শিত সংস্কার মতবাদের ফরায়েযীরা অনুসারী ছিল না। অন্যদিকে তরিক-ই-মুহাম্মদিয়া, আহলুল হাদিস এবং তা'আয়্যুনি একভাবে বা অন্যভাবে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহর সংস্কার কর্মসূচীর অনুবর্তী ছিল। জুমু'আ সম্পর্কিত ফরায়েযী মতাদর্শ এ আন্দোলনের অন্যতম মূল বিষয় ছিল। মিশরের সালাফিয়া আন্দোলন বা আরবের ওয়াহাবী ঐতিহ্যের সঙ্গে ফরায়েযী সংস্কার কর্মসূচির যোগসূত্র খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর। সুতরাং ফরায়েযী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা স্থানীয়ভাবেই উৎসারিত যা সমসাময়িক ঘটনাবলি বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এ ঘটনাবলিসমূহ থেকেই ফরায়েযী মতাদর্শ বিকশিত হয়।

জুমু'আ বা 'ঈদের নামায সম্পর্কে ফরায়েযীদের প্রধান আপত্তি ছিল আমির এবং কাযীর অনুপস্থিতির বিষয়ে, যা উক্ত নামায আদায়ের বিষয়ে শর্ত ছিল। বৃটিশ পূর্ব মুসলিম প্রশাসনের কাযীকে বিচার বিভাগীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব ছাড়াও আরও বিবিধ দায়িত্ব পালন করতে হত। শারী'আহ বা ইসলামী আইনের রক্ষাকর্তা হিসেবে মুসলিম সমাজকে সাহায্য এবং তত্ত্বাবধান করা ছিল কাযীর গুরুদায়িত্ব। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও পরে বৃটিশদের দ্বারা প্রশাসনিক পরিবর্তনের ফলে কাযীদের ক্ষমতা এবং সুবিধাদি একতরফাভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, যা মুসলিম সমাজে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। জেমস্ ওয়াইজ লিখেছেন যে, বৃটিশ আধিপত্যের পূর্বে বাংলায় কাযী পদটিকে বলা হত মুসলিমগণের নেতৃস্থানীয় পদ।[২৮] নওয়াব কর্তৃক কাযী নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও দিল্লীর কাযীউল কুযাতের অধস্তন ছিল মাত্র। কাযী আইন প্রশাসন এবং মুসলিম ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা বিষয়টি তত্ত্বাবধান করতেন। এছাড়া কাযী মুসলিমগণের কাছে ধর্মের

---

২৮ 'He acted with great prudence and caution, rarely assuming any other character then that of a religious reformer.' Cf. James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal,* Ibid, p. 22

*Dhaka University Institutional Repository*

রক্ষণশীলতা বজায় এবং সকল ধর্মীয় বিতর্কের সমাধান করতেন। সারা দেশে সমভাবে ছড়িয়ে থাকা নায়েব বা সহকারীদের দ্বারা মুসলিমদের আধ্যাত্মিক জীবন পর্যবেক্ষণ করা হত এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদেরকে দমন করা হতো। 'কাযীর ক্ষমতা ছিল বেশি' এর ফলে শাসন এবং জনসাধারণকে সমভাবে কাযীকে সমীহ করতে হত। ওয়াইজ বলেন যে, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে দেওয়ানি চলে যাওয়ার পর এ ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। কাযীদের অস্তিত্ব থাকলেও ক্ষমতা ছিল না। এ কারণে অপরাধীদের কাছে কাযী কোনো ভয়ের বিষয় থাকেন না। এরা 'ক্ষমতা ছাড়াই' বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তায় পরিণত হয়। যদিও তাদের কোনো ধর্মীয় কর্তৃত্ব বা সালিশ করার কোনো ক্ষমতা ছিল না। মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় কাযী এবং তাঁর সহকারীদের গুরুত্ব সম্পর্কে হান্টার উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিমগণের অভিযোগের বিষয়ে হান্টার বলেন,

> 'আইন কর্মকর্তার চাকুরির পদ বিলুপ্ত করায় হাজার হাজার পরিবারে দরিদ্রতা ও অনটন নেমে এসেছে মর্মে এরা আমাদের অভিযুক্ত করে। স্মরণাতীতকাল থেকে বিবাহ অনুষ্ঠানে ধর্মের বিধান, প্রশাসনিক, প্রাত্যহিক জীবনে ইসলামি আইনের রক্ষক ছিল। তাদের বিশ্বাস ও কর্তব্য পালনে বাঁধাদান করা হয়েছে মর্মে এরা আমাদেরকে অভিযুক্ত করে। উপরোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা ধারণা করা যায় যে, জুমু'আ এবং 'ঈদের নামায অনুষ্ঠানে ফরায়েযী মতাদর্শ শুধু নামমাত্র আদর্শ ছিল না। বৃটিশ কর্তৃক প্রশাসনিক পরিবর্তন ছিল মুসলিম সমাজের প্রতি স্বার্থহানিকর যা মুসলমগণের অনুভূতির বিরুদ্ধে যায়।'[২৯]

ফরায়েযীগণের মতাদর্শ এর বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ ছিল। ফরায়েযীগণের মতাদর্শে আমির, কাযী এবং হাকিম সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এ মতের প্রতি সমর্থন বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন মারাঠা শক্তি মোগল ভারতকে বিপর্যস্ত করেছিল, তখন থেকেই মুসলিমগণের মনে ভারতের মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু হান্টার বলেন, মারাঠা শক্তি যখন রাজস্বের এক চতুর্থাংশ 'চৌথ' হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের সন্তুষ্ট করেছিল এবং প্রশাসনে আর হস্তক্ষেপ করছিল না, তখন ভারতকে 'দারুল ইসলাম' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। সে সময়ের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টির কথা বলেনি। বৃটিশ প্রশাসন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হান্টার স্বীকার করেন যে, বর্তমানে ভারতকে বিশ্বাসীদের ভূখণ্ড হিসেবে বিবেচনা করার মত একটি কারণও দেখান হয়নি। এ বিষয়টি খলিফা আব্দুল জব্বারের মন্তব্যে প্রতিভাত হয়েছে। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে অনুষ্ঠিত মাওলানা কেরামত আলীর বিরুদ্ধে বিতর্ক করার সময় একজন ধর্মতত্ত্ববিদ পরামর্শ দেন যে, মক্কার কোনো ফাত্ওয়াকে ভিত্তি করে মুসলিম এলাকায় ইমাম নিয়োগ দান করে যদি নামায আদায়

২৯ Sir William Wilson Hunter, *The Indian Musalmans*, Ibid, p. 148

*Dhaka University Institutional Repository*

করা হয় তাহলে তা বৈধ হবে। সেক্ষেত্রে শহরের কোতোয়ালকে উদ্দেশ্য করে খলিফা উত্তর দেন, যদি আমরা ইমাম নিয়োগ করি তাহলে আপনি আমাদের হাতে হাতকড়া পরাবেন।[৩০]

সুতরাং উক্ত মন্তব্য দ্বারা ভারতের মর্যাদা সম্পর্কিত বিতর্কে ফরায়েযীদের অংশ গ্রহণের অনীহার কারণ ধারণা করা যায়। সম্ভবত ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সংঘাত হতে পারে এ ধারণার বশবর্তী হয়েই ফরায়েযীগণ বিতর্কে অংশ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে সাপ্তাহিক নামায এবং 'ঈদের নামায পড়া স্থগিত করার মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশকে 'দারুল হারব' হিসেবে ফরায়েযীগণ বিবেচনা করেছিল। সৃষ্টিকর্তার একত্বের পরিপন্থী যে কোনো আচার এবং বিশ্বাস থেকে নিজেকে বিরত রাখা 'তাওহীদ' এর অংশ। স্বাভাবিক কারণেই হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) বহুসংখ্যক কুসংস্কার, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদি বিলুপ্ত করেন। কোনো কুফর, শিরকই তাঁর সংস্কার থেকে বাদ পড়েনি। সমসাময়িক এবং পরবর্তী উৎস থেকে বিভিন্ন কুসংস্কারের তালিকা এবং বর্ণনা পাওয়া যায় যা তিনি ফরায়েযীদের মধ্য থেকে বিলুপ্ত করেন। জেমস্ টেইলর লিখেছেন যে, ফরায়েযীগণ, পট্টি, চাট্টি এবং চিল্লা ত্যাগ করে যা একটি শিশুর জন্মদিন এবং চল্লিশদিনের সময় উদযাপিত হত। ফরায়েযীগণ শুধু আক্বিকা অনুষ্ঠান পালন করত যা ইসলামী বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। পুরুষ সন্তানের জন্য দু'টি ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল জবাই করে অনুষ্ঠান করা হত। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মীয় এবং বন্ধুদের আপ্যায়ন করা হত এবং শিশুর নাম রাখা হত। তিনি আরও লিখেন যে, ফরায়েযীগণ শিশুর মাথার চুল কামানো, বিবাহ এবং মৃত্যুর সময়ের অনুষ্ঠানকে অনাড়ম্বর করে। সকল অনৈসলামি রীতিনীতি যেমন বিবাহের সময়ের মিছিল (শাবগাশত) এবং দাফনের সময়ের বিভিন্ন 'ফাতিহা' অনুষ্ঠান ত্যাগ করা হয়।[৩১]

পরিশেষে বলা যায় যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফরায়েযী আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু হয় ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে নিজস্ব অঞ্চলের পরিমণ্ডলে এবং পরবর্তীতে এটা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ লাভ করে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

৩০ মাওলানা কেরামত আলী, *হুজ্জাত ই ক্বাতি*(কলিকাতা : মাকতাবাতে জৌনপুর, ১৩৪৪ হি.), পৃ. ১০৪

৩১ James Taylor, *A sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, Ibid, p. 249-250; 'ছট্টি হলো শুদ্ধভাবে 'ছটি', 'চিল্লা' হলো 'আশুচিঘর' এবং 'ফাতিহা' হলো পূর্ব পুরুষদের স্মৃতি স্মরণ করার অনুষ্ঠান। দ্র. James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal,* Ibid, p. 50-52

*Dhaka University Institutional Repository*

# ৪.২ ফরায়েযীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন

## ৪.২.১ ফরায়েযী আন্দোলনের ভৌগোলিক এলাকা

ফরায়েযী প্রভাবান্বিত এলাকা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজনীয় উপাত্তের অভাবে কষ্টকর হয়েছে। এ সকল উপাত্ত যথেষ্ট না হলেও ফরায়েযী অনুসারীদের সংখ্যা বা এর পরিধি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে জামালপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট রুবকারিতে ফরায়েযী আন্দোলনের প্রাথমিক কাজ উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩২] এতে দেখা যায় যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এ সময়ে ঢাকা জেলার রামনগর গ্রামের কৃষকদের কাছে তাঁর মতাদর্শ প্রচার করেছেন। এ গ্রামটির বর্তমান নাম চারিগ্রাম এবং এটা নয়া বাড়ির সন্নিকটে অবস্থিত। স্থানীয় মুসলিম এবং হিন্দু জমিদারগণের সঙ্গে তাঁর বিরোধের ফলে তাকে গ্রাম থেকে বহিষ্কার করা হয়। এতে ধারণা করা যায় যে এ সময়ে তাঁর যথেষ্ট সংখ্যক অনুসারী ছিল না। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে একজন হিন্দু ভদ্রলোক স্থানীয় পত্রিকা 'দর্পন' এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন যে, 'হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর ১২০০০ তাঁতি এবং মুসলিম অনুসারী রয়েছে, এরা ফরিদপুর জেলার অধিবাসী।'[৩৩] হাজী এ এলাকার সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হন। একই প্রতিবেদনে কিছু ঘটনা প্রমাণ করে যে, হিন্দু জমিদারগণ তাদের বিরুদ্ধে শক্তিতে পেরে উঠেনি। আইন-আদালত বা দৈহিক শক্তি কোনোটাতেই জমিদারগণ পেরে উঠছিল না। প্রতিবেদক আরও লিখেন যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তাঁর পূর্বসূরি তিতুমীর থেকে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেন এবং ফরিদপুর আদালতের উকিল এবং কেরানীদের উপর তাঁর ব্যাপক প্রভাব ছিল।[৩৪] এ সময়ে তাঁর কার্যকলাপের কেন্দ্র ছিল শিবচর থানার বাহাদুরপুর গ্রাম। এখানে পরবর্তী সময়ে দুদু মিয়া বসতি স্থাপন করেন।

হাজী শরী'অতুল্লাহর (রহ) সমসাময়িক দার্শনিক বলেন যে, ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ফরায়েযী আন্দোলন ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ এবং ময়মনসিংহ জেলাগুলোতে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল পুলিশের প্রধান দুদু মিয়াকে ৮০,০০০ লোকের নেতা হিসেবে রিপোর্টে উল্লেখ করেন।[৩৫] ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে 'কলকাতা রিভিউ'র সম্পাদক ফরায়েযীদেরকে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সম্প্রদায় হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, ফরায়েযীদের সংখ্যা ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জ জেলায় যথেষ্ট ছিল। দুদু মিয়ার সমসাময়িক জে. ই. গ্যাসট্রেল মনে করেন যে, ফরিদপুর জেলার অধিকাংশ মুসলিম ছিল ফরায়েযী

---

৩২ Board of Editors, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*(Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1961), p. 123-124

৩৩ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনুঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

৩৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*(কলিকাতা : ১৩৪২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩১১-৩১২

৩৫ James Taylor, *A Skectch of the Topography and Statistics of Dacca,* Ibid, pp. 228-250

*Dhaka University Institutional Repository*

এবং ঢাকা, বাকেরগঞ্জ এবং যশোর জেলার আরও জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ফরায়েযী। তিনি আরও লিখেন যে, ১৮৬২ সাল পর্যন্ত সময় ফরায়েযীদের সংখ্যা ধীর গতিতে বৃদ্ধি পায়।[৩৬] পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি পাওয়া যায় নবীন চন্দ্র সেনের আত্মজীবনী থেকে। তিনি ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মাদারিপুরের মহকুমা প্রশাসক ছিলেন। তাঁর মতে ফরায়েযী আন্দোলন ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জ শহরে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। তাছাড়া এ শহরগুলোর সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলেও এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।[৩৭] উল্লেখ্য যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর জীবদ্দশাতেই ত্রিপুরা জেলায় ফরায়েযী আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল। আদমশুমারি রিপোর্টে ফরায়েযীগণ নিজেদেরকে আলাদা সম্প্রদায় হিসেবে তালিকাভুক্ত না করায় তাদের সংখ্যা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে হান্টার বলেন, ফরায়েযীদের সংস্কারধর্মী মতাদর্শ বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। তাদের অধিকাংশই কৃষিতে নিয়োজিত থাকলেও অনেকেই ধান, পাট, চামড়া এবং তামাক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। তিনি নোয়াখালী জেলার মুসলিমগণকে সুন্নী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে বর্ণনা করেন এবং তাদের অধিকাংশই ছিল ফরায়েযী। গেজেটিয়ারে নদীয়া জেলার মুসলিমগণকে একইভাবে ওয়াহাবী বা ফরায়েযী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে আন্দোলন উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলায় বেশ প্রভাব বিস্তার লাভ করে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয় যে, এ জেলায় ফরায়েযী আন্দোলন প্রসার লাভ করেছে এবং পূর্ববঙ্গে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আসামের স্টাটিসটিক্যাল একাউন্টে হান্টার উল্লেখ করেছেন যে, সিলেট, গোয়ালাপাড়া, লক্ষ্মীপুর, শিবচর, দারাং এবং কামরূপ জেলার মুসলিমগণের মধ্যে অনেক ফরায়েযী ছিল। ফরায়েযীগণ সম্প্রদায় হিসেবে স্বচ্ছল ছিল।[৩৮]

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে যশোর, ফরিদপুর এবং বাকরগঞ্জের জরিপের দায়িত্ব প্রাপ্ত জে. ই. গ্যাসট্রেল বলেন যে, ফরায়েযী আন্দোলনের রয়েছে নদী ভিত্তিক চরিত্র। তিনি দেখেন যে, মধুমতি, নবগঙ্গা, বারাকুর এবং হরিণঘাটা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ফরায়েযীদের সংখ্যা ছিল বেশি। প্রকৃতপক্ষে এ নদীগুলোর তীরবর্তী অঞ্চল ছিল তাদের দখলে। এ গ্রন্থের লেখক কর্তৃক পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ভুবনেশ্বর-আঁড়িয়াল খাঁ অববাহিকা ছিল ফরায়েযী মিশনারিদের গতিপথ। এরা এ পথে আসা-যাওয়া করে ফরায়েযী মতাদর্শ প্রচার করত। ফরায়েযী বসতিসমূহে মাঠ পর্যায়ের বসতি স্থাপন করা হয়, যেখানে ফরায়েযী পরিবারসমূহ উক্ত তথ্য সরবরাহ করে। পদ্মা নদীর শাখা

৩৬ Col. J. E. Gastrel, *Geographical and Statistical Report of the District of Jessore, Faridpore and Bakerganj*(London : Trubner & Co., Ludgate Hill, 1876), p. 36

৩৭ মওলবী কেরামত আলী, *ইশতিহার যাখিরা-ই-কারামত*(কলিকাতা : মাকতাবাতে জৌনপুর, ১৩৪৪ হি.), খ.১, পৃ. ১০৮; মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৩৮ W. W. Hunter, *Statistical Account of Assam*(London : 1879), Vol. 1, pp. 39, 188, 245,Vol. 2, pp. 47, 283

*Dhaka University Institutional Repository*

ভূরনেশ্বর উত্তর এবং পূর্ব দিকের জেলাসমূহের সঙ্গে সহজেই যোগসূত্র স্থাপন করে। ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা এবং পাবনা জেলাসমূহ পদ্মা, যমুনা এবং মেঘনা নদীর মাধ্যমে যোগসূত্র স্থাপন করে। অন্যদিকে আঁড়িয়াল খাঁ নদী পদ্মায় পতিত হয়ে দক্ষিণ দিকে গিয়ে সাগরে মিলিত হয়। বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চল চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালির সঙ্গে এদের মাধ্যমে প্রবেশ করা সহজ। উপরন্তু গ্যাসট্রেল বলেন যে, হরিণঘাটা এবং মধুমতির মাধ্যমে ফরায়েযীগণ পশ্চিমাংশের সঙ্গে যশোর এবং খুলনা জেলার পূর্বাংশের যোগসূত্র স্থাপন করে। স্বাভাবিক কারণেই ফরায়েযী আন্দোলন নদী বিধৌত এ জেলাগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। এ সূত্রে, এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বর্ষাকালে ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, ঢাকা, ত্রিপুরা, পাবনা এবং নোয়াখালির অধিকাংশ এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়। এ সময় ছোট নৌকায় সহজেই চলাচল করা সম্ভব হত।[৩৯]

ফরায়েযী নেতাদের পারিবারিক তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.), দুদু মিয়া এবং খান বাহাদুর সাঈদ উদ্দীন সবসময় নৌকায় চলাচল করতেন। দেশের নদীমাতৃক চরিত্রের কারণে মাওলানা কেরামত আলী এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণও একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রচার কার্য চালানোর জন্য নৌকাকে অগ্রাধিকার দিতেন। ফরায়েযী আন্দোল প্রসারে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। সেটা হলো যে, সামগ্রিকভাবে এ আন্দোলন প্রসার লাভ করে। যেখানেই আন্দোলন কাজ করেছে সেখানেই তা ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমা (বর্তমানে জেলা), ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর (বর্তমানে জেলা) মহকুমা এবং ঢাকা জেলার রেকাবি বাজার গ্রামের কথা বলা যায়। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের বাইরে ফরায়েযী আন্দোলন প্রসারে তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আসাম, আগরতলা রাজ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কয়জন ফরায়েযীদের সন্ধান পাওয়া যায় তারা মূলত ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা জেলা থেকে আগত মুসলিমগণের দ্বারা প্রভাবিত। পশ্চিমবঙ্গে এমন ধরনের হিজরত না ঘটায় ফরায়েযী আন্দোলন ওখানে একেবারেই প্রসার লাভ করেনি।[৪০]

বাংলায় ব্রিটিশদের দ্বারা যে সকল প্রশাসনিক পরিবর্তন আনা হয় তাতে নগর ও গ্রামীণ মুসলিম সমাজ কোনো না কোনো প্রকারে প্রভাবান্বিত হয়। যেমন নগর কেন্দ্রিক মুসলিমগণ সরকারি চাকুরি, ব্যবসা, বাণিজ্য ও অন্যান্য পেশায় নিয়ন্ত্রণ হারায়। অপর দিকে গ্রামীণ মুসলিমগণ ইউরোপীয় নীলকর এবং হিন্দু জমিদারগণ দ্বারা নির্যাতিত হয়। সুতরাং রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে প্রথমোক্ত শ্রেণি এবং গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসায় শেষোক্ত শ্রেণি দুর্ভোগে পতিত হয়। ফরায়েযী মতাদর্শের সঙ্গে হিন্দু জমিদার

৩৯ J.C. Jack, *Final Report on the Survey and Setelment Operations in the Faridpore District, 1904-1914*(Calcutta : 1816), p. 6

৪০ L.S.S.O Malley, *Bengal District Gezetter Faridpore*(Calcutta : 1925), p. 36

*Dhaka University Institutional Repository*

ও ইউরোপীয় নীলকরদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংঘাত ছিল বলে ঢাকা, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম শহরের মুসলিমগণের উপর ফরায়েযীগণ তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু পূর্ববঙ্গের যেসব স্থানে এ ধরনের সমস্যা বিশেষ করে হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার ছিল, সেসব স্থানে ফরায়েযী আন্দোলন সাধারণ মানুষের আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সুতরাং এ আন্দোলন গ্রামীণ বাংলার নিম্নবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বেশি জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া যে সকল স্থানে হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার ছিল সেসব স্থানে এ আন্দোলন অনন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ফরায়েযী আন্দোলনের বিকাশ একটা সুনির্দিষ্ট ধারায় বিকশিত হয়। প্রথমত ফরায়েযী নেতারা স্থানীয় শহর বা গ্রামে কিছু প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে।

তিনি ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুরে, ঢাকা জেলার নয়াবাড়ি ও রেকাবি বাজারে এবং ফরিদপুরের কমলাপুরে এ ধরনের কেন্দ্র স্থাপন করেন। সাধারণত স্থানীয় ফরায়েযীগণ এসব কেন্দ্রে একটি বিশ্রামাগার তৈরি ও সংরক্ষণ করত, যা আস্তানা হিসেবে পরিচিত ছিল। এ আস্তানায় ফরায়েযী নেতাগণ আরাম করতেন এবং দূর-দূরান্ত থেকে আগত ফরায়েযীগণ অবস্থান করত। ফরায়েযী নেতাগণ এ সকল স্থান কিছুদিন পরপর সফর করতেন এবং দূর-দূরান্তের লোকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতেন। এ সকল আস্তানায় হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর আগমনে বহুলোকের সমাগম হত। কারণ তাঁর নাম ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এরা ‘প্রচার কেন্দ্রের’ অনুকরণে তাদের নিজ গ্রামে আস্তানা তৈরি করে প্রভাবশালী ফরায়েযীকে নেতা নির্বাচিত করত। পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে দুদু মিয়ার সময়ে এ ধরনের নেতাদেরকে ‘গাঁও খলিফা’ হিসেবে নির্বাচিত করা হত। উদাহরণস্বরূপ লাকসামের সন্নিকটে অবস্থিত সিঙ্গারদা গ্রামের জনৈক আজিমউদ্দীন খন্দকার চাঁদপুরে হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফরায়েযী মতাদর্শে দীক্ষিত হন। গ্রামে ফিরে এসে আজিমউদ্দীন ফরায়েযী মতাদর্শ প্রচারে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই ফরায়েযীদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, ত্রিপুরা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থানীয় নেতা নিয়োগের জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এজন্য হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) আজিম উদ্দীনকে খলিফা নিয়োগ করেন। আর ত্রিপুরা সদর মহকুমায় ফরায়েযী অনুসারীদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, দুদু মিয়ার সময়কালে এখানে আরও পাঁচজন খলিফা এবং একজন তত্ত্বাবধায়ক খলিফা নিয়োগ করতে হয়েছিল।[৪১]

দুদু মিয়ার জীবদ্দশায় ফরায়েযী মতার্দশের প্রচার গতিশীল হয়। হিন্দু জমিদারগণের বিরুদ্ধে চমকপ্রদ সাফল্য, ইংরেজ কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার এবং তাঁর অপূর্ব সাংগঠনিক শক্তি সাধারণ

৪১ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

*Dhaka University Institutional Repository*

মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। গ্রামে গ্রামে ব্যাপক সফর তাকে গ্রামবাসীদের অতি নিকটে নিয়ে যায়। তাঁর দলে যোগ দেয়ার বিষয়ে কেউ দ্বিধা করেনি। এর ফলে ফরায়েযী আন্দোলনের ঢেউ পূর্ব বাংলায় প্রবাহিত হয়। দুদু মিয়ার মৃত্যুবরণ করার পর এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। মাওলানা কেরামত আলীর প্রচারের ফলে ফরায়েযীদের সাফল্যে ভাটা পড়েছিল। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ফরায়েযী প্রচারকগণ সনাতন মুসলিম সমাজকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, ইসলামের নামে সমাজ কুসংস্কার এবং বিভিন্ন অনাচারে ডুবে আছে। কিন্তু ফরায়েযীগণ তাদের শুদ্ধিবাদী ইসলাম প্রচারের সঙ্গে জুমু'আ এবং 'ঈদের নামায অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছিল যা 'রেওয়াযি' মুসলিম সমাজ মেনে নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।[৪২]

জনসাধারণের মনে এর আকর্ষণ এবং প্রত্যাখানের বিষয়টি সম্ভবত মুসলিম সমাজে নতুন একটি বিরোধ তৈরি করে যা মাওলানা কেরামত আলীর সংস্কার গ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এর ফলে মাওলানার অধিকার সহজ সংস্কারসমূহ সাধারণভাবে জনগণ গ্রহণ করে। সুতরাং ঊনিশ শতকের শেষার্ধে অন্যান্য ধর্মীয় সংস্কারপন্থী দলসমূহ তাইউনী, তরীকা-ই-মোহাম্মদীয়া এবং আহলুল হাদিস জুমু'আ এবং 'ঈদের নামায অনুষ্ঠান করাকে সমর্থন করায় পূর্ববঙ্গে ফরায়েযীদের সংখ্যা হ্রাস পায়। কিন্তু ঢাকা, ত্রিপুরা, ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জে ফরায়েযীদের প্রাধান্য অব্যাহত থাকে। এ জেলাগুলোতে ফরায়েযীদের শক্তিশালী প্রচার কেন্দ্র ছিল। এমনকি উক্ত নামাযের বিরুদ্ধে এ জেলাগুলোতেও মুসলিম সমাজ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। ফরায়েযীগণ বে-জুমু'আওয়ালা এবং অন্যায় জুমু'আওয়ালা হিসেবে পরিচিত ছিল। সকল তথ্যাদি দ্বারা ধারণা করা যায় যে, ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়ার মৃত্যুর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রথমোক্ত দল থেকে শেষোক্ত দলে যোগ দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। বর্তমান সময়ে ফরায়েযীদের সংখ্যা বেশি দেখা যায় শুধুমাত্র ঢাকা বিভাগের নারায়নগঞ্জ এবং মুন্সিগঞ্জ জেলায় এবং ত্রিপুরা কুমিল্লা ও চাঁদপুর অঞ্চলে। সুতরাং দুদু মিয়ার সময়কালে ফরায়েযী আন্দোলনের হঠাৎ করে প্রসার লাভ করেছিল মূলত তাঁর নেতৃত্বের জন্য যা মুসলিম জনসাধারণের আকাঙ্খিত ছিল।

## ৪.২.২ ফরায়েযীদের সামাজিক সংগঠন

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) শুদ্ধ ধর্মীয় নীতিসমূহের উপর তাঁর সংস্কার পরিকল্পনার ভিত্তি প্রস্তুত করেন। তাঁর পুত্র দুদু মিয়া অনুসৃত সাংগঠনিক নীতিসমূহ গঠন করেন। ফরায়েযীগণ বাংলার বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমগণের ন্যায় 'হানাফি' মতাদর্শের অনুযায়ী ছিল। তা সত্ত্বেও ফরায়েযীগণ তাদের আন্দোলনে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে, যা তাদেরকে আলাদা হিসেবে চিহ্নিত করে। স্বাভাবিকভাবেই আলাদা মতাদর্শের

---

৪২ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে ফরায়েযীগণ একটি শিবিরে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়।[৪৩] প্রাথমিক পর্যায়ে নয়া বাড়িতে যখন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তাঁর মতাদর্শ প্রচার করছিলেন তখন থেকেই ফরায়েযী অনুসারীদের মাঝে একতাবোধের পরিচয় পেয়ে হিন্দু জমিদারগণ শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে তাঁর স্থান থেকে বহিষ্কার করে।

ঢাকার রেকাবী বাজারে বাসরত ফরায়েযীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী জানা যায় যে, তিনি এখানে স্থানীয় পঞ্চায়েত সংগঠিত করেন। কিন্তু তিনি ফরায়েযীদেরকে একসূত্রে সংগঠিত করার কোনো প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন কিনা তা জানা যায় না। দুদু মিয়া প্রথম এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁর উচ্চ পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি ফরায়েযীদেরকে একটি শক্তিশালী সংগঠনে আবদ্ধ করেন। সাংগঠনিকবাদ সোপান বা রূপান্তরের মাধ্যমে ফরায়েযীদেরকে কেন্দ্রিয়ভাবে সংগঠিত করা হয়। সুতরাং ফরায়েযীদেরকে সংগঠিত করে একটি সমাজে রূপদান করার কৃতিত্ব হলো দুদু মিয়ার। ফরায়েযী সমাজ সংগঠিত করার বিষয়ে দুদু মিয়ার দু'টি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। যথা :

**(১)** ইউরোপীয় নীলকর এবং হিন্দু জমিদার থেকে ফরায়েযী কৃষক সমাজকে রক্ষা করা;
**(২)** সাধারণ মুসলিমের জন্য সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা।

প্রথম উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার জন্য দুদু মিয়া একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলেন। এ বাহিনীকে তিনি লাঠিখেলা শেখানোর মাধ্যমে লাঠিয়াল হিসেবে গড়ে তোলেন, যাতে তারা লাঠিযুদ্ধে অংশ নিতে পারে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি সনাতনী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ফরায়েযী নেতৃত্বের মাধ্যমে গড়ে তোলেন। ফরায়েযীদের প্রথমোক্ত অংশটিকে বলা হতো রাজনৈতিক অংশ (সিয়াসী) এবং শেষোক্ত অংশটিকে বলা হতো 'দ্বীনি' বা ধর্মীয় অংশ। দু'টি অংশকেই নিয়ন্ত্রণ করা হতো ফরায়েযী খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে। এভাবে পূর্ববাংলার সকল ফরায়েযীদেরকে দুদু মিয়ার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে এবং তত্ত্বাবধানে আনা হয়।

## ৪.২.৩ সিয়াসি বা রাজনৈতিক অংশ

হিন্দু জমিদার এবং ফরায়েযী কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলশ্রুতিতে এ রাজনৈতিক শাখার সৃষ্টি হয়। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ফরায়েযী কৃষকদের উপর ধার্যকৃত পৌত্তলিক করসমূহের বিরোধিতা করেছেন। পরবর্তী সময়ে হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ

৪৩ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

*Dhaka University Institutional Repository*

পর্যন্ত সময়ে জমিদারগণ কম করে হলেও ২৩ ধরনের অবৈধ কর ধার্য করে, [৪৪] যা সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত করের অতিরিক্ত ছিল। এ অবৈধ কর আদায়ের ক্ষেত্রে জমিদারদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) লাঠিয়ালদের সংগঠিত করার নিমিত্তে জালাল উদ্দিন মোল্লাকে নিয়োজিত করেন। জেমস ওয়াইজ বলেন যে, দুদু মিয়া জমিদারগণ কর্তৃক 'অবৈধ কর' আরোপের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন।[৪৫] বিশেষ করে অবৈধ পৌত্তলিক করের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন দৃঢ় চেতা। ওয়াইজ মনে করেন যে, এ ধরনের করারোপ ছিল সহ্যসীমার বাইরের একটি নির্যাতন। এ ধরনের পদক্ষেপের বাইরে হিন্দু দেবী দূর্গাকে সাজানোর অর্থ আদায় করা হত।

হিন্দু জমিদারের এমন সকল কর্মকাণ্ডে এ অর্থ ব্যয় করা হত, যা পৌত্তলিকতার সঙ্গে জড়িত ছিল। এ সকল করারোপ জনগণের সঙ্গে এবং প্রাচীন আচারের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অজুহাতে অব্যাহত রাখা হয়। সুরতাং আর্থ-সামাজিক কারণে দুদু মিয়ার সঙ্গে জমিদারদের বিরোধিতার সূত্রপাত ঘটে। ফরায়েযীগণকে একত্রে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে দুদু মিয়া এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখেন। দুদু মিয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর তিনি ফরিদপুর জেলার (তৎকালীন মাদারিপুর মহকুমাসহ) বিভিন্ন অংশে বেশ কয়েকজন 'সিয়াসী খলিফা' (রাজনৈতিক প্রতিনিধি) নিয়োগ করেন। মাদারিপুরের জমিদারগণ ফরায়েযীদের প্রতি বিশেষভাবে বৈরীভাবাপন্ন ছিল। সিয়াসী খলিফাদের দায়িত্ব ছিল লাঠিযুদ্ধের জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া খলিফাদের অপর দায়িত্ব ছিল এলাকার প্রতিটি নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব সম্পর্কে দুদু মিয়াকে অবহিত করা। পরবর্তী সময়ে যখন দ্বীনি বা ধর্মীয় অংশটি কেন্দ্রিয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগঠিত করা হয় তখন রাজনৈতিক অংশটিকে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়, যা ছিল নিম্নরূপ :

- উস্তাদ (সর্বোচ্চ পদ)
- উপরস্থ খলিফা (পরবর্তী উচ্চতর প্রতিনিধি)
- তত্ত্বাবধায়ক খলিফা (তত্ত্বাবধায়ক)

## ৪.২.৪ গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিট খলিফাদের কার্যাবলি

শহরের জন্য পূর্ববঙ্গের ফরায়েযী বসতিসমূহকে ছোট ছোট ফরায়েযী ইউনিটে ভাগ করা হয়। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী ২০০ থেকে ৫০০ ফরায়েযী পরিবার নিয়ে একটা ইউনিট গঠিত ছিল। প্রতিটি ইউনিটের খলিফা হিসেবে একজন বিশিষ্ট ফরায়েযীকে দায়িত্ব দেয়া হত। দশ অথবা এর বেশি গ্রাম নিয়ে একটি

৪৪ '১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর কালেক্টরেটের রেকর্ডরুম থেকে সংগৃহীত। ফরিদপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতিক্রমে চিঠি নং ১৬৯ তারিখ ১৬ মে ১৮৭২, ফাইল নং ১৮৭২-১৮৭৩, ফরিদপুর কালেক্টরেট রেকর্ডস।' দ্র. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

৪৫ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

*Dhaka University Institutional Repository*

সার্কেল গঠিত হতো যা গির্দ (Gird) হিসেবে পরিচিত ছিল। এটা একজন তত্ত্বাবধায়ক খলিফার দায়িত্বে থাকত। ইউনিট খলিফাগণ তাঁর অধস্তন হিসেবে কাজ করত। তত্ত্বাবধায়ক খলিফাকে একজন 'পিয়াদা' ও একজন 'পিয়ন' রাখতে হত। তত্ত্বাবধায়ক খলিফার আদেশকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব ছিল পেয়াদার উপর।[৪৬] পিয়নকে খবর নিয়ে সার্কেল প্রধানের কাছে এবং বাহাদুরপুরে অবস্থানরত উস্তাদের কাছে আসা যাওয়া করতে হত। 'উস্তাদ' এর উপদেষ্টা হিসেবে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হয় যাদেরকে বলা হয় উপরস্থ বা সুপিরিয়র খলিফা। উদাহরণস্বরূপ নয়া মিয়ার অভিভাবকগণের কথা বলা যায়। তাদের ছিল বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড। ঐগুলোর মধ্যে ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উস্তাদকে উপদেশ দেয়া, ফরায়েযী সম্প্রদায়কে পরিচালনা করা, ফরায়েযী মতাদর্শ প্রচার করা এবং ফরায়েযী আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া। এদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে বিশেষ কোনো মহকুমা বা জেলার দায়িত্ব দেয়া হয়। তবে উপদেষ্টাগণ ফরায়েযী সম্প্রদায়ের কাছে উস্তাদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রধানত কাজ করতেন। ইউনিটে বসবাসকারী ফরায়েযীদের সঠিক কল্যাণের দায়িত্বে ছিল ইউনিট খলিফাগণ। ইউনিট খলিফার কার্যক্রম ছিল বহুবিধ।

**প্রথমত:** তিনি তাদেরকে কালিমা বা বিশ্বাসের প্রাথমিক সূত্র শিক্ষা দিতেন।

**দ্বিতীয়ত:** ফরজ বা ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ, যেমন দৈনিক নামায, রমযানের রোযা এবং যাকাত ও ফিতরা আদায় ইত্যাদি পালনে ইউনিট খলিফাগণ নজরদারি করতেন।

**তৃতীয়ত:** যে স্থানে মসজিদ ছিল না সে স্থানে তাকে ইবাদতখানা নির্মাণ করে জামা'আতে নামায আদায়ের লক্ষ্যে ইমাম নিয়োগ করতে হত।

**চতুর্থত:** তিনি সম্প্রদায়ের সামাজিক এবং ধর্মীয় নৈতিকতা নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে ন্যায় বিচার কায়েম করতেন।

**পঞ্চমত:** তিনি কোনো ব্যক্তির বিবাহ বা মৃত্যুর সময় ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতেন এবং সে সাথে মৃত্যুপথ যাত্রীকে তাওবা করাতেন। মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে ইউনিট খলিফা ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার জন্য মক্তব পরিচালনা করতেন। উক্ত কর্তব্যসমূহ পালনের জন্য তিনি ইউনিটের এলাকাধীন জমি থেকে সম্মানী হিসেবে 'ঊশর' গ্রহণ করতেন। এ সম্মানীর হার অবশ্য যাকাতের মতই ছিল। ইউনিট খলিফাদের কার্যক্রম ছিল সম্পূর্ণ ধর্মীয়, যা বর্তমানেও চলছে। নিজেরা রাজনীতিতে জড়াতেন না। অবশ্য তাঁর ইউনিটের সকল রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর খোঁজ রাখতে হত এবং তত্ত্বাবধায়ক খলিফার নিকট রিপোর্ট পেশ করতে হত। বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার গৃহস্থালি বিতর্ক অথবা ঝগড়া বিবাদ, জমি অথবা অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কিত বিবাদের মীমাংসা করার জন্য ইউনিট খলিফাকে ক্ষমতা প্রদান করা হত। তিনি এ সকল বিষয় বয়োজ্যেষ্ঠদের সাহায্যে সমাধান করতেন।

---

৪৬ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

*Dhaka University Institutional Repository*

## ৪.২.৫ তত্ত্বাবধায়ক খলিফার কার্যাবলি

তত্ত্বাবধায়ক খলিফার কার্যাবলি কোনোভাবেই সহজসাধ্য বলা যায় না। তাঁর কাজে সার্কেল বা গির্দ এর রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় দায়িত্ব অর্পিত ছিল।

**প্রথমত:** তাঁকে ইউনিট খলিফাদের কার্যাবলি নিষ্ঠার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে হত। তাদের পদক্ষেপসমূহের নির্দেশনা এবং সীমা অতিক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করতে হত। গির্দ এর কোনো বাসিন্দা ইউনিট খলিফাদের বিরুদ্ধে কোনো নির্যাতন বা ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ করতে পারত এবং তত্ত্বাবধায়ক খলিফার কাছে বিচার চাইতে পারত।

**দ্বিতীয়ত:** তত্ত্বাবধায়ক খলিফা ছিলেন আপিল কোর্টের মত। ইউনিট খলিফার সিদ্ধান্তে কেউ অসন্তুষ্ট হলে সে তত্ত্বাবধায়ক খলিফার কাছে আশ্রয় বা আপিল করতে পারত।[৪৭] এ ধরনের আপিলকে তত্ত্বাবধায়ক খলিফা তাঁর নিয়ন্ত্রণের সকল ইউনিট খলিফাদের উপস্থিতিতে পুনরায় বিচার করতেন।

**তৃতীয়ত:** তিনি গির্দে বসবাসরত সকল ফরায়েযীদের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। এছাড়া তাকে বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত পরিদর্শন করে ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ প্রচার করতে হত। তত্ত্বাবধায়ক খলিফাকে একটি 'আস্তানা' ধর্মীয় ক্লাব পরিচালনা করতে হত, যাতে করে এখানে সম্প্রদায়ের নামায, জনসভা, ধর্মীয় সম্মেলন এবং সম্প্রদায়ের অন্যান্য কার্যাবলি অনুষ্ঠিত হতে পারে। যখন উস্তাদ বা অন্যকোন সম্মানিত অতিথি গির্দ পরিদর্শনে আসতেন তখন আস্তানাটি বিশ্রামাগার হিসেবে ব্যবহৃত হত। উপরন্তু ফরায়েযীগণ সুফিবাদের কাদেরিয়া মতাদর্শ অনুসরণ করত। এক্ষেত্রে প্রতি বুধবার রাতে আস্তানায় হালকা যিকির অনুষ্ঠিত হত।

**চতুর্থত:** তত্ত্বাবধায়ক খলিফাকে গির্দের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে খবরাখবর নিতে হত। অবশ্য যদি তিনি শুধু ধর্মীয় কার্যক্রমে নিজেকে রাখতে চাইতেন তাহলে একজন 'সিয়াসী খলিফা' (রাজনৈতিক প্রতিনিধি) সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য নিয়োগ করা হত। পিয়াদা এবং পিয়নের সহযোগিতায় তিনি 'উস্তাদ' এর কাছে এলাকার প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাতেন।

**পঞ্চমত:** তিনি প্রতি বছরে 'গির্দ' এর প্রতিটি স্থান পরিদর্শন করতেন, যাতে করে প্রতিটি ফরায়েযী ধর্মীয় মৌলিক বিষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখতে পারে। শেষ বিষয় হিসেবে ফরিদপুরের তত্ত্বাবধায়ক খলিফাকে লাঠিয়ালদের একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠিত করতে হত এবং তাদেরকে প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থা

৪৭ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

রাখতে হত। ফরিদপুর জেলায় এ বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হত। কারণ এখানে ফরায়েযী আন্দোলনের বিরুদ্ধে জমিদার ও জমিদারের গোমস্তাগণ শত্রুভাবাপন্ন ছিল।

### ৪.২.৬ সমন্বয়কারী টিম

ইউনিট খলিফা এবং তত্ত্বাবধায়ক খলিফার সকল যোগাযোগ কার্যবিবরণী খাতায় রক্ষিত হত। যখন উস্তাদ অথবা উপরস্থ খলিফা গির্দ পরিদর্শনে আসতেন তখন কার্যবিবরণী তাদের কাছে উপস্থাপন করা হত। যদি কার্যবিবরণী অনুমোদন করতেন তাহলে তিনি তাতে তাঁর সিল ও স্বাক্ষর দিতেন। যদি তিনি অনুমোদন না করতেন তাহলে তা আরও পরীক্ষা করার জন্য বাহাদুরপুর প্রেরণ করতেন।[৪৮] সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইউনিট খলিফাগণ উস্তাদের হস্তক্ষেপ আগ্রহ ভরে কামনা করত। সকল ধর্মীয় এবং পার্থিব বিষয়ে উস্তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে ধরা হত। এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই মানতে হত। যদি কোনো তত্ত্বাবধায়ক খলিফার সিদ্ধান্তে কেউ অসন্তুষ্ট হত, তাহলে সে উস্তাদদের কাছে আপিল করতে পারত। এ ধরনের আপিল হলে উস্তাদ নির্দিষ্ট দিনে শুনানির জন্য বাহাদুরপুরে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাধায়ক খলিফা এবং অন্য পক্ষকে ডেকে পাঠাতেন। জটিল মামলায় একজন উপরস্থ খলিফা ঘটনা স্থলে গিয়ে আপিল গ্রহণ করতেন এবং উস্তাদের দূত হিসেবে রায় প্রদান করতেন। যদি কেউ সরকারি আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য সাহস প্রদর্শন করত, তাহলে আদালতের রায়কে ক্ষমতাধর খলিফাগণ প্রতিরোধ করত। বিশেষ করে এ রায় যদি ফরায়েযী কোনো ব্যক্তির স্বার্থ বিরোধী হত।

### ৪.২.৭ খিলাফত প্রতিষ্ঠায় বাঁধা

ফরায়েযী খিলাফত ব্যবস্থার পূর্বোক্ত রূপরেখা অংশত ফরায়েযী খলিফাদের পারিবারিক রেকর্ড এবং বর্তমান ফরায়েযী সমাজকে পর্যবেক্ষণ করে গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিবরণ সমসাময়িক লেখক, বিশেষ করে জেমস ওয়াইজ, নবীন চন্দ্র সেন, মাওলানা কেরামত আলী এবং এইচ. বেভারিজের লেখা দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। কিন্তু এ লেখকগণের লেখাতে ফরায়েযী সমাজের আংশিক প্রতিফলন থাকায় বিভিন্ন বিষয়ে ভুল নির্দেশনা লক্ষ্য করা যায়।[৪৯] এ কারণে তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নয়। জেমস ওয়াইজ বলেন, বৈষ্ণবদের উদাহরণ অনুযায়ী তিনি পূর্ববঙ্গকে বিভিন্ন সার্কেলে বিভক্ত করেন এবং প্রতি সার্কেলের জন্য একজন খলিফা বা এজেন্ট নিয়োগ করেন। তাদের দায়িত্ব ছিল সম্প্রদায়কে একসূত্রে রাখা এবং ধর্মান্তর করা এবং সম্প্রদায়ের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা। খলিফাগণ দুদু মিয়াকে তাদের আওতাধীন এলাকার প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখত। তিনি আরও বলেন যে, তিনি বিবাদের মীমাংসা করতেন এবং সংক্ষিপ্ত

৪৮ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

*Dhaka University Institutional Repository*

বিচারের মাধ্যমে যে কোনো হিন্দু মুসলিম বা খ্রিস্টানদের শাস্তি প্রদান করতেন। এ সকল ব্যক্তিরা তাদের ঋণ আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট মুন্সিফ কোর্টে যাওয়ার সাহস না দেখিয়ে, তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিত। সাধারণ জনগণের মাঝে ফরায়েযী পঞ্চায়েতের প্রভাব সম্পর্কে ওয়াইজ বলেন, এ পঞ্চায়েতসমূহ (পূর্ববঙ্গের) জনগণের উপর এবং ফরায়েযী গ্রামসমূহের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এরা সকল ঘটনা সম্পর্কে অবহিত থাকত। এর কারণে হিংসাত্মক ঘটনা বা নির্যাতনের কোনো মামলা কালেভদ্রে আদালতে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পেত।

নবীন চন্দ্র সেনের আত্মজীবনীতে, আমরা নয়া মিয়ার সময়ের ফরায়েযী সমাজের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি। নিম্নোক্ত বিবরণ তা প্রমাণ করে :

পূর্ব বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ত বিশেষ করে ফরিদপুর জেলার রায়তেরা ছিল ফরায়েযী মুসলিম। এরা নয়া মিয়ার কথাকে ঐশ্বরিক বিবেচনা করত এবং এ ধরনের দাসত্ববোধক সমর্পণ অন্যকোন মানব জাতির মধ্যে দেখা যায় না। এ অঞ্চলে (মাদারিপুর) নয়া মিয়া ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে একটি নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রতিটি গ্রামে তিনি একজন তত্ত্বাবধায়ক এবং পেয়াদা নিয়োগ করে তাদের মাধ্যমে ফরায়েযীদের নিয়ন্ত্রণ করেন। তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি ছাড়া গ্রামের কোনো বিরোধ দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালতে যেতে পারত না। তিনি আরও লিখেন প্রথমত, তত্ত্বাবধায়ক খলিফা বিবাদের বিচার করতেন। এরপর যদি তিনি অনুমতি দিতেন তাহলে বিষয়টি আইন-আদালত বা পুলিশের নিকট উত্থাপন করা যেত। যদি কেউ এর বিপরীত কাজ করত তাহলে তাকে বিপথগামী বা কাফির হিসেবে চিহ্নিত করা হত।[৫০] ফলে তত্ত্বাবধায়ক বিবাদে অংশ গ্রহণকারী যে দলকে সমর্থন করত সে দলই জয়ী হত। এমনকি দলটি যদি ভুল অবস্থানে থাকত তাতেও জয় পেত। তত্ত্বাবধায়কের ইচ্ছানুযায়ী লোকেরা সাক্ষী প্রদান করত। তিনি যদি কারও বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেন তাহলে ঐ মামলা সত্য প্রমাণ করা কঠিন ছিল। মামলার পক্ষে কোনো প্রমাণাদি সংগ্রহ করা জজ এবং পুলিশের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত। এমনকি কোনো জমির উপর কোনো ব্যক্তি আদালতের রায় আনতে পারলেও তা দখল করা অসম্ভব হয়ে পড়ত, যদি ফরায়েযী তত্ত্বাবধায়ক খলিফা তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করত।[৫১]

মাওলানা কেরামত আলী ফরায়েযীদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনেন তার অন্যতম যুক্তি হিসেবে বলেন, যেহেতু পূর্ববঙ্গে ফরায়েযীগণ দৃঢ়ভাবে তাদের শাসন কায়েম করেছে সেহেতু জুমু'আর নামায

৫০ নবীন চন্দ্র সেন, *আমার জীবন*(কলিকাতা : ১৩১৭ বাং), খ.৩, পৃ. ১৪৯

৫১ প্রাগুক্ত। নবীন চন্দ্র সেন ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং ফরায়েযী আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হওয়া বিষয়টি একই ধরনের মনে করেছেন। এটা সঠিক যে, ফরায়েযীগণ তাদের বিরোধীদের সঙ্গে উঠাবসা করত না। তা সত্ত্বেও ফরায়েযীগণ কোন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত বা কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করত না। ফরায়েযীগণ নিজেদেরকে হানাফি মতাদর্শের এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী মনে করত। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মুসলিমগণ এ মতাদর্শের অনুসারী ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা সমীচীন নয়। তিনি ফরায়েযীদের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করেন এভাবে যে, যেখানে তারা তাদের অনুসারীদের উপর বিচার ব্যবস্থা কায়েম করেছে এবং তারা শাস্তি হিসেবে জুতাপেটা করে, জরিমানা বা একশত বেত্রাঘাত, একশত-দুইশত টাকা জরিমানা করতে পারছে। কোনো অভিযোগ ব্রিটিশ আদালতে দায়ের করতে দিচ্ছে না, সেখানে জুমু'আর নামায আদায়ের বিষয়ে আর কি অজুহাত থাকতে পারে। তাদের নির্বাচিত আমীর যেখানে শাসন করছে।

বাখেরগঞ্জ জেলার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিবরণের সাহায্যে এইচ. বেভারিজও বলেন, সরকারি কর্মকর্তা ব্যতীত দুইজন ব্যক্তি রয়েছেন যারা জজ বা ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।[৫২] আমি মুহাম্মদিয় ধর্মপ্রচারক কেরামত আলী এবং দুদু মিয়ার নাম এখানে উল্লেখ করছি। যদি উপরোক্ত প্রমাণাদি সত্য হয় তাহলে ধরে নেয়া যায় যে, ফরায়েযী সমাজ সংগঠনের দুদু মিয়ার প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ফরায়েযীদেরকে শুধু নিজের নিয়ন্ত্রণে আনেনি, উপরন্তু তিনি তাদের জন্য সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করেছিলেন। নীলকর, তাদের অনুচর ও অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের হাত থেকে তিনি ফরায়েযীদের রক্ষা করেছিলেন। ফরায়েযী সমাজ গঠনে তিনি সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধের নীতি প্রয়োগ করেন, যার প্রভাব ছিল সূদূর প্রসারী।

### ৪.২.৮ সশস্ত্র আন্দোলন শুরু

মুসলিমগণের অধঃপতন দেখে আঁতকে উঠলেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে তুলে আনার জন্য ব্যাপকভাবে দীনি দা'ওয়াতের কাজ শুরু করলেন। যাবতীয় কুসংস্কার পরিত্যাগ করে ইসলামের খাঁটি অনুসারী হবার জন্য তিনি তাঁর সংস্কার আন্দোলন চালাতে থাকলেন। সাধারণ মুসলিমগণকে নৈতিক শিক্ষায় তিনি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। অপরদিকে তিনি ইংরেজ এবং অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ালেন। এভাবে গর্জে উঠলেন সাহসী সৈনিক হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। দীর্ঘকাল মক্কায় থেকে তিনি কেবল কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, তাসাউফই শেখেননি, তিনি বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন ধর্ম, সমাজ বিজ্ঞান ও রাজনীতি সম্পর্কেও। এ সময়ে তিনি বুঝলেন, ইসলাম কেবল একটি ধর্মের নাম মাত্র নয়; বরং একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম।

ইসলামের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত হবার পর এর প্রচার এবং প্রসারের জন্য হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) নতুনভাবে উদ্যোগী হলেন। এক মহা আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে তিনি নিজের পথকে আবিষ্কার করলেন। আত্মত্যাগ ও আত্ম কুরবানীর শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে তিনি ইসলামের দা'ওয়াতের কাজ শুরু করলেন। এ দা'ওয়াতি কাজ শুরু করলেন তিনি তাঁর নিজ গ্রামে, নিজ দেশে। কিন্তু কাজটি খুব সহজসাধ্য ছিল না।

৫২ Henry Beveridge, *The District of Bakergonj its History and Statistics*(London : Trubner & Co., 1876), p. 339

Dhaka University Institutional Repository

কেননা তখনও চারপাশে অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং অপসংস্কৃতির পংকিলে হাবুডুবু খাচ্ছিল সাধারণ মুসলিমগণ। তখনকার সামাজিক অবস্থাটা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। একদিকে চলছে ধর্মীয় অনাচার, অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা। আর আছে সাধারণ মুসলিমগণের ঘাড়ের উপর ইংরেজ দস্যু, নীলকর ও অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের ক্ষিপ্ত চাবুক। আছে তাদের হাতে শাণিত তরবারি। এর মধ্য দিয়েই হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) নতুনভাবে, নতুন উদ্যমে ঝড়ের মত এগিয়ে চললেন ক্রমাগত সামনের দিকে। শুরু করে দিলেন প্রতিরোধ। বৃটিশদের কাজের জবাব দিতে লাগলেন।

বিশেষ করে ১৮৩৫ কিংবা ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে মুহসিন উদ্দিন আহমদ দুদু মিয়া (১ম) মক্কা শরীফ থেকে বাংলায় আগম করে পিতার কাজে সহযোগিতা শুরু করেন। পিতার খলিফা ও সামরিক কমান্ডার জালাল উদ্দিন মোল্লার কাছে লাঠি খেলায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। স্বল্প সময়ে তিনি লাঠিয়াল বাহিনী তথা মুজাহিদ বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম হন। তাঁর শারীরিক শক্তি ও মানসিক কৌশল তাঁকে কৃষকদের নেতায় পরিণত করে। ১৮৩৮ সালের যে লাঠি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় তার নেতৃত্ব দেন মুহসীন উদ্দীন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া। ১৮৩৯ সালে তাঁর পিতা হাজী শরী'অতুল্লাহ যখন পুলিশের হাতে বন্দী তখন তিনি নির্যাতিত কৃষক সমাজকে সংঘবদ্ধ করে লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে নিপীড়ক হিন্দু-মুসলিম জমিদারদের বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়ান।[৫৩]

### ৪.২.৯ বাংলাদেশকে দারুল হার্‌ব ঘোষণা

তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে একটা ইসলামী দেশ দারুল হারব বা শত্রু দেশে পরিণত হয়।[৫৪] তাহলো-

- যখন বিধর্মীর শাসন নির্বিচারে জারি করা হয় এবং ইসলামের অনুশাসন পালন করা যায় না।
- যদি দারুল হারবভুক্ত কোনো দেশের সীমান্তে দেশটির অবস্থান হয়ে থাকে এবং তার ফলে সংশ্লিষ্ট দেশটিও দারুল-হারবভুক্ত দেশের মধ্যকার কোনো বিষয়ে দারুল ইসলামের কোনো শহর থেকে হস্তক্ষেপ না করা যায়।
- কোনো মুসলিম যখন ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না এবং কোনো জিম্মি (মুসলিম শাসনের শর্তাবলি স্থায়ীভাবে মেনে চলার শর্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ বিধর্মী) যখন ইসলামী শাসনে যে সব শর্ত মেনে চলেছে তা আর মানতে পারছে না।

হানাফি মাযহাবের বিজ্ঞ আলিম হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) উপরে বর্ণিত দারুল-হারবের তিনটি শর্তই উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্বকালে দেখতে পান। তিনি বাংলাদেশে বৃটিশ শাসনকে মুসলিমগণের ইসলামী আদর্শ অনুসরণের জন্য বাধাস্বরূপ মনে করতেন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) হানাফি ফিকাহের মত

৫৩ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ফরায়েজী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম*(ঢাকা : শরীয়তিয়া প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১০), পৃ. ১৭-১৮

৫৪ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

অনুসারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ যেহেতু মুসলিম শাসন বঞ্চিত, সেহেতু মুসলিমগণ এখানে জুমু'আ ও 'ঈদের নামায আদায় করতে পারে না। যদিও তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জিহাদ ঘোষণা করেননি। কিন্তু জুমু'আ ও 'ঈদের নামায অনুষ্ঠান মুসলিম শাসন কায়েম না হওয়া পর্যন্ত মূলতবি করেছেন। জুমু'আ ও 'ঈদের নামায অনুষ্ঠান মূলতবি করা ফরায়েযী আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এ দিক দিয়ে ফরায়েযী আন্দোলনকে ইসলামের পুনরুজ্জীবনবাদী অন্যান্য আন্দোলনের চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনে করা হয়।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) উপমহাদেশকে দারুল হারব ঘোষণা করায় অন্যান্য ইসলামি পুনরুজ্জীবনবাদী ও বিদ্রোহী আলিমেদ্বীন সৈয়দ আহমাদ বেরলভি, ঈসমাঈল শহীদ, মাওলানা এনায়েত আলী, মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা নিসার আলী তিতুমীর, মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ তার ভ্রাতৃষ্পুত্র মাওলানা আব্দুল হাই প্রমুখ উক্ত দারুল হারব ফতোয়াকে প্রকাশ্য সমর্থন করে উপমহাদেশের সকল মুসলিমগণকে জুমু'আ ও 'ঈদের নামায পড়া থেকে বিরত রাখেন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) প্রদত্ত দারুল হারব ফাত্ওয়ার প্রভাব সারা ভারতের মুসলিমগণের উপরে বর্তায়। মুসলিমগণ বুঝতে পেরেছে যে, ভারত যথার্থই একটি শত্রু দেশে পরিণত হয়েছে। ভারতে শুধু যে ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণের অনেকে জুমু'আর নামায আদায় করে না তাই নয়, এমনকি অনেক মসজিদে জুমু'আর নামায পড়তেই দেয়া হত না। কলকাতার দু'জন প্রখ্যাত মুসলিম, মোহামেডান কলেজের পরলোকগত হেড প্রফেসর মৌলভী মোহাম্মদ ওয়াজিহ[৫৫] এবং সাবেক প্রধান কাযীউল কুযাত (আইন অফিসার) তাঁরা মনে করেন যে, ভারত শত্রু দেশে পরিণত হওয়ায় তাদের উপরোক্ত ধর্মীয় সুযোগ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফরায়েযী আন্দোলন ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে নিজস্ব অঞ্চলের গণ্ডি পেরিয়ে অবশেষে এটা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ লাভ করে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

৫৫ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

*Dhaka University Institutional Repository*

# ৪.৩ হাজী শরী'অতুল্লাহর সমাজ গঠন

## ৪.৩.১ শরী'অতুল্লাহর বৈপ্লবিক সংস্কার

ফরায়েযী মতের প্রবর্তক হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মুসলিম ধর্মের যে সংস্কার সাধন করেন তা মূলত প্রচলিত ইসলাম ধর্মের বিরোধী। এ সংস্কার কাজে তিনি মুসলিম জনসাধারণের অর্থাৎ মুসলিম কৃষক, কারিগরদের স্বার্থই সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছিলেন এবং এ সকল ধর্মীয় উৎপীড়কদের কবল হতে উৎপীড়িত মুসলিম কৃষক ও শ্রমজীবীদেরকে রক্ষার প্রয়াস পেয়েছিলেন। প্রচলিত মুসলিম ধর্মে 'পীর' ও 'মুরিদ' শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়। পীর শব্দ দ্বারা বুঝায় প্রভূ আর মুরিদ শব্দ দ্বারা বুঝায় অনুগত শিষ্য।[৫৬] উৎপীড়ক প্রভূর নিকট উৎপীড়িত কৃষক ও শ্রমজীবী মুসলিমগণ অনুগত থাকতে পারে না এবং পীর ও মুরিদ শব্দ দু'টি প্রভূ-ভৃত্যের সম্পর্ক প্রকাশ করে বলে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এ শব্দ দু'টির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এ শব্দ দু'টির পরিবর্তে তিনি তাঁর শিষ্যদিগকে উস্তাদ (শিক্ষক) ও শাগরেদ (শিক্ষার্থী বা ছাত্র) শব্দ দু'টি ব্যবহার করার নির্দেশ দেন।[৫৭] এটা ব্যতীত আরও বহু উৎপীড়নমূলক ধর্মীয় নিয়ম রদ করে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে মোল্লা মৌলভীদের উৎপীড়ন হতে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। তাঁর এ সংস্কার কাজের ফলে ইসলাম ধর্ম কৃষক ও শ্রমজীবী জনসাধারণের ধর্মে পরিণত হয় এবং ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার লক্ষ লক্ষ মুসলিম কৃষক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কেবল ধর্মসংস্কার করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি তাঁর ধর্ম-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্যদেরকে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য শোষণ-উৎপীড়নের কবল হতেও মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। জমিদার ও নীলকরের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রচার কাজ তাঁর ধর্মীয় প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই চলত।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তাঁর শিষ্যদেরকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এবং বিপদের সময় তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণের শিক্ষক, বন্ধু ও বিপদ-আপদের সহায়। তাই দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণ তাঁকে তাদের পিতার আসনে বসিয়েছিল। তাঁর ধর্ম-প্রচারের অভাবনীয় সাফল্যের কারণ নির্দেশ করে জেমস ওয়াইজ লিখেছেন, এক অতি দরিদ্র মুসলিম তাঁতীর সন্তান হয়ে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) যে পূর্ববঙ্গের জলাভূমি অঞ্চলে বহু দেবদেবী-অধ্যুষিত হিন্দুধর্মের সহিত দীর্ঘকালের সংযোগ হতে উদ্ভূত অসংখ্য প্রকারের কুসংস্কার ও বিকৃতি হতে মুসলিম জনসাধারণকে মুক্ত করার জন্য প্রথম প্রচার আরম্ভ করেছিলেন তা অবশ্যই বিশেষ প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি

---

৫৬ সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গনতান্ত্রিক সংগ্রাম*(কলিকাতা : বুক ওয়ার্ল্ড প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ২৪০-২৪৮

৫৭ Dr. James Wise, *Artical on Sariatullah and the Faraizis*(Dacca : The Royal Asiatic Socaity of Bengal, 1894), vol. III, p. 65

*Dhaka University Institutional Repository*

যে নির্বিকার ও নিরুৎসাহ কৃষক জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করতে পেরেছিলেন তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ ঘটনা। এর জন্য প্রয়োজন ছিল একজন বিশ্বস্ত ও সহানুভূতিশীল প্রচারকের এবং এ বিষয়ে আর কেউই হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) অপেক্ষা অধিক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তিনি সমাজের নিম্নতম ও সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য শ্রেণি হতে আবির্ভূত হলেও তাঁর নিষ্কলঙ্ক ও আদর্শ জীবন দেশের সকল মানুষের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিল। তারা তাঁকে বিপদে পরামর্শদাতা ও দুঃখ-দুর্দশায় সান্তনা দানকারী পিতার ন্যায় সম্মান করত।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ধর্ম সংস্কারে রক্ষণশীল ধনী মুসলিমগণ তাঁর উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। এটা ব্যতীত ফরিদপুর জেলার সকল মুসলিম কৃষক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর নেতৃত্বে জমিদারি শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে থাকলে জমিদারগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন এবং তাঁকে এ জেলা হতে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। জেমস ওয়াইজ লিখেছেন, এ নতুন ধর্মমত বিস্তার লাভ করতে এবং এটা দ্বারা সকল মুসলিম কৃষককে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখে জমিদারগণ অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। শীঘ্রই জমিদারদের সাথে বিরোধ দেখা দেয় এবং ফলে তিনি তাঁর ঢাকার নয়াবাড়ী হতে বিতাড়িত হয়ে পুনরায় তার জন্মস্থান (ফরিদপুরে) ফিরে আসেন।

## ৪.৩.২ সূচিত আন্দোলনের প্রকৃতি

জমিদারদের সঙ্গে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর সংঘর্ষ এবং পুলিশের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও বলা যায় যে, তিনি রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, অথবা এটাও বলা যায় না যে, প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওয়াইজ এবং বেভারিজ সুস্পষ্টভাবেই উক্ত ধারণাকে নাকচ করেছেন। ওয়াইজ বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর আন্দোলন রাজনীতি আশ্রিত ছিল না এবং নয়াবাড়ি ঘটনার পর (১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস) তিনি অত্যন্ত সতর্কভাবে কাজ করেন এবং ধর্মীয় সংস্কার ব্যতীত অন্য কিছু করেননি। বেভারিজ বলেন, এটা প্রতীয়মান হয় না যে, ফরায়েযীগণ ওয়াহাবীদের মত বিপদজনক রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করে।[৫৮] জমিদারদের ধার্যকৃত খাজনা সম্পর্কে বিতর্ক করা ছাড়া তাদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় অন্য কিছু ছিল না। হিন্দু জমিদার এবং তাদের সমর্থকগণ ফরায়েযীদেরকে রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক মনে করে। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ ব্যতীত এটা গ্রহণ করা যায় না। যদিও সাধারণ মুসলিমগণের চেয়ে ফরায়েযীদের মধ্যে উদ্দীপনা বেশি ছিল। এটা তাদের চরিত্রের জন্য অপরাধ হতে পারে না।

---

২৫ Dr. Moyin Uddin Ahmad Khan, *The Struggle of Titumir*(Calcutta : JASP, 1959), p.113

২৬ James Wise, *Eastern Bengal.* Ibid, p. 25

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত প্রমাণাদিতে প্রতীয়মান হয় যে হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) বৈধ একজন ধর্মীয় সংস্কারক হিসেবেই থাকতে চেয়েছেন। সুতরাং পুলিশ তাকে আটক করলেও তার কোনো অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। রাষ্ট্রবিরোধী কাজের জন্য নয়; বরং নির্যাতিত কৃষকদের উপর অবৈধ কর ধার্য করায় অত্যাচারী জমিদারগণের বিরুদ্ধে তিনি যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, সে জন্যই তাকে পুলিশ আটক করেছিল। তিনি যদি ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকতেন, তাহলে ব্রিটিশ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিত, যেমনটি তাঁর সমসাময়িক তিতুমীরের বেলায় ঘটেছিল। সুতরাং এটা বলা যায় যে, হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর সূচিত সংস্কার আন্দোলনটি রাজনৈতিক ছিল না বরং তা ছিল সম্পূর্ণ ধর্মীয় সংস্কারমূল আন্দোলন।

### ৪.৩.৩ হাজী শরী‘অতুল্লাহ পুনর্বার কলকাতায় গমন

গঙ্গা নদীতে নৌকা ডুবির দুর্ঘটনার পর বিশাল এ পৃথিবী ছোট হয়ে আসল হাজী শরী‘অতুল্লাহর কাছে। মনে পড়ল শিশুকালে মা-বাবা হারানোর কথা। একদিন যে চাচা আজিম তালুকদারের স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছিলেন সে চাচার কথা। তিনি জানতে পারলেন না যে, তাঁর আদরের ছোট বোনটি কেমন আছে? তিনি কোথায় যাবেন ভেবে না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর মনে পড়ে কলকাতার উস্তাদ মাওলানা বাশারাত আলীর কথা। মুর্শিদাবাদে চাচার সাথে সাক্ষাত করার জন্য দু‘আ করে বিদায় দেয়ার সময় উস্তাদ যখনই যে কোনো প্রয়োজনে দ্বিধাহীন চিত্তে তাকে তাঁর কাছে চলে যেতে বলেছিলেন। আজ সে প্রয়োজনকে সামনে রেখে তিনি উস্তাদ বাশারাত আলীর যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন। তিনিই একমাত্র অভিভাবক, যিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন ছোট্ট বেলায়। তিনি কলকাতা পৌঁছে উঠলেন মাওলানা বাশারাত আলীর ঘরে। অনেক দিন পর হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) কে পেয়ে তিনি দারুণ খুশি। হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর মুখ থেকে সকল বিবরণ শুনে মাওলানা বাশারাত আলী অবাক হলেন এবং তিনি হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) কে আরও বেশি আদর-স্নেহে কাছে টেনে নিয়ে সান্তনা দিলেন।

### ৪.৩.৪ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন পরিকল্পনা

হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহম্মদ মোহসীন উদ্দীন আহমেদ দুদু মিয়া পিতার অসমাপ্ত কার্যভার গ্রহণ করেন। মুহম্মদ মোহসীন উদ্দীন আহমেদ ‘দুদু মিয়া’ নামেই সমধিক পরিচিত। ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে দুদু মিয়ার জন্ম হয়। তরুণ বয়সেই তিনি মক্কা গমন করেন এবং দেশে ফিরে এসে পিতার মতবাদের প্রচার ও সংগঠন স্থাপনের কার্যে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন।[৫৯] হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) বৈপ্লবিক ধর্মসংস্কার ও প্রচার-কার্যের ফলে জমিদার গোষ্ঠির অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত পূর্ববঙ্গের কৃষক জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ শুরু হয়েছিল। কৃষক জনসাধারণ জমিদার ও

৫৯ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো’মান, *হাজী শরী‘অতুল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠির শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য উন্মুখ হয়েছিল। দুদু মিয়া দেশে ফিরে এসেই জমিদারি শোষণ ও বিদেশী ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার এক পরিকল্পনা রচনা করেন এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি শুরু হয়। এভাবে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক সূচিত ধর্মীয় সংগ্রাম দুদু মিয়ার নেতৃত্বে বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়।

দুদু মিয়া পরিচালিত ফরায়েযীরা যে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ সাধন এবং স্বাধীন ভারতে বা স্বাধীন বঙ্গে স্বাধীন মুসলিম রাজ্য স্থাপনের জন্যই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল তা সরকারি বিবরণ হতেও জানতে পারা যায়। মুসলিম কৃষক, কারিগর প্রভৃতি জনসাধারণের প্রতি দুদু মিয়ার গভীর দরদ এবং সকল প্রকার শোষণ হতে তাদের মুক্তির বাণী প্রচারের জন্য অল্পকালের মধ্যে দুদু মিয়া পিতার মতই দরিদ্রের শিক্ষক, বন্ধু ও পিতার আসন লাভ করেন।

## ৪.৩.৫ বিশিষ্ট কয়েকজন ফরায়েযী নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা

**(১) জালাল উদ্দীন মোল্লা (ফরিদপুর) :** আধুনিক ফরিদপুর শহরের কমলাপুরের অধিবাসী ছিলেন জালাল উদ্দীন। তাঁর পারিবারিক তথ্য অনুযায়ী তাঁর চাচাদের একজন মক্কা শরীফে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যখন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) বাংলায় ফিরে আসেন এবং তাঁর সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন তখন জালাল উদ্দীনের চাচা তাকে সমর্থন করেন।[৬০] তাঁর মাধ্যমে জালাল উদ্দীন তরুণ বয়সেই ফরায়েযী মতাদর্শে দীক্ষিত হন। জালাল উদ্দীন 'মণ্ডল' পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ফরায়েযী হওয়ার পর তিনি কুরআন অধ্যায়ন করেন। এছাড়া তিনি সামান্য আরবি ও উর্দু শিক্ষা করেন। এরপর হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তাঁর পরিবারের পদবি পরিবর্তন করে 'মোল্লা' আখ্যা দেন। জালাল উদ্দীন মোল্লা একজন বয়োজ্যেষ্ঠই ছিলেন না একজন ভাল কুস্তিগীরও ছিলেন। সে সময় জমি-জমার বিরোধের সময় লাঠিযুদ্ধ ছিল একটি সাধারণ বিষয়। জালাল উদ্দীন মোল্লা একজন অসাধারণ লাঠিয়াল ছিলেন।

এ সময়ে হিন্দু জমিদার এবং ফরায়েযী কৃষক শ্রেণির মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তাঁর অনুসারীদেরকে জমিদারদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একদল লাঠিয়ালের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি জালাল উদ্দীন মোল্লাকে লাঠিয়ালদের একটি দল সংগঠিত করার দায়িত্ব দেন এবং তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ দেবার নির্দেশ দেন। যখন দুদু মিয়া ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে মক্কা থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি লাঠিয়াল বাহিনীর প্রশিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক জালাল উদ্দীন মোল্লার সঙ্গে হাত মেলান। দুদু মিয়ার সময়ে জালাল উদ্দীন ফরায়েযী সংগঠনের রাজনৈতিক শাখার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

---

২৮ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

*Dhaka University Institutional Repository*

**(২) মুন্সি ফাইজ উদ্দীন মোখতার :** যশোরের অধিবাসী আগার মোহাম্মদ সুতকারের পুত্র ছিলেন ফাইজ উদ্দীন মোখতার। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ফরিদপুরে আগমন করেন। তাঁর পরিবারে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তাঁকে আরবি শিক্ষা গ্রহণের জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়।[৬১] তিনি ছিলেন স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিশালী একজন ব্যক্তি। খুব শীঘ্রই তিনি কুস্তি খেলার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। এ সময়ে তিতুমীর কুস্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে কলিকাতায় অবস্থান করছিলেন। তরুণ ফাইজ উদ্দীন তাঁর দলে যোগ দেয়। পরবর্তী সময়ে সৈয়দ আহম্মদ শহীদের অনুসারী হওয়ার পর তিতুমীর (১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে) কলিকাতায় ফিরে আসেন। তিতুমীরের সঙ্গে তাঁর এখানে সাক্ষাৎ করার সুযোগ আসে। এরপর ফাইজ উদ্দীন তিতুমীরের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে যশোর ফিরে আসেন। তিনি তিতুমীরের প্রচারিত শুদ্ধিবাদী মতাদর্শ প্রচার শুরু করেন। তাঁর নিজ গ্রাম পানিপাড়ার অনতি দূরে বারাসিরা নদীর তীরবর্তী মীরগঞ্জে একটি নীলকুঠি ছিল। মুসলিম কৃষকদের উপর নীলকরদের অত্যাচার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি তাঁর সংস্কার মতাদর্শ কৃষকদের নিকট প্রচার করেন এবং তাদেরকে একটি সংঘবদ্ধ দলে পরিণত করেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইউরোপীয় নীলকর কৃষকদের মধ্যে সংঘটিত একটি সংঘর্ষে ফাইজ উদ্দীন আহত হন। এরপর তিনি মীরগঞ্জের কাছাকাছি বাস করতে নিরাপদ বোধ করেননি। এ কারণে তিনি ফরিদপুরের অধিবাসী হন। ফরিদপুরের খ্যাতনামা ফরায়েযী নেতা জালাল উদ্দীন মোল্লার কন্যাকে বিয়ে করে ফরিদপুরের স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। অবশ্য কখনও তিনি ফরায়েযী মতাদর্শ গ্রহণ করেননি বরং আমৃত্যু তিতুমীরের অনুসারী ছিলেন। ফরিদপুর জেলা কোর্টে মোখতার (প্রচলিত ভাষা মোক্তার) হিসেবে তার পেশা শুরু করেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তাকে দুদু মিয়া Legal Attorny নিযুক্ত করেন।[৬২] দুদু মিয়া তাঁর স্থাবর সম্পত্তি দেখাশুনা এবং সরকারি অফিস আদালতে তাঁর প্রতিনিধিরূপে কাজ করার অধিকার প্রদান করেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়া যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তাকে দুদু মিয়ার পুত্রদের অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়। তিনিও কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন।

**(৩) মওলভী কফিল উদ্দীন আহমেদ :** ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কফিল উদ্দীন আহম্মেদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ফাইজ উদ্দীন মোখতার এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং খানবাহাদুর সাইদ উদ্দীন আহম্মদের সহকর্মী। দু'জন একই সঙ্গে বাহাদুরপুর এবং ঢাকার স্কুলে লেখাপড়া করেন। ঢাকাতে তিনি মওলভী দীন মোহাম্মদের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ঢাকার মোহসিনিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং মাওলানা উবায়দুল্লাহ উবায়দীর ছাত্র হন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন ফরিদপুরে ফিরে আসেন তখন খান বাহাদুর

---

৬১ 'ফরিদপুর নিবাসী ফাইজ উদ্দীন মোখতারের পৌত্র মওলবী রফিক উদ্দীন কর্তৃক সরবরাহকৃত।' উদ্ধৃত: মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৬২ Board of Editors, *Journal of Asiatic Society of Pakistan*(Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1959), vol. vi, pp. 124-131

*Dhaka University Institutional Repository*

সাইদ উদ্দীন তাকে খলিফা নিযুক্ত করেন। পরে তিনি তত্ত্বাবধায়ক খলিফায় উন্নিত হন। ঊনিশ শতকের শেষের দিকে পূর্ণাঙ্গ খলিফা হন। এ সঙ্গে তাকে রাজবাড়ি, ভাঙ্গা, মকসুদপুর, ভূষণা, ফরিদপুর, সদরপুর, নগরকান্দা এবং সন্নিহিত অঞ্চলের ফরায়েযীদের সামাজিক এবং ধর্মীয় ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য সনদ প্রদান করা হয়। অন্য কথায় তাকে ফরিদপুর সদর মহকুমা এবং গোয়ালন্দ মহকুমার অংশ বিশেষের দায়িত্ব দেয়া হয়। কফিল উদ্দীনের তত্ত্বাবধানে আরও খলিফা ছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ছিলেন কাজেম মোল্লা, গিদই জাহানপুর, মুন্সি গিয়াস উদ্দীন শাহ ফকির, গিদই ইতালমা। ফরায়েযী সংগঠনের ন্যায় বিচার বিষয়ক প্রশাসন বিশেষ স্থানের অধিকারী। তত্ত্বাবধায়ক খলিফার অনুমতি ছাড়া কোনো ফরায়েযী সরকারি আদালতে মামলা দায়ের করতে পারত না। জটিল ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে শুধু অনুমতি দেয়া হত। অন্যান্য সকল বিবাদ খলিফাগণ মীমাংসা করত। একজন উপরস্থ খলিফা হিসেবে মওলবী কফিল উদ্দীনকে তাঁর এলাকায় নিয়মিত পরিদর্শন করতে হত। বিভিন্ন বিবাদ মীমাংসার জন্য তিনি তা করতেন। এছাড়া কাদেরিয়া সুফী মতাদর্শ মোতাবেক আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণও প্রদান করতে হত। উপরন্তু তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা এবং বিভিন্ন স্থানে ফরায়েযীদের আয়োজিত সভাসমূহে তিনি বক্তব্য রাখতেন। কখনও কখনও ফরায়েযীগণ, ফরিদপুর, মাদারিপুর, বরিশাল, ঢাকা, চাঁদপুর এবং রেকাবি বাজারে ধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করত। কফিল উদ্দীন এ সকল সম্মেলনে প্রধান ভূমিকা পালন করতেন। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে মাওলানা কেরামত আলী ও তাঁর অনুসারীগণ জুমু'আ এবং 'ঈদের নামায সম্পর্কিত ফরায়েযী মতাদর্শের তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। বাংলার বিভিন্ন স্থানে এ দু'দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত তর্কযুদ্ধ একটি নিয়মিত দৃশ্যে পরিণত হয়। এ ধরনের বিতর্কে ফরায়েযী অবস্থান রক্ষা করার জন্য মওলভী কফিল উদ্দীনকে প্রায়ই ডাকা হত। মাওলানা কেরামত আলীর পুত্র মাওলানা আব্দুল আওয়াল যখন পূর্ববঙ্গে সফর করেন তখন তাঁর সঙ্গে কফিল উদ্দীনের বেশ কয়েকটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।[৬৩]

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সময়ে মওলবী কফিল উদ্দীন এবং খান বাহাদুর সাইদ উদ্দীন এ বিভক্তিকে সমর্থন করেন এবং ঢাকার নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর সঙ্গে হাত মেলান। অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেসে এক সময়ের সভাপতি ফরিদপুরের শ্রী অম্বিকা চরণ মজুমদারের প্রচারের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়ান। যেখানে হিন্দুরা ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করে সেখানে তিনি ফরিদপুরে লিভারপুল থেকে আসা লবণের একটি স্টোর খোলেন। ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি খিলাফতীদের সঙ্গে যোগ দেন এবং বাদশাহ্ মিয়ার সঙ্গে কারারুদ্ধ হন। সে সময় থেকে ফরায়েযীগণ ব্রিটিশদের সঙ্গে বন্ধুত্বের বদলে বিরোধিতা শুরু

৬৩ ফরিদপুর শহরের কমলাপুরের অধিবাসী মওলবী কফিল উদ্দিন আহম্মদের পরিবার থেকে সংগৃহীত তথ্য। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস গ্রন্থের লেখক ফরিদপুর শহরের মওলবী রফি উদ্দিন আহম্মদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। খিলাফত আন্দোলনের সময় থেকে দেওবন্দ স্কুলের বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ বাংলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেশ প্রভাব বিস্তার করেন। মুসলিমগণের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি প্রত্যেকের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাই ছোট-খাটো ধর্মীয় বিষয় যেমন জুমু'আর নামায অনুষ্ঠানের বিষয়টি ক্রমে গৌণ হয়ে পড়ে এবং বিস্মৃতির অতলে ঢাকা পড়ে। জুমু'আ এবং 'ঈদের নামায যেহেতু মুসলিমগণের একতার প্রতীক তাই তরুণ ফরায়েযীগণ এ নামাযসমূহ অনুষ্ঠানের পক্ষে চাপ দিতে থাকে। ফরায়েযী মতাদর্শ অনুসারে মওলবী কফিল উদ্দীন মত প্রকাশ করেন যে, জুমু'আ বা 'ঈদের নামায গ্রামসমূহে আইনসম্মতভাবে অনুষ্ঠিত করা যাবে না।

কিন্তু তিনি যখন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা মহানগরী সফর করেন তখন তিনি দেখেন যে শহর বা নগরে যেখানে সরকার বা প্রশাসন রয়েছে সেখানে উক্ত নামায অনুষ্ঠানে কোনো বাধা নেই। তাঁর পুত্র মওলভী রফি উদ্দীন আহমেদের চাপে জুমু'আ সম্পর্কিত ফরায়েযী মতাদর্শ পুনঃপরীক্ষা করে মতামত দেয়ার জন্য রফি উদ্দীনকে তিনি মাওলানা আব্দুর রউফ দানাপুরী এবং মাওলানা জাফর আহম্মেদ উসমানীর কাছে প্রেরণ করেন। এ দু'জন কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে প্রমাণাদির মাধ্যমে বাংলার শহর এবং গ্রামে জুমু'আ আদায়ের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ফলে মওলবী কফিল উদ্দীন আহম্মদ তার অনুসারীদেরকে ফরিদপুরে 'ঈদ ও জুমু'আর নামায আদায়ের অনুমতি দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কফিল উদ্দীন আহম্মদ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর এলাকায় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফরায়েযীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রথম জুমু'আতে অংশ নিতে পারেননি। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে কফিল উদ্দীন মৃত্যুবরণ করেন।[৬৪]

**(৪) সৈয়দ আজিম উদ্দীন খন্দকার ও তাঁর অনুসারিবৃন্দ :** ত্রিপুরা জেলা (বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চল) সৈয়দ আজিম খন্দকার এর (মৃত্যু, ১৮৪২) সঙ্গে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর সংযোগ ঘটে যখন হাজী নদী বন্দর চাঁদপুর সফর করেন। যখনই হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) চাঁদপুর সফরে আসতেন তখনই ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরা দলে দলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করত। আজিম উদ্দীন ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে দূরবর্তী নিজ গ্রাম সিঙ্গারদাহ্ থেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং তাঁর মতাদর্শে মুগ্ধ হন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর একজন একনিষ্ঠ অনুসারী এবং ফরায়েযী আন্দোলনের কড়া সমর্থক হিসেবে তিনি বাড়ি ফিরেন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর জীবনের শেষের দিকে যখন তিনি বিভিন্ন স্থানের জন্য খলিফা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন তখন ত্রিপুরা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য আজিম উদ্দীনকে খলিফা নিযুক্ত করেন। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো আতাউল্লাহ মুন্সি (মৃত্যু, ১৮৫৮ খ্রিঃ) এবং মতিউল্লাহ মুন্সি (মৃত্যু, ১৮৬০) এবং তাদের বংশধরগণ বর্তমান সময় পর্যন্ত

---

৬৪ আবুল বাশার ও আব্দুল বাতিন, *সিরাহ-ই-মওলানা আব্দুল আওয়াল জৌনপুরী*(জৌনপুর : মাকতাবাতে কারামতিয়া, ১৩৭০ হি.), পৃ. ৯, ৫২, ৫৩, ১২৭, ১৩৪, ১৫৩, ১৮৫

*Dhaka University Institutional Repository*

ফরায়েযী খলিফা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন বলে দাবি করে থাকেন। ফাইজ উদ্দীন মুন্সি কিছু পড়াশুনার অধিকারী ছিলেন। তিনি গ্রাম্য রাজনীতিতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং ত্রিপুরা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফরায়েযী মতাদর্শ প্রচার করেন। বাড়িতে তিনি একটি মক্তব খোলেন এবং এখানে তিনি শিশুদেরকে কুরআন শিক্ষা, উর্দু ও ফারসি ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞান দিতেন। দূরবর্তী গ্রামগুলো থেকেও অনেক ছাত্র এ মক্তবে পড়তে আসত। তাঁর অন্যতম প্রিয়ছাত্র ছিলেন দরবেশ আলী মুন্সি যিনি পরবর্তী সময়ে তত্ত্বাবধায়ক খলিফা পদে উন্নিত হন।

**(৫) বাজারী খোলার দরবেশ আলী মুন্সী :** বাজারী খোলার দরবেশ আলী মুনসি ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়ার শিষ্য হন। দুদু মিয়া পূর্ববাংলার মানুষগণকে তাঁর পক্ষে টানার চেষ্টা করেন। তিনি চাঁদপুর মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্যই শুধু ৫ জন খলিফা নিযুক্ত করেন, এদের মধ্যে দরবেশ আলীও ছিলেন। তাদের অক্লান্ত চেষ্টায় সিঙ্গারদা (লাকসাম) থেকে দাউদকান্দি (সদর মহকুমার নদী বন্দর) পর্যন্ত একটি লম্বালম্বি এলাকার জনগণ একচেটিয়াভাবে ফরায়েযী মতাদর্শে দীক্ষিত হয়। এ ত্রিপুরা জেলার মধ্যে ফরায়েযী আন্দোলনের এ চমকপ্রদ সাফল্যের জন্য দরবেশ আলী মুন্সিকে দুদু মিয়া তত্ত্বাবধায়ক খলিফা পদে উন্নিত করেন। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়া চাঁদপুর নদী বন্দর থেকে ত্রিপুরা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল সফরে যান। তিনি সরাসরি বাজারী খোলায় দরবেশ আলী মুনসির বাড়ি যান এবং তাকে নিয়ে সিঙ্গারদাহ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ফরায়েযী বসতিসমূহ সফর করেন। তিনি বিভিন্ন এলাকার জন্য আরও পাঁচজন খলিফা নিযুক্ত করেন এবং তাদেরকে দরবেশ আলীর অধীনস্থ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, দুদু মিয়া এ এলাকায় একটি ফরায়েযী গির্দ (সার্কেল) গঠন করেন। এ সার্কেলে বর্তমান কচুয়া, চান্দিনা এবং দাউদকান্দি থানা রয়েছে। এ গির্দ বা সার্কেলের ফরায়েযীদের উপর ইসলামি আইন এবং সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল দরবেশ আলীর উপর। দরবেশ আলীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবদুর রহমান মুনসি তত্ত্বাবধায়ক খলিফা হন। তিনি ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তাঁর পুত্র ইরফান উদ্দীন মুনসি তত্ত্বাবধায়ক খলিফা হন যা শেষ ফরায়েযী প্রধান বাদশাহ্ মিয়া কর্তৃক অনুমোদিত হয়।[৬৫]

পরিশেষে বলা যায় যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফরায়েযী আন্দোলন ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে। তিনি ভালবাসা দিয়ে মানুষের মন জয় করেন এবং দরদ দিয়ে তৎকালীন পঙ্কিল সমাজকে শিরক ও বিদ'আতমুক্ত একটা সুন্দর ইসলামি সমাজ হিসেবে গড়ে তোলেন।

---

৬৫ '১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস গ্রন্থের লেখক বাজারীখোলা পরিদর্শন করেন এবং ইরফান উদ্দীনের খিলাফতের সনদ ব্যক্তিগতভাবে যাচাই করেন এবং এটা যথাযর্থ সম্পর্কে বাদশা মিয়া নিশ্চিত করেন।' উদ্ধৃত: মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

*Dhaka University Institutional Repository*

# পঞ্চম অধ্যায়

# ফরায়েযী আন্দোলনে হাজী শরী'অতুল্লাহর উত্তরসূরিগণের ভূমিকা

## ৫.১ দুদু মিয়ার জন্ম, বংশ পরিচয় ও সংগ্রামী জীবন

### ৫.১.১ মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া

মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া ছিলেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর একমাত্র পুত্র।[১] কেউ কেউ তাকে ফরায়েযী আন্দোলনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বলে থাকেন। তিনি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে মূলফতগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন। সে সময়ে এ স্থানটি বাকেরগঞ্জ জেলার মাদারিপুর মহকুমার একটি থানা ছিল, যা পরবর্তীতে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও তিনি তাঁর পিতার মত জ্ঞান অর্জন করতে পারেননি, তা সত্ত্বেও তিনি ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাসে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পিতাকে ছাড়িয়ে যান। বিশেষ করে ফরায়েযীদের সংগঠিত করার মাধ্যমে তিনি এ সম্প্রদায়কে একটা শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। ১৮৩৮ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে দুদু মিয়ার উদ্যমী কর্মজীবন। তিনি তাঁর বিরোধীদের জন্য ছিলেন কঠোর এবং বন্ধু ও অনুসারীদের নিকট ছিলেন ত্রাণকর্তার মত। অত্যাচারী ও শোষক জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে তাঁর সাহসী পদক্ষেপ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সমসাময়িক আদালতের নথি এবং পুলিশ রেকর্ডে এ সকল কার্যক্রমের বিবরণ রয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর কর্মজীবন নিয়ে বেশ কয়েকটি পুঁথি লিখিত হয়েছে। কালের গর্ভে এ সকল উপাদান অধিকাংশ বিলীন হয়ে গেছে। সৌভাগ্যবশত ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত ষড়যন্ত্রমূলক ফৌজদারি মামলার বিবরণীটি আছে। এ ছাড়া বেশ কিছু আদালতের নথি, পুলিশ রেকর্ড, সরকারি রিপোর্ট, দুরর, দুরর-ই-মোহাম্মদ এর পুঁথি, যা নাজিম আলদীন এবং ওয়াজির আলী কর্তৃক লিখিত এবং সবশেষে কেরামত আলী জৌনপুরীর বিভিন্ন লেখা রয়েছে।[২] এ সকল বিবরণী ও উপাদানে দুদু মিয়ার বর্ণাঢ্য কার্যকলাপের চিত্র ফুটে উঠেছে।

---

১ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ জুন ২০০৭), পৃ. ৫৫

২ তাঁর পারিবারিক পরিধিতে তাকে আদর করে দুদু মিয়া ডাকা হতো। সে নামটি পরবর্তী জীবনে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। ওয়াহাবীরা তাকে 'দুদু মিঞা' হিসেবে লিখেছেন। অন্যরা তাঁকে দুদু মিয়া বলেছেন। অথবা "দুদু মিয়ানে"। তার অনুসারীগণ তাকে উস্তাদ দুদু মিয়ান অথবা মওলবী দুদু মিয়া হিসেবে স্মরণ করে থাকে। অনুসারীগণ তাকে শুধু উস্তাদ বা মওলবী বলে থাকে। তিনি নিজের নাম স্বাক্ষর করার সময় সাধারণত: মোহসীন উদ্দীন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া লিখতেন। সর্বশেষ বানানটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এইচ. বেভারিজ দুদুমিয়া এবং তাঁর পিতা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে ফরায়েযী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন। দ্র. Henry Beveridge, *The District of Bakergonj its History and Statistics*(London : Trubner & Co.,1876), p. 254,

### ৫.১.২ দুদু মিয়ার শিক্ষা জীবন

মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া পিতার যত্নে তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। তাঁর পিতা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তাকে বাড়িতে আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষাদান করেন। প্রাথমিক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনের পর বার বছর বয়সী দুদু মিয়াকে মক্কায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রচলিত ধারণা মতে দুদু মিয়া মক্কা যাওয়ার পথে কলিকাতায় কিছু দিনের জন্য অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত তিতুমীরের গ্রামের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি মক্কায় গমন করেন। প্রচলিত ধারণা মতে তিনি পাঁচ বছর পর স্বদেশে ফিরে আসেন। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে সরকারি তথ্যে তাঁকে ফরিদপুর অঞ্চলের শান্তি বিনষ্টকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এতে ধারণা করা হয় যে, তিনি আরও আগেই ফিরে আসেন। এরপর থেকে দুদু মিয়া তাঁর পিতার দলে থাকেন এবং তাঁর পিতার কাছে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। দুদু মিয়ার শিক্ষা জীবন সম্পর্কে এতটুকুই জানা যায়।[৩]

### ৫.১.৩ দুদু মিয়ার পারিবারিক জীবন

মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়াকে একজন দীর্ঘ অবয়ব ও সুঠাম দেহী এবং কাল, লম্বা শ্মশ্রুধারী ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি তাঁর মাথায় লম্বা পাগড়ি পরিধান করতেন।[৪] বর্তমানে প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী দুদু মিয়া ১৮টি বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বলা হয়েছে যে, তিনি এক সঙ্গে চারজনের বেশি স্ত্রী রাখেননি। তাঁর শেষ স্ত্রী ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ মেয়ে। কালা মৃধা গ্রাম (দুদু মিয়ার নিজ গ্রাম বাহাদুরপুর থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত) থেকে তিনি এ মেয়েকে বিয়ে করেন। ঢাকায় মৃত্যুপূর্ব দিনগুলোতে দুদু মিয়ার সঙ্গে তাঁর স্ত্রী অবস্থান করেন এবং দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর তিনি সেখানেই বসবাস করছিলেন। তার মৃত্যুর পর তাকে একই চত্বরে দুদু মিয়ার পাশে দাফন করা হয়।

### ৫.১.৪ সংগ্রামী বাহিনীর সংগঠক

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তাঁর জীবনের শেষের দিকে হিন্দু জমিদারগণের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এর ফলে জমিদার এবং তাঁর অনুচরদের হাত থেকে ফরায়েযী কৃষকদের রক্ষা করার জন্য দক্ষ লাঠিয়াল বাহিনীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে।[৫] এ পরিপ্রেক্ষিতে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) লাঠিয়াল সংগ্রহ করার জন্য তাঁর প্রভাবশালী অনুসারী ফরিদপুরের জালাল উদ্দীন মোল্লাকে দায়িত্ব দেন। মক্কা থেকে ফেরার পর দুদু মিয়া জালাল উদ্দীনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে লাঠিয়ালদের নিয়মিত অনুশীলনের

---

৩ দুদু মিয়া ও তাঁর অনুসারীদের স্থায়ী নিবাস বাহাদুরপুরে একটি তাসবিহ সংরক্ষিত আছে। এটি পরবর্তী ফরায়েযী প্রধান বাদশা মিয়া কর্তৃক সনাক্ত করা হয়। বাদশাহ মিয়ার মতে তাসবিহটা তিতুমীর উপহার হিসেবে দুদু মিয়াকে প্রদান করেন। মক্কা যাওয়ার পথে দুদু মিয়া তা গ্রহণ করেছিলেন এবং তার মৃত্যুর পর স্মৃতি হিসেবে ফরায়েযীদের প্রধানগণ সংরক্ষণ করেন। দ্র. দুদু মিয়ার পরিবারের প্রচলিত তথ্য থেকে।

৪ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*(London : 1884), p. 24

৫ Ibid, p. 25

*Dhaka University Institutional Repository*

ব্যবস্থা করেন। কিছু সময়ের মধ্যেই তিনি লাঠিয়ালদের নিয়ে একটি বড় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলেন এবং এদেরকে দক্ষ যোদ্ধায় পরিণত করেন। উপরোক্ত ঘটনাবলি প্রমাণ করে কেন পুলিশ দুদু মিয়াকে ঘরবাড়ি লুটের জন্য অভিযুক্ত করেছিল। জেমস টেইলর মন্তব্য করেন যে, পুলিশ হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের দিকে তাদের নজরে রাখে।[৬] এ সম্পর্কে আরও দেখা যায় যে, দুদু মিয়ার লাঠিয়াল বাহিনী ঐ সময়ের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। দুদু মিয়ার ছিল প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি এবং কূটনৈতিক প্রজ্ঞা। তিনি ইসলামের অনুশাসনের চেয়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

### ৫.১.৫ ফরায়েযী আন্দোলনের প্রধান হিসেবে দুদু মিয়ার ভূমিকা

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মৃত্যুবরণ করেন। তখন ফরায়েযীগণ মিলিত হয়ে মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়াকে তাদের উস্তাদ বা প্রধান হিসেবে স্বীকার করে। এ নির্বাচন দুদু মিয়ার কর্মজীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাসেও তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর দুদু মিয়ার অপ্রতিরোধ্য শৌর্য প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাঁর পিতা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এতদিন তাঁর রশি টেনে ধরেছিলেন। তিনি চিন্তা করেন যে, ফরায়েযী কৃষকদের উপর জমিদারদের উচ্চাভিলাষী নির্যাতনের বিরুদ্ধে দ্রুত ও দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।[৭] ১৮৪১ এবং ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া দু'টি অভিযান পরিচালনা করেন। একটি অভিযান ছিল কানাইপুরের 'সিকদার' ও অপরটি ছিল ফরিদপুরের 'ঘোষ' জমিদারদের বিরুদ্ধে। দুদু মিয়া এবং তাঁর অনুসারীদের কাছে এ ছাড়া কোনো বিকল্প পথ খোলা ছিল না। বল প্রয়োগ না করে যুক্তির মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হওয়া ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এ অভিযানগুলো সফলতা অর্জন করে। এর ফলশ্রুতিতে দুদু মিয়া আন্দোলনের নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেন, যা ফরায়েযী আন্দোলনকে নবজীবন দান করে। ফরায়েযীগণ দাবি করেন যে, 'সিকদার' এবং 'ঘোষ' জমিদারগণ তাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছে।[৮] 'গো হত্যা' নিবারণের প্রচেষ্টা এবং পৌত্তলিক আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য কর আদায় অর্থাৎ 'দূর্গাপূজা', 'কালিপূজা' করার জন্য কর আদায়ের লক্ষ্যে জমিদারগণ বিভিন্ন ধরনের শারীরিক নির্যাতনের আশ্রয় নেয়। অত্যাচার করা সত্ত্বেও জমিদারগণ এ আন্দোলনের প্রসার রোধ করতে ব্যর্থ হয়। ফরায়েযীগণ জমিদারদের নির্যাতনের উদাহরণ হিসেবে বেশ কয়েকটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো-

(১) নির্দয়ভাবে চাবুক মারা।
(২) বস্ত্রহীন শরীরে লাল পিঁপড়া ছড়িয়ে দেয়া।

৬ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ জুন ২০০৭), পৃ. ৪৮

৭ প্রাগুক্ত।

৮ James Wise, *Eastern Bengal,* Ibid, p. 25

Dhaka University Institutional Repository

(৩) ময়লা গর্তে বুক সমান শরীর পুঁতে রাখা।
(৪) নির্যাতিত ব্যক্তিকে শুইয়ে তাঁর পিঠে পিঁপড়া এবং ঝিল্লি পোকা ছেড়ে দেয়া ও উপুড় করা গামলা দ্বারা আটকিয়ে রাখা।
(৫) অবাধ্য প্রজার শ্মশ্রু বেঁধে নাকে নস্যি হিসেবে লাল মরিচের গুড়া দিত।

এ সকল নির্যাতন করে দুদু মিয়া থেকে ফরায়েযীদের বিচ্ছিন্ন করতে না পেরে জমিদারগণ কুখ্যাত ‘শ্মশ্রু কর’ ধার্য করে। এ কর ইতিপূর্বে চব্বিশ পরগনা জেলায় তিতুমীরের অনুসারীদের উপর হিন্দু জমিদারগণ ধার্য করেছিল। জমিদারদের এ নির্যাতন দুদু মিয়ার ধৈর্যের উপর আঘাত হানে। তিনি এ সকল নির্যাতনের বিরুদ্ধে চুপ করে থাকা সমীচীন মনে করেননি।

### ৫.১.৬ কানাইপুরের সিকদার ও ঘোষ পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযান

১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়া এবং জালাল উদ্দীন মোল্লা কানাইপুরের দিকে অগ্রসর হন। তাদের সঙ্গে ছিল কয়েকশত লাঠিয়াল। এ দলটি জমিদারের প্রাসাদের নিকটবর্তী স্থানে জমায়েত হয়। দুদু মিয়া জমিদারকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে, যদি ফরায়েযীদের সঙ্গে সমঝোতায় না আসে তাহলে জমিদার প্রাসাদের প্রতিটি ইট খুলে ফেলা হবে। সিকদার (জমিদার) অন্য কোনো উপায় না দেখে সমঝোতায় উপনীত হন। জমিদার ফরায়েযীদের উপর শারীরিক নির্যাতন বন্ধ করে এবং অবৈধ ও পৌত্তলিক কর আরোপ করা বন্ধ হবে এ মর্মে ঘোষণা দেন। জমিদারগণ তাদের প্রজারা যাতে ফরায়েযী আন্দোলনে যোগ না দেয়, সে উদ্দেশ্যে নির্দেশ অমান্যকারীদের শাস্তি ও নির্যাতন করে। অত্যাচারের পদ্ধতি ছিল বেদনাদায়ক। কিন্তু অত্যাচারের কোনো চিহ্ন পাওয়া যেতনা। এ পদ্ধতি উভয় পক্ষ থেকেই করা হত। সিকদারদের বিরুদ্ধে সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে দুদু মিয়া ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে ফরিদপুরের শক্তিশালী ঘোষ পরিবারের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযান পরিচালনা করেন। পুলিশ রিপোর্টে ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ :

‘রাত্রে পরিচালিত একটি আক্রমণের প্রকৃতি ছিল গুরুতর। কমপক্ষে ৮০০ ফরায়েযীর একটি দল জয় নারায়ণ ঘোষের বাড়ি আক্রমণ করে এবং সবকিছু লুট করে। এরপর তাঁর ভাই মদন নারায়ণ ঘোষকে অপহরণ করে। ফরায়েযী উপাত্ত অনুসারে দেখা যায় যে, মদন ঘোষকে হত্যা করে পদ্মা নদীতে ডুবিয়ে দেয়া হয়। ওয়াজির আলী লিখেছেন-[৯]

“বারশ সাতাইস সন এই বাঙালার
হিন্দুগণ শত্রু হল মোসালেম উপর।।
গরীব লোকেরে কত মত সাজা দিত।
নাপীত বন্দ দাড়ি বাঁধা সাজা দেলাইত।।

---

৯ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

এই মত সাজা কত মোসলমান পাইল।
মদন ঘোষ জমিদারে মারিয়া ফেলিল।।
প্রকাশ করিয়া দিল খেয়েছি মদন ঘোষে।
সেই হইতে হিন্দুগণ গড়িল তরাশে।।
ইসলামিতে বাধ্য দিতে না উঠিল মন।
সানন্দে এসলামি চলে বাড়িয়া তখন।।”[১০]

এ আক্রমণ ফরায়েযী সম্প্রদায়ের একতা প্রমাণ করে। চারদিক থেকে ফরায়েযীগণ গোপনে হঠাৎ করেই জমায়েত হত এবং আক্রমণের পর একইভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। বেঙ্গল পুলিশ প্রধানের মতে এ আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশোধ নেয়া। তিনি বলেন, ফরায়েযীগণ লুটের উদ্দেশ্যে নয় বরং অত্যাচার এবং জমিদার কর্তৃক করারোপের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই তা করত। ফরায়েযীদের দাখিলকৃত দরখাস্তে বর্ণিত অত্যাচারের এক দশমাংশও যদি সত্যি হয়, তাহলে ঘটনার ভয়াবহতার তীব্রতা কম দেখে আমি বিস্মিত, তাদের বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই। জমিদারগণ ফরায়েযীদের ধর্ম এবং জেনানাদের অবমাননা করার জন্য সব কিছুই করেছিল। এরপর তিনি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য বলেন, ম্যাজিস্ট্রেটকে অবশ্যই কড়া নজর রাখতে হবে।

বিশেষ করে হিন্দু জমিদারদের বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। পূজা খরচের জন্য ধার্যকৃত করসমূহ আদায় না করায়, হিন্দু জমিদারগণ যে কোনো উপায়ে কর উসূল করতে যাওয়ায়, ফরায়েযীদের মধ্যে অসন্তোষ জাগ্রত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ফরায়েযীগণ মনে করে যে, এ সকল কর একজন নাস্তিককে প্রদান করা মানে আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করা। যেখানে একজন জমিদার রায়ত সম্পর্কে কোনো বিবেচনা না করে, কর আদায়ের জন্য যে কোনো উপাত্ত ব্যবহার করছে, সেখানে নির্যাতিতরা ক্ষুব্দ হওয়ার বিষয়টি প্রত্যাশিত। উক্ত ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট ১১৭ জনকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে ১০৬ জনের বিচার হয়। শেষে ২২ জনকে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। প্রচলিত সূত্র অনুযায়ী দুদু মিয়াকে অভিযুক্ত করা হলেও সেশন জজ প্রমাণের অভাবে তাকে মুক্তি দেন। দুদু মিয়ার এ প্রারম্ভিক বিজয়ে সাধারণ মানুষের মনে রেখাপাত করে। এর ফলে ভবিষ্যতে ফরায়েযী আন্দোলনের গতিপথ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

**প্রথমত:** দরিদ্র কৃষক শ্রেণির মধ্যে দুদু মিয়ার সম্মান বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। কৃষক শ্রেণি তো তাকে তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে বিবেচনা করে। এর ফলে তার নাম ফরিদপুর, পাবনা, বাকেরগঞ্জ, ঢাকা ও নোয়াখালির ঘরে ঘরে উচ্চারিত হতে থাকে।

১০ ওয়াজির আলী, *মুসলিম রত্নাহার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭

*Dhaka University Institutional Repository*

**দ্বিতীয়ত:** এ ঘটনা ফরায়েযী আন্দোলনে বাড়তি শক্তি যোগায় এবং যে সকল মুসলিম এতদিন জমিদারগণের নির্যাতনের ভয়ে দূরে ছিল তারাও আন্দোলনে এগিয়ে আসে। সুতরাং এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বেঙ্গল পুলিশ দেখতে পায় যে, দুদু মিয়া প্রায় ৮০,০০০ অনুসারীদের নেতা হিসেবে কৃষক সম্প্রদায়কে এক সূত্রে আবদ্ধ করেন এবং সকলের আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

## ৫.১.৭ জমিদারগণের প্রতিক্রিয়া

জমিদারগণ ফরায়েযী আন্দোলনের ক্রম প্রসারে আতংকিত হয়ে পড়ে। আন্দোলনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হিসেবে ইংরেজ প্রশাসক এবং নীলকরদের মনে আন্দোলন সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে। জমিদারগণের প্ররোচনায় মাদারীপুর নীল কুঠির প্রভাবশালী নীলকর মি. এন্ড্রু এন্ডারসন ডানলপ দুদু মিয়ার ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। জেমস ওয়াইজ বলেন, মি. এন্ড্রু এন্ডারসন ডানলপ দুদু মিয়াকে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার করতে সক্ষম হন এবং তাকে অবৈধ কর্মকাণ্ডের জন্য বিচারের ব্যবস্থা করা হয়।[১১] জেমস ওয়াইজ আরও বলেন যে, দুদু মিয়াকে অবৈধ কার্যক্রম এবং সীমানা অতিক্রমের জন্য ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে এবং লুটের কারণে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে বিচার করা হয়। মামলার তদন্ত করতে এক দারোগাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।[১২] কিন্তু প্রমাণের অভাবে উভয় মামলা থেকে তিনি অব্যাহতি পান। ফরায়েযীগণ যারা অত্যাচারী জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল তাঁরা ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে মি. ডানলপের বিরুদ্ধে দুদু মিয়ার কোনো অভিযানের উল্লেখ করেননি। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ফরায়েযীরা মি. ডানলপের ব্রাহ্মণ গোমস্তাকে আক্রমণ করে। নিম্নে বর্ণিত জেমস্ ওয়াইজের বক্তব্যে দেখা যায় যে, জমিদার এবং নীলকরগণ দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে একই উদ্দেশ্যে জোট বেঁধেছিল। তা ছিল জমিদারদের কায়েমী স্বার্থের উদ্দেশ্যে, তারা যার বিরোধিতার সম্মুখীন হত দুদু মিয়ার পক্ষ থেকে। দুদু মিয়ার পিতার জীবদ্দশায় এ সম্প্রদায়টি দেশের আইনের সংস্পর্শে ছিল। তাঁর আন্দোলনের প্রকৃতির কারণে জমিদার এবং নীলকরগণ তাঁর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়।

১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুরের সরকারি প্রসিকিউটর স্বীকার করেন যে, মি. ডানলপ এবং রায়তদের (জমিদারগণ) মাঝে ফরায়েযী মতবাদ প্রসারে বাধা দেন। এর ফলে দুদু মিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। দুদু মিয়া ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে নীলকরদের অপপ্রচার গ্রহণ করার জন্য কলিকাতায় একটি মহল Calcutta Review তে লিখে যে, '১৪ বছর আগে বারাসতে তিতুমীর যেভাবে সরকারকে বেগ দিয়েছিল ফরায়েযীগণ তাদের মতই একটি দল। এরা বর্তমানে দুদু মিয়া নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ফরিদপুর, ঢাকা এবং বাকেরগঞ্জ জেলায় ব্যাপক প্রতিপত্তি অর্জন করেছে। নিজেদেরকে মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে এবং হত্যা করা হল দলের প্রধান কাজ। তাদের ঐ সকল

১১ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

১২ 'মামলার তদন্তকারী দারোগার নাম মৃত্যুঞ্জয়ী ঘোষ।' দ্র. ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১৩

Dhaka University Institutional Repository

কার্যকলাপ বিচার কার্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফরায়েযীগণ বাংলায় গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে। যদিও এক কোম্পানি সিপাহী তাদের পরাজিত করতে পারবে, তা সত্ত্বেও রক্তপাত ছাড়া তাদের দমন করা সম্ভব হবে না।'[১৩]

জে.ই. গ্যাসট্রেল ছিলেন সার্ভেয়ার জেনারেল এবং রাজস্ব জরিপের সুপার। তিনি দুদু মিয়ার সমসাময়িক ছিলেন এবং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে যশোর, ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জে জরিপ কার্য পরিচালনা করেন। এ কারণে তাঁর কাছ থেকে ফরায়েযী নেতা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর বক্তব্যে দুদু মিয়া সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা সমসাময়িক কোনো সূত্র থেকে প্রমাণযোগ্য প্রতীয়মান হয় না। তিনি বলেন দুদু মিয়া বেশ কয়েকবার অনুসারীদের আমানতের অর্থ তছরূপ করেছিলেন। এছাড়া ধর্মীয় কাজের জন্য তাঁর কাছে গচ্ছিত অর্থ দিয়ে তিনি নিজের জন্য জমি ক্রয় করেন। এরপর তিনি একজন স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এ অভিযোগগুলোর একটির জন্য তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি অভিযুক্ত এবং কারারুদ্ধ হন। তিনি আরও বলেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাকে কলিকাতায় স্থানান্তর করে নিরাপদে বন্দী রাখা হয় মহাবিদ্রোহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত।[১৪]

**প্রথমত:** জেমস ওয়াইজ এবং পুলিশ রিপোর্টের মাধ্যমে জানা যায় যে, দুদু মিয়া কখনও দণ্ডপ্রাপ্ত হননি, যদিও তাকে অভিযুক্ত করে আদালতে মামলা হয়েছিল। তাছাড়া তিনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কখনও জেলে বন্দী থাকেননি। তাকে রাজনৈতিক কারণে কলিকাতা স্থানান্তর করা হয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর শেষ মামলার সময় তাকে কলিকাতার জেলে রাখা হয়। এ সময়ে শোনা গিয়েছিল যে, তাকে হয়ত মুক্তি দেয়া হবে। দুদু মিয়া যদি ৫০,০০০ লোককে প্ররোচনা না দেয় অথবা তাঁর কথা ও হুকুম অনুযায়ী যেখানে সেখানে তৎপরতা না চালায়, তাহলে তাকে মুক্তি দেয়া হতে পারে।[১৫]

**দ্বিতীয়ত:** গ্যাসট্রেল ফরায়েযীদের একটি সূত্র ব্যবহার সম্পর্কে বলেন, ফরায়েযীদের উত্থান সম্পর্কিত বিবরণ ফরিদপুর থেকে এ সম্প্রদায়ের একজন সদস্যের মাধ্যমে আমার কাছে এসেছে। সুতরাং একজন ফরায়েযীর কাছ থেকে তাঁর নেতা সম্পর্কিত কুৎসা আশা করা যায় না যদি সে কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে থাকে। অন্য দিকে ফরায়েযীগণ শেষ পর্যন্ত তাঁকে সমর্থন দিয়ে যায়। যদিও একটি সময়ে তাঁর কিছু অনুসারী তার দল ত্যাগ করে। তবে এটা ঘটেছিল অন্য কারণে। দুদু মিয়ার কিছু কার্যকলাপ তাঁর বেশ কিছু অনুসারীদের পছন্দ হয়নি। দুদু মিয়া একজন ব্রাহ্মণ মেয়েকে নিকাহ্ করার বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। তা সত্ত্বেও দ্বিমত পোষণকারী অনুসারীগণ তাকে ত্যাগ করেনি।

---

১৩ Calcutta Review, voll. vii, Jan-Jun, 1847, p. 199

১৪ J. E. Gastrel, *Jassore, Furreedpore and Buckergonge*, Ibid, pp. 1, 46; ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

১৫ James wise, *Eastern Bengal*, Ibid, p. 25; ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে ফরায়েযীগণ শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করে যে তিনি সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য তাদের কষ্টার্জিত অর্থ মুক্ত হস্তে ব্যয় করেছেন। একটি সময়ে কিছু অনুসারী তাঁর দলত্যাগ করে। দলত্যাগীগণ মক্কায় গমন করে এটা নিশ্চিত করার জন্য যে মাওলানা কেরামত আলীর শিক্ষা ছিল গোড়াপন্থী অন্যদিকে তাদের আধ্যাত্মিক নেতা হলেন ওহাবী মনোভাব সম্পন্ন এবং গোড়াপন্থী। উপরন্তু গ্যাসট্রেল একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হওয়ায় তাঁর ভ্রমাত্মক মত পরবর্তী সময়ের লেখকদের বিভ্রান্ত করে। এদের মধ্যে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার অন্যতম। এভাবে দুদু মিয়া ও ফরায়েযীদের বিরোধী পক্ষ ইংরেজ কর্তকর্তাদের নালিশ করার প্রয়াস পায় এবং সফল হয়। পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদি ও ফরায়েযী সূত্রসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৮৪১ ও ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাগুলোর পর জমিদারগণ ফরায়েযীদের ভয়ে হিংসাত্মক কোনো ঘটনায় না জড়িয়েও ফরায়েযী বিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত ছিল। মি. ডানলপের ব্রাহ্মণ গোমস্তা ছিল কালিপ্রসাদ কাঞ্জিলাল।[১৬] মূলফতগঞ্জ থানার পাঁচ্চর নীলকুঠির এ গোমস্তা ফরায়েযীদের বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকে। ফরায়েযী সূত্রানুসারে এ ব্যক্তি দুদু মিয়ার ঘোর বিরোধী ছিল। তাঁর ইংরেজ মালিকের ছত্রছায়ায় সে ফরায়েযীদের উপর অত্যাচার অব্যাহত রাখে। ফরায়েযীগণ মনে করে যে, কালি প্রসাদ ছোট জমিদারের মতোই আচরণ করে এবং নীল চাষীদের উপর নির্যাতন করে। চাষীদের অনেকেই ছিল ফরায়েযী। সে ফরায়েযী চাষীদের উত্তম ধানী জমিগুলোতে নীলচাষ করার জন্য নির্দেশ দেয়। অবাধ্য চাষীদেরকে মরিচের গুড়া দিয়ে তৈরি নৈস্য দিয়ে শারীরিক নির্যাতন করে এবং শুশ্রুকর ধার্য করে। জমিদারগণের সঙ্গে বিরোধের সমঝোতা হওয়ার পর দুদু মিয়া এ কুখ্যাত গোমস্তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। দুদু মিয়ার একজন প্রভাবশালী অনুসারী নারায়নগঞ্জ জেলার অধিবাসী কাদির বখস জানকে গোমস্তার বিপক্ষে অভিযান পরিচালনা করার জন্য নির্দেশ দেন। এ সময় দুদু মিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সহ গ্রামে যান বুনো মহিষ ও ষাড় শিকার করার জন্য যে বিবরণ দিয়েছেন তা নিম্নে বর্ণিত হল :

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর তারিখে সশস্ত্র ব্যক্তিদের একটি বড় দল পাঁচ্চর নীলকুঠি আক্রমণ করে পুড়িয়ে দেয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো তছনছ করে স্থান ত্যাগ করে। ব্রাহ্মণ গোমস্তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় এবং বাকেরগঞ্জ জেলায় তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এ বিষয়ে বেভারিজ এর সঙ্গে ওয়াইজের বিবরণের মিল রয়েছে। বেভারেজ একজন ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠির উপর ভিত্তি করে লিখেন যে, কাঞ্জিলালের দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং প্রচলিত কাহিনীতেও কাঞ্জিলালকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস দেখা যায়। জেমস্ ওয়াইজের মতে মি. ডানলপের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার অভিপ্রায় থেকেই এ আক্রমণ সূচিত হয়েছিল। ওয়াইজ আক্রমণের তাৎক্ষণিক কারণ সম্পর্কে কিছু বলেননি। কিন্তু দুদু মিয়ার সঙ্গে মি. ডানলপের শত্রুতার কথা উল্লেখ

১৬ James wise, *Eastern Bengal*, Ibid, p. 25-26; ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

করেন। এ কারণে দুদু মিয়া অনুচরদেরকে তাঁর নির্দেশ পালন করতে বলেন। যাহোক, দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, ১২৫৩ বঙ্গাব্দের ৩০ ভাদ্র তারিখে পাঁচ্চর ঘটনার দুইমাস ২০ দিন পূর্বে বাহাদুরপুরে একই ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছিল। পাঁচ্চর ঘটনা ঘটেছিল ১২৫৩ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ। বাহাদুরপুরে মি. ডানলপের গোমস্তা এবং পাঁচ্চরবাসী হিন্দু বাবু ও জমিদারগণ ৭০০ থেকে ৮০০ ব্যক্তি নিয়ে দুদু মিয়ার বসতবাড়ি আক্রমণ করেছিল।

সেশন জজের কাছে দেয়া জবানবন্দীতে দুদু মিয়া বলেন, তাঁরা আমার বাড়ির সম্মুখের দরজা ভেঙ্গে ৪ জন প্রহরীকে হত্যা করে এবং অন্যান্যদেরকে মারাত্মকভাবে আহত করে। তারা নগদ একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পদ লুট করে। মৃত ব্যক্তিদের গোপন করে এবং অবৈধ জমায়েতের অভিযোগ করে আহতদেরকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। পুলিশ কর্মকর্তা আহতদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে ন্যস্ত করে এবং অভিযোগ দায়ের করে। এদের মধ্যে আমির উদ্দীন হাসপাতালে মারা যায়। ম্যাজিস্ট্রেট এ মামলায় কোনো আগ্রহ প্রদর্শন করেনি। অন্যদিকে মি. ডানলপের দলের অভিযোগের ভিত্তিতে দারোগা বাহাদুরপুর অভিযোগ তদন্ত করার জন্য আসেন। দুদু মিয়ার অনুসারীদের অবৈধ জমায়েতের বিষয়ে তদন্ত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। দুদু মিয়ার পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে বিরোধী পক্ষ দারোগাকে ঘুষ প্রদান করে এবং দুদু মিয়াকে অপহরণ করে পাঁচ্চরে নিয়ে যায়।

ওখানে তাকে দুইদিন আটকিয়ে রাখে যাতে সে দারোগার কাছে কোনো অভিযোগ নথিভুক্ত করতে না পারে। তদন্ত রিপোর্টে হিন্দু দারোগা হিন্দু জমিদারদের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতির কারণে উল্লেখ করে যে, দুদু মিয়া তদন্তকালীন সময়ে অনুপস্থিত থাকে। দুদু মিয়া বলেন যে, তিনি পাঁচ্চর থেকে মুক্তি পেয়ে সরাসরি ফরিদপুর শহরে যান এবং এখানে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি আবেদন পত্র জমা দেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সে আবেদন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। ম্যাজিস্ট্রেট দুদু মিয়াকে পরামর্শ দেন লিখিত সমঝোতায় স্বাক্ষর প্রদানের জন্য। কিন্তু দুদু মিয়া এ প্রস্তাব বার বার প্রত্যাখ্যান করায় মেজিস্ট্রেট তদন্ত করার জন্য রাজি হন এবং শিবচরের দারোগাকে রাস্তা মেরামতের জন্য নির্দেশ দেন। এ প্রক্রিয়ার মধ্যে দুদু মিয়া ঢাকা ও ফরিদপুর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তদন্তের জন্য চাপ দিতে থাকেন। এর মধ্যে প্রায় আড়াই মাস অতিক্রান্ত হয়। ১২৫৩ বঙ্গাব্দের ১৯ অগ্রহায়ণ পাঁচ্চর ঘটনার দুইদিন পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সহচরদের নিয়ে ঢাকা থেকে গ্রামে যান। বন্য ষাড় শিকারের উদ্দেশ্যে তিনি ঐ স্থানে গমন করেন।[১৭]

গ্রামে একটি তাঁবুতে তিনি কোর্ট স্থাপন করেন যেখানে দুদু মিয়া এবং তাঁর অনুসারীগণ ১৬ অগ্রহায়ণ অপেক্ষা করছিল। ২০ অগ্রহায়ণ ম্যাজিস্ট্রেট একটি ষাড় শিকার করে ঢাকায় ফিরে যান এবং দুদু মিয়া অন্যান্যদের কথা দেন যে তিনি শীঘ্রই আবার ফিরে আসবেন এবং তাদের মামলা গ্রহণ করবেন। ২১

১৭ Henry Beveridge, *The District of Bakergonj its History and Statistics*, Ibid, p. 399

*Dhaka University Institutional Repository*

অগ্রহায়ণ পর্যন্ত দুদু মিয়া গ্রামে উপস্থিত থাকেন। উক্ত দিন সকালে পাঁচ্চর ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্তু যখন ম্যাজিস্ট্রেট ফিরে আসেননি তখন দুদু মিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের অধস্তন কর্মকর্তার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ঢাকার দিকে রওয়ানা হন। ২২ অগ্রহায়ণ ভোরবেলা নৌকা যোগে দুদু মিয়া ঢাকায় পৌঁছেন। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের বসতবাড়িতে পৌঁছানোর পর ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর প্রতি রুষ্ট হন। এর কারণ হিসেবে দুদু মিয়া বলেন তাঁর দাঁড়ি দর্শন করে কিছু মহিলা ভয় পেয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট তাকে গ্রামে ফিরে যাওয়ার জন্য আদেশ দেন এবং তাঁর অভিযোগের শুনানি গ্রহণ করবেন বলে জানান। সুতরাং দুদু মিয়া পাড়া গ্রামে ফিরে আসেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট ২৩ অগ্রহায়ণ সেখানে যান। পাঁচ্চরের ঘটনায় দুদু মিয়ার কোনো কিছু করার সুযোগ ছিল না। কারণ পাঁচ্চর ছিল পাড়া গ্রাম থেকে নৌকায় দেড় দিনের দূরত্ব।

তাছাড়া ঘটনা ঘটেছিল ২১ অগ্রহায়ণ। যেভাবেই হোক মি. ডানলপ ২৩ অগ্রহায়ণ দুদু মিয়া এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করেন। এ অভিযোগের বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এডওয়ার্ড ডি লাটোর প্রমাণ করেন যে, মেজিস্ট্রেট মি. ডানলপের সঙ্গে তাঁবুতে আহার করেন। এ সময়ে বিষয়টি নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং এরপর তাঁর নিজের কিছু ব্যক্তিদের সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে দুদু মিয়াকে সেশন কোর্টে পাঠান।[১৮] মি. ডিলাটোর মনে করেন যে, দুদু মিয়ার বাসগৃহে আগমনের পাল্টা হিসেবে মি. ডানলপের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হয়। এ বিষয়ে এইচ, বেভারিজও মি. ডিলাটোরের মতের সঙ্গে একই মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন যে, ফরায়েযী কৃষক শ্রেণি কাঞ্জিলালকে অত্যাচারী বিবেচনা করেই অপহরণ করেছিল। ফরায়েযী সূত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফরায়েযী কৃষক শ্রেণি কাঞ্জিলালের বিরুদ্ধে যেমন ক্ষুব্ধ ছিল তেমনি ডানলপের বিরুদ্ধে দুদু মিয়ার ক্ষোভও ছিল। উদাহরণস্বরূপ ওয়াজির আলী লিখেছেন:[১৯]

ফরিদপুর জিলাধীন পাঁচচর পর।
বাঙ্গালার নীলকুঠি ছিল তথা বড়।
কালী কাজলিয়া ছিল কর্মচারী বড়।
উৎপীড়ন করিত বর মোসলমান পর।।
একদিন মিয়ার শিষ্য কাদের বক্স জান।
দুদু মিয়ার এসারায় লিয়া সুবিদান।
বেইমানের তরে সবে মারিয়া ফেলিল।

এ ঘটনায় দুদু মিয়া এবং তাঁর ৬৩ জন অনুসারীকে ফরিদপুরের সেশন জজ কোর্টে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিচার করা হয়। কিন্তু কলিকাতায় নিজামত আদালতে আপিল করার পর তাদের সকলকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। জানা যায় এ ঘটনাকে গৌরবান্বিত করার জন্য পুঁথি রচনা করা হয় যা

১৮ Parlamentary pappers, vol. xiiv, 1861, Indigo Commission Extract From Minute of Evidence, p. 256, Argument No. 3917

১৯ Session Judge, *Trial of Dudu Miyan,*( Calcutta : 1848), Ibid, p. 47

*Dhaka University Institutional Repository*

বর্তমানে দুর্লভ শুধু মাত্র কয়েকটি লাইন উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরার (বর্তমান কুমিল্লা) একজন বৃদ্ধ ফরায়েযী থেকে যা নিম্নরূপ:[২০]

কবিতাতে বাঁধিয়া করিলাম প্রচার।
সেই মূল্লুকের ধন্যমান না জাই সিকদার॥
তারা কাঁছাখোলা, জোলার পোলা, খাটি মোসলমান।
দুদু মিয়া নিয়া তাগ্যে দিল বস্ত্রদান।
তোমরা চল্যা ঘরে যাও কাবিলা নাও কাইও মুখের বানী
এই মত জারে ভাই ওস্তাদের নিশানী॥
ওস্তাদ দুদু মিঞা। দুদু মিয়া তাম দিয়া রাজ্যভালা করে॥
ছোট লোকের হাতে লাঠি ফাল ফারিয়া ফিরে।
তাতে কমলা ছোঁচা পোক্কা মোছা ছদরী বাড়ী যার।
লাল মনিয়ার পুকুরেতে হামেশা ঘুরায়॥
তাতে কব কত মষের মত কত ঘর পাড়া।
দুদু মিয়া শিমুলিয়ার গাঁও কইরা দিল ছাড়া॥

মামলার বিবরণ অনুযায়ী দুদু মিয়াকে অভিযুক্ত করা হয় একটি বৃহৎ দলকে প্ররোচনা, পরামর্শ সরাসরি নির্দেশ এবং ভাড়াটে সংগ্রহ করার জন্য। এ ছাড়া এ দলটি ছিল হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) বা ফরায়েযীদের অন্তর্ভুক্ত। দলটি মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঙ্গার উদ্দেশ্যে বলপূর্বক মি. ডানলপের নীল ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করে। এ ছাড়া এ দলটি পাঁচ্চর গ্রামের বিভিন্ন দোকান, মি. ডানলপের কাচারি এবং খাড়াকান্দির হাদানুল্লাহর বাড়ি তছনছ করে। এ কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭,০০০ টাকা। নীল ফ্যাক্টরি ও মি. ডানলপের কাচারি পুড়িয়ে দেয়া হয়। এছাড়া হিন্দু জমিদারদের ৪০টি কাঁচাবাড়িও পোড়ানো হয়। এ সময়ে কয়েকজনকে আহত করা ছাড়াও মি. ডানলপের গোমস্তা কালিপ্রসাদ কাঞ্জিলালকে অপহরণ করা হয়। এরপর থেকে তার কোনো খোঁজ অথবা তাকে কোথাও দেখা যায়নি এবং তার বন্ধুগণও কোনো সন্ধান দিতে পারেনি। মি. ডানলপকে এ আক্রমণের তাৎক্ষণিক কারণ কি জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, গত নীল কাটার মওসুমে দুদু মিয়া তাঁর লোকদের মাধ্যমে আমাদেরকে নীল না কাটার জন্য অনেকবার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিরাপত্তা চান বলে জানান। এ বিষয়গুলো ছাড়া তিনি অন্য বিশেষ কিছু স্মরণ করতে পারছেন না বলে মি. ডানলপ উল্লেখ করেন। ডানলপ কর্তৃক দুদু মিয়ার বাসগৃহে আক্রমণের বিষয়টি মামলার বিবরণে উল্লেখিত হয়নি। ফৌজদারি কোর্টের মুহরি বরুণ চন্দ্র রায় দুদু মিয়াকে

২০ 'উপরোক্ত স্তবক স্পষ্টত:ই একটা পুঁথির অংশ। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস গ্রন্থের লেখকের সফর চলাকালে ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলার সদর মহকুমা থেকে সংগৃহীত। মহকুমার বজরিখোলা নিবাসী মুনসী ইরফানউদ্দীনের স্মৃতি থেকে। শিমুলিয়া ছিল মি. ডানলপের পাঁচ্চর কুঠির সন্নিহিত গ্রাম। এ গ্রামে উক্ত কুঠির শ্রমিক এবং লাঠিয়ালগণ বাস করত। নীল ফ্যাক্টরি ধ্বংস করার পর ফরায়েযীগণ শিমুলিয়া তছনছ করে যা উপরোক্ত পুঁথিতে বর্ণিত হয়েছে।' উদ্ধৃত: ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

*Dhaka University Institutional Repository*

ঘটনার সঙ্গে জড়াতে চেষ্টা করে। মুহরির সেশন জজের কাছে দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে কিছু যুক্তি প্রদর্শন করে।

**প্রথমত:** পাড়াগ্রামের নিকট মাহতাবপুরে বেশ কিছু লোক জমায়েত হয়। এ জমায়েতটি ছিল পাঁচ্চর ঘটনার কিছুদিন আগের। এখানে দুদু মিয়া উপস্থিত ছিল এবং আক্রমণের জন্য নির্দেশ দেয়। এ জমায়েতের এবং আক্রমণের নেতৃত্বে ছিল জাহিদ খান।

**দ্বিতীয়ত:** ঘটনার পূর্বের দিন রাতে কিছু দাঙ্গাবাজ দুদু মিয়ার বাড়িতে (বাহাদুরপুর) জমায়েত হয়। দুদু মিয়া রাতের অন্ধকারে বের হয়ে পাঁচ্চর আক্রমণে অংশ নেয়।

**তৃতীয়ত:** দুদু মিয়া এবং তাঁর অনুসারীগণ মনে করে তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী নয় এমন ব্যক্তিদের আক্রমণ করা পাপ নয়।[২১]

**চতুর্থত:** মি. ডানলপ বলেন যে এ আক্রমণটি যে দুদু মিয়ার দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল তা 'দিবালোকের মত স্পষ্ট। ৬৭ জন সাক্ষীর মধ্যে মাত্র একজন সাক্ষী মনে করে যে এ আক্রমণটি বাহাদুরপুর গ্রামবাসীদের দ্বারা পরিচালিত হয়নি। কিন্তু যারা আক্রমণে অংশ নেয় তারা দূরাঞ্চল থেকে এসেছিল। সে আরও বলে, ঘটনার পর অন্যান্যদের কাছ থেকে জানা যায় না যে, আক্রমণকারীগণ আগের রাতে বাহাদুরপুর গ্রামে জমায়েত হয়। দুদু মিয়ার গোপন খবরের ভিত্তিতে নারায়নগঞ্জের 'জান' নামক এক স্থান থেকে একটা দল পাঁচ্চরের উদ্দেশ্যে রাতে রওয়ানা দেয়। ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দলটি পায়ে হেঁটে এবং লাঠি সোটা ছাড়াই অগ্রসর হয়। পাঁচ্চরের অনতিদূরে পদ্মা নদী পার হয়ে দলটি অপর একটি দলের সঙ্গে মিলিত হয়। পূর্ব নির্দেশ মত দলটিকে বর্শা, কুঠার ও লাঠি সরবরাহ করা হয়।

সূর্য উঠার সময়ে দলটি একত্রিত হয়ে আক্রমণ পরিচালনা করে। কাজ সুষ্ঠুরূপে সমাধান করে দলটি আবার ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়। লাঠি সোটা ফেলে ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দলটি সাধারণ ব্যক্তিদের মত হেঁটে সরাসরি নারায়নগঞ্জে ফিরে আসে। মামলায় উত্থাপিত ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ ছিল অনুমান নির্ভর। পুলিশ অভিযোগের সমর্থনে অনেক জাল কাগজপত্র আদালতে পেশ করে। দুদু মিয়ার চাতুর্যপূর্ণ কর্মকাণ্ডে মি. ডানলপ এবং হিন্দু বাবুরা হতবিহ্বল হয়ে পড়ায় উক্ত কাগজপত্রের কিছু অংশ ঘটনার এক অথবা দুই সপ্তাহ পরে প্রস্তুত করে দাখিল করতে বাধ্য হয়। উপরন্তু সরকারি উকিল এবং পুলিশ ঘটনার গভীরে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। দুদু মিয়া এবং আত্মপক্ষ সমর্থনকারীদের পক্ষ থেকে মামলার বিবরণ অস্বীকার করতে কোনো বেগ পেতে হয়নি। দুদু মিয়ার জোরালো যুক্তি প্রদর্শনের ফলে ঘটনার বিষয়বস্তু কল্পনাপ্রসূত বলে ধারণা জন্মে।

মামলার সাক্ষী প্রমাণ আইন কর্মকর্তা মওলভী আব্দুল ওয়াহিদের ফাত্ওয়ার মাধ্যমে ঢাকার সেশন জজ হেনরি সোয়েটানহাম দুদু মিয়ার ৪৮ জন অনুসারীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করেন। কিন্তু বড় ধরনের শাস্তি প্রদান করার বিষয়ে তাঁর ক্ষমতা সীমিত হওয়ায় জজ মামলার কাগজপত্র অনুমোদনের

২১ Session Judge, *Trial of Dudu Miyan,* Ibid, p. 313

*Dhaka University Institutional Repository*

জন্য ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে কলিকাতার সদর নিজামত আদালতে প্রেরিত হয়। নিজামত আদালত ব্যবহৃত সাক্ষী প্রমাণাদির প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হয় এবং ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বরে সেশন জজের রায় নাকচ করে দেন। এ সঙ্গে মন্তব্য করা হয় যে, মামলায় ব্যবহৃত ঘটনার বিবরণ অংশত সম্পূর্ণ অবাস্তব ভ্রান্ত এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয় যে ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ঢাকার অতিরিক্ত সেশন জজ মি. লংম্যান যেভাবে মামলার রায় প্রদান করেছিলেন তাঁর সঙ্গে বর্তমানটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সে সময়ে বন্দী দুদু মিয়া ও তাঁর অনেক অনুসারীদের বিচার করা হয়েছিল এবং অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল।[২২] মামলায় পরাজিত হওয়া ছিল মি. ডানলপ ও হিন্দু বাবুদের জন্য মরণাঘাত স্বরূপ। দুদু মিয়ার অনুসারীগণের কাছে এটা ছিল নির্যাতিত কৃষকদের বিজয়। এডোয়ার্ড ডিলাটোর ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন সময়ে ফরিদপুরের ডেপুটি কালেক্টর এবং জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ পান, মনে করেন যে যদিও ডানলপের ফ্যাক্টরির উপর দুদু মিয়ার আক্রমণ ছিল প্রতিশোধ স্বরূপ, তা সত্ত্বেও তাকে মি. ডানলপের চেয়ে বেশি দায়ী বলা যায় না। মি. ডানলপের নীতিহীনতা এবং নির্যাতনের ফলেই 'ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দুদু মিয়ার সংঘাত শুরু হয়। তিনি মনে করেন যে একজন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের মর্যাদাহীন কার্যকলাপের কারণে স্থানীয় জনগণের কাছে ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

স্থানীয় জনগণ যখন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের আওতাধীন এলাকার নীতিহীন কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে, তখন তাদের মধ্যে বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা থাকতে পারে না। দুর্নীতি, ব্রিটিশ আদালতের কার্যকরহীন ভূমিকা ও প্রশাসনের বিশৃংখল অবস্থার কারণে ফরিদপুর ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে ফরায়েযী খিলাফত ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা অর্জন করে বলা যায়। কালিপ্রসাদ কাঞ্জিলালের বিরুদ্ধে সফল অভিযানের ফলশ্রুতিতে দুদু মিয়ার পথ থেকে শেষ বাধাটি দূর হয়। এরপর থেকে ফরায়েযীগণ নির্ভয়চিত্তে মাথা উঁচু করে চলাফেরা করার সুযোগ পায়। জমিদার অথবা নীলকরদের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা দূর হয়। এর ফলে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে দুদু মিয়া এলাকার শান্তি উপভোগ করেন বলে প্রতীয়মান হয়।

### ৫.১.৮ দুদু মিয়ার কারাবরণ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মহাবিদ্রোহের বা প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা ঘটলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দুদু মিয়াকে গ্রেফতার করে এবং তাকে কলিকাতায় আলীপুর জেলে বন্দী রাখা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করা হয়নি। তাঁকে (দুদু মিয়া) মুক্তি দেয়া হতে পারে যদি তিনি তাঁর ৫০,০০০ জন অনুসারীদের উত্তেজিত না করেন অথবা তাঁর ইচ্ছেমত কোথাও অগ্রসর হতে না দেন বলে অঙ্গীকার করেন। দুদু মিয়াকে গ্রেফতারের কারণ সম্ভবত মি. ডাম্পিয়ারের পুলিশ রিপোর্ট।[২৩] ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে

---

২২ Session Judge, *Trial of Dudu Miyan,* Ibid, p. 311-313

২৩ J.E Gastrell, *Fureedpore and Buckargong* p. 36

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রেরিত এ পুলিশ রিপোর্টে দুদু মিয়াকে ওয়াহাবী নেতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয় যে, তিনি ৮০,০০০ জন ব্যক্তির নেতৃত্বে ছিলেন। এ রিপোর্টে তাঁর গ্রেফতারের ভিত্তি রচনা করে। তবে দুদু মিয়ার গ্রেফতারের কারণটি ছিল রাজনৈতিক। যখন বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে তখন ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাকে কলিকাতা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু দুদু মিয়া যখন বাড়ি পৌছেন তখন ফরিদপুর পুলিশ তাকে আবার গ্রেফতার করে এবং ফরিদপুর হাজতে আটক রাখে। জে, ই, গ্যাসট্রেলের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তাঁর এ গ্রেফতারের বিষয়টি ছিল ষড়যন্ত্রমূলক। গ্যাসট্রেল বলেন দুদু মিয়ার জেলায় ফিরে আসার পর তাকে চাতুরতার সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় ফরিদপুর থানার একজন দারোগা কিছু পুলিশকে দুদু মিয়ার আস্তানায় পাঠায় এবং তারা ফরায়েযীদের দলে যোগ দেয়ার প্রস্তাব করে। দুদু মিয়া এ প্রস্তাব শুনে কিছু সন্দেহ না করে এদের সঙ্গে আস্তানা ত্যাগ করেন। এরপর তাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করে নৌকায় নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে দারোগা অপেক্ষা করছিল। দুদু মিয়াকে ফরিদপুর নিয়ে যাওয়া হয় এবং নিরাপদে জেলে রাখা হয়।

এবারের গ্রেফতারের কারণও বলা হয়নি। গ্যাসট্রেল শুধু বলেন, যখন তাকে মুক্তি দেয়া হয় তখন চরম উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে দুদু মিয়া ঢাকায় আশ্রয় নেন। এখানে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন।[২৪] উপরোক্ত মন্তব্য থেকে

**প্রথমত:** ধারণা করা যায় যে, দুদু মিয়া ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মুক্তি পান।

**দ্বিতীয়ত:** মন্তব্যের ভাষা থেকে ধারণা করা যায় যে, দুদু মিয়াকে কোর্টে হাজির করা ছাড়াই পুলিশের কাছ থেকে মুক্তি দেয়া হয়। এ গ্রেফতার এবং হাজতবাসকে পুলিশ কর্তৃক অন্তরীন রাখা বলা যেতে পারে।

### ৫.১.৯ দুদু মিয়া কর্তৃক সূচিত সংগ্রামের প্রকৃতি

দুদু মিয়ার জীবন থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে ধারণা করা যায় যে জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে তাঁর বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল মূলত ফরায়েযী কৃষকদেরকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য। ইউরোপীয় লেখকগণ অবশ্য তাকে দস্যুতা, আইন অমান্যকারী ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করেছে।[২৫]

১. বেঙ্গল পুলিশের কমিশনার মি. ডাম্পিয়ার অভিযোগ করেন যে, ফরায়েযীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শাসকদের বহিষ্কার করে মুসলিম শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তিনি দুদু মিয়াকে একজন বিপদজনক ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং যাবজ্জীবন নির্বাসন দেয়ার

---

২৪ W. W. Hunter, *Indian Musalmans*, Ibid, p. 101-109

২৫ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশ করেন। এ ছাড়া ফরায়েযী সম্প্রদায়ের উপর নজর রাখার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

২. ক্যালকাটা রিভিউর একজন লেখক পূর্ববতী সময়ে তিতুমীরের গোলযোগের সঙ্গে দুদু মিয়ার একটি যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন। এ লেখায় দুদু মিয়াকে একজন অপরাধী এবং শান্তি বিনষ্টকারী হিসেবে চিহ্নিত করে।

৩. মওলানা কেরামত আলী ও দুদু মিয়াকে এইচ. বেভারিজ বাকেরগঞ্জ জেলার যে কোনো জজ বা ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবশালী বেসরকারি ব্যক্তি বলে মনে করেন। তিনি অবশ্য দুদু মিয়ার চরিত্রকে পাপাচারে দূষিত বলে মনে করেন এবং তিনি তাঁর প্রভাবকে জনকল্যাণমূলক বলতে রাযি নন।

৪. জেমস ওয়াইজ বলেন যে, দুদু মিয়া তাঁর আইন বিরোধী কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজের চরিত্রকে ক্রমাগত অধঃপতিত করেছেন। তাঁর পক্ষে দুদু মিয়ার ১৮৩৮, ১৮৪১, ১৮৪৪ এবং ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের বিচারের উদাহরণ উল্লেখ করেন।[২৬] এ বিচারগুলো সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন বাধা, যেগুলোর বিরুদ্ধে দুদু মিয়া আন্দোলন করেছেন সেগুলো যদি পরীক্ষা করা হয় তাহলে উক্ত অভিযোগগুলো অসার এবং অনভিপ্রেত মনে হবে।

**প্রথমত:** মোহসিন উদ্দিন আহমেদ দুদু মিয়া যে বিদ্রোহী ছিলেন তা কখনও প্রমাণিত হয়নি। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় ড. মল্লিক বলেন, আমরা এখানে দুদু মিয়া কর্তৃক ব্রিটিশ শক্তির পরিবর্তে মুসলিম রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার কোনো মনোভাব দেখতে পাই না। শুধু মাত্র একটি গুজবের উপর ভিত্তি করে ফরিদপুরের জয়েন্ট মেজিস্ট্রেট ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ শে জুন একটি পত্রে উল্লেখ করেন যে, ফরায়েযীগণ ওয়াহাবীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গোলযোগ সৃষ্টি করতে যাচ্ছে।

**দ্বিতীয়ত:** ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে, হিন্দু জমিদার ইউরোপীয়ান নীলকর এবং তাদের অধীনস্তরা কৃষক সমাজকে অসহনীয় নির্যাতন এবং করভাবে জর্জরিত করেছিল। আমরা অন্যস্থানে লক্ষ্য করেছি যে, ফরিদপুরের জমিদারবর্গ তাদের প্রজাদের উপর কম করেও ২০টি অবৈধ কর ধার্য করেছিল। এ সকল কর ছিল নিয়মিত খাজনার অতিরিক্ত। প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের নেতা হিসেবে দুদু মিয়া এ ধরনের অত্যাচার নীরবে মেনে নিতে না পারার কারণে জমিদার নীলকরদের সঙ্গে তিনি বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর অনুসারীদের দ্বারা সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাবলী ছিল, এ সকল অত্যাচারী পদক্ষেপ থেকে ফরায়েযী কৃষকদের রক্ষা করার জন্যে। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পাঁচ্চর ঘটনায় একজন ব্যক্তিও নিহত না হওয়ায় বিষয়টি ফরায়েযী আন্দোলনের একটি ইতিবাচক দিক।

২৬ Session Judge, *Trial of Dudu Miyan,* Ibid, পরিশিষ্ট পৃ. xxvii-xxxiv

*Dhaka University Institutional Repository*

**তৃতীয়ত:** তিতুমীরের জীবনী লেখক বিহারীলাল সরকারের মতে ফরায়েযী আন্দোলনের সময়ে ব্রিটিশ প্রশাসন গ্রাম বাংলায় তখনও কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর ফলে জমিদারগণ তাদের ইচ্ছানুযায়ী স্বেচ্ছারী ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ পায়। মাদারীপুর মহকুমার প্রশাসনিক প্রধান ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দেও মনে করেন যে, সরকার জমিদারগণের নির্যাতনের হাত থেকে ফরায়েযী কৃষকদের রক্ষা করতে পারেনি। ডিলাটোরের বক্তব্য থেকে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অত্যাচারী জমিদার এবং নীলকরদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা দুদু মিয়ার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। তিনি অন্যভাবে বলেন ফরিদপুরের ছিল তেমনি একটি বিশৃংখলা অবস্থা যে জেলায় আমাকে পাঠানো হয়। এ স্থানান্তর আমার ভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের কারণে। এ অবস্থায় দুদু মিয়া বাধ্য হয়েই কিছুটা দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে ছিলেন, যা নির্যাতিত কৃষক শ্রেণির কল্যাণের জন্য নেয়া হয়েছিল।

**চতুর্থত:** এইচ বেভারিজ মনে করেন যে, ফরায়েযীগণ ওয়াহাবীদের মতো বিপদজনক রাজনৈতিক মত পোষণ করে না। তাদের মতাদর্শিক চিন্তা ধারা ছিল জমিদারগণের করারোপ সম্পর্কিত পদক্ষেপের বিরোধিতা করা। অপর দিকে তিনি দেখান যে, হিন্দু জমিদারগণ ফরায়েযীদেরকে রাজনৈতিকভাবে 'বিপদজনক' মনে করে, কিন্তু এ ধরনের সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল না। তিনি অনুভব করেন যে, ফরায়েযীগণ সাধারণ মুসলিমদের চেয়ে অধিক ধর্মান্ধ ছিল, যা তাদের চরিত্রের অবমূল্যায়ন করে না।

**পঞ্চমত:** যদিও হান্টার ফরায়েযীদেরকে আপোষহীন বলে অভিযোগ করেন। তা সত্ত্বেও তিনি এদেরকে শান্তিপ্রিয় কৃষক এবং ব্যবসায়ী হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে ফরায়েযীগণ ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রদর্শন করছে না। তাদেরকে ব্রিটিশ বিরোধী অভিযোগে অভিযুক্ত করা অন্যায়। তাদের অধিকাংশই স্থানীয় কৃষিজীবী এবং অল্প সংখ্যক ছিল ব্যবসায়ী। এ ব্যবসায়ীগণ চামড়া রফতানি কারক ছিল, এ সম্প্রদায়ের সকলেই নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে ছিল নিষ্ঠাবান।[২৭] সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, তিতুমীরের মতোই দুদু মিয়া হিন্দু জমিদার এবং নীলকরদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত হানেন এবং একটি বিপদজনক পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়েন। এ পরিস্থিতি শুধু তাঁর জীবনের প্রতিই নয় বরং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত সংস্কার আন্দোলনের প্রতি হুমকি স্বরূপ ছিল। দুদু মিয়া তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের দ্বারা এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন যা তিতুমীর করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

## ৫.১.১০ দুদু মিয়ার মৃত্যু

মোহসিন উদ্দীন আহমেদ দুদু মিয়া ঢাকা শহরের বংশাল রোডে বাস করতেন। এখানে তিনি প্রায়শ অসুস্থ থাকেন। অবশেষে তিনি ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত ২৪ সেপ্টেম্বর ১২৬৮ বঙ্গাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২৮] তাকে ১৩৭ বংশাল রোডে অবস্থিত তাঁর বসত বাড়ির পিছনে দাফন করা হয়। তাঁর সমাধিটি এখনও সমতল অবস্থায় বিদ্যমান। সমাধিটিতে চারদিকে লম্বালম্বিভাবে ইট ও সিমেন্টের মিশ্রণ দিয়ে

২৭ Sir William Wilson Hunter, *The Indian Musalmans*, Ibid, p. 339
২৮ J.E Gastrell, *Jessore, Fureedpore and Buckargong,* Ibid, p. 33

Dhaka University Institutional Repository

দেয়াল তৈরি করা আছে। উপরে বর্ণিত প্রমাণাদি দ্বারা হেদায়েত হোসেন এর অভিমত দুদু মিয়া ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর বাহাদুরপুরে মৃত্যুবরণ করেন।[২৯] এবং এ স্থানেই তাঁকে দাফন করা হয় এবং কিছু দিনের মধ্যেই আড়িয়াল খাঁ নদী তাঁর কবর ও তাঁর বসতবাড়ি নিশ্চিহ্ন করে দেয়া, সঠিক নয় বলে প্রমাণ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া পিতার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে ফরায়েযী আন্দোলনের কাণ্ডারির ভূমিকা পালন করেন। ক্ষণজন্মা এ বীর সংগ্রামী তাঁর সারাটা জীবন অতিবাহিত করেন তৎকালীন জমিদার ও বৃটিশ কর্মকর্তাদের সাথে সংঘর্ষ ও এ থেকে সৃষ্ট মামলা পরিচালনা করে।

২৯ Gulam Murtuza, *Chepe rakha Itihas*(Calcutta : Bisha Bangio Prokashan, 1991), p. 336

*Dhaka University Institutional Repository*

# ৫.২ হাজী শরী'অতুল্লাহর উত্তরসূরী

## ৫.২.১ দুদু মিয়ার পরবর্তী নেতৃবৃন্দ

১৮৬২ সালের দুদু মিয়ার মৃত্যু পর ফারায়েজী আন্দোলন একটু দুর্বলতার সম্মুখীন হয়। তিনি তাঁর তিনজন নাবালক সন্তান গিয়াস উদ্দিন হায়দার, আব্দুল গাফফার (১৮৫২-১৮৮৪) ও সাইজ উদ্দীন আহমদ (১৮৫৬-১৯০৬) কে রেখে দুনিয়া ত্যাগ করেন।[৩০] বড় ছেলে গিয়াস উদ্দিন ১৮৬৪ সালে ফারয়েজীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এদিকে জমিদাররা ফরায়েযীদের বিরুদ্ধে শত্রুতার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। জমিদারের এজেন্টরা এক রাত্রিতে দুদু মিয়ার বাহাদুরপুর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে সব কিছু পুড়িয়ে দেয়। এদিকে মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী তাদের বিরুদ্ধে বাংলার খারেজি বলে প্রচারণা অব্যাহত রাখেন। দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা বনি আমীন মিয়া তাঁর সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী, মাওলানা আব্দুল জব্বার মুফতি হিসেবে ও মুন্সি ফরিদ উদ্দীন মুখতার এ্যাটর্নি হিসেবে ১৮৬২-১৮৬৪ পর্যন্ত ফরায়েযীদের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করেন।

## ৫.২.২ আব্দুল গফুর ওরফে নয়া মিয়া

আব্দুল গফুর নয়া মিয়া (রহ.) ১২৫৮ বাংলা সন ও ১৮৫২ সালে বাহাদুরপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার কাছে প্রাথমিক পর্যায়ের পড়াশুনা করেন। তারপর একজন বড় আলিম পেশোয়ারী মৌলভীর কাছে তাঁর শিক্ষার ছবক দেয়া হয়। পরবর্তীতে তিনি একজন পাঠান শিক্ষকের অধীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নেন। তারপর বিভিন্ন স্থানে ভাল ভাল মাদরাসায় তিনি অধ্যায়ন করেন। নবীন চন্দ্র সেন মাদারিপুরের একজন ম্যাজিষ্ট্রেট তার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেন।[৩১] তিনি মাদারিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ১৮৫৯-১৮৮১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর জামাতা বনি আমীন মিয়া তাঁর সন্তানদের ও গার্ডিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৬৪ সালে নয়া মিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ফরায়েযীদের উচ্ছ্বাস-উদ্দিপনা বেড়ে যায়। একদিকে তিনি পিতা ও দাদার পদাংক অনুসরণ করে ইসলামী আন্দোলনের কাজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, অন্যদিকে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের অধিকার আদায়ে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ফরায়েযীদেরকে পুনরায় সংঘটিত করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজগুলি ছিল নিম্নরূপ :

- পিতা ও দাদার মত ইসলামী আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যাওয়া।
- হত দরিদ্র কৃষক তাঁতীদের পক্ষে জমিদার ও বৃটিশদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ।

৩০ ড. আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *হাজী শরী'অতুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম*(ঢাকা : শরীয়তিয়া প্রকাশনী, জানুয়ারী- ২০১০), পৃ. ১৫

৩১ Muhammad Ahsan Ullah, *Ideology of the Faraizi Movement of Bangal* (Aligarh Muslim University: unpublished thesis 2001), p. 87

Dhaka University Institutional Repository

- জুমু'আর নামায নিয়ে মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী ও তাঁর ছেলে হাফেজ আহমদ এর সাথে বাহাছে লিপ্ত হওয়া।
- আল্লাহর চিল: অত্যাচারী ব্রাহ্মণ জমিদার চক্রবর্তী প্রজাদের উপর অত্যাচার চালালে জনগণ তাকে হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দেন। পরবর্তীতে এ কাজ ফরায়েযীদের বলে বলা হয় কিন্তু ফরায়েযীরা বলেন যে, আল্লাহর চিলে তাকে নিয়ে গেছে।
- পাবনার কৃষক বিদ্রোহ ১৮৭৩ সালে বৃটিশ ভারতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কৃষক বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলায়। এতে বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা করা হয়। যার মাধ্যমে বৃটিশ সরকার কৃষকদের অধিকার সংরক্ষণে আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়। মেহের আলী, এ. আর. মল্লিক এবং মঈন খান বলেন- 'ফরায়েযীরা দুদু মিয়ার পরে স্তিমিত হয়ে যায়।' কথাটি সত্য নয়, কারণ নয়া মিয়ার আমলে তারা পুনরায় শক্তি পায়। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও পাবনার নীল বিদ্রোহ তাঁর নেতৃত্বের ফসল। কৃষক সমাজ তাঁর আমলে আগ্রাসী ভূমিকা নেয়। মাদারিপুরে তাঁর আমলে কোনো মুসলিম অফিসারকে সরকার না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে ফরায়েযীরা অনেক কৃষক সংস্থা কায়েম করে। মালদহ হতে তারা Trade Union of England এর মত সংগঠন কায়েম করে বলে সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। ফরায়েযীরা সরকারি ট্যাক্স প্রদানে বাধা দেয় এবং ১৮৭১-১৮৭২ সালের জরিপ অনুযায়ী নোয়াখালির ৮০% লোক ফরায়েযী ছিল। তারা ইংরেজ হত্যার হুমকি দেয় 'মার ফিরিঙ্গি' বলে।[৩২]
- নয়া মিয়ার আমলে বহু জায়গায় জমিদার নীলকর ও বৃটিশদের সাথে সংঘাত লাগে। যেসব জেলায় এরূপ সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় সেগুলো হলো, ঢাকা, বাকেরগঞ্জ, মালদাহ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নোয়াখালি, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর। নবীন সেন লেখেন যে, ১৮৫৯ সালে ফরায়েযীরা চক্রবর্তী ব্রাহ্মণকে হত্যা করেন। এ ব্যাপারে আদালতে মামলা হলে কোর্ট জমিদারকে ছেড়ে ফরায়েযীদেরকে জেলখানায় পাঠায়। এ ছাড়া ১৮৮৯ সালে পূর্ণচন্দ্র নামক একজন জমিদারকেও হত্যা করেন বলে ধারণা করা হয়। নবীন সেন আরও লেখেন যে, নয়া মিয়া তাঁর এলাকায় রাষ্ট্রের ভিতর রাষ্ট্র কায়েম করেন। হাজার হাজার লোক তাকে অবতার মনে করতেন এবং তাঁর কথাবার্তাকে বেদের মত মনে করত। এ মুহূর্তে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা এক মিলিয়ন অর্থাৎ দশ লক্ষের বেশি বলে নবীন সেন উল্লেখ করেন। নবীন সেন আরও বলেন, নয়া মিয়ার অনুসারীরা তাঁর অনুমতি ছাড়া দেওয়ানি কিংবা ফৌজদারি কোনো সরকারি আদালতে উপস্থিত হতে পারতেন না এবং তিনি নিজেই অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর আমলে পূর্ব বাংলার কৃষকদের অধিকাংশ তাঁর অনুসারী ছিল। তাঁর আদেশকে ঐশী আদেশ মনে করা হত। এমন একনিষ্ঠ আনুগত্য মানব ইতিহাসে আর পরিদৃষ্ট হয় না। তিনি সমাজে অপরাধ করলে জুতা পেটা, অর্থদণ্ড ও বেত্রাঘাত করতেন। এভাবে তিনি বাঘের বাচ্চা বাঘের মত রাষ্ট্রের

৩২ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সল, *হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফারায়েযী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম*(ঢাকা : শরীয়তিয়া প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১০), পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

ভিতর রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। নয়া মিয়া ১৮৮৪ সালে মক্কা শরীফে হজ্জ করতে যান। হজ্জ থেকে ফিরে ৬ মাস পর ৩২ বৎসর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় বাহাদুরপুরে ইন্তিকাল করেন। এখানেই তাকে সমাহিত করা হয়।

### ৫.২.৩ খান বাহাদুর সাইদ উদ্দিন আহমদ

মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়ার তৃতীয় পুত্র খান বাহাদুর সাইদ উদ্দীন আহমদ রহ. ১৮৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফরিদপুরের মুন্সি বশির উদ্দিনের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর তিনি ঢাকাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য গমন করেন। সেখানে বিখ্যাত দার্শনিক মাওলানা দ্বীন মুহাম্মদ রহ. এর অধীন ঢাকার মুহসিনিয়া মাদরাসায় পড়াশুনা শুরু করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নানা মাওলানা উবাইদুল্লাহ উবাইদির কাছে তিনি শিক্ষা লাভের সুযোগ গ্রহণ করেন।[৩৩] ১৮৮৬ সালে নেতা হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি ঢাকাতে বিবাহ করে বসবাস করতে থাকেন। ফরায়েযীদের নেতা হয়ে তিনি সরকারের সাথে কিছুটা সম্পর্ক রাখার কারণে সরকার তাকে খান বাহাদুর উপাধি দেন। এ বিষয়টিও রশিদ উদ্দিন আহমদ বাদশা মিয়ার আমল ১৯১১ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে বলে ওয়াজের আলী 'মুসলিম রত্নাহারে' উল্লেখ্য করেন। বিষয়টি অবশ্যই বিতর্কিত। ফরায়েযী নেতা আব্দুল লতিফ ও মাওলানা আব্দুল বাতেন নোমান বলেন, ১৮৯৮ সালে বাংলায় গুটি বসন্ত মহামারি আকারে দেখা দিলে সরকারের নেয়া টিকা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া বৈধ বলে ফতোয়া দিলে সরকার তাকে খান বাহাদুর উপাধি দেন। তবে বাদশা মিয়া এ খিতাব প্রত্যাখান করেন।

পীর বাদশা মিয়া ১৯০৫ সালে নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুর এর পক্ষে 'বঙ্গভঙ্গ" বিষয়ে তিনি একমত পোষণ করে এবং বহুস্থানে এর স্বপক্ষে বক্তৃতা করেন। খান বাহাদুর সাইদ উদ্দীন আহমদ এর সময়ে ফরায়েযীরা প্রতিপক্ষের বাহাছে বারবার লিপ্ত হতে বাধ্য হন। খান বাহাদুর সাইদ উদ্দিন আহমদ ১৩১২ হি. মোতাবেক ১৯০৬ খ্রি. সালে বিহারের মধুপুরে শিক্ষা সফরে গিয়ে ইন্তিকাল করেন। পরবর্তীতে তাকে বাহাদুরপুরে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিন পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য ভক্ত রেখে যান। তিনি একজন উদারমনা, বন্ধুবৎসল, ছোট-বড় সবার প্রিয় ও ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর আমলে ফরায়েযীদের সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষে উন্নিত হয়। যা পরবর্তীতে বাদশা মিয়ার আমলে ৬০ লক্ষে উন্নিত হওয়ার কথা 'বঙ্গবাসী' নামক পত্রিকা ও সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা ১৯২১ সালের রিপোর্টে উল্লখ করা হয়।

### ৫.২.৪ হযরত পীর বাদশাহ মিয়া

বর্তমান মাদারিপুর জেলার শিবচর থানার অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামে ১৮৮৪ সালের ২২ মে আবা খালেদ রশিদ আহমদ ওরফে হযরত পীর বাদশা মিয়া (রহ.) জন্ম গ্রহণ করেন।[৩৪] তাঁর পিতার নাম মাওলানা সাইদ উদ্দিন আহমদ। মাতার নাম মোছাঃ হাসমাতুন নেছা। ঢাকার জমিদার চৌধুরী গোলাম

---

৩৩ Muhammad Ahsan Ullah, *Ideology of the Faraizi Movement of Bengal*(Aligarh Muslim Uneversity, unpublished thesis- 2001), p. 11

৩৪ Ibid, p. 38

*Dhaka University Institutional Repository*

কুদ্দুসি ওরফে দাদন মিয়ার কন্যা। জন্মগ্রহণের পর ইসলামি নীতি অনুযায়ী তাঁর আক্বিকা সম্পন্ন হয়। তিনি সুন্দর চেহারা, শান্ত, সংযত ও হাসি-খুশি স্বভাবের ছেলে ছিলেন। বাল্যকালেই মায়ের কাছে পড়াশুনা শুরু করেন। এরপর বাবার কাছে 'কায়দায়ে বাগদাদি' ছবক নেন।[৩৫] তারপর ঢাকা নগরীর বিখ্যাত ক্বারী পীর মুহাম্মদ এর কাছে কুরআন শিক্ষা লাভ করেন। পরে হাফেজ রমযান সাহেবের কাছেও কুরআন অধ্যায়ন করেন। গ্রামের পণ্ডিত শ্রী বাবুগুরু দাস পোর্দারের কাছে বাংলায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর আরবি, উর্দু, ফারসি, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন। কোনো স্কুল কলেজে না পড়ে তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষা ভালভাবে রপ্ত করেন।

ইসলামি জ্ঞান অর্জনের জন্য ১৮৯৭ সালে তিনি ঢাকার মুহসিনিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল খায়ের মুহাম্মদ সিদ্দিক পীর সাহেবের অভিভাবক নিযুক্ত হন। তারপর মাওলানা শামসুদ্দিন সাহেব তাঁর গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী বাদশা মিয়া বেচারাম দেওড়ির কাশমিরি সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলীও তাঁর ব্যক্তিগত শিক্ষক ছিলেন। মুহসিনিয়া মাদরাসায় ফাযিল পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। ওস্তাদ ভক্তি ও হাক্কানী পীরের মুরিদ হওয়ার বাসনায় তিনি তাঁর পিতার কাছে বাই'আত গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অসুস্থ্য হলে তৎকালীন লাট বাহাদুর জে. বি. ফুলার এর পরামর্শে ভারতের বিহারের মধুপুর নামক স্থানে চিকিৎসার জন্য নৌকা ও পালকি যোগে যান।

১৯০৫ সালে পিতা খান বাহাদুর সাঈদ উদ্দিন আহমদ ইন্তিকাল করলে তিনি ফরায়েযীদের গণতান্ত্রিক পন্থায় নেতা মনোনীত হন। পীর বাদশা মিয়া পিতার মত দ্বীনের দা'ওয়াত ও সংস্কারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব নেন। ১৯০৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর বুধবার ঢাকার শাহবাগের বর্তমান জাতীয় যাদুঘরের পাশে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ভারতবর্ষের মুসলিম নেতারা 'মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স'এ মিলিত হলে পীর বাদশা মিয়া ঐ কনফারেন্সে যোগ দিয়ে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির শিক্ষার উন্নতির জন্য একশ বিশ টাকা চাঁদা প্রদান করেন। নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ঐ মিটিং এ ১৯০৬ সালে 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা করলে তিনি তাতেও উৎসাহ যোগান এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

১৯০৭ সালে তিনি মুসলিম লীগের জন্য রিকাবি বাজার বন্দরে বিরাট সমাবেশ করেন ঐ সালেরই ১৫ আগস্ট নবাব খাজা রসূল বক্সের কন্যা সালেহা বেগমের সাথে নবাব সলিমুল্লাহর উকালাতিতে বিবাহ সম্পূর্ণ হয়।[৩৬] পীর বাদশা মিয়া খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে পাক-ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন সমাবেশ করেন। ১৩২৮ বাংলা সনে ফরিদপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট পীর বাদশা মিয়ার সাথে বাহাদুরপুরের বাড়ীতে একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। ম্যাজিষ্টেস্ট্র সাহেব পীর বাদশা মিয়াকে বৃটিশের বিরুদ্ধাচারণ ও তাদের বিরুদ্ধে কোনো বিবৃতি না দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং তাকে এর

৩৫ মাওলানা আব্দুল লতিফ শরীফাবাদী, *হযরত পীর বাদশাহ মিয়া*(বরিশাল : শরীয়তিয়া লাইব্রেরী, ১৯৫৮), পৃ. ৩৩
৩৬ গোলাম মুর্তযা, *চেপে রাখা ইতিহাস*(কলিকাতা : বিশ্ব বঙ্গীয় প্রকাশন, ১৯৯১), পৃ. ৩৩৬

Dhaka University Institutional Repository

বিনিময়ে বড় পদ প্রদান ও অনেক সুবিধার প্রলোভন দেখান। পীর বাদশা মিয়া তখন বলেন, আমি কাপুরুষ নই, কাপুরুষের বংশে জন্ম গ্রহণ করিনি, আমার পূর্ব পুরুষগণ ইংরেজ কারাগারে অনেক নির্যাতন ভোগ করেছে, আমি সে জালিম শাসকের খতম না হওয়া পর্যন্ত, আমার জানমাল বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, তবুও তাদের আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকার করতে রাজি নই।

১৯২১ সালের ৬, ৭, ৮ আগষ্ট কোলকাতায় খেলাফত কমিটির বিরাট কনফারেন্সে মাদারিপুর থেকে বিপুল জনতার এক বিরাট শোভাযাত্রা নিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এর বাসায় স্বাক্ষাৎ করেন। কনফারেন্সে পীর বাদশা মিয়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে উদাত্ত আহ্বান জানান। ঐ বৎসর ২৮ আগস্ট মাদারিপুরে খেলাফত কমিটি ও কংগ্রেসের বিরাট সমাবেশ সরকারি পেটুয়া বাহিনী ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করলেও সভাপতির অভিভাষণে পীর বাদশা মিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। ২ সেপ্টেম্বর বরিশাল শহরের বি এম হাইস্কুল প্রাঙ্গণে খেলাফত কমিটি ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে তিনি বক্তৃতায় স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোষণা দেন। ঐ মিটিং এ মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা আজাদ সোবহানী, কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধি ও বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা ইংরেজদের শোষণ নিপীড়ণের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ঘোষণা দেন।[৩৭]

পরের দিন গুরুত্বপূর্ণ যৌথ মিটিং এ খেলাফত কমিটি ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তুরস্ক সরকারের সাহায্যের জন্য চাঁদা তোলেন ও বিলাতি মাল-সামগ্রি বর্জনের আহ্বান জানান। দেশের হাট-বাজার, শহর বন্দরে ও বিলাতি মালপত্রে আগুন লাগিয়ে দেয়া হলে গোটা ভারতবর্ষ এ নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। পরদিন পীর বাদশা মিয়াকে ইংরেজ শাসনতন্ত্রের ১০৮ ধারা অনুযায়ী রাজদ্রোহি হিসেবে গ্রেফতার করা হয়। চতুর্দিকে জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে শ্লোগান দিতে থাকে 'পীর বাদশা মিয়া জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজ ধবংশ হোক নিপাত যাক'। রাজদ্রোহি বক্তৃতা ও স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বিরত রাখার জন্য মাদারিপুরের এস. ডি. ও. এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করতে চাইলে পীর সাহেব নতি স্বীকার না করে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান। এদিকে চতুর্দিকে জনতা পীর বাদশা মিয়ার নামে শ্লোগান দিতে থাকে। পীর বাদশা মিয়ার ভাই মাওলানা নবাব মিয়া, খেলাফত কমিটির নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী, কংগ্রেস নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কারাগারে তাঁর সাথে দেখা করেন এবং তার জামিনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। ঐ দুই নেতা ফরিদপুর টাউনে বিক্ষুদ্ধ জনতার মাঝে বক্তৃতা দিয়ে পীর বাদশা মিয়াকে বের করে আনার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে তিনি মুক্তি পান। তাঁর মুক্তির দিনটি 'মুক্তি দিবস' হিসেবে কলকাতায় হল দিয়া পার্কে মহা সমাগমের মাধ্যমে পালিত হয়। পীর বাদশা মিয়া ১৯২৩ সালে নোয়াখালি টাউন হলে এক জনসভায় বলেন, ইংরেজ অধিকৃত এ পরাধীন অনৈসলামিক রাষ্ট্রে মুসলিমগণ তাদের ধর্মীয়নীতি সম্পূর্ণ পালন করতে অক্ষম। তাই সে শ্রেষ্ঠ

৩৭ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সল, *হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফারায়েযী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

ইবাদত হতে তারা বঞ্চিত। দেশ স্বাধীন করে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলে, হানাফি মাযহাব অনুযায়ী শহর, বন্দরে জুমু'আ ও 'ঈদের নামায পড়ে অসীম ছাওয়াব লাভ করতে পারব।

১৯২৫ সালে পীর বাদশা মিয়ার সভাপতিত্বে শরীয়তপুরে স্বাধীনতা আন্দোলনকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মহাত্মা গান্ধি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সে বছর তিনি ফুরফুরার পীর সাহেব মাওলানা আবু বক্কর সিদ্দিক এর সাথে মিলিত হয়ে তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক এর ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী আন্দোলন ও খেলাফত উচ্ছেদের প্রতিবাদ এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বহু সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। তারপর ১৯২৬ সালে আঞ্জুমানে রশিদুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে ইসলামি আদর্শ কায়েমের সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। তিনি বাহাদুরপুরে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন, যা বর্তমানে কামিল স্তর পর্যন্ত উন্নিত হয়েছে। এ মাদরাসার জমি দান করেন তাঁর মুরিদ ও জেলখানার সঙ্গী হাজী জব্বার বালা। ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব লাহোরে পাশ হলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সিলেটসহ বহুস্থানে এর স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। ১৯৪৮ সালে মার্চ মাসে তিনি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সহিত সাক্ষাৎ করে এক কপি কুরআন শরীফ প্রদান করে পাকিস্তানের সংবিধান ইসলামি আদর্শভিত্তিক করার জন্য এবং মদ, জুয়া এবং বেশ্যাবৃত্তি বন্ধের আহ্বান জানান। ১৯৩৬ সালে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক 'কৃষক প্রজা পার্টি' গঠন করলে পীর বাদশা মিয়া প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ঐ পার্টির আন্দোলন চালিয়ে যান। উল্লেখ্য, ঐ মুহূর্তে পূর্ব বাংলায় তিন কোটি লোকের মধ্যে আশি লক্ষ ছিল ফরায়েযীদের কর্মী।[৩৮]

১৯৩৭ ও ১৯৫৪ সালে কৃষকরা তাদের অধিকার এ পার্টির মাধ্যমে পায়। বৃটিশ সরকারের Divide and Rule পলিসির কারণে বৃটিশ ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। এতে প্রায় বিশ/ত্রিশ হাজার মুসলিম নর-নারী, শিশু ও বৃদ্ধ নিহত হয়। বাদশা মিয়া এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং সকল ধর্মের লোকদের জীবনের নিরাপত্তার দাবী জানান। এ মুহূর্তে মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালিতে অবস্থান করলে পীর বাদশা মিয়া তার সাথে থেকে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা নিরসনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে পীর বাদশা মিয়া জুমু'আ ও 'ঈদের নামায পড়ার জন্য জনগণকে সম্মতি দেন। যা ১৮১৮ থেকে ফরায়েযীরা অমুসলিম শাসনের অধীন বৈধ নয় বলে জুমু'আ ও 'ঈদের নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকেন। এরপর তিনি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মাওলানা ওয়াজিহউল্লাহর সাথে বিভিন্ন স্থানে উপরোক্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। ১৯৫৫ সালে পীর বাদশা মিয়া ঢাকার পল্টন ময়দানে আল্লাহ্‌র রসূল সা. এর হাদীস অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এক সমাবেশ আয়োজন করেন। এতে বক্তব্য রাখেন এ. কে. ফজলুল হক, মাওলানা আতাহার আলী, মাওলানা সিদ্দিক আহম্মদ, প্রাক্তণ শিক্ষামন্ত্রী আশরাফ উদ্দিন, প্রফেসর সুলতান আলমসহ প্রমুখ।

---

৩৮ মাওলানা আবদুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফারায়েযী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

*Dhaka University Institutional Repository*

পীর বাদশা মিয়া ঐ সমাবেশে সভাপতির ভাষণে হাদীস অস্বীকারকারীদেরকে 'অমুসলিম' বলে ঘোষণা দেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পীর বাদশা মিয়া মুসলিম লীগের ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী আচরণ ও ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠা না করার কারণে নিজামী ইসলামী পার্টির সাথে ঐক্যমত পোষণ করে কুরআন সুন্নাহ্ভিত্তিক ইসলমি রাষ্ট্র কায়েম ও মদ, জুয়া, সিনেমা, বেশ্যাবৃত্তিসহ অবৈধ কার্যাবলি বন্ধ করার আহ্বান জানান। তিনি মুসলিম লীগের ইসলামি আন্দোলনে তেমন ভূমিকা না রাখার কারণে যুক্ত ফ্রন্টের সাথে একত্রিত হয়ে তার পুত্র পীর দুদু মিয়াকে নেজামী ইসলামীর টিকেটে বিপুল ভোটে জয়ী করান পূর্ববাংলার সংসদে। বাদশা মিয়া কৃষকদের অধিকারে সক্রিয় নেতা, সমাজ সংস্কারক, আল্লাহ্র ওলি ও আল্লাহ্র পথের একজন সত্যিকার প্রচারক ছিলেন। তিনি পীর পূজা, পীরকে সিজদা করা এবং মুরীদের স্ত্রী দিয়ে খিদমত নেয়াকে অবৈধ ঘোষণা করেন। ১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা পার্টির পক্ষে যেমন ভূমিকা রাখেন, তেমনি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি যথাযথ ভূমিকা পালন করেন। তিনি তিনবার হজ্জ করেন। ১৯৫৯ সালে এ মহান ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগ করেন।[৩৯] তার শিক্ষাগুলো হলো,

- পীর সাহেব লক্ষীপূজা নিষিদ্ধ করেন ও বিদ'আতি পীরের অনুসরণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।
- যাত্রা, নাটক, কবর পূজা, কবর স্থানে আলো জ্বালানো কবরের উপরে দালান নির্মাণ করা ও মৃত ব্যক্তির নামে মাটিয়াল খাওয়ানো নিষিদ্ধ করণ।
- মদ, জুয়া, গাঁজা ও নেশা জাতীয় দ্রব্য বর্জন।
- আশ্বিণে রান্না কার্তিকে খাওয়া, যে বর মাগে সে বর পাওয়া নিষিদ্ধ করণ।
- শিয়াদের তাজিয়া মিছিল নিষিদ্ধ করণ।
- বিবাহ উৎসবে হিন্দুদের মত গায়ে রং ছিটানো ও রাখি বন্ধন নিষিদ্ধ করণ।
- আল্লাহ্ ছাড়া কারও নামে যেমন, পীর ফকিরের নামে মান্নত করা হারাম ঘোষণা দেয়া।
- মুসলিমগণের সমাজে আশরাফ-আতরাফ তথা শ্রেণি বৈষম্য নিষিদ্ধ করণ।
- জোলা, তাঁতী, ক্ষৌরকার ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন পদের কাজগুলিকে মুসলিমগণের জন্য হালাল ঘোষণা করা।

### ৫.২.৫ মাওলানা পীর মুহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (দ্বিতীয়)

ভারতীয় উপমহাদেশে যে ব্যক্তি মুসলিমগণের ধর্মের সংস্কার সাধন করে সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন তিনি হলেন ফরায়েযী আন্দোলনের নেতা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি ফরায়েযীদের পঞ্চম নেতা হযরত মাওলানা পীর মুহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (২য়)।[৪০] শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, মহাত্মা গান্ধি, লিয়াকত আলী খান এর রাজনীতি করে স্বদেশের গণতান্ত্রিক ও ধর্মীয় শাসন

---

৩৯ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সল, *হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফারায়েযী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৪০ মাওলানা আব্দুল লতিফ শরীফাবাদী, *হযরত পীর বাদশাহ মিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

কায়েম করার ক্ষেত্রে এক অকুতোভয় নেতা হিসেবে ভূমিকা রাখেন। আবা হাফিজ পীর মুহসিন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (২য়) (রহ.) ১৯১৭ সালে পিতা আবা খালেদ রশিদ আহমদ ওরফে বাদশা মিয়া ও ঢাকার নওয়াব বাড়ির খাজা রসূল বক্সের সুন্দরী কন্যা মোছাঃ সালেহা খাতুনের ঔরসে ঢাকার আহসান মঞ্জিল (বর্তমানে জাদুঘর) মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।[৪১]

তিনি পিতা ও মাতার কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে ঢাকার শ্রেষ্ঠ ইসলামি বিদ্যাপীঠ ইসলামিয়া মাদরাসায় জামা'আতে উলা (ফাযিল) পাশ করেন। প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৬ সালে দাওরায়ে হাদীস পড়ার জন্য ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় গমন করেন। ছাত্রদের মাঝে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত হয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৪০ সালে তিনি পিতা পীর বাদশা মিয়া (রহ.) এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেন। পিতার সাথে তিনি সর্বত্র ওয়াজ-নছিহত, যিকির-আযকার ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে বৃটিশ কর্তৃক যে নির্বাচন হয় সে নির্বাচনে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য ১৯৪১ সালে মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী রহ. কর্তৃক 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ও তার পিতা বাদশা মিয়া প্রথম থেকেই জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা করতে থাকেন।

১৯৪৯ সালে মুসলিম লীগ থেকে বের হয়ে মাওলানা ভাসানী ও শামসুল হক কর্তৃক 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তিতে 'মুসলিম' শব্দ কেটে আওয়ামী লীগ করা হয় ১৯৫২ সালে। এদের সাথেও ফরায়েযীরা ধর্ম নিরপেক্ষতার কারণে খুব ভালভাবে সম্পর্ক রাখেননি। এক দিকে দুদু মিয়া ও বাদশা মিয়া শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এর সাথে ও ফরায়েযীরা ধর্ম নিরপেক্ষতার কারণে সম্পর্ক খুব ভালভাবে রাখেনি। অন্যদিকে দুদু মিয়া ও বাদশা মিয়া শেরে বাংলার 'কৃষক প্রজা পার্টি'র সাথে সম্পর্ক রাখেন। আবার ইসলাম কায়েম করার জন্য তিনি জীবন বাজি রেখে কাজ করতে থাকেন। ১৯৫৯ সালে পিতা বাদশা মিয়া ইন্তিকাল করলে হযরত পীর মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (২য়) ফরায়েযীদের নেতা হিসেবে মনোনীত হন। ১৯৫৪ সালে শেরে বাংলা, মাওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও আওয়ামী মুসলিম লীগের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। পীর সাহেব নেজামী ইসলাম পার্টি হতে যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন।[৪২]

পরিষদে তিনি ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা ও পাকিস্তানকে একটি ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে সংবিধানে ঘোষণা দেয়ার জোর দাবি জানান। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রথম যে নয় নেতা বিবৃতি প্রদান করেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে পিডিএম এর টিকিটে তিনি

৪১ পীর মুহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া, *তরিকুস সুলূক*(ঢাকা : হাজী শরীয়াতুল্লাহ একাডেমী, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯১), পৃ. ১১২
৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

এম এল এ নির্বাচিত হন।[৪৩] ১৯৬৫ সালের ১৯ জুলাই পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সংসদে হযরত পীর মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (২য়) বলেন যে, ১৯৬৩ সালে Advisory Council of Islamic Ideology এবং ১৯৬৪-১৯৬৫ সালেও এ নিয়ে আলোচনা ও সুপারিশমালা পাশ হয়, কিন্তু এর কোনো কার্যক্রম দেখা যায় না।

তিনি পাকিস্তানের সংবিধানে ইসলামি নীতির প্রতিষ্ঠা করা ও ইসলামি আইন বাস্তবায়ন এবং একদল ইসলামিক গবেষক দিয়ে ঐ কাউন্সিল পরিচালনার আহ্বান জানান। তাঁর ও অন্যান্যদের প্রচেষ্ঠায় ঢাকাতে লন্ডনের মত ইসলামিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা পরবর্তিতে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে ইসলামী ফাউন্ডেশন নাম দেন। তবে মদ-জুয়া নিষিদ্ধ করার বিল পার্লামেন্টে উত্থাপন করলে তা ভোটাভুটিতে নাকচ হয়ে যায়। নাকচ হওয়া সম্পর্কে পীর দুদু মিয়া বলেন, আমি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে এ বিল সম্পর্কে বলব যে, পবিত্র কুরআনের ঘোষণার দ্বারা মদ ও মাদক দ্রব্যকে নিষিদ্ধ করায় আমি পাকিস্তান আইন পরিষদে তা আইনের মাধ্যমে বন্ধ করার প্রস্তাব করেছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার সে প্রচেষ্টাকে কবুল করে আমার নাযাতের পথ প্রশস্থ করে দাও। ১৯৬৫ সালের ১৮ জুলাই পীর সাহেব উপমহাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের মহান শহীদ সৈয়দ আহমদ বিরলভী ও মাওলানা ইসমাইল শহীদের মাজার জিয়ারত করেন। তারপর ৭ আগস্ট লাহোরের প্রখ্যাত আলিম ওলিয়ে কামিল হযরত নূর উদ্দিন মোঃ জাগির ও দিল্লির বিখ্যাত নারী নূর জাহান বেগমের মাজার জিয়ারত করেন এবং লাহোরে শাহী মসজিদ পরিদর্শন শেষে হযরত দাতাগঞ্জ লাকার রহ. মাজার জিয়ারত করেন।

১৯৬৭ সালে ২২ জুলাই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে হযরত মুহাম্মদ সা. এর নবুওয়্যাত অস্বীকারকারী মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির ভ্রান্ত মতবাদকে নিষিদ্ধকরণ ও কাদিয়ানিদের অ-মুসলিম ঘোষণা দেয়াসহ সংখ্যালঘুদের মর্যাদা দেয়ার জন্য বিল উত্থাপন করেন। পার্লামেন্টে এ বিল পাশ হয়। ১৯৬৮ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিবাহ পড়ানোর জন্য শেখ মজিবুর রহমান পীর সাহেবকে অনুরোধ জানান। পীর সাহেব তার খুলনার প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে এ বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা ও মুনাজাত করেন। ১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি হযরত পীর সাহেব রাওয়ালপিণ্ডির প্রখ্যাত আইনজীবী এ্যাডভোকেট ছালাহ্‌ উদ্দীনের বাসা থেকে দু'জনে প্রেসিডেন্ট ভবনে রওয়ানা হন। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান কনফারেন্স রুমে আসন গ্রহণ করলে জাতীয় নেতৃবৃন্দসহ তিনি গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত হন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এন. ডি. এফ এর হামিদুল হক চৌধুরী ও জনাব মোহাম্মদ, পি. ডি. এম. এর পক্ষে নওয়াব জাদা নাছরুল্লাহ খান ও জনাব আব্দুস সালাম খান, জমিয়াতে উলামায়ে ইসলামের পক্ষে মুফতি মাহমুদ ও পীর দুদু মিয়া, আওয়ামী লীগের পক্ষে জনাব শেখ মজিবুর রহমান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম, নেজামী ইসলামীর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও মৌলভী ফরিদ আহমদ,

৪৩ মাওলানা আবদুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফারায়েযী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

*Dhaka University Institutional Repository*

মুসলিম লীগের মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা ও খাজা খয়ের উদ্দিন, জামায়াতে ইসলামীর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী ও অধ্যাপক গোলাম আযম, ন্যাপ এর খান আব্দুল ওয়ালী খান ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতা জনাব নুরুল আমীন, স্বতন্ত্রের পক্ষে এয়ার মার্শাল আজগর খান ও সাবেক প্রধান বিচারপতি মাহাবুব মোর্শেদ, দুই পাকিস্তানের কনভেনার জনাব শওকত হায়াত খান ও খন্দকার মোস্তাক আহমদ। পীর সাহেব দীর্ঘ বক্তৃতায় পাকিস্তানে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নেতাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান। আইয়ুব খান পরামর্শ শুনেন এবং অনতিবিলম্বে তা কার্যকর করার আশ্বাসও দেন।

১৯৬৯ সালে ঢাকাতে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে আসাদ নামক একজন ছাত্র মৃত্যু বরণ করলে তিনি চৌধুরী ইউসুফ আলী মোহন মিয়া, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া, অধ্যাপক গোলাম আযম ও জনাব মহিউদ্দিন আহমদসহ পাকিস্তানের জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে এর প্রতিবাদ ও বিচার দাবী করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের' প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রচারণা চালান। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ প্রলায়ংকারী ঘূর্নিঝড় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ত্রিশ লক্ষ লোক মারা গেলে তিনি নির্বাচন বয়কট করে দুর্গত মানুষের সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। সফরে জনাব আতাউর রহমান খান ও ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়ার সাথে (পীর সাহেবের আপন ভগ্নিপতি ও সাবেক মন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ ও আকমল ইবনে ইউসুফ এমপির পিতা) রিলিফ বিতরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সে বছরে তিনি মাওলানা ভাসানীর সাথে সাক্ষাত করে দুস্থ মানবতার সেবায় কাজ করার অঙ্গিকার করেন।[৪৪]

১৯৭০ সালে ২১ ডিসেম্বর পাকিস্তানের শাসকদের প্রতি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সর্বোচ্চ আসন অর্জনকারী আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য এক বিবৃতিতে তিনি আহ্বান জানান। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালোরাত্রিতে বাংলার মানুষের উপর পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী ঝাপিয়ে পড়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয় বহু নারী নির্যাতিত হয়। ভারতের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ৯ মাস যুদ্ধ শেষে পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সৈন্যের আত্মসমর্পনের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ কালে ফরায়েযীরা নিশ্চুপ থাকেন। কিন্তু তাদের নেতা পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। কারণ বহু আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন পাকিস্তান ভাঙ্গা ছিল কষ্টের কারণ। এতে ভারতের আধিপাত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী নীতি ও তাদেরকে আতংকিত করে তোলে। তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা না হলেও স্বাধীনতার পরপর ঢাকার বংশাল রোডের বাড়ি ও বাহাদুরপুরের বাড়ি মাদরাসা আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে

৪৪ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সল, *হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফারায়েযী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া হয়। দুস্থ মানুষের সেবায় দুদু মিয়া সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। ১৩৭৪ সালের ১৩ ফাল্গুন তিনি ফরায়েযী আন্দোলনকে ফরায়েযী জামায়াত নামে পুনরায় প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমের জন্য শপথ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি 'জমিয়ত উলামায়ে ইসলাম' এর সভাপতি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।[৪৫]

তিনি পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি হয়ে চীনে গমন করে চৌ এন লাইর সাথে সাক্ষাত করেন। তাছাড়া ফ্রান্স, বৃটেন, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, ইস্তাম্বুল ও সাউদি আরব ভ্রমন করেন। ১৯৭৫ সালে আগস্ট মাসে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হয়ে গণচীন ও সাউদি আরব ভ্রমণ করেন। ১৯৮০ সালে বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেস সম্মেলনে সাইপ্রাস গমণ করেন। তিনি সর্বমোট ১০ বার হজ্জ ও সাত বার উমরা পালন করেন। ১৯৮৪ সালে লন্ডনে ওপেন হার্ট সার্জারি হয়। সাবেক মন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ ও আকমল ইবনে ইউসুফ এর পিতা মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম চৌধুরী ইউসুফ আলী (মোহন মিয়া) তাঁর ভগ্নিপতি ছিলেন। হযরত পীর মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (২য়) প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও স্বৈরাচারি এরশাদকে কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক শাসন কায়েম করার জন্য বহুবার অনুরোধ করেন। ১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি খালেদা জিয়াকেও অনুরূপ অনুরোধ জানান। পরবর্তিতে তিনি বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে নিজকে অনেকটা গুটিয়ে ফেলেন। তাঁর ছেলে মাওলানা মোসলেহ্ উদ্দিন আবু বকর মিয়া (রহ.) রাজনৈতিক ময়দানে ইসলামের কাজ পরিচালনা করতে থাকেন।

হযরত পীর মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (২য়) ফরায়েযী জামা'আতের আদর্শ বইতে লিখেন যে, মুসলিমগণের ইসলামি জিন্দিগী গঠনের জন্য আল্লাহ্‌র কালাম ও রসূলে করিম সা. এর হাদীস শরীফ-ই যথেষ্ট। তিনি আরও বলেন, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) দিশেহারা ও হতাশাগ্রস্থ জাতির অনুপ্রেরণা ও বিজাতীয় নাগপাশ থেকে মুক্তির আলো দেখিয়েছেন। আমরাও তাঁর অনুসারী হিসেবে ঐ কাজটি সমাপ্ত করার কাজে লিপ্ত আছি। হযরত পীর মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (২য়) ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী আন্দোলন ও বাংলাদেশ জামা'আতে ইসলামীকে পছন্দ করতেন না। রাজনৈতিক সমাবেশ ও আন্দোলন রাজনীতিবিমুখ ওয়াজ নছিয়তে লিপ্ত তাঁর পূর্বসুরি সকল নেতার মত একজন আল্লাহ্‌র অলি হিসেবে ১৯৯৭ সালে ইন্তিকাল করেন। লক্ষ লক্ষ জনতা বাহাদুরপুরে তাঁর দাফন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি আজীবন ইসলামের খিদমত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কুরআনের আইন বাস্তবায়ন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় একজন নির্ভিক সৈনিক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি আট পুত্র ও দুই কন্যা রেখে যান। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও রাজনৈতিক সচেতনতার কারণে 'তরিকুস সুলুক' 'বাংলাদেশ ফরায়েযী জামায়াতের আদর্শ' ও 'ফরায়েযী জামায়াতের গঠনতন্ত্র' লিখেন।

---

৪৫ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দোলন*(কুষ্টিয়া : সেন্টার ফর ইসলামিক দা'ওয়াহ্ এন্ড কালচার, ফেব্রুয়ারি ২০১১), পৃ. ৭৪-৭৫

Dhaka University Institutional Repository

## ৫.২.৬ পীর মুহিউদ্দিন আহমদ দাদন মিয়া

আল্লাহ্‌র অলি পীর মাওলানা মহিউদ্দিন আহমদ (দাদন মিয়া) (রহ.) তাঁর পূর্বসূরিদের মত ইসলামের সকল কাজ সমাধান দিয়েছেন আজীবন। ১৯১৮ সালে কোনো এক প্রত্যুষে ঢাকার আহসান মঞ্জিলে জন্ম গ্রহণ করেন তিনি।[৪৬] পীর বাদশা মিয়ার ছেলে পীর মহিউদ্দিন আহমদ (দাদন মিয়া) আপন বড় ভাই পীর দুদু মিয়া (২য়) এর সারাজীবনের সাথী ছিলেন। মাদরাসায় পড়ালেখা ও ভারতের দেওবন্দে একত্রে পড়াশুনা করেছেন। বড় ভাই এর ইন্তিকালের পর ১৯৯৭ সালে তিনি পীরের আসনে আসীন হন। চেহারায় আদব কায়দায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন স্থির। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা ও ইসলামি আইন বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তাঁর আমলে তাঁর বড় ভাই পীর দুদু  মিয়ার বড় ছেলে বাহাদুরপুর কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। ঐ মাদরাসার জমি পীর বাদশাহ মিয়ার মুরিদ ও জেলখানার সহবন্দী হাজী জব্বার বালা দান করেন। তাঁর ছেলে সংসদ সদস্য ছিলেন। এটা দাবী করেন জব্বার বালার বংশধর আল মাহবুব আলম। প্রিন্সিপাল মাওলানা মোছলেহ্ উদ্দিন আবু বকর মিয়া (রহ.) ফরায়েযী জামা'আতের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৫ সালে ১৪ এপ্রিল পীর মহিউদ্দিন আহমদ (দাদন মিয়া) ইন্তিকাল করলে তাঁর একমাত্র ছেলে মাওলানা মঈন উদ্দীন আহমদ জুবায়ের মিয়া ফরায়েযী জামা'আতের আমির হন।[৪৭]

২০০১ সালে পীর মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ ঢাকায় ছিনতাইকারীর হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করলে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ হাসান ফরায়েযী জামা'আতের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। তার মৃত্যুর পর তার ছোট ভাই পীর দুদু মিয়ার ছেলে পীরজাদা হাজী শরফ উদ্দিন আহমদ জুনায়েদ মিয়া রহ. ফরায়েযী জামা'আতের সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর অনুপম আদর্শ, চারিত্রিক মাধুর্য ও যিকির-আযকারে লিপ্ত আল্লাহ্‌র অলি ফরায়েযী জামা'আতের একনিষ্ঠ কর্মী বীর ব্যক্তি ছিলেন। পীরজাদা মহিব উদ্দিন মিয়া ও পীরজাদা হাজী রশিদ আহমদ ইয়াহিয়া মিয়া রহ. কিছুদিন পূর্বে ইন্তিকালের আগে ফরায়েযী জামা'আতের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন।

## ৫.২.৭ শহীদ মাওলানা প্রিন্সিপাল আবু বকর মিয়া

ফরায়েযী বংশধরের প্রথম শহীদ মাওলানা প্রিন্সিপাল মুসলিহ্ উদ্দীন আহমদ আবু বকর মিয়া ১৯৪৬ সালে বাহাদুরপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মাওলানা পীর মুহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (২য়) ও মাতা ফাতেমা বেগম।[৪৮] প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের মক্তবে শুরু করেন। পরবর্তীতে

৪৬ Muhammad Ahsan Ullah, *Ideology of the Faraizi Movement of Bangal*, Ibid, p. 66
৪৭ মাওলানা আবদুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফারায়েযী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

তিনি শরীয়তিয়া কামিল মাদরাসা থেকে ফাজিল ও মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা থেকে কামিল (এম.এ) পাশ করেন। ২০০০ সালে তিনি ফরায়েযী জামা'আতের মহাসচিব মনোনীত হন। রাজনৈতিক ময়দানে ইসলামী ঐক্যজোটের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বাহাদুরপুর কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন। উক্ত পদদ্বয় ছাড়াও তিনি চারদলীয় ঐক্যজোটের স্বনামধন্য ও আপোষহীন নেতা ছিলেন। শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাবের অধিকারী মাওলানা আবুবকর মিয়া স্পষ্টভাষী ও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। ভণ্ডপীরদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন কঠোর। ভণ্ড পীরেরা তাঁর নাম শুনলে ভয় পেতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে কটুক্তি করলে তিনি পল্টনের বিশাল সমাবেশে উক্ত শিক্ষকের মাথার বিনিময়ে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। উক্ত শিক্ষক তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে তাকে বাহাদুরপুর থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং তিনি আদালতে জামিনে মুক্তি এবং মামলায় বেকসুর খালাস পান।

১৯৯৭ সালে সরকারি মাদরাসার প্রিন্সিপাল হওয়া সত্ত্বেও তিনি শরীয়তিয়া মাদানিয়া কাওমী মাদরাসা স্থাপন করেন। যার দায়িত্বে রয়েছে তাঁর বড় ছেলে ও আমীর হাফেজ মাওলানা আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ হাসান। ২০০১ সালে তিনি চারদলীয় ঐক্যজোট (বি.এন.পি, জামায়াতে ইসলামী, বিজেপি ও ইসলামী ঐক্যজোট) গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২০০২ সালে চাঁদপুরের চর ভৈরবিতে অনুষ্ঠিত ফরায়েযী সম্মেলনে যোগদান শেষে ঢাকার শনির আখড়ায় সন্ত্রাসীদের হাতে ৫৬ বৎসর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি কাদিয়ানী, ভণ্ডপীর দেওয়ানবাগী, পরজীবী বুদ্ধিজীবী, নাস্তিক, কমিউনিস্ট, পীরপূজা, কবরপূজার বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর ছিলেন। ইসলামী ঐক্য জোটের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চারদলীয় জোটের অন্যতম শীর্ষনেতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর হত্যাকারীদেরকে গ্রেফতার করা যায়নি। স্বভাবে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর মত কৌশলী ও চেহারায় পীর বাদশা মিয়ার মত বিশিষ্ট আলিম ও রাজনীতিবিদ নেতা মাওলানা আবু বকর মিয়া শাহাদাতকালে স্ত্রী ও তিন পুত্র এবং অসংখ্য ভক্ত-অনুরক্তকে রেখে যান।

## ৫.২.৮ হাজী শরফ উদ্দীন আহমদ জুনায়েদ মিয়া

বিশ্ববরেণ্য আলিমেদ্বীন পীর মুহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (২য়) এর ঘরে আল্লাহ্‌র অলি, ফরায়েযী জামা'আতের একনিষ্ঠ নেতা ও অনুপম আদর্শের অধিকারী হাজী শরফ উদ্দীন আহমদ জুনায়েদ মিয়া ১৯৫৪ সালে বাহাদুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৪৯] দাদা পীর বাদশা মিয়ার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে ১৯৭৭ সালে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন। তিনি সর্বদা পিতার খিদমতে নিয়োজিত থাকতেন। ১৯৮০ সালে পিতার সাথে তিনি হজ্জে যান এবং মদিনায় রাসূল সা. এর কবরের পাশে পিতার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। তাকে সবাই হাজী বলে ডাকতেন। তাঁর

৪৯ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

*Dhaka University Institutional Repository*

ছোট ভাই নওশিন মিয়া ও বিন আমিন মিয়া। আল্লাহ্র রসূল সা. এর অনেক গুণাবলি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। ২০০২ সালে ফরায়েযীদের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী মজলিসে শুরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে তাঁর ভাইয়ের শাহাদাতের পর ফরায়েযী জামা'আতের সেক্রেটারি জেনারেল নিয়োগ করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মাওলানা পীর আবু ইয়াহিয়া মুহিউদ্দিন আহমদ দাদন মিয়া।[৫০]

দ্বীন প্রচারে সারা বছর ব্যস্ত হাজী জুনায়েদ মিয়া ফরায়েযীদের মসজিদ, মাদরাসা, লিল্লাহ বোর্ডিং, হিফজখানা ও পরিবারের দেখাশুনা করতেন। তিনি ২০০৬ সালে ইন্তিকাল করেন। এ কথা প্রাণিধানযোগ্য যে ঊনবিংশ শতকে ফরায়েযী আন্দোলনে বহু আলিম জড়িত ছিলেন। তারা হলেন, মাদারিপুরের মাওলানা আহসান উল্লাহ, মাওলানা ইবরাহীম ও মাওলানা আব্দুর জব্বার, মাওলানা সানাউল্লাহ্ (কচুয়া), আজিম উদ্দিন খন্দকার (চান্দিনা, দাউদকান্দি), দরবেশ আলি মুন্সি, জালাল উদ্দিন মণ্ডল বা মোল্লা (ফরিদপুরের কামালপুর), তাঁর মেয়ে জামাতা ফরিদ উদ্দিন, মৌলভী কফিল উদ্দিন আহমদ (১৮৫৬-১৮৮৫ সংযুক্তিকাল), গিয়াস উদ্দিন শাহ্ ফকির, সাঈদ আজিম উদ্দিন খন্দকার (ত্রিপুরা বা কুমিল্লা) আতাউল্লাহ মুন্সি, মহিউল্লাহ মুন্সি, আব্দুর রহমান মুন্সি, ইরফান উদ্দিন মুন্সি, মৌলভী আব্দুল হাই প্রমুখ। এদের অধিকাংশই ফরায়েযীদের খলিফা ছিলেন।

বর্তমান সরকারের শিক্ষানীতি ছাড়াও মাদরাসা শিক্ষা ও ইসলামি আইন বাস্তবায়নে পীর মঈনুদ্দীন জোবায়ের মিয়া, পীরজাদা হাজী হাসিব উদ্দিন আহমদ ওরফে সোয়েব আহমদ (সাবেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান) ও পীরজাদা হাজী মবিন উদ্দিন আহমদ নওশিন মিয়া, আবা খালিদ রাজি উদ্দিন বিন ইয়ামিন এবং আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান (বিগত নির্বাচনে সংসদ সদস্য প্রার্থী ছিলেন) বর্তমান ফরায়েযী জামা'আতের নেতৃত্বের হাল শক্ত করে ধরে আছেন। সরকারি ও কাওমি মাদরাসা, ইয়াতিম খানা, হিফজখানা পরিচালনা ফরায়েযীদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

ফরায়েযীরা তথা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও দুদু মিয়া ইসলামি খিলাফত ও ইসলামি হুকুমত আলা মিনহাজিন নাবুওয়াত শুরু করেছিলেন। কিন্তু পীর বাদশা মিয়া ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি গঠনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেন এবং পীর দুদু মিয়া (২য়) ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি, ১৯৫৪ সালে যুক্ত ফ্রন্ট, ১৯৬৫ সালে পি. ডি. এম., প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমদের ডেমোক্রেটিক লীগ, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার বি. এন. পি. ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পূর্ববর্তী নীতির সাথে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সাথে মিলিত হয়ে ফরায়েযী আন্দোলনের যৌবনকে বার্ধ্যকে উপনীত করেছেন। যা মূল আদর্শের বিচ্যুতি বলে মনে করেন বর্তমান ফরায়েযী বংশধর আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান। ফরায়েযীরা বর্তমানে ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারিপুর, মানিকগঞ্জ (বর্তমানেও তাঁরা ২২টি গ্রামে সরকারি কোর্ট কাচারিতে না

৫০ Muhammad Ahsan Ullah, *Ideology of the Faraizi Movement of Bangal*, Ibid, p. 65

*Dhaka University Institutional Repository*

গিয়ে জায়গা-যমিন ও সামাজিক সমস্যাবলি একজন খলিফার নেতৃত্বে সমাধান করার চেষ্টা করে থাকেন)। দাউদকান্দি, চাঁদপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ, যশোর, বরিশাল ও ভোলাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ময়দানে তারা সক্রিয় আছেন।

### ৫.২.৯ মাওলানা মঈন উদ্ দীন আহমদ জোবায়ের মিয়া

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর ষষ্ঠ পুরুষ ছিলেন মাওলানা মঈন উদ্ দীন আহমদ জোবায়ের মিয়া। পীর মহি উদ্ দীন আহম্মদ দাদান মিয়া রহ. এর সাহেবজাদা। তিনি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৩ সেপ্টম্বর ১৯৪৫ সালে জন্ম গ্রহন করেণ।[৫১] প্রথমে তিনি বাহাদুরপুর আলিয়া মাদরাসায় লেখাপড়া করেন তারপর তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা থেকে কামিল পাশ করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস নিয়ে মাস্টার্স পাশ করেন। মাওলানা জোবায়ের মিয়া ১৯৭৪ সালে জানুয়ারিতে বিবাহ করেন। ফরায়েযীদের পঞ্চম নেতা হযরত মাওলানা পীর মুহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (২য়) কাছে মাওলানা মঈন উদ্ দীন আহমদ জোবায়ের মিয়া বাই'আত গ্রহণ করেন। ১৩ এপ্রিল ২০০৫ সালে পীর মহিউদ্ দীন আহম্মদ দাদান মিয়া (রহ.) এর ইন্তিকালের পর ১৪ এপ্রিল ২০০৫ সাল থেকে মাওলানা মঈন উদ্ দীন আহমদ জোবায়ের মিয়া বাহাদুরপুর পীরের ও ফরায়েযী আন্দোলনের আমীরের এর দায়িত্ব পালন করেন। পিতার আদর্শে আদর্শবান হয়ে আল্লাহ্ ও রসুল সা. এর ভালবাসায় হাজারো ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পরিচালনা করেছেন বাবার রেখে যাওয়া দা'ওয়াতী মিশন ও ইসলামি আন্দোলন। তিনি ২০১২ সালের ২৫ নভেম্বর ইন্তিকাল করেন। তাঁর লিখিত বই হলো তা'লিমুছ ছালাত বা নামায শিক্ষা। মাদরাসা শিক্ষা ও ইসলামি আইন বাস্তবায়নে পীর মঈনুদ্দীন আহমদ জোবায়ের মিয়া ফরায়েযী জামা'আতের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

### ৫.২.১০ মাওলানা আব্দুল্লাহ মোহাম্মাদ হাসান (জীবিত)

আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর সপ্তম পুরুষ। তিনি শহীদ পীর মোসলেহ উদ্দীন আহম্মদ আবু বকর (রহ.) এর বড় সাহেবজাদা। তিনি ২০ অক্টেবর ১৯৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[৫২] দাদাজি পীর মোহসীন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (২য়) তাঁকে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে ঢাকার বড় কাটরা হিফজ খানায় ভর্তি করে দেন। তের বছর বয়সে তিনি হিফজ সমাপ্ত করেন। দাদাজি পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (২য়) সর্বপ্রথম তাঁকে বাই'আত করান ও খিলাফত প্রদান করেন। ঢাকার মিরপুর মাদ্রাসা থেকে দাওরা হাদিস সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাকিস্তানের করাচি শহরে

৫১ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
৫২ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান, *তরীকুল জান্নাহ্*(বাহাদুর পুর: শরীয়াতিয়া আস্তানা, ১ম প্রকাশ ২০০৫) পৃ. ৯৬

*Dhaka University Institutional Repository*

জামেআ ইসলামিয়াতে কুরআন হাদিসের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর এশিয়া মহাদেশের শ্রেষ্ঠ দ্বীনি বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারতে লেখাপড়া করেন।

২০০০ সালে বাবা-মাকে নিয়ে বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্য রওয়ানা হন ও পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। হজ্জ শেষে মদিনা মুনাওয়ারায় প্রিয় নবীজি সা. এর রওজা মুবারকের সামনে তাঁর আব্বাজান তাঁকে দ্বিতীয় বার বাই‘আত করান ও খিলাফত দান করেন। দেশে ফিরে তরিকতের লাইনে মেহনত করতে থাকেন। ২০০৩ সালে হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. এর খলিফা হযরত আবরারুল হক রহ. তাঁকে সবক দেন ও বাই‘আত করান এবং তাঁর খলিফা মজলিসে দাওয়াতুল হক এর আমির হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ. তাঁকে তৃতীয় বার খিলাফত দান করেন। বর্তমানে পিতার আদর্শে আদর্শবান হয়ে আল্লাহ ও রসুল সা. এর ভালবাসায় হাজারো ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পরিচালনা করেছেন বাবার রেখে যাওয়া দা’ওয়াতি মিশন ও ইসলামি আন্দোলন। শহীদ পীর মোসলেহ উদ্দীন আবু বকর রহ. প্রতিষ্ঠিত মাদানীয়া শারীয়াতিয়া কওমী মাদরাসার মুহতামিম এর দায়িত্ব পালন করেছেন হযরত আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান। তিনি ২০০৮ সালে ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে ফরায়েযী আন্দোলনের আমীরের দায়িত্ব পালন করছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, হাজী শরী‘অতুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফরায়েযী আন্দোলন একটা খাঁটি দ্বীনি ও সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলন ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর বংশধরদের দ্বীনি কার্যক্রমের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সে কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

*Dhaka University Institutional Repository*

# ৫.৩ হাজী শরী'অতুল্লাহর উত্তরসূরিদের দায়িত্ব গ্রহণ

## ৫.৩.১ হাজী শরী'অতুল্লাহর চিন্তা ও দুদু মিয়ার আত্নীকরণ

মুসলিম নামধারীদের পূর্ণাঙ্গ মুসলিম তৈরির জন্য হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) আজীবন আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের জমে থাকা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দীর্ঘদিন হিন্দুদের পাশাপাশি থাকার কারণে এবং যথারীতি ধর্মীয় জ্ঞান না থাকায় মুসলিমগণ হিন্দু কৃষ্টির প্রতি ঝুকে পড়ে, যা ছিল মুসলিমগণের আক্বীদা ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।[৫৩] ১৭৬৫ সালে বৃটিশ কোম্পানির শাসন দেওয়ানি লাভের পর থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত এ পঞ্চাশ বছর পূর্ববাংলার মুসলিমগণ ছিল রাখাল বিহীন মেষ পালের মত। নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস হতে বহু দূরে সরে গিয়ে তারা হিন্দু ধর্মীয় বহুবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিমগণের পীর এবং পীরের মাজারের প্রতি ভক্তি চরম আকার ধারণ করে। পীরকে পূঁজনীয় মনে করে পীরের পায়ের আঙ্গুল চোষন, পীরকে সিজদা এবং পীর গায়েব জানেন মনে করা হত। পরকালের হিসেব নিকাশের সময় পীরের সাহায্য পাওয়া যাবে ধারণার পাশাপাশি পীরের মাজারে গিলাফ পরানো ও মোমবাতি জ্বালানো হত। মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য পীরের মাজারের কাছে মাথা নত করে মৃত পীরের সাহায্য এবং মাজারের মাটি মাদুলীতে ভরে গলায় ধারণ করা হত। গোটা দেশ ভরে যায় পীর পূঁজা ও মাজার পূঁজায়। মুসলিমগণের অবশ্য করণীয় ফরয কাজ নামায-রোযার পরিবর্তে প্রবল হয়ে উঠে মাজার আর পীরের সেবা। দেশ ভরে যায় মাজার আর পীর মুরীদে।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এদেশে প্রথম ব্যক্তি, যিনি শরীয়ত, তরীকত তথা পীরের স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে মানুষকে জানান যে, পীর একজন মানুষ মাত্র। পীর শিক্ষক এবং মুরীদ ছাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। পীর আল্লাহ্‌র সমকক্ষ নয় এবং তিনি কবরে বা হাশরে কোনো উপকারে আসবেন না। কল্যাণ-অকল্যাণে পীরের কোনো ভূমিকা নেই। পীরের মাজারে গিলাফ, মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালানো বিদ'আত ঘোষণা করেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। তিনি ফরযের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ধর্মীয় সংস্কাররূপে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) প্রচার চালিয়ে ছিলেন, বিধর্মীয় আচার-আচরণ পরিহার করা, টুপি পরা, দাড়ি রাখা এবং ধুতিপরা বাদ দিয়ে লুঙ্গি বা পাজামা পরার কথা বলেছেন। পায়খানা-প্রস্রাবে ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা। অনেক নিম্নবর্ণের হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং অনেকে ইসলাম গ্রহণ না করেই মুক্তি আন্দোলন 'ফরায়েযী আন্দোলনের' সহায়ক শক্তি হিসেবে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর পাশে এসে দাঁড়ান।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তাঁর একমাত্র পুত্র মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়াকে এতদিন কোনো দায়িত্ব ভার অর্পণ করেননি। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ইন্তিকাল করেন, তখনও দুদু

৫৩ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

মিয়ার বয়স কম ছিল। তখন ফরায়েযীগণ মিলিত হয়ে মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়াকে তাদের উস্তাদ বা প্রধান হিসেবে স্বীকার করে। এ নির্বাচন দুদু মিয়ার কর্মজীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাসেও তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর দুদু মিয়ার অপ্রতিরোধ্য শৌর্য প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

তিনি চিন্তা করেন যে, ফরায়েযী কৃষকদের উপর জমিদারদের উচ্চাভিলাষী নির্যাতনের বিরুদ্ধে দ্রুত ও দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ১৮৪১ এবং ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া দু'টি অভিযান পরিচালনা করেন। একটি অভিযান ছিল কানাইপুরের 'সিকদার' ও অপরটি ছিল ফরিদপুরের 'ঘোষ' জমিদারদের বিরুদ্ধে। দুদু মিয়া এবং তাঁর অনুসারীদের কাছে এ ছাড়া কোনো বিকল্প পথ খোলা ছিল না। বল প্রয়োগ না করে যুক্তির মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হওয়া ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এ অভিযানগুলো সফলতা অর্জন করে। এর ফলশ্রুতিতে দুদু মিয়া আন্দোলনের নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেন, যা ফরায়েযী আন্দোলনকে নবজীবন দান করে।

### ৫.৩.২ দুদু মিয়ার সংগ্রামে নৈর্ব্যক্তিক সহায়ক প্রতিফলন

মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু  মিয়ার জীবন সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে ধারণা করা যায় যে, জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে তাঁর বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল মূলত ফরায়েযী কৃষকদেরকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য। ইউরোপীয় লেখকগণ অবশ্য তাকে দস্যুতা, আইন অমান্যকারী ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করেছে।[৫৪]

(১) ক্যালকাটা রিভিউর একজন লেখক পূর্ববতী সময়ে তিতুমীরের গোলযোগের সঙ্গে দুদু মিয়ার একটি যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন। এ লেখায় দুদু মিয়াকে একজন অপরাধী এবং শান্তি বিনষ্টকারী হিসেবে চিহ্নিত করে।

(২) বেঙ্গল পুলিশের কমিশনার মি. ডাম্পিয়ার অভিযোগ করেন যে, ফরায়েযীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শাসকদের বহিষ্কার করে মুসলিম শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তিনি দুদু মিয়াকে একজন বিপদজনক ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং যাবজ্জীবন নির্বাসন দেয়ার সুপারিশ করেন। এ ছাড়া ফরায়েযী সম্প্রদায়ের উপর নজর রাখার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

(৩) মওলানা কেরামত আলী ও দুদু মিয়াকে এইচ. বেভারিজ বাকেরগঞ্জ জেলার যে কোনো জজ বা ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবশালী বেসরকারি ব্যক্তি বলে মনে করেন। তিনি অবশ্য দুদু মিয়ার চরিত্রকে পাপাচারে দূষিত বলে মনে করেন এবং তিনি তাঁর প্রভাবকে জনকল্যাণ মূলক বলতে রাযি নন।

---

৫৪ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

(৪) জেমস ওয়াইজ বলেন যে, দুদু মিয়া তাঁর আইন বিরোধী কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজের চরিত্রকে ক্রমাগত অধঃপতিত করেছেন। তাঁর পক্ষে দুদু মিয়ার ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের বিচারের উদাহরণ উল্লেখ করেন। এ বিচারগুলো সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন বাধা, যেগুলোর বিরুদ্ধে দুদু মিয়া আন্দোলন করেছেন সেগুলো যদি পরীক্ষা করা হয় তাহলে উক্ত অভিযোগগুলো অসার এবং অনভিপ্রেত মনে হবে। সুতরাং দুদু মিয়া রহ. এর আন্দোলন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতা।

### ৫.৩.৩ অন্যান্য উত্তরসূরিবৃন্দের বুদ্ধি বৃত্তিক সমন্বয়

**আব্দুল গফুর ওরফে নয়া মিয়া :** ১৮৬৪ সালে নয়া মিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ফরায়েযীদের উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা বেড়ে যায়। একদিকে তিনি পিতা ও দাদার পদাংক অনুসরণ করে ইসলামি আন্দোলনের কাজ যোগান দিচ্ছেন, অন্যদিকে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের অধিকার আদায়ে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ফরায়েযীদেরকে পুনরায় সংঘটিত করেন।[৫৫] তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজগুলি ছিল নিম্নরূপ :

- পিতা ও দাদার মত ইসলামি আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যাওয়া।
- হত দরিদ্র কৃষক তাঁতীদের পক্ষে জমিদার ও বৃটিশদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ।
- জুমু'আর নামায নিয়ে মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী ও তাঁর ছেলে হাফেজ আহমদ এর সাথে বাহাছে লিপ্ত হওয়া।
- ১৮৭৩ সালে বৃটিশ ভারতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পাবনার কৃষক বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা করা হয়। যার মাধ্যমে বৃটিশ সরকার কৃষকদের অধিকার সংরক্ষণে আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়।

**খান বাহাদুর সাইদ উদ্দিন আহমদ :** খান বাহাদুর সাইদ উদ্দীন আহমদ রহ. ফরায়েযীদের নেতা হয়ে তিনি সরকারের সাথে কিছুটা সম্পর্ক রাখার কারণে সরকার তাকে খান বাহাদুর উপাধি দেন। ফরায়েযী নেতা আব্দুল লতিফ ও মাওলানা আব্দুল বাতেন নোমান বলেন, ১৮৯৮ সালে বাংলায় গুটি বসন্ত মহামারি আকারে দেখা দিলে সরকারের নেয়া টিকা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া বৈধ্য বলে ফাত্ওয়া দিলে সরকার তাকে খান বাহাদুর উপাধি দেন। খান বাহাদুর সাইদ উদ্দীন আহমদ এর সময়ে ফরায়েযীরা প্রতিপক্ষের বাহাছে বারবার লিপ্ত হতে বাধ্য হন। তিনি একজন উদারমনা, বন্ধুবৎসল, ছোট-বড় সবার প্রিয় ও ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর আমলে ফরায়েযীদের সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষে উন্নিত হয়। যা পরবর্তীতে বাদশা মিয়ার আমলে ৬০ লক্ষে উন্নিত হওয়ার কথা 'বঙ্গবাসী' নামক পত্রিকা ও সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা ১৯২১ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

৫৫ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

**হযরত পীর বাদশাহ মিয়া :** ১৯০৫ সালে পিতা খান বাহাদুর সাঈদ উদ্দিন আহমদ ইন্তিকাল করলে তিনি ফরায়েযীদের গণতান্ত্রিক পন্থায় নেতা হন। পীর বাদশা মিয়া পিতার মত দ্বীনের দাওয়াত ও সংস্কারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব নেন। ১৯০৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর বুধবার ঢাকার শাহবাগের 'বর্তমান জাতীয় যাদুঘরের পাশে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ভারতবর্ষের মুসলিম নেতারা 'মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স' এ মিলিত হলে পীর বাদশা মিয়া ঐ কনফারেন্সে যোগ দিয়ে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির শিক্ষার উন্নতির জন্য একশ বিশ টাকা চাঁদা প্রদান করেন। পীর সাহেব লক্ষীপূজা নিষিদ্ধ করেন ও বিদ'আতি পীরের অনুসরণ থেকে জনগণকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। তার শিক্ষাগুলো ছিল নিম্নরূপ :

- যাত্রা, নাটক, কবর পূজা, কবর স্থানে আলো জ্বালানো কবরের উপরে দালান নির্মাণ করা ও মৃত ব্যক্তির নামে মাটিয়াল খাওয়ানো নিষিদ্ধ করণ।
- মদ, জুয়া, গাঁজা ও নেশা জাতীয় দ্রব্য বর্জন।
- আশ্বিণে রান্না কার্তিকে খাওয়া, যে বর মাগে সে বর পাওয়া নিষিদ্ধ করণ।
- শিয়াদের তাজিয়া মিছিল নিষিদ্ধ করণ।
- বিবাহ উৎসবে হিন্দুদের মত গায়ে রং ছিটানো ও রাখি বন্ধন নিষিদ্ধ করণ।
- আল্লাহ্ ছাড়া কারও নামে যেমন, পীর ফকিরের নামে মান্নত করা হারাম ঘোষণা দেয়া।
- মুসলিমদের সমাজে আশরাফ-আতরাফ তথা শ্রেণি বৈষম্য নিষিদ্ধ করণ।
- জোলা, তাঁতী, ক্ষৌরকার ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন পদের কাজগুলোকে মুসলিমদের জন্য হালাল ঘোষণা করা।[৫৬]

**মাওলানা পীর মুহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (২য়) :** ১৯৪০ সালে তিনি পিতা পীর বাদশা মিয়া রহ. এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেন। পিতার সাথে তিনি সর্বত্র ওয়াজ-নছিহত, যিকির-আযকার ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে বৃটিশ কর্তৃক যে নির্বাচন হয় সে নির্বাচনে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। একদিকে দুদু মিয়া ও বাদশা মিয়া শেরে বাংলার 'কৃষক প্রজা পার্টি'র সাথে সম্পর্ক রাখেন। অন্যদিকে ইসলাম কায়েম করার জন্য তিনি জীবন বাজি রেখে কাজ করতে থাকেন। ১৯৫৯ সালে পিতা বাদশা মিয়া ইন্তিকাল করলে হযরত পীর মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (২য়) ফরায়েযীদের নেতা হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ সালের ১৯ জুলাই পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সংসদে হযরত পীর মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (২য়) বলেন যে, ১৯৬৩ সালে Advisory Council of Islamic Ideology এবং ১৯৬৪-১৯৬৫ সালেও এ নিয়ে আলোচনা ও সুপারিশমালা পাশ হয়, কিন্তু এর কোনো কার্যক্রম দেখা যায়নি।  তিনি পাকিস্তানের সংবিধানে ইসলামি নীতির প্রতিষ্ঠা করা ও ইসলামি আইন বাস্তবায়ন এবং একদল ইসলামিক গবেষক দিয়ে ঐ কাউন্সিল পরিচালনার আহ্বান জানান।

---

৫৬ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

*Dhaka University Institutional Repository*

১৯৬৭ সালে ২২ জুলাই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে হযরত মুহাম্মদ সা. এর নবুওয়্যাত অস্বীকারকারী মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির ভ্রান্ত মতবাদকে নিষিদ্ধ করণ ও কাদিয়ানিদের অ-মুসলিম ঘোষণা দেয়াসহ সংখ্যালঘুদের মর্যাদা দেয়ার জন্য বিল উত্থাপন করেন। পার্লামেন্টে এ বিল পাশ হয়। ১৯৬৮ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিবাহ পড়ানোর জন্য শেখ মজিবুর রহমান পীর সাহেবকে অনুরোধ জানান। পীর সাহেব তার খুলনার কর্মসুচি বাদ দিয়ে এ বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা ও মুনাজাত পরিচালনা করেন।[৫৭]

**পীর মুহিউদ্দিন আহমদ দাদন মিয়া :** আল্লাহ্‌র অলি পীর মাওলানা মহিউদ্দিন আহমদ (দাদন মিয়া) রহ. তাঁর পূর্বসূরিদের মত ইসলামের সকল কাজ যোগান দিয়েছেন আজীবন। পীর বাদশা মিয়ার ছেলে পীর মহিউদ্দিন আহমদ (দাদন মিয়া) আপন বড় ভাই পীর দুদু মিয়া (২য়) এর সারা জীবনের সাথী ছিলেন। বড় ভাই এর ইন্তিকালের পর ১৯৯৭ সালে তিনি পীরের আসনে আসীন হন। চেহারা আদব কায়দায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন সমুদ্রের মত স্থির। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা ও ইসলামি আইন বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তিনি অনুপম আদর্শ, চারিত্রিক মাধুর্য ও যিকির-আযকারে লিপ্ত আল্লাহ্‌র অলি ফরায়েযী জামা'আতের একনিষ্ঠ কর্মী বীর ব্যক্তি ছিলেন যার আচরণ ভুলার নয়।

**শহীদ মাওলানা প্রিন্সিপাল আবু বকর মিয়া :** ফরায়েযী বংশধরের প্রথম শহীদ মাওলানা প্রিন্সিপাল মুসলিহ্ উদ্দীন আহমদ আবু বকর মিয়া। ২০০০ সালে তিনি ফরায়েযী জামা'আতের মহাসচিব মনোনীত হন। শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাবের অধিকারী মাওলানা আবুবকর মিয়া স্পষ্টভাষী ও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। ভণ্ডপীরদের তিনি আতঙ্ক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলে বাহাদুরপুর থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং তিনি আদালতে জামিনে মুক্তি ও মামলায় বেকসুর খালাস পান। ১৯৯৭ সালে সরকারি মাদরাসার প্রিন্সিপাল হওয়া সত্ত্বেও তিনি শরীয়তিয়া মাদানিয়া কাওমি মাদরাসা স্থাপন করেন। যার দায়িত্বে রয়েছে তাঁর বড় ছেলে ও আমীর হাফেজ মাওলানা আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ হাসান।

**হাজী শরফ উদ্দীন আহমদ জুনায়েদ মিয়া :** বিশ্ব বরেণ্য আলেমেদ্বীন পীর মুহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (২য়) এর ঘরে আল্লাহ্‌র অলি, ফরায়েযী জামা'আতের একনিষ্ঠ নেতা ও অনুপম আদর্শের অধিকারী হাজী শরফ উদ্দীন আহমদ জুনায়েদ মিয়া ১৯৫৪ সালে বাহাদুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এদের অধিকাংশই ফরায়েযীদের খলিফা ছিলেন। বর্তমান সরকারের শিক্ষানীতি ছাড়াও মাদরাসা শিক্ষা ও ইসলামী আইন বাস্তবায়নে পীর মঈনুদ্দীন জুবায়ের মিয়া, পীরজাদা হাজী হাসিব উদ্দিন আহমদ ওরফে সোয়েব আহমদ (সাবেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান) ও পীরজাদা হাজী মবিন উদ্দিন আহমদ নওশিন মিয়া, আবা খালিদ রাযি উদ্দিন বিন ইয়ামিন এবং আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান। বর্তমান

---

৫৭ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯-১৭০

*Dhaka University Institutional Repository*

ফরায়েযী জামা'আতের নেতৃত্বের হাল শক্ত করে ধরে আছেন। সরকারি ও কাওমি মাদরাসা, ইয়াতিমখানা, হিফজখানা পরিচালনা ফরায়েযীদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। ফরায়েযীরা তথা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও দুদু মিয়া ইসলামি খিলাফত ও ইসলামি হুকুমত আলা মিনহাজিন নাবুওয়াত শুরু করেছিলেন।[৫৮]

**মাওলানা মঈন উদ্ দীন আহমদ জোবায়ের মিয়া :** ভারতীয় উপমহাদেশের ফরায়েযী আন্দোলনের অগ্রনায়ক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রদূত তথা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর ষষ্ঠ পুরুষ ছিলেন মাওলানা মঈন উদ্ দীন আহমদ জোবায়ের মিয়া। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৩ সেপ্টম্বর ১৯৪৫ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ফরায়েযীদের পঞ্চম নেতা হযরত মাওলানা পীর মুহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (২য়) (রহ.) এর কাছে মাওলানা মঈন উদ্ দীন আহমদ জোবায়ের মিয়া বাই'আত গ্রহণ করেন। ১৩ এপ্রিল ২০০৫ সালে পীর মহি উদ্ দীন আহম্মদ দাদন মিয়া (রহ.) এর ইন্তিকালের পর ১৪ এপ্রিল ২০০৫ সাল থেকে মাওলানা মঈন উদ্ দীন আহমদ জোবায়ের মিয়া বাহাদুরপুর পীরের ও ফরায়েযী আন্দোলনের আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১২ সালের ২৫ নভেম্বর ইন্তিকাল করেন।

**মাওলানা আব্দুল্লাহ মোহাম্মাদ হাসান (জীবিত) :** আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রদূত তথা ভারতীয় উপমহাদেশের ফরায়েযী আন্দোলনের অগ্রনায়ক হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর সপ্তম পুরুষ। তিনি শহীদ পীর মোসলেহ উদ্দীন আহম্মদ আবু বকর রহ. এর বড় সাহেবজাদা। বর্তমানে পিতার আদর্শে আদর্শবান হয়ে আল্লাহ্ ও রসুল সা. এর ভালবাসায় হাজারো ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পরিচালনা করেছেন বাবার রেখে যাওয়া দা'ওয়াতি মিশন ও ইসলামি আন্দোলন। শহীদ পীর মোসলেহ উদ্দীন আবুবকর রহ. প্রতিষ্ঠিত মাদানীয়া শারীয়াতিয়া কওমী মাদরাসার মুহতামিম এর দায়িত্ব পালন করেছেন হযরত আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান। তিনি ২০০৮ সালে ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন এবং ১১৪১৯ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ছিল মোট বৈধ ভোটের ৭.৩১%।[৫৯] তিনি বর্তমানে ফরায়েযী আন্দোলনের আমীরের দায়িত্ব পালন করছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফরায়েযী আন্দোলন একটা খাঁটি দ্বীনি ও সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলন ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি সমাজ থেকে শিরক, বিদ'আত উচ্ছেদ করে সেখানে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বংশধরগণও সেই প্রদর্শিত পথে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন যুগের পর যুগ ধরে।

---

৫৮ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩

৫৯ পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২৯ ডিসেম্বর ২০০৮)(ঢাকা : জনসংযোগ অধিশাখা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, জানুয়ারি ২০১২), পৃ. ১৬৯

*Dhaka University Institutional Repository*

# ষষ্ঠ অধ্যায়

# ফরায়েযী আন্দোলনের সমসাময়িক সংস্কার আন্দোলনসমূহ

## ৬.১ ফরায়েযী ও সমসাময়িক বিশ্ব আন্দোলন

### ৬.১.১ হাজী শরী'অতুল্লাহর সমসাময়িক বিশ্ব ইসলামি আন্দোলনসমূহ

প্রখ্যাত ইসলামি ধর্মতাত্ত্বিক হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে বৃটিশ অধিকৃত বাংলায় যে আন্দোলন শুরু করেন, তা শুধু ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না; বরং তা ছিল ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, দা'ওয়াতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। তাঁর সংস্কারমূলক ও পুনর্জীবনদানকারী আন্দোলন ছিল ভারত তথা বাংলার মুসলিম সমাজে ঔপনিবেসিক শাসন-শোষণ, অর্থনৈতিক দূরবস্থা, ধর্মীয় ভণ্ডামী ও সাংস্কৃতিক গোলামি থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য। নবাব সিরাজ উদ্ দৌলার পতনের সাথে বৃটিশ শাসনের ভিত মজবুত হতে থাকে। একে একে ভারতের সকল রাজ্যগুলো বৃটিশের অধীনে চলে যায়। এতে হিন্দুরা আলো পেয়েছে বলে দাবি করলেও মুসলিমগণের জন্য এটা ছিল একটা কিয়ামত বা সুনামি।[১]

ঊনিশ শতকে বাংলা বিশ্ব মুসলিম থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। দীর্ঘ প্রায় আট'শ বছর মুসলিমগণ পৃথিবী শাসন করেছিল। ১৪৯২ সালের পহেলা এপ্রিল (এপ্রিল ফুল) স্পেনে মুসলিমগণের প্রায় আট'শ বছরের শাসন উৎখাত করে মুসলিমগণকে মসজিদে ঢুকিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে অট্টহাসি হাসেন রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রাণী ইসাবেলা। ১৪৯৬ সালে খৃষ্টান রাজা-রাণী ও পর্তুগিজ সরকার পশ্চিম আফ্রিকায় স্পেন এবং পূর্ব আফ্রিকা ও এশিয়ার মুসলিম দেশসমূহকে বাঘের মত টুকরো টুকরো করে ভাগ বাটোয়ারা করার একটি গোপন চুক্তিতে মিলিত হয়। এদের সাথে যুক্ত হয় ইটালি, ফ্রান্স, জার্মানি। ফ্রান্স ও স্পেন আলজেরিয়াসহ কয়েকটি মুসলিম দেশ দখল করে। ইটালি দখল করে লিবিয়াসহ কয়েকটি দেশ।[২]

পর্তুগিজরা ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া তাদের শাসনের অধীনে আনে। বৃটিশরা মিশর ও ভারতবর্ষ দখল করে। তবে ভারতবর্ষ তথা বাংলায় প্রথম ব্যবসা করে ও বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে পর্তুগিজরা। এ সকল খৃষ্টান দেশগুলো মুসলিমগণের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঈমান-আক্বিদা, সভ্যতা ও রাজনীতি-অর্থনীতি ধ্বংস করে ছাড়ে। পাশ্চাত্যের এ ঔপনিবেশিক শাসনগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মুসলিম দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন আন্দোলন শুরু করে। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর আন্দোলনও অনুরূপ একটি বিশ্ব

---

১ ড. মোঃ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম*(ঢাকা : শরীয়তিয়া প্রকাশনী, জানুয়ারী- ২০১০), পৃ. ২৫

২ এ, এইচ, এম, শামসুর রহমান, *স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস*(ঢাকা : ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, সং. ৫, রমযান ১৪১৬ হি.), পৃ. ১৮৩-১৮৫

আন্দোলনের অংশ। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য নেতারা তাদের দেশে সংস্কারমূলক ও মুসলিম শাসন পুনরুদ্ধারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনেন। উল্লেখ্য, আরব দেশে তথা বর্তমান সাউদি আরব কখন কোনো পরাধীন রাষ্ট্রের শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে সেখানে হযরত মুহাম্মদ সা. ও তাঁর সাহাবীদের সোনালী আমলের শিরক-বিদ'আত মুক্ত সমাজ আর থাকেনি। তারা তুর্কিদের অধীন থাকলেও ইসলাম বিরোধী অনেক কর্মকাণ্ড তাদের সমাজে প্রবেশ করে। সেসব কর্মকাণ্ড উৎপাটন করে মূল ইসলামি আক্বিদা ফিরিয়ে আনার জন্য মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (১৭০৩-১৭৯২) তার চিন্তাগুরু ইমাম ইব্ন তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম এর অনুসরণ করে বর্তমান সউদি আরবের রিয়াদে (দারিয়া) ১৭৩০ সাল থেকে সংস্কারমূলক আন্দোলনের যৌবন আনেন। তিনি যখন আন্দোলন শুরু করেন তখন (১৭৫৭ সালে) বৃটিশরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা দখল করে। সে সময় দিল্লির প্রখ্যাত আলিম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (১৭০৩-১৭৬২) ভারতে সংস্কারমূলক আন্দোলনের চিন্তাধারা তার লেখনির মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

ঊনিশ শতকে যে সমস্ত আন্দোলন মুসলিম বিশ্বে উদ্ভব হয়, তা হলো- আরব বিশ্বে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব 'মুয়াহহিদুন আন্দোলন', লিবিয়াতে মুহাম্মদ আলি আস-সানুসি 'সানুসি আন্দোলন', মিশরে 'সালাফি আন্দোলন', ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়াতে 'ফাদুরি' ও 'মুহাম্মদি' আন্দোলন, সুদান ও মধ্য আফ্রিকায় 'মাহদি আন্দোলন', পশ্চিম আফ্রিকায় 'ফুলানি আন্দোলন', ভারত বর্ষে সৈয়দ আহমদ বেরলোভির 'তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া' মীর নেসার আলি তিতুমীরের 'জিহাদ আন্দোলন', মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরির তা'আয়্যুনি ও হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর ফরায়েযী আন্দোলন অন্যতম।[৩]

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মক্কায় অধ্যয়ন কালে ওয়াহাবি ও অন্যান্য আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে কোনো না কোনো কারণে মিলিত হয়েছেন। কারণ ঐ আন্দোলনগুলোর প্রতিষ্ঠাতাগণ প্রায় সবাই মক্কায় পড়াশুনা করেছেন। ওয়াহাবিদের তাওহীদের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া ও শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা তাদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে পারে বলে মনে করা যেতে পারে। তবে প্রাচীন ফরায়েযীরা এটাকে অস্বীকার করে বলেন যে, তারা কোনোভাবে ওয়াহাবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়নি। তবে সব বৃটিশ রেকর্ড ও বর্তমান ফরায়েযী কয়েকজন নেতা ঐ প্রভাবকে স্বীকার করেন। ওয়াহাবি আন্দোলন মূলত বিশ্ব ইসলামি আন্দোলনের গত তিন শতকের মূল আন্দোলন। বর্তমান সাউদি রাজতন্ত্রের শাসকগণ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের অনুসারী। যারা কবর পূজা, গাছ পূজা, নবী পূজাসহ সকল ধরনের বিদ'আতের বিরোধী। এখানে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর সমসাময়িক আন্দোলনসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল:

৩ ড. মো: আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

## ৬.১.২ ওয়াহাবি আন্দোলন

মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (১৭০৩-১৭৯২ সাল) প্রতিষ্ঠা করেন 'মুওয়াহহিদুন আন্দোলন'। তাঁর বিরোধীরা তাকে ও তাঁর আন্দোলকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে নাম দেন ওয়াহাবি আন্দোলন।[৪] মূলত ওয়াহহাব তাঁর পিতার নামের শেষের শব্দ। মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ১৭০৩ সালে তৎকালীন নজদের উযাইনা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সে তিনি কুরআনের হাফিজ হন এবং মক্কা, মদিনা, মিশর, ইরাক ও সিরিয়াসহ বিভিন্ন নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি ইসলামি শিক্ষা অর্জন করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পড়ার সময় তিনি বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা ইব্ন তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮ হি.) ও তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়িম এর চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হন। ইব্ন তাইমিয়ার শিক্ষা অনুযায়ী আরব বিশ্বে প্রবেশ করা বিভিন্ন ধরনের শিরক-বিদ'আত মুছে ফেলা ও প্রকৃত মুসলিম হওয়ার এবং ইসলামের সোনালী যুগের খিলাফত আবার ফিরিয়ে আনা জরুরি হয়ে পড়ে, যা তৎকালিন মুসলিম সমাজের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। প্রথম দিকে তিনি কিছুটা বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তবে তাঁর উদ্যম ও প্রচেষ্টা থেমে থাকেনি। তিনি একটা বিখ্যাত বই লেখেন। যার নাম হলো 'কিতাবুত তাওহীদ' যাতে রয়েছে ইসলাম অননুমোদিত সকল ধরনের আল্লাহর সাথে ইবাদত করার ক্ষেত্রে আপোষ পরিহার করা এবং বিভিন্ন ধরনের শিরক-বিদ'আতকে মুছে ফেলা।[৫]

একদা তিনি দ্বীনের দা'ওয়াত ও সংস্কারমূলক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সময় বিরোধিতার সম্মুখীন হলে তৎকালীন দরিয়ার (রিয়াদ) গোত্রপতি ও বর্তমান সাউদি আরবের বাদশাহগণের পূর্বপুরুষ মুহাম্মদ বিন সাউদ (যার নাম অনুসারে বর্তমান সাউদি আরব) এর সাথে তিনি সম্পর্ক কায়েম করেন। তিনি ইব্ন সাউদের মেয়েকে বিবাহ করেন আর ইব্ন সাউদ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের আগের ঘরের মেয়েকে বিবাহ করেন। এতে করে বিদ'আতি ও কবর পূজারীরা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। আর সাউদি বংশ তার দ্বীনের দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বড় ধরনের শক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। তিনি বিভিন্ন স্থানে তার দা'ওয়াতি কাজ অব্যাহত রাখেন। বারবার তিনি বিভিন্ন প্রকারের বিদ'আতি মুসলিমগণের শত্রুতার সম্মুখীন হন। হযরত আদম আ. ও সুলায়মান আ. ছাড়া সকল আম্বিয়াগণ আ. যেমন কায়েমী স্বার্থবাদী শাসক গোষ্ঠির নিপীড়ন-নির্যাতনের সম্মুখীন হন, মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবও অনুরূপ বিরোধিতার সম্মুখীন হন। আল্লাহ্র রসূল সা. এর দা'ওয়াতি মিশন ও কৌশল রপ্ত করে দ্বীনের সঠিক দা'ওয়াত দিতে থাকেন। তিনি বিভিন্ন এলাকার গোত্রপতি, রাজা ও বিভিন্ন দেশের শাসক শ্রেণির কাছে তাঁর দা'ওয়াতি কাজের আহ্বান জানান।

---

৪ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দালন*(কুষ্টিয়া : সেন্টার ফর ইসলামিক দা'ওয়াহ্ এন্ড কালচার, ফেব্রুয়ারী ২০১১), পৃ. ৩

৫ Dr. Mohammad Ahsan Ullah Faysal, *Ideology of the Faraizi Movement of Bengal* (Aligar : Aligar Muslim University, 2001), p. 58

*Dhaka University Institutional Repository*

যারা তার বিরোধিতা করতেন, তিনি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে মক্কা, মদীনাসহ অনেক স্থান থেকে শিরক-বিদ'আত নির্মূল হয়। তাঁর কাজ বর্তমান সাউদি রাজবংশ অদ্যাবধি চালিয়ে যাচ্ছেন। তার কাজের মূল ক্ষেত্র ছিল সাউদি আরব। কিন্তু তাঁর প্রভাব পড়েছে প্রায় মুসলিম বিশ্বের সকল স্থানে। কারণ মক্কা-মদীনা মুসলিমগণের প্রাণকেন্দ্র। আর সকল সংস্কারক সেখানে হাজ্জ করতে যেতে বাধ্য হন ধর্মীয় নির্দেশের কারণে।

আদর্শিকভাবে ওয়াহাবিরা তাওহীদের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। তারা শিরক, বিদ'আত, আল্লাহ্ ছাড়া কারও নামে কসম খাওয়া, পীর-মুরিদী প্রথা, কবর পূজা, কবরে ফুল ও বাতি দেয়া, অন্ধ অনুকরণ, দলভিত্তিক যিকির, নাচ, গান, সুরে সুরে কবিতা আবৃতি, শিয়া, মু'তাজিলা, সুফিজম, মিলাদ পড়া, আশুরার অনুষ্ঠান করা, ধুমপান ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি ইজতিহাদ ও ইজমাকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর আদর্শ বর্তমান সাউদিদের আদর্শ। তবে ওয়াহাবিরা হাম্বলি ও শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারি, কিন্তু ফরায়েযীরা হানাফি মাযহাবের অনুসারী।

### ৬.১.৩ অন্যান্য ইসলামি আন্দোলন

ঊনিশ শতকে যে সমস্ত আন্দোলন মুসলিম বিশ্বে উদ্ভব হয়, তা হলো- আরব বিশ্বে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব 'মুত্তাহহিদুন আন্দোলন', ১৭৯১-১৮৫৯ সালে লিবিয়াতে মুহাম্মদ আলী আস-সানুসি শুরু করেন 'সানুসি আন্দোলন',[৬] মিশরে 'সালাফি আন্দোলন',[৭] ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়াতে শাইখ আলহাজ্ব মাসক এবং তাঁর আটজন হাজী সহচর ফাদুরি আন্দোলন শুরু করেন। এরা সবাই মক্কাতে ওয়াহাবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে দেশে ফিরে অন্যান্য আন্দোলনের মত একই মিশন নিয়ে কাজ শুরু করেন। আন্দোলনটি শুরু হবার সাথে সাথে হল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৮২২-১৮৩৫ পর্যন্ত জিহাদ-সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। পরবর্তীতে এম এ আহমদ (১৮৭৮-১৯৩৩ খৃ.), এ এ করিম আমরুল্লাহর (১৮৭৯-১৯৪৫) নেতৃত্বে কার্যক্রম চলতে থাকে। উলামা কাউন্সিলের প্রধান হলেন করিম আমরুল্লাহ, জামিল জাম্বিক (১৮৬০-১৯৪৭) এবং তায়েব ওমর এর (১৮৭৩-১৯২০) 'ফাদুরি' আন্দোলন। মালয়েশিয়াতে (১৮৬৯-১৯২৩) সালে শাইখ আলহাজ্ব আহমদ দ্বালানের নেতৃত্বে শুরু হয় 'মুহাম্মদিয়া আন্দোলন', 'মুহাম্মদি' আন্দোলন, সুদান ও মধ্য আফ্রিকায় 'মাহদি আন্দোলন', পশ্চিম আফ্রিকায় উনবিংশ শতকে শাইখ ওসমান বিন ফাদিও (১৭৬১-১৮০৭ সালে, বিরোধিরা তাকে ডান ফাদিও বলে) শুরু করেন 'ফুলানি আন্দোলন', ভারতবর্ষে সৈয়দ আহমদ বেরলভির 'তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া', মীর নেসার আলি তিতুমীরের 'জিহাদ আন্দোলন', ও হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর ফরায়েযী আন্দোলন অন্যতম।[৮]

---

৬ Dr. Serajul Hoq, *Reform of Imam Ibn Taymiyah*(Dhaka : IFB, 1980), p. 35

৭ http://www.alazhar.gov.eg, visited on 24.12.2013

৮ www.gamji.com/fulani4.htm, visited on 06. 07. 2012

Dhaka University Institutional Repository

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে রাজনৈতিক ও আক্বিদাগত সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে আরেকটি আন্দোলন সূচনা করেন মুহাম্মদ আহমদ আল-মাহদী ইবনে আবদুল্লাহ (১৮৪৫-১৮৮৫ খ্রি) 'মাহদি আন্দোলন'। আলজেরিয়ার সাহারা অঞ্চলে আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ আত-তীজানি (১৭৩৭-১৮১৫ খ্রি) 'তীজানিয়া আন্দোলন' শুরু করেন। ১৮১৮-১৮২০ সালে সাইয়েদ আহমদ শহীদ তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া তথা 'মুজাহিদুন আন্দোলন' শুরু করেন। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ১৭৮২-১৮৩১ সালে নির্ভেজাল তাওহীদের উপর ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ময়দানে আর্বিভুত হন সাইয়েদ মীর নেসার আলী তিতুমীর তিনি 'জিহাদ আন্দোলন' প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের উত্তর প্রদেশের জৌনপুর এলাকায় মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (১৮০০-১৮৭৩) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব বাংলায় এবং আসামে তাঁর আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর আন্দোলনের নাম 'তা'আয়্যুনি আন্দোলন' বা 'রাহী আন্দোলন'। ১৮৫৭ সালের পর ১৮৫৮ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে সৈয়দ আহমদ শহীদের 'মুজাহিদুন বা ওয়াহাবি' আন্দোলন এর বিপুল সংখ্যক অনুসারী দিল্লিতে আহলুল হাদিস আন্দোলন শুরু করেন তাদের নেতা ছিলেন মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা এনায়েত আলী, সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী, রহমত উল্লাহ হিন্দি ও মাওলানা নাজির হোসাইন।[৯]

পরিশেষে বলা যায় যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফরায়েযী আন্দোলন মূলত পরিচালিত হয়েছিল শিরক ও কুসংস্কারমুক্ত তাওহিদভিত্তিক এবং সমসাময়িক বিশ্বে প্রচলিত আন্দোলনের আলোকে। ছোট-খাটো কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপি চলমান ইসলামি আন্দোলনগুলোর সাথে তাঁর আন্দোলনের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

৯ ড. মোঃ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম*(ঢাকা : শরীয়তিয়া প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১০), পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

# ৬.২ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য ধর্মীয় আন্দোলনসমূহ

## ৬.২.১ সানুসি আন্দোলন

পরাধীনতা থেকে মুক্তি ও ইসলামের মূল চেতনায় ফিরে যাওয়া এবং শিরক-বিদ'আত উচ্ছেদের জন্য মুহাম্মদ আলি আস্-সানুসি (১৭৯১-১৮৫৯) সালে লিবিয়াতে সানুসি আন্দোলন শুরু করেন।[১০] তিনি আলজিরিয়ার মুসতাগনিম শহরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ফেজ মরক্কোর কারভিন বিশ্ববিদ্যালয়ে, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, মিশর, হিজায, ইয়ামান ও মক্কায় অধ্যায়ন করেন। তিনি প্রায় চল্লিশটির উপর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে মাহদি মুহাম্মদ (১৮৪৪-১৯০২) ও চাচাত ভাই আহম্মদ শরীফ (মৃ. ১৮৭৩) তাঁর খলিফা হন। তারা ইংরেজ ও ইটালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সানুসিরা কুরআন-সুন্নায় বিশ্বাস করতেন এবং আহমদ বিন হাম্বল, ইব্ন তাইমিয়া, আল-গাযালী ও মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবকে তাদের চিন্তাগুরু মনে করতেন। খাওয়া-দাওয়া ও ইবাদতে খুব কঠোর ছিলেন তারা। চা, কফি ও ধুমপান নিষিদ্ধ করেন। তারা তাকলিদের বিরুদ্ধে অবস্থান ও ইজতিহাদের পক্ষে ছিলেন। সন্ত্রাস ও জোর করে মুসলিম বানানো তাদের নীতি ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্য, নিজের হাতের কামাই ও কৃষি কাজ করাকে তারা ভাল চোখে দেখতেন। সাম্রাজ্যবাদ ও খৃষ্টান মিশনারি তৎপরতার বিরুদ্ধে তারা চিরস্থায়ী জিহাদ ঘোষণা করেছেন। মক্কায় তিনি হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর সময়ে অবস্থান করেছিলেন এবং ওয়াহাবিদের প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে লিবিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় তিনি মুসলিম সমাজকে অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন ও শিরক-বিদ'আত থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করেন।

তিনি ইসলামের মূল শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা চালান। সানুসিরা খৃষ্টান মিশনারি তৎপরতা বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। সানুসিদের আন্দোলনের ফসল হলো আল মাহদি (মৃত্যু-১৮৪৬) এর 'মাহদি আন্দোলন', শরিফ (মৃত্যু-১৯০২), আহমদ শরিফ (মৃত্যু-১৯৩৩) ও ওমর আল মুখতার (মৃত্যু-১৯৩০)। প্রথম দিকে ধর্মীয় সংগ্রাম অব্যাহত রাখলেও পরবর্তীতে সশস্ত্র ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ইটালি ও ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে তাদেরকে পূর্ব-উত্তর আফ্রিকা থেকে বিতাড়ন করেন। লিবিয়ার ইতিহাসে এ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। কর্ণেল গাদ্দাফি এ সংগঠনকে নিষিদ্ধ করেন। তবে তাঁর ছেলে মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ইসলামি আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। মুহাম্মদ আলি আস-সানুসি একজন মালেকি মাযহাবের অনুসারী হলেও তিনি তাকলিদের অনুসারী ছিলেন না। তিনি সহনশীলতা ও উদারতার সাথে ইজতিহাদের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। উত্তর আফ্রিকা, তিউনেশিয়া,

---

১০ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

*Dhaka University Institutional Repository*

সুদান, সোমালিয়া ও আলজিরিয়ায় এবং পূর্ব দিকে মালয় দ্বীপপুঞ্জে তাদের প্রভাব রয়েছে। বলাবাহুল্য যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও আস-সানুসি একত্রে মক্কাতে অবস্থান করেন।

### ৬.২.২ ফুলানি আন্দোলন

উনবিংশ শতকে পশ্চিম আফ্রিকায় শাইখ ওসমান বিন ফাদিও (বিরোধিরা তাকে ডান ফাদিও বলে) ফুলানি আন্দোলন শুরু করেন। আফ্রিকার বহু অঞ্চল এ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফুলানিরা জিহাদ ঘোষণা করেন শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার এবং পশ্চিমা সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। ১৮১৫-১৮১৮ সালে ওয়াহাবিরা যখন মক্কা দখল করেন তখন ফুলানি নেতা ও হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মক্কায় অবস্থান করেন। যার কারণে তিনি ওয়াহাবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। ওয়াহাবিদের চিন্তা চেতনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি অবহিত হন। তিনি ওয়াহাবিদের মত 'আমরু বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' তথা 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' এর প্রচারণা অব্যাহত রাখেন। তিনি ইজতিহাদের পক্ষে মতামত দেন।[১১]

তার আন্দোলনটা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর আন্দোলনের মত কৃষক আন্দোলনের চরিত্র অর্জন করে। এ আন্দোলনের নেতা পরামর্শ সভা (মজলিসে শুরা), নারীদের অধিকারকে গুরুত্ব দেয়া ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের আহ্বান জানান। উত্তর আফ্রিকাসহ নাইজেরিয়ার অনেক অঞ্চল তার আন্দোলনের ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হয়। এ আন্দোলনের প্রভাব পশ্চিম আফ্রিকায় বিশেষ স্থান দখল করেছিল। একজন আমিরুল মু'মিনিন এর নেতৃত্বে জিহাদ ও উম্মাহর ঐক্যের উপর তারা গুরুত্ব দিতেন। উত্তর সাহারা ও নাইজেরিয়ায় এ আন্দোলনটি নিষিদ্ধ হয়। তারপরও এ আন্দোলন হাওসা, জারিয়া, লেকসাদ, ইউরুবা, বাগিরমি, সোকাটা ওসাকট ও জানফারাতে খুব শক্তিশালী ছিল। যার আন্দোলনটি অব্যাহত রাখেন শাইখ আহমাদু (মৃত্যু-১৮৪২) ও আলহাজ্ব ওমর (মৃত্যু-১৮১৪)। বর্তমানে পশ্চিম আফ্রিকা বিশেষ করে আলজেরিয়াতে ইসলামি সালভেশন ফ্রন্ট ও নাইজেরিয়াতে তিজানি এবং অন্যান্য দেশে মাহদি আন্দোলনও ফুলানি আন্দোলনের ফসল।[১২]

### ৬.২.৩ ফাদুরি আন্দোলন

তাওহীদ ও শিরক-বিদ'আত বিরোধী চিন্তা চেতানায় ইন্দোনেশিয়ায় ফাদুরি আন্দোলনের উদ্ভব হয়।[১৩] ইন্দোনেশিয়ার সমাজ ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঈশ্বরবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত। তাওহিদের সাথে শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত হয়ে যায়। তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ভাল ছিল না। মুসলিমগণ প্রায় হিন্দু হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধদেব প্রভাবও সেখানে অনেক বেশি। মুসলিমগণ নিজের পরিচয় দিতে

---

১১ www.gamji.com/fulani4.htm, visited on 06. 07. 2012

১২ P.M. Holt, *A Cambridge History of Islam*(London: Journal of the American Oriental Society 1970), Vol. II, pp. 345-405

১৩ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিধান্বিত ছিল। এ মুহূর্তে শাইখ আলহাজ্ব মাসক এবং তাঁর আটজন হাজী সহচর ফাদুরি আন্দোলন শুরু করেন। এরা সবাই মক্কাতে ওয়াহাবিদের যারা প্রভাবান্বিত হয়ে দেশে ফিরে অন্যান্য আন্দোলনের মত একই মিশন নিয়ে কাজ শুরু করেন। আন্দোলনটি শুরু হবার সাথে সাথে হল্যান্ডের বিরুদ্ধে (১৮২২-১৮৩৫) পর্যন্ত জিহাদ-সংগ্রাম অব্যহত রাখেন। পরবর্তিতে এম এ আহমদ (১৮৭৮-১৯৩৩ সাল), এ এ করিম আমরুল্লাহর (১৮৭৯-১৯৪৫) নেতৃত্বে কার্যক্রম চলতে থাকে। বর্তমান উলামা কাউন্সিলের প্রধান হলেন করিম আমরুল্লাহ, জামিল জাম্বিক (১৮৬০-১৯৪৭) এবং তায়েব ওমর এর (১৮৭৩-১৯২০) পিতা। ফাদুরি আন্দোলন শিরক, বিদ'আতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও আমেরিকা-ইউরোপিয় অর্থনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে সমাজে শক্ত অবস্থান নেয়। তারা ইসলামের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে ইউরোপিয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিপরীতে ইসলামি অর্থনীতি চালু করেন। তারা স্বাভাবিকভাবে শারী'আতের অনুসারি হলেও শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, সাধারণ স্কুল প্রতিষ্ঠা, পত্র পত্রিকা প্রকাশ করা ইত্যাদি তাদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ওয়াহাবিদের মত সুফি মতবাদের বিরুদ্ধে হলেও কাদেরিয়া ও নকশবন্দিয়া সিলসিলার অনুসারী ছিলেন। এটা হয়তো বা স্থানীয় কারণে তারা গ্রহণ করেছেন। তবে তারা প্যান-ইসলাম তথা বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের পতাকা ধারণ করেন।[১৪] ফরায়েযীদের মত তারাও কৃষকদের সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের সর্বশেষ চিন্তা রয়েছে মিনিওগাহাকাবু ও ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে। তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে বর্তমান উলামা কাউন্সিল (প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান ওয়াহেদ তাদের নেতা ছিলেন) ও অন্যান্য ইসলামি আন্দোলন বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

### ৬.২.৪ মুহাম্মাদিয়া আন্দোলন

ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াতে মুহাম্মদিয়া আন্দোলন শুরু হয় শাইখ আলহাজ্ব আহমদ দ্বালানের (১৮৬৯-১৯২৩) নেতৃত্বে। এ আন্দোলনটিও ওয়াহাবিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।[১৫] ধর্মীয়, সামাজিক ও বিদেশি ঔপনিবেশিক (পর্তুগিজ ও আমেরিকা) শাসন থেকে মুক্তি দেবার জন্য ও মুসলিম সমাজকে দূরাবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য এ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে তারা সবচেয়ে বেশি সফল হন শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনে। এ অঞ্চলে আন্দোলনের খুব প্রভাব থাকলেও তারা বিদেশিদেরকে তাড়াতে সক্ষম হয়নি। তবে তাদের আন্দোলনের জের ধরে পরবর্তীতে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মত ইংরেজি শিক্ষিত নেতাদের কাছে বিদেশিরা ক্ষমতা হস্তান্তর করে। বর্তমানে নাহদাতুল উলামাসহ অনেক ইসলামি সংগঠন এ আন্দোলনের ফসল।[১৬]

---

১৪ P.M. Holt, *A Cambridge History of Islam*, Ibid, p. 345

১৫ www.html-emergence-of-the-tariqa-muhammadiyya-movement, visited on 18.12.2012

১৬ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

## ৬.২.৫ মাহ্দি আন্দোলন

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে রাজনৈতিক ও আক্বিদা গত সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে আরেকটি আন্দোলন সূচনা করেন মুহাম্মদ আহমদ আল-মাহদী ইবনে আবদুল্লাহ (১৮৪৫-১৮৮৫ সালে)। তিনি দানকালা শহরের দক্ষিণ লোবাবে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার শিক্ষক ছিলেন বড় পণ্ডিত মাহমুদ শানকিতি। তিনি ছোট অবস্থায় কুরআন মাজিদ হিফজ করেন। ১৮৭০ সালে তিনি আব্বা প্রদেশে অবস্থান করেন এবং গুহার মধ্যে থেকে ধ্যান-জ্ঞান করতে থাকেন। ১৮৮০ সালে তিনি তার শিক্ষক কুরাইশির খলিফা হন। ১৮৮১ সালে তিনি কাফির ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন এবং দক্ষিণ সুদানের পুরো অঞ্চল তার অধীনে চলে আসে। তিনি ৪০ দিন পর্যন্ত ই'তিকাফে থাকেন। তাকে হত্যা করার জন্য শত্রুরা পদক্ষেপ নেয়। তিনি পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং চারজন খলিফার হাতে পতাকা দেন। তারা হলেন- আব্দুল্লাহ, আলী ওয়াদহালু, মুহাম্মদ আলী আসসানুসি ও মুহাম্মদ শরিফ। ১৮৮৩ সালে তার সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ হয়। পরবর্তীতে খার্তুমে তার সাথে আবারও যুদ্ধ হয়। ১৮৮৫ সালে তাকে গ্রেফতার করে নেয়া হলে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাকে সেখানে সমাহিত করা হলে বৃটিশ সেনাপতি গর্ডন এর হত্যার প্রতিশোধে তার কবরকে বৃটিশ মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৬১ সালে ছিদ্দিক বিন আব্দুর রহমান মৃত্যু বরণ করলে এবং ১৯৭১ সালে আলহাদীকে হত্যা করলে তার দল তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তিনি শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, ঘুষ ও জুলুমের বিরুদ্ধে এবং ইংরেজ ও তুর্কিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তিনি কুরআন সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু মানতেন না। তিনি মাযহাবের বিরুদ্ধে ও ইজতিহাদের পক্ষে ছিলেন। তিনি সকল ধরনের সুফি মতবাদের বিপক্ষে ছিলেন এবং নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। নিজকে খুলাফায়ে রাশেদুন ও ইমাম মাহাদি আ. এর মত মনে করেন। মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ও জামাল উদ্দিন আফগানি এবং মুফতি মুহাম্মদ আবদুহু এর সাথে চিন্তার মিল থাকলেও তিনি শিয়াদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন।[১৭] তাঁর আন্দোলনের ফসল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ থেকে মিশরসহ কয়েকটি দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। তিনি তাওহীদ ও সালাফিদের অনুসরণে কট্টর ছিলেন।[১৮]

## ৬.২.৬ তীজানিয়া আন্দোলন

তীজানিয়া আন্দোলন শুরু করেন আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ আত-তীজানি (১৭৩৭-১৮১৫)। তিনি আলজেরিয়ার সাহারা অঞ্চলে আইনে মাদিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোট অবস্থায় কুরআন মাজীদ হিফজ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর উচ্চতর ইসলামি শিক্ষার জন্য তিনি ফাস, তিলমিসান, তিউনিসিয়া, কায়রো, মক্কা, মদিনা ও হেরানে যান। পুরো আফ্রিকাতে বিশেষ করে তার মূল কেন্দ্র ফাস

---

১৭ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

১৮ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg, visited on 02.10.2013

Dhaka University Institutional Repository

এ তার দা'ওয়াত দিতে শুরু করেন। তিনি 'যাওয়াহিরুল মায়ানি' কিতাব লিখেন।[19] তার খলিফা ছিলেন আবুল হাসান ইবনুল 'আরাবি, আহমদ ছিকারজ আল-আব্বাসি, ওমর বিন সাইদ আস-সিনিগালি ও মুহাম্মদ হাফেজ বিন আব্দুল লতিফ আল মিশরি। তার চিন্তাধারা ছিল- ঈমানের সাথে শরিক করা যাবে না। সূফী মতবাদ ও দর্শনের 'ওয়াহাদাতুল ওয়াজুদ' এবং 'ওয়াহাদাতুশ শুহুদ' এর পক্ষে তিনি ছিলেন। মনে হয় যেন তিনি ইসলামকে জগাখিচুরি মতবাদে রূপান্তরিত করেন।[20]

তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের কাশফ ও রসূল সা. কে দৈহিকভাবে দেখা সম্ভব। তারা বিশেষ ধরনের মিলাদ শরীফ পড়তেন। তিনি একবার কুরআন শরীফ পড়লে ৬ বারের ছাওয়াব পেতেন এবং একবার যিকির করলে ছয় হাজার বার পড়ার ছাওয়াব পেতেন বলে দাবি করেন। তারা বিশেষ ধরনের নামায পড়তেন যাকে বলা হয় 'সালাতুল ফাতিহ', যা পড়লে সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। ইসলামি শারি'আতে অনেক কিছু অবৈধ হলেও তীজানিরা রসূল সা. ও আব্দুল কাদের জিলানিকে ওয়াসিলা এবং 'কুতুব' 'আবদাল' এর মতবাদে বিশ্বাস করতেন যা কুরআন-হাদিসে নেই। এজন্য আলিম সমাজ তাদেরকে বিদ'আতপন্থি সূফি দল বলে মনে করেন। বাংলাদেশে চট্টগ্রামের সুন্নি এবং আফ্রিকার সাজেলিদের মত তারা নামাযের আগে দরূদ শরিফ পড়া জরুরি মনে করে। এদের প্রভাব রয়েছে মরক্কো, সুদান, সেনেগাল, নাইজেরিয়া, উত্তর আফ্রিকা, মিশর ও আফ্রিকা মহাদেশের অন্যান্য দেশে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হলেও তারা পরবর্তীতে একটি বিদ'আত পন্থি দলে পরিণত হয়। উল্লেখ্য, ঊনবিংশ শতকের এ আন্দোলনগুলো পশ্চিমা উপনিবেশ তাড়িয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করে। সুদানে মুহাম্মদ আহামদ আব্দুল্লাহ, উত্তর সুদানে শাইখ তাকরুনস (১৮৪৮) ও খায়ের উদ্দিন ভাসা আত-তিউনিশি (১৮১০-১৮৭৯), মুহাম্মদ আহমদ বিন আব্দুল্লাহ (মৃত্যু-১৮৮৫), ইরাকে মুহাম্মদ সাকুরি আল-আলুসি (১৮৫৭-১৯২৪), ইয়ামানে আল্লামা শাওকানি (মৃত্যু-১৮৩০), সিরিয়াতে জামাল উদ্দিন কাদেমি, কামিল খাত্তাব, তাহির জাযায়িরি, আফ্রিকায় আহমদ তিজানু (১৮৩০-১৯৯৮), মাহাদাত বাসা (১৮২২-১৮৮৩) ও সায়িদ বদিউজ্জামান নওরোসি। উপরোক্ত আন্দোলনগুলো সদ্য আলোচিত ব্যক্তিদের আন্দোলনের উৎস হিসেবে কাজ করে। মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশ তাদের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করে। বিশ শতকের আরব বিশ্বে ইখওয়ানুল মুসলিমিন, আলজেরিয়ায় ইসলামী সালভেশন ফ্রন্ট, ভারতবর্ষে তাবলীগ জামা'আত, জামায়াতে ইসলামী, ফিলিস্তিনে হামাস ও ফাতাহ, লেবাননে হিজবুল্লাহ, বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, খিলাফত মজলিশ, পাকিস্তানে মুত্তাহিদা মজলিসে আমল, তুরস্কে নাজিমউদ্দিন আরবাকনের রাফাহ পার্টি, আব্দুল্লাহগুল ও রজব

১৯ প্রফেসর ড. মো: আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *হাজী শরী'অতুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

২০ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

তায়য়েব এরদুগানের জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি অন্যতম। তবে ইরানে শিয়াদের খোমেনির ইসলামী বিপ্লবও উল্লেখযোগ্য।

বৃটিশ শাসিত বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে পাঁচটি সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সেগুলো হলো-ফরায়েযী, তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া বা মুজাহেদীন, জিহাদ, তায়াউনি ও আহলুল হাদিস আন্দোলন। এদের প্রায় সবাই কোনো না কোনোভাবে ওয়াহাবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। তবে তায়াউউনি আন্দোলন শেষের দিকে এসে তার প্রভাবকে প্রত্যাখান করেন। এ আন্দোলনগুলোর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজে সংস্কারমূলক কার্যক্রম ও বৃটিশের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা। ঔপনিবেশিক শাসন উৎখাত করে ইসলামী শাসন জারি করা। তবে মোঘল ও সুলতানদের চেয়ে এরা আরও বেশি ইসলামি ছিল। এদের সবার আগে যিনি আন্দোলন শুরু করেছিলেন তিনি হলেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। ঐতিহাসিকগণ ১৮০২ সালে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) আন্দোলন শুরু করেছেন বলে বর্ণনা দেন। তবে সর্বসম্মত বর্ণনায় ১৮১৮ সালে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও সাইয়েদ আহমদ শহীদ আন্দোলন শুরু করেন বলে সবাই একমত। কিন্তু কেয়ামুদ্দিন আহমদ তাঁর 'ওয়াহাবি মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে বলেন যে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর আগে সৈয়দ আহমদ আন্দোলন শুরু করেন। আমরা এ বিষয়ের সাথে একমত নই।

## ৬.২.৭ তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া তথা মুজাহিদুন আন্দোলন

মুজাহিদুন আন্দোলন শুরু করেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ ১৮১৮-১৮২০ সালে।[২১] তাঁর চিন্তাধারার মিল ছিল আহমদ সারহিন্দি, শাহ ওয়ালীউল্লাহ, শাহ আব্দুল আজিজ ও শাহ আব্দুল কাদিরের সাথে। সাইয়েদ আহমদ শহীদ জন্মগ্রহণ করেন ১৭৮৬ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশে রায় বেরেলীতে আর মৃত্যুবরণ করেন ১৮৩১ সালে বালাকোটে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পর তিনি মাওলানা আব্দুল হাই ও মাওলানা শাহ ইসমাইল শহিদ এর সাথে একত্রে কাজ শুরু করেন। ১৮২২ সালে তিনি হাজ্জ করতে দিল্লি থেকে কোলকাতা হয়ে যাবার পথে তিতুমীরকে তাঁর খলিফা করেন। সে সময় নোয়াখালি (মাওলানা ইমাম উদ্দিন বাঙ্গালিসহ) বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুষ্টিয়ার (কাজী মিয়াজান) বহু লোক তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন।[২২] তাঁর জিহাদে বাংলার অসংখ্য মুসলিম অংশগ্রহণ করেন এবং মুষ্টি চাউলের মাধ্যমে জিহাদে চাঁদা দেন। তিনিও শিরক-বিদ'আত থেকে সমাজকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তার ডানহস্ত ও খলিফা শাহ ইসমাইল শহীদ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন (ক) তাকভিয়াতুল ঈমান (খ) ছিরাতে মুসতাকিম। তিনি হানাফি মাযহাবের অনুসারী হলেও মক্কায় যাবার পর তাকলিদের বিষয়ে উদারতা প্রদর্শন করতে শুরু করেন। তিনি তাঁর শিক্ষক শাহ আব্দুল আজিজের

---

২১ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

২২ www.html-emergence-of-the-tariqa-muhammadiyya-movement, visited on 18.12.2012

*Dhaka University Institutional Repository*

মত বৃটিশ ভারতকে 'দারুল হারব' তথা শত্রু রাষ্ট্র ঘোষণা দেন। ১৮৩১ সালে সাইয়েদ আহমদ শহীদ বৃটিশ ও শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার দুই সিপাহশালার শাহ ইসমাইল ও শাহ আব্দুল হাইসহ শহীদ হন বর্তমান ভারত-পাকিস্তানের বালাকোট স্থানে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা ও ভারতে তাঁর বহু অনুসারী শহীদ হন। তাঁর অনুসারীরা কয়েকভাবে বিভক্ত হন। দেওবন্দের মাওলানা ইসহাক, মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী, এনায়েত আলী, বেলায়েত আলী ও মুহাদ্দিস নাজির আহমদ এবং তাঁর খলিফা মীর নেসার আলী তিতুমীর। এছাড়াও অন্য একটি বিদ'আতি দল বেরলভি নামে তার অনুসারী বলে দাবি করে।

### ৬.২.৮ জিহাদ ও ইসলামি আন্দোলন

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভেজাল তাওহীদের উপর ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ময়দানে পারমানবিক বোমার মত আর্বিভুত হন জিহাদ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ মীর নেসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১)।[২৩] তিনি পশ্চিম বাংলার ২৪ পরগণার সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামি বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান অর্জন করেন। তবে খুব বেশি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। দৈহিক কসরত চর্চায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি জমিদার পরিবারে বিবাহ করেন। ১৮২২-২৩ সালে মক্কার উদ্দেশ্যে তিনি রাওয়ানা হন। সেখানে তিনি ওয়াহাবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। মক্কায় অথবা কলকাতায় তিনি সাইয়েদ আহমদ শহীদের মুরিদ হন। হাজ্জ থেকে ফিরে এসে তিনি নারকেল বাড়িয়ায় 'জিহাদ আন্দোলন' শুরু করেন। তিনি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রচার করতে থাকেন। তাওহীদ, মানবতার ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ন্যায়ের জন্য এবং সকল ধরনের শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। হিন্দুদের প্রভাবে মুসলিমগণ ধুতি পরতে বাধ্য হতেন। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে ধুতি পরার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

এ মুহূর্তে হিন্দুরা একদিকে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সরকারি অফিস-আদালত দখল করে। অন্যদিকে ১৭৬৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে মুসলিমগণের জমি-জমার মালিক সেজে বসে। বৃটিশরা হিন্দু জমিদারকে সব ধরনের সহযোগিতা করতে থাকে। মুসলিমগণ কাঁচা মসজিদ বানালে ২৫০ রুপি এবং পাকা মসজিদ বানালে ৫০০ রুপি জরিমানা করত হিন্দুরা। কুরবানির সময় গরু হত্যা নিষিদ্ধ করেন। তিতুমীর এ অবস্থা দেখে চুপ থাকতে পারেননি। তিনি জমিদার ও বৃটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। হিন্দুরা অবৈধ আবওয়াব ও দাঁড়ির উপর ট্যাক্স ও বিভিন্ন ধরনের পূজার জন্য মুসলিম প্রজাদের কাছে কর আদায় করতেন। তিতুমীর এ অন্যায় কাজের চ্যালেঞ্জ করেন।[২৪] হিন্দুরা বৃটিশ নীলকরদের কান ভারি করে তোলেন এবং তিতুমীরের বিরুদ্ধে এ বলে অভিযোগ আনেন যে মহান

---

২৩ M. A Khan, *History of the Foraidi Movement Muslim Struggle for preedom in Bengal* (Dhaka : Shariatia Laibrary, 1991), p. 34

২৪ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ শাসনের অধীনে তিতুমীর ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চান। হিন্দু এবং বৃটিশদের যৌথ ষড়যন্ত্র তিতুমীর রুখে দাঁড়ান। বৃটিশরা তাঁর বিরুদ্ধে হিন্দুদের দ্বারা আদালতে মামলা ঠুকে দেন। ১৮৩১ সালে তিতুমীর বিরাট সংখ্যক লাঠিয়াল বাহিনী একত্রিত করে জমিদারদের জুলুম নির্যাতনের প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কালি মন্দিরে গরু জবাই করে রক্ত লাগিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ১৮৩১ সালে ১৯ নভেম্বর তিতুমীর হিন্দু জমিদার, নীলকর ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বৃটিশ ও হিন্দু জমিদারদের সম্মুখে বাঁশের লাঠি দিয়ে তিতুমীর বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেননি। তিনি ও তাঁর সেনাপতি গোলাম মাসুম ও অসংখ্য অনুসারী ঐ অসম যুদ্ধে শহীদ হন। জীবিতরা জেলাখানায় বন্দি হন। তাঁর অনুসারীরা পরে নদীয়া, কুষ্টিয়া, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও ঢাকাতে নিজেদেরকে ফরায়েযী বলে পরিচয় দিতেন। তাঁর এ আত্মত্যাগ বাংলাদেশে তথা ভারত বর্ষে বিফলে যায়নি বরং তা স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

### ৬.২.৯ তা'আয়্যুনি আন্দোলন

ভারতের উত্তর প্রদেশের জৌনপুর এলাকায় মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরি (১৮০০-১৮৭৩ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব বাংলায় এবং আসামে তাঁর আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর আন্দোলনের নাম 'তা'আয়্যুনি আন্দোলন' বা 'রাহী আন্দোলন'।[২৫] তাঁর আন্দোলন অন্যান্য আন্দোলনের মত জিহাদি ছিল না; বরং মধ্যম পন্থি ও সর্বশেষ বৃটিশের সাথে সহযোহিতামূলক ছিল। তিনি কিছু কিছু বিষয়ে ফরায়েযীর বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তিনি ও তাঁর ছেলে বহুবার তাদের সাথে বাহাছে লিপ্ত হন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও বিখ্যাত প্রচারক ছিলেন। শিরক-বিদ'আতের মত ইসলামে গর্হিত কার্যাবলির বিরুদ্ধেও ছিলেন। তবে তিনি মিলাদ শরীফ ও ফাতেহা খানির পক্ষে ছিলেন। ১৮৩৫-১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ৪০ বছর বজরাযোগে দ্বীনের দাওয়াত চালিয়ে যান। আরবি, উর্দু, ফারসিতে তিনি ৫৫টি বই লিখেন। নোয়াখালি ও রংপুরে তিনি যেমন বিবাহ করেন, তেমনি অনেকগুলো মাদরাসাও স্থাপন করেন।[২৬]

তিনি প্রথম দিকে সাইয়েদ আহমদ শহীদের খলিফা হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে পূর্ববাংলার নবাব আব্দুল লতিফের সাথে মিলিত হয়ে ১৮৬৭ সালে 'মোহামেডান লিটারেচারি সোসাইটি' গঠন করেন। তাঁর শিক্ষক সাইয়েদ আহমদ ও শাহ আব্দুল আজিজ বৃটিশ ভারতকে 'দারুল হারব' বা শত্রু রাষ্ট্র ঘোষণা করলেও তিনি ভারতকে 'দারুল আমান' বা শান্তির দেশ ঘোষণা করেন। কারণ ১৮৫৭ সালে পুরো ভারতবর্ষ বৃটিশের অধীনে চলে যায় এরপর ১৮৬৬ সালে আম্বালা ট্রায়ালে মুজাহিদিনদেরকে ফাঁসিতে

২৫ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দালন*, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

২৬ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg, visited on 02.10.13

*Dhaka University Institutional Repository*

ঝুলানো হয়। মুসলিমগণের নেতৃত্বের আসনে কোনো নেতা না থাকায় ও সম্রাট বাহাদুর শাহ রেঙ্গুনে পালিয়ে গেলে বৃটিশরা ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে। তখন বৃটিশ বিরোধিতা মানে আত্মহত্যার শামিল। তাই আলিগড়ের সৈয়দ আহমদ খান ও বাংলার নবাব আব্দুল লতিফ বৃটিশের পক্ষে এডভোকেসি করেন। তিনি বৃটিশ ভারতে জুমু'আ ও 'ঈদের নামাযকে বৈধ বলেন। তবে হিন্দুদের সর্বেশ্বরবাদ ও শবে বরাত এবং শবে কদরের রাত্রিতে ড্রাম পিটানো, পুরুষের জন্য সিলকের পোশাক পরিধান করা ও সোনার বাটিতে খাওয়া-দাওয়া করা অবৈধ ঘোষণা করেন। তিনি যিকির, মুরাকাবা, তাহাজ্জুদ ও মহিলাদের জন্য পর্দা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ইজমাকে স্বীকৃতি দেন। তবে ইজতেহাদকে অবৈধ মনে করেন। তিনি কট্টর হানাফি ছিলেন।

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরি ৫টি সুফি সিলসিলার অনুসারী হলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অনর্থক বলে মনে করতেন। তবে তিনি শাইখ আহমদ সারহিন্দি ও সৈয়দ আহমদ শহীদকে মুজাহিদ বলে দাবী করেন। ১৮৫৭ সালে বৃটিশরা সৈয়দ আহমদ শহীদের অনুসারী হিসেবে তাঁকে ফাঁসির কাষ্ঠে নিয়ে যান। তবে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কয়েকজন বৃটিশ মহিলার সম্ভ্রম রক্ষার কারণে তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। তিনি ফরায়েযী, তথাকথিত দরবেশ, শিয়া, বহু ঈশ্বরবাদী ও আহলে হাদিসদের বিরুদ্ধে ছিলেন। ফরায়েযীদের সাথে তার বিতর্কের বিষয় ছিল আমল ঈমানের অংশ কী-না, পীরের হাতে মুরিদ হাত রাখবে কী-না, জুমু'আ ও 'ঈদের নামায পড়বে কী-না, সদ্য নবজাত সন্তানের নাড়ি কাটা পিতার জন্য বাধ্যতামূলক কী-না, পঙ্গপাল খাওয়া জায়েয কী-না, সদকা-ফিতরা নেয়া ও জুতা দিয়ে শাস্তি দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে। তার ছেলে হাফিজ আহমদ ও আব্দুল আওয়াল প্রায় ১০০ টি বই লিখেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ও তাঁর ছেলেরা বাংলাদেশে ইসলামের যে প্রচার ও প্রসার চালিয়েছেন তার নজিরও কম নয়। বিশ শতকের প্রথম দিকে সরকারি রিপোর্টে এ আন্দোলনের অনুসারীদেরকে ফরায়েযী বলে উল্লেখ করা হয়।[২৭]

## ৬.২.১০ আহলুল হাদিস আন্দোলন

সৈয়দ আহমদ শহীদের মুজাহিদুন বা ওয়াহাবি আন্দোলন এর বিপুল সংখ্যক অনুসারী দিল্লিতে ১৮৫৭ সালের পর আহলুল হাদিস আন্দোলন শুরু করেন এবং তা ১৮৫৮ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত জোরেশোরে পরিচালিত হয়।[২৮] তাদের নেতা ছিলেন মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা এনায়েত আলী, সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী, রহমত উল্লাহ হিন্দি ও মাওলানা নাজির হোসাইন। এনায়েত আলী এবং বেলায়েত আলী বিহারের বাসিন্দা হলেও তারা সৈয়দ আহমদ শহীদের খলিফা হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তাদের নেতৃত্বে বহু লোক শহীদ হয়। ১৮৬৭ সালে পাঞ্জাবের আম্বালায়

২৭ Sikander Ibrahimi, *Mawlana Karamat Ali and his projects of reform*,(Rajshahi : unpublished thesis, Rajshahi University, 1975), p. 40

২৮ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫

Dhaka University Institutional Repository

মামলায় তাদের বিরুদ্ধে আদালত ফাঁসির নির্দেশ দেয়। তারা বাংলা-বিহার-আসাম সব জায়গা থেকে বৃটিশের বিরুদ্ধে মুজাহিদ সংগ্রহ করতেন। মাওলানা নাজির আহমদ ১৮৫৭ সালের বীভৎস অবস্থায় দিল্লিতে থাকেন। বৃটিশরা তাকে ও মাওলানা সিদ্দিক হাসান খান ভূপালিকে তেমন কিছু করেননি। তবে মুহাদ্দিস নাজির আহমদ ও নবাব সিদ্দিক হাসান খান আহলে হাদিস আন্দোলন জোরদার করতে থাকেন। মাওলানা ভূপালি ২০২ খানার মত বই লেখেন।

তবে তিনি বৃটিশদের থেকে অর্থ ও সহযোগিতা পান বলে এস এম আকরাম তার বইয়ে উল্লেখ করেন। কারণ এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলী ভ্রাতৃদ্বয় বৃটিশ বিরোধি সংগ্রামে ও শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে সারা জীবন প্রচারণা চালিয়ে যান। আহলে হাদিসের লোকেরা কুরআন-হাদিসকে বিশ্বাস করেন। কোনো মাযহাবকে মানেন না। তারা আব্দুল ওহাব নজদি ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং আল্লামা ইবনুল কায়য়ুম আল জাওজিকে তাদের নেতা মনে করেন। মাযহাবের চেয়ে হাদিসের উপর তারা বেশি জোর দেন। ইজতিহাদ ও ইজমার যৌক্তিকতা মানলেও কিয়াস মোটেও সহ্য করতে পারেন না। কোনো মাযহাবের অনুসারীকে তারা অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম বলে মনে করেন না। তারা তাদেরকে আহলুল হাদিস বা মুহাম্মদি বলে অভিহিত করেন।[২৯] তাদের বিরোধিরা তাদেরকে লা-মাযহাবি, গাইরে মুকাল্লাদ, রাফি' ইয়াদাইন, ওয়াহাবি, আমিনি, লা-দ্বীনি, সালাফি, জিহাদি ও নয়া মুসলিম বলে আখ্যায়িত করেন। আহলে হাদিসের নেতারা সৈয়দ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাইলের প্রকৃত অনুসারী বলে দাবি করলেও তারা ঐ নেতাদের ইমামত ও হিজরত তত্ত্ব গ্রহণ করেননি। তাদের অনুসারীরা পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের পরবর্তী নেতা ছিলেন মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফি, মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী, ড. আসাদুল্লাহিল গালিব ও জাতীয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. আব্দুল বারী, ঢাকার মেয়র মুহাম্মদ হানিফ, সাবেক এমপি রহমতুল্লাহ, ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার, ড. এরশাদুল বারী ও ড. মুসলেহউদ্দিন। তারা দিনাজপুরসহ বাংলাদেশে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক কোটির মত সদস্য আছে বলে দাবি করেন। ফরায়েযীদের সাথে তাদের শুধু মাযহাব গত বিষয় নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তেমন কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তবে তারা কুসংস্কার মুক্ত ইসলামি সমাজ কায়েম ও আল্লাহর রাসূলের হাদিসের ব্যাপক প্রচারণা ও মাযহাব বন্ধের আন্দোলনের ময়দানে যথেষ্ট সক্রিয় আছেন। আহলে হাদিসরা ফরায়েযীদেরকে তেমন খারাপ জানেন না। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরি, চরমোনাই এর পীর মরহুম মাওলানা এসহাক ও মাওলানা ফজলুল করীম এবং শর্ষিণার পীর মরহুম মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমদ ও মরহুম আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ প্রমূখ ফরায়েযী আন্দোলনকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং শর্ষিণার বর্তমান পীর মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ এ আন্দোলনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

---

২৯ Board of Editors, *Bangla Pedia(6)*(Dhaka : Asiatic Soceity of Bangladesh 2002), p. 65

*Dhaka University Institutional Repository*

পরিশেষে বলা যায় যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফরায়েযী আন্দোলন মূলত পরিচালিত হয়েছিল শিরক ও কুসংস্কারমুক্ত তাওহিদভিত্তিক এবং সমসাময়িক স্থানীয়ভাবে প্রচলিত অন্যান্য আন্দোলনগুলোও ছিল এর সম্পূরক শক্তি। ছোট-খাটো কিছু মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও চলমান সকল ইসলামি আন্দোলনগুলোর সাথে তাঁর আন্দোলনের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়; বিশেষ করে বৃটিশ বিরোধী মনোভাবের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে সে কথারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

## ৬.৩ এতদঞ্চলে সমসাময়িক সংস্কারসমূহ

### ৬.৩.১ সমসাময়িক আন্দোলনের সাথে ফরায়েযী আন্দোলনের সাদৃশ্য

ঊনিশ শতকে যে সমস্ত আন্দোলন মুসলিম বিশ্বে উদ্ভব হয় তা হলো- আরব বিশ্বে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব 'মুয়াহহিদুন আন্দোলন', লিবিয়াতে মুহাম্মদ আলি আস-সানুসি 'সানুসি আন্দোলন', মিশরে 'সালাফি আন্দোলন', ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়াতে 'ফাদুরি' ও 'মুহাম্মদি' আন্দোলন, সুদান ও মধ্য আফ্রিকায় 'মাহদি আন্দোলন', পশ্চিম আফ্রিকায় 'ফুলানি আন্দোলন', ভারত বর্ষে সৈয়দ আহমদ বেরলভির 'তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া' মীর নেসার আলি তিতুমীরের 'জিহাদ আন্দোলন', মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরির তা'আয়্যুনি ও হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর ফরায়েযী আন্দোলন অন্যতম।[৩০]

উক্ত আন্দোলনসমূহ যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে গড়ে উঠেছিল সেগুলো নিম্নরূপ :

১. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ।
২. শিরকমুক্ত ও তাওহীদ ভিত্তিক দ্বীনের প্রচার।
৩. বিদ'আতমুক্ত আমলের প্রচলন।
৪. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নামে কসম খাওয়া বন্ধ করা।
৫. পীর-মুরিদী প্রথার বিলোপ সাধন।
৬. কবর পূজা, কবরে ফুল ও বাতি দেয়া নিষিদ্ধকরণ।
৭. দ্বীনের ব্যাপারে না বুঝে অন্ধ অনকরণ বন্ধ করা।
৮. দলবদ্ধ হয়ে যিকির না করা।
৯. নাচ-গান ও সুরে সুরে কবিতা আবৃত্তি না করা।
১০. শিয়া, মু'তাজিলা, সুফিজম নিষিদ্ধকরণ।
১১. মিলাদ পড়া বন্ধ করা।
১২. আশুরার অনুষ্ঠান করা নিষিদ্ধকরণ।
১৩. ধুমপান ও মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।
১৪. মুসলিম সমাজকে অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্ত করা।
১৫. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মক্কায় অধ্যায়নকালে ওয়াহাবি ও অন্যান্য আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে কোনো না কোনো কারণে মিলিত হয়েছিলেন। কারণ ঐ আন্দোলনগুলোর প্রতিষ্ঠাতাগণ প্রায় সকলেই মক্কায় লেখাপড়া করেছেন। ওয়াহাবিদের তাওহীদের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া ও শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা তাদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে পারে বলে ধারণা করা হয়। ওয়াহাবি আন্দোলন মূলত বিশ্ব ইসলামি আন্দোলনের গত তিন শতকের মূল প্রস্রবণ। বর্তমান সাউদি শাসকগণ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের অনুসারী। তারা কবর পূজা, গাছ পূজা, নবী পূজাসহ সকল ধরনের

---

৩০ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *ঊনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

বিদ'আতের বিরোধী। অন্যান্য আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণ হলো, এ সকল আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল একই। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন, শিরক ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি আন্দোলনে কিছু বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়।

### ৬.৩.২ চলমান ধর্মীয় সংস্কারের সাথে ফরায়েযী আন্দোলনের বৈসাদৃশ্য

মুসলিম বিশ্বে ঊনিশ শতকে যে সমস্ত আন্দোলন উদ্ভব হয় তা হলো- মুয়াহহিদুন আন্দোলন, আস-সানুসি আন্দোলন, সালাফি আন্দোলন, ফাদুরি আন্দোলন, মুহাম্মদি আন্দোলন, মাহদি আন্দোলন, ফুলানি আন্দোলন, সৈয়দ আহমদ বেরলভির তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া, মীর নেসার আলি তিতুমীরের জিহাদ আন্দোলন, মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরির তা'আয়্যুনি ও হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর ফরায়েযী আন্দোলন অন্যতম।[৩১]

প্রাচীন ফরায়েযীরা বলেন যে, তারা কোনোভাবে ওয়াহাবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হননি। তবে সব বৃটিশ রেকর্ড ও বর্তমান ফরায়েযী কয়েকজন নেতা ঐ প্রভাবকে স্বীকার করেছেন। ফরায়েযীগণ চলমান ধর্মীয় সংস্কার ও বিভিন্ন ব্যাপারে আন্দোলন-সংগ্রাম করে থাকেন। কিন্তু ফরায়েযী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল ফরযকে প্রতিষ্ঠা করা। এটাই চলমান ধর্মীয় সংস্কারের সাথে ফরায়েযী আন্দোলনের বৈসাদৃস্য। এছাড়াও ফরায়েযী আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে শাসন ক্ষমতার বৈরি পরিবেশে। মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব তাঁর আন্দোলন পরিচালনা করেছেন সম্পূর্ণ শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায়; পক্ষান্তরে হাজী শরী'অতুল্লাহ তাঁর আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন বৃটিশ সরকারের, স্থানীয় হিন্দু জমিদার শ্রেণির এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য সংস্কারমূলক আন্দোলনরত সংগঠনের। সমসাময়িক আন্দোলনগুলোর মাঝে মাযহাবগত বৈসাদৃশও পরিলক্ষিত হয়। যেমন- বেশির ভাগ আন্দোলনগুলোর মাযহাবগত মতাদর্শ ছিল শাফি'ঈ কিংবা হাম্বলী। কিন্তু ফারায়েযীগণ ছিলেন হানাফি মাযহাবের অনুসারী।

### ৬.৩.৩ তৎকালীন বাংলার ধর্মীয় সংস্কারের উপর ফরায়েযী আন্দোলনের প্রভাব ও ফলাফল

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তাতে ফরায়েযী আন্দোলনকে প্রথম যুগের একটি বিখ্যাত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন বলা চলে। এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ছিলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মাদারিপুর মহকুমার শামাইল গ্রাম নিবাসী হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)।[৩২] ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দেই ফরায়েযী নামক এ ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন মাদারিপুর মহকুমায় সাংগঠনিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ইসলামের প্রধান পাঁচটি স্তম্ভ যথা কালিমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ পালন করার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনেক অনৈসলামি

৩১ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৫১
৩২ ড. অমলেন্দু দে, *ফরায়েজী আন্দোলন : আত্মসত্তার রাজনীতি*(কলকাতা : অনুপম প্রকাশনী, ১৯৭২), পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় বাংলার মুসলিমগণ ইসলামের পাঁচটি অবশ্য করণীয় মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তাদের নিকটে এ মূলনীতিসমূহ পালনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। সুতরাং বাঙালি মুসলিম সমাজের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনেই ফরায়েযী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ফরায়েযী মতবাদ অনুযায়ী 'তাওহীদ' বা একেশ্বরবাদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত থাকার জন্যও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফরায়েযীদের মতে, কেবলমাত্র একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করলেই চলবে না, এ বিশ্বাসকে কার্যে রূপান্তরিত করতে হবে। বহু ঈশ্বরবাদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য আছে এমন কোনো চিন্তা বা কর্ম থেকে বিরত থাকতে মুসলিমগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। তাছাড়া যেসব আচার-অনুষ্ঠান কুরআনের ও রসূল সা. এর নির্দেশ বহির্ভূত তাও পরিহার করা কর্তব্য। জাঁকজমক পরিহার করে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে কুরআন কর্তৃক নির্দিষ্ট একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল ফরায়েযী আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে কৃষক, তাঁতী, কলু প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির মুসলিমগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তিনি হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার থেকে মুসলিম কৃষকদের রক্ষা করতে তৎপর হন। কালিপূজা, দুর্গাপূজা ইত্যাদি ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনে হিন্দু জমিদারেরা মুসলিম কৃষকদের নিকট হতে কর আদায় করতেন। যেহেতু এসব কর পৌত্তলিকতার সহায়ক ছিল সেজন্য হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মুসলিম কৃষকদের এ কর দিতে নিষেধ করেন। তাছাড়া তিনি হিন্দু জমিদারদের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে মুসলিমগণের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গরু কুরবানী করতেও উৎসাহিত করেন। তার ফলে একদিকে যেমন হিন্দু জমিদারদের আর্থিক ক্ষতি হয়, তেমনি অন্যদিকে তাঁদের ধর্মীয় মনোভাবও আহত হয়। স্বভাবতই ফরায়েযীদের সঙ্গে হিন্দু জমিদারদের সংঘর্ষ হয়। এভাবে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) পরিচালিত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়। অবশ্য তখনও ফরায়েযী আন্দোলন মূলত: ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনই ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ধর্মীয় সংস্কারক। কয়েকটি ক্ষেত্রে জমিদারদের সঙ্গে ফরায়েযীদের বিরোধ হলেও হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) যথেষ্ট সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এ আন্দোলন পরিচালনা করেন যাতে ধর্মীয় সংস্কারকরূপে তাঁর ভূমিকা ক্ষুন্ন না হয়। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর মৃত্যুর পরে তাঁর একমাত্র পুত্র মোহসীন উদ্ দীন আহমদ দুদু মিয়া ফরায়েযী আন্দোলনের নেতা হন। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে নেতৃত্ব পদে আসীন হবার পরে প্রধানত দুটো উদ্দেশ্য সামনে রেখে দুদু মিয়া ফরায়েযীদের সংগঠিত করেন :

(ক) জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের রক্ষা করা।

(খ) ফরায়েযীদের মধ্যে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ বিলোপ করে সামাজিক জীবনে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।[৩৩]

ফরায়েযী মতবাদে বলা হয়, একজন ফরায়েযীকে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আড়ম্বর পরিহার করতে হবে এবং কুরআনের নির্দেশ অনুসরণ করে সমস্ত রকমের পৌত্তলিকতা ও ব্যক্তিপূজা পরিহার

৩৩ M. A. Khan, *History of the Foraidi Movement Muslim Struggle for Freedom in Bengal,* Ibid, p. 38

*Dhaka University Institutional Repository*

করতে হবে। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু ও অন্যান্য উপলক্ষে মুসলিম সমাজে যে সব অনুষ্ঠান করা হত এবং অর্থব্যয় করা হত, তা পাপকার্য মনে করে ফরায়েযীরা বন্ধ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। অবশ্য সত্যনিষ্ঠ হওয়া একান্ত প্রয়োজন হলেও ফরায়েযীদের স্বার্থে তা শিথিল করার ব্যবস্থাও ছিল। ফরায়েযীদের পরিচালনার জন্য যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গঠন করা হয়, তা ছিল খুবই মজবুত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ফরায়েযী আন্দোলনের প্রচণ্ডতা হ্রাস পেলেও ফরায়েযীদের সংখ্যা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও নেহাত কম ছিল না। ধর্মীয় সংগঠনের সদস্য হিসেবে তাদের অস্তিত্ব দীর্ঘকাল টিকে আছে এবং গ্রাম বাংলায় ইসলামিকরণের ধারাটিকে তারা অব্যাহত রেখেছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশভাগের সময়ে ও তার পরবর্তীকালেও পূর্ববঙ্গে ফরায়েযীদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল।[৩৪] এমনকি আজও ধর্মীয় সংগঠনরূপে এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

পরিশেষে বলা যায় যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফরায়েযী আন্দোলন মূলত পরিচালিত হয়েছিল শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারমুক্ত তাওহিদভিত্তিক এবং সমসাময়িক বিশ্বে প্রচলিত আন্দোলনের আলোকে। ছোট-খাটো কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপি চলমান ইসলামি আন্দোলন ও স্থানীয় অন্যান্য সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলোর সাথে এ আন্দোলনের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাই দেখা যায় যে, ফরায়েযী আন্দোলনের প্রভাব বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অত্যন্ত সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।

৩৪ মোঃ আনোয়ার হোসেন, *ইতিহাসের ইতিহাস*(ঢাকা : মৌলী প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, একুশে গ্রন্থমেলা ২০১১), পৃ. ২৬

*Dhaka University Institutional Repository*

# সপ্তম অধ্যায়

# হাজী শরী‘অতুল্লাহর বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের মূল্যায়ন

## ৭.১ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের বহুমাত্রিকতা

### ৭.১.১ বাংলায় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন

বাঙালিরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে খুবই মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। বাঙালি মুসলিমগণ সর্বপ্রথম বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্-দৌলার পরাজয়ের ফলে শাসন ক্ষমতা যে এদেশের কাছ থেকে বিদেশীদের হাতে চলে গিয়েছিল এটা বুঝতে এখানকার জনগণের বেশ সময় লেগেছিল। ১৭৬০ খ্রি. চট্রগ্রামের এবং ১৭৬৫ খ্রি. বাংলার দেওয়ানি লাভের সাথে শাসন ক্ষমতাও তারা কুক্ষিগত করতে অগ্রসর হয়। পলাশির যুদ্ধের পর এ রাজনৈতিক পট পরিবর্তন জনমনে বিশেষ রেখাপাত করেনি। দেরিতে হলেও এদেশীয়রা ইংরেজদের অভিসন্ধি যখন বুঝতে পারল তখনই তারা রাজস্ব দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ইংরেজদের দেওয়ানি রাজস্ব দিতে প্রথম অস্বীকৃতি জানায় পার্বত্য চট্রগ্রামের চাকমা জনগোষ্ঠি।

১৭৭২ সাল থেকে ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে। অবশেষে ইংরেজরা তাদের সেনাবাহিনী দিয়ে প্রতিরোধ করে।[১] তারপর দুর্জন সিংহের নেতৃত্বে চেয়ার বিদ্রোহ হয়। ১৭৯৯ সালে তাও সেনাবাহিনীর সাহায্যে দমন করা হয়। ১৭৬০-১৮০০ সালে ফকির সন্যাসি বিদ্রোহ মুসলিম জনগোষ্ঠির মাঝে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। সময় মত খাজনা দিতে না পারায় তাদেরকে জমি থেকে উৎখাত করা হত। তখন কৃষকগণ তাদের সাথে যোগ দিয়ে সন্যাসি বিদ্রোহকে গণবিদ্রোহে রূপদান করেছিল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ফকির সম্প্রদায়কে ডাকাত আখ্যায়িত করে তাদের সংগ্রামকে দমিয়ে দেয়। এ আন্দোলন প্রশমিত হওয়ার পূর্বেই সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম ভারতে দুর্নিবার ধর্মভিত্তিক ওয়াহাবি আন্দোলন শুরু হলে ইংরেজদের বেকায়দায় পড়তে হয়। তাই ইংরেজরা কৌশল অবলম্বন করে মুসলিমগণের সাথে শিখদের সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়। এতে করে এ আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ওয়াহাবি আন্দোলনের পরপরেই ১৮৩০-৩২ সালে তিতুমীরের নেতৃত্বে মুসলিম সাধারণ সমাজ বিশেষ করে রায়তদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন শুরু হয়। মক্কায় তিতুমীর হজ্জ করতে গেলে সেখানে তিনি সৈয়দ আহমদের সংস্পর্শে আসেন। উত্তর চব্বিশ পরগনায় অবস্থিত

---

১ ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*(ঢাকা : আবরার প্রকাশনী, ১৯৯৩) পৃ. ২৩

নারকেল বাড়িয়ায় তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা নামে একটি দেশীয় দূর্গ নির্মাণ করেই ইংরেজদের আক্রমন প্রতিরোধ করেছিল। শেষ পর্যন্ত তিতুমীর শহীদ হলে তাদের দলের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। প্রায় একই সময়ে আরম্ভ হয়েছিল দক্ষিণ-মধ্য বঙ্গে ফরায়েযী আন্দোলন। ১৭৮১-১৮৪০ সালে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) বৃটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে  তোলেন। তিনি তাঁর আন্দোলনে সফল হয়েছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর একমাত্র পুত্র ও ফরায়েযী নেতা মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া পরবর্তীতে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল ছিল চাষিদের নিকট ভয়ংকর। জমিদারদের অন্যায় কর আদায়ের ব্যাপারে জমিদারদের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। বাংলার জমিদারদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু আর চাষি বা রায়তদারের অধিকাংশই ছিল মুসলিম। যে কারণে সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখা দেয়। ইংরেজ দ্বারা সৃষ্টি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই এ বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপন করেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। ১৮৫৭ সালে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে সর্বশেষ এবং সর্বপেক্ষা রক্তক্ষয়ী প্রয়াস ছিল সিপাহী বিদ্রোহ। উত্তর ভারতে প্রায় সমস্ত বড় বড় শহরে এ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। বিদ্রোহের লক্ষ্য ছিল শ্বেতাঙ্গরা। সিপাহী বিপ্লব অনেকটা আকস্মিক ছিল ভারতের বিশাল এ জনগোষ্ঠির বিদ্রোহ অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না। এ সীমাবদ্ধতা যদি না থাকতো তবে নিঃসন্দেহে এর ফলাফল অন্যরূপ হতো।

সিপাহী বিদ্রোহের ১৮ বছর পর বাংলার মুসলিম সমাজের জাগরণের ইতিহাস যে সকল কীর্তিমান ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছিল তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। তিনি ১৮৭৫ সালে চন্দনাইশ সাবেক পটিয়া থানার আডালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি হুগলি মাদরাসা থেকে টাইটেল পাশ করেন। ১৮৯৮ সালে তিনি বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কয়েকটি সংগঠন মুসলিম সমাজে এক পরিবর্তনের সূচনা করে। এ সংগঠনসমূহ ছিল মেমোরেন্ডাম কনফারেন্স। ১৯০২ সালের নিকটবর্তী সময় বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এ সংগঠনসমূহের  প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

কংগ্রেসের আহ্বানে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে মুসলিম জাতীয়তাবাদী শক্তি এ আন্দেলনে অংশ নিয়েছিলেন মৌলানা জামাল উদ্দীন আফগানি। প্রচারিত প্যান-ইসলাম আন্দোলন প্রগতিশীল মুসলিম সমাজে জাতীয় চেতনার সৃষ্টি করে। এ চেতনাকে ভিক্তি করেই মুসলিম জাতীয়তাবোধের দৃঢ় ভিক্তি রচিত হয় মুসলিম সমাজে। সত্যবার্তা পত্রিকা লিখে কর্মবীর তিনি ১৯০৬ সালের বঙ্গভঙ্গ রহিত আন্দোলনে যোগ দিয়ে উক্ত পত্রিকায় আন্দোলনের বহু প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রকাশ করেন।[২] ১৯২০ সালের প্রথম দিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটি

২ মোঃ আনোয়ার হোসেন, *ইতিহাসের ইতিহাস*(ঢাকা : মৌলী প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, একুশে গ্রন্থমেলা ২০১১), পৃ. ২৭-৩০

Dhaka University Institutional Repository

গঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।[৩] সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী।

১৯২০ সালের ৩ মার্চ ঢাকা আহসান মনজিলের খিলাফত কনফারেন্সে মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী বলেছিলেন, পাশ্চাত্যের দেশসমূহের ষড়যন্ত্রের ফলে তুরস্কের স্বাধীনতা লোপ পেলে এশিয়ার অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহের স্বাধীনতাও বিপন্ন হয়ে পড়বে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামও অর্থহীন হয়ে পড়বে। এ বছরেই তিনি চট্টগ্রাম জে এস সেন হলের খিলাফত জনসভায় সভাপতির বক্তব্য দিয়েছিলেন। মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেন। পবিত্র কুরআন স্বাধীনতাকে কত উচ্চে স্থান দিয়েছেন এবং কাপুরুষতা ও পরাধীনতাকে কিরূপ ঘৃণিত বিষয় ও অভিশপ্ত বস্তু রূপে ব্যাখ্যায়িত করেছে তা সুষ্ঠভাবে চিন্তা করে দেখলে রাজনৈতিক জগতে ও স্বাধীনতার ইতিহাসে এটা এক অমূল্য সম্পত্তি বলে নির্দিষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন যে,

> ‘স্বাধীনতা আল্লাহর দান ও পরাধীনতাকে আল্লাহ কঠিন আজাব ও গজব বলে কুরআনে পুনঃপুন ঘোষণা করেছেন। সে অভিশাপ হতে উদ্ধার হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এ কর্তব্য পালনে শৈথিল্য করলে সে জন্য শুধু পরকালে নয় ইহকালেও আল্লাহর গজবে পড়তে হয়।’[৪]

ইতিহাসে দু'বার বঙ্গভঙ্গ ঘটে, ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ রাজত্বকালে বঙ্গভঙ্গ যাতে উদ্বেলিত বাঙ্গালির প্রবল প্রতিবাদ স্বরূপ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হলে ১৯১১ সালে এ বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। দ্বিতীয় বার বাংলা ভাগ হয় ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার সময়। বাংলার মুসলিম প্রধান পূর্ব ভাগ পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পাকিস্তানের অন্তর্গত হয় ও হিন্দু প্রধান পশ্চিম ভাগ পশ্চিমবঙ্গ নামে ভারতের অংশ থাকে। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর হয় অধুনা স্বাধীন বাংলাদেশ।

## ৭.১.২ ফরায়েযী আন্দোলনের তৃণমূল রূপ

উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলার কিছু অর্বাচিন আমলা ও ব্যবসায়ীর কারণে ১৭৫৭ সালে প্রথমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ও পরবর্তীতে ইন্দোনেশিয়া থেকে কাবুল পর্যন্ত এলাকার স্বাধীনতাই নস্যাৎ হয়ে যায়। ১৭৫৯ থেকে ১৮০৬ পর্যন্ত দিল্লির দুর্বল মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম এর সময় কান্দাহারের (পরবর্তীতে কাবুলের) বাদশা আহমেদ শাহ আবদালী বা দূররানী ১৭৬১ সালে মারাঠাদের সম্মিলিত বাহিনীকে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত করেন।[৫] উল্লেখ্য যে, এ দুর্যোগপূর্ণ সময়ে মুসলিমগণের উপর স্থানীয়ভাবে মারাঠা (বর্গী) ও বহির্দেশ থেকে ইংরেজ ও অন্য ইউরোপীয়রা সামরিক চাপ সৃষ্টি করেছিল। মারাঠারা ঝামেলা সৃষ্টি না করলে বাদশা আহমেদ শাহ আবদালী দূররানী বা তার সম্প্রদায়ের অন্য কোনো

৩ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল, *উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দালন*(কুষ্টিয়া : সেন্টার ফর ইসলামিক দা'ওয়াহ্ এন্ড কালচার, ফেব্রুয়ারী ২০১১), পৃ. ১২০

৪ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg, visited on 20.11.2012

৫ মাহবুবুর রহমান, *বাংলার ইতিহাস(১২০০-১৯৭১খ্রি.)*(ঢাকা : বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৯), পৃ. ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

আফগান সামরিক নেতা ইংরেজদের উচিত শিক্ষা দিতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় ইতিহাস ভিন্ন খাতে চলতে থাকে।

১৭৫৭ সালের পর ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ও বাংলার নবাব মীর কাসেম পরাজিত হন। ১৭৬৫ সালে পরাজিত মোগল সম্রাটের নিকট থেকে ইংরেজরা বাংলা-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি (খাজনা আদায়ের অধিকার) লাভ করে। ১৮০৩ সালে ইংরেজরা তো দিল্লি দখল করলই আর মোঘল বাদশা দ্বিতীয় শাহ আলম হয়ে গেলেন ইংরেজদের ভাতাভোগী। ইংরেজরা কৌশল করে মোঘল বা বাংলার নবাবদের নামে মাত্র রাখল জনগণকে ধোকা দিতে। তবে সামরিক বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা তারা নিজেদের হাতে রাখে। শক্তিশালী মোঘল ও বাংলার নবাবরা সাত সমুদ্র তের নদী পারের ইংরেজদের ভাতা-ভোগীতে পরিণত হলেন।

যাহোক, উপমহাদেশে মুসলিমগণের ভাগ্য বিপর্যয়ে শুধু রাজনৈতিক-সামরিক দিক দিয়ে তারা নাজেহাল হল না, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও ক্ষতিগ্রস্থ হল। এ সময়ে কিছু সচেতন ব্যক্তিত্ব মুসলিমগণের মান সম্মান উদ্ধারে নানা ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হল ফকীর আন্দোলন, ফরায়েযী আন্দোলন, তথাকথিত ওয়াহাবী-জিহাদী আন্দোলন, ১৮৫৮ সালে আজাদী আন্দোলন, স্যার সৈয়দ আহমদের শিক্ষা আন্দোলন, মাদরাসা শিক্ষার পক্ষে দেওবন্দী শিক্ষা আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, মোপলা বিদ্রোহ, মুসলিম লীগ আন্দোলন, খৃষ্টান মিশনারি-বিরোধী মুন্সি মেহের উল্লাহর আন্দোলন ইত্যাদি। প্রফেসর মোঃ ইনামূল হক মন্তব্য করেন।[৬] উনিশ শতকে যে কয়টা আন্দোলন হয় উপমহাদেশের মুসলিমগণের হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি ও ক্ষমতা উদ্ধারে।[৭] বাংলায় মুসলিমগণের দুর্দিনে একদিকে বৃটিশ ও হিন্দু জমিদারদের কুশাসন ও অর্থনৈতিক জুলুম চলছিল, অন্যদিকে মাদরাসা শিক্ষার প্রায় বিলুপ্তিতে মুসলিমগণের ধর্মীয় চেতনাও লুপ্তপ্রায় হয়ে পড়ে। মাদরাসা-মক্তব-শিক্ষা বঞ্চিত সাধারণ গরীব মুসলিমগণ শক্তিশালী হিন্দুদের প্রভাবে মনসা পূজা, দক্ষিণ রায় নামক বাঘ পূজা, বনদেবী পূজা, শীতলা বসন্ত ব্যারাম ঠেকানো পূজা, এমনকি শিব-পূজা পর্যন্ত করতে বাধ্য হল। এ সময়ে ১৭৮৪ সালের ফরিদপুর জেলায় হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর আবির্ভাব ঘটে। ১৮ বছর বয়সে তিনি মক্কায় হজ্জ করতে গিয়ে আঠার-বিশবছর পর ১৮০২ সালে দেশে ফিরেন। মক্কায় তিনি মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদির ওয়াহাবি সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে আসেন। তিনি ইসলামের 'ফরয' (অত্যাবশ্যকীয় আমল) পালনের উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করলেন। তাই তার আন্দোলন 'ফরায়েযী' আন্দোলন নামে পরিচিত হয়। ইংরেজ হানাদাররা তো আগেই মুসলিমগণের জমাজমি কেড়ে নিয়ে হিন্দুদের

---

৬ Dr. A. R. Mallick, *British Policy & the Muslims in Bengal*(Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1966), p. 69

৭ Manzoor Ahmad Hanif, *A Short History of Muslim rule in Indo-Pakistan*(Michigan : Ideal Library, 1964), p. 430

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছিল। মুসলিমগণের আয়মা ও লাখেরাজ সম্পত্তি তারা বাজেয়াপ্ত করে। খাজনা আদায়ের ভার হিন্দুদের উপরে দেয় ইংরেজরা।

১৭৭০-১৮২৫ সালে বিলাতি বস্ত্রের স্বার্থে বাংলার তাঁত শিল্পকে তারা ধবংস করে। লবণ শিল্প ধবংস করতে ১৭৬৬ সালে লবণের উপর মন প্রতি দু'টাকা হারে কর ধার্য করে। ইংরেজ-প্রিয় হিন্দু জমিদাররা গো-কুরবানি ও আযান দেয়া নিষিদ্ধ করে। দাড়ির উপরে ট্যাক্স বসায়। পূজা-পার্বণে মুসলিমগণের চাঁদা দিতে, পূজার যোগান ও বেগার দিতে বলপ্রয়োগ করা হয়। কলকাতা সমীক্ষাতে ১৮৪২ সালে এক ইংরেজ আমলা একটা প্রতিবেদনে লেখেন যে, একটা জেলাতে সব নতুন জমিদার মাত্র দু'জন ছাড়া, পুরাতন মুসলিম জমিদারের নিম্নস্তরের কর্মচারী ছিল। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, জেমস ও কিনেলির বরাতে লেখেন যে, জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হিন্দু খাজনা সংগ্রহকারী কর্মচারীরা হয়ে গেল জমিদার। ড. মুঈন উদ্-দীন আহমদ খান লেখেন, ১৮৪২ সালে বাংলার পুলিশ প্রধান বলেছেন যে, ফরিদপুরের হিন্দু জমিদারগণ সবকিছু করে যা মুসলিম কৃষক, তাদের ধর্ম, এমনকি তাদের মেয়েদেরকে লাঞ্ছিত করে। এর অর্থ হল মুসলিম মেয়েদের সতীত্ব নাশ করত! এক ইংরেজ আমলা বলেছেন, ক্যালকাটা রিভিউ লেখেন যে, পূর্ববর্তী জমিদারির বদলে যে নতুন জমিদাররা এল তা ছিল একটা ঘৃণ্য বিপ্লব, যা অপরাধী ভাগ্যান্বেষী একটি শ্রেণিকে জিম্মাদার করণ যাদের জুলুমবাজির হাত প্রজাগণের রাজনৈতিক নয় তবে সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানের গোপন অংশে আঘাত করল, আর এ নতুন জমিদারদের ছিল না পূর্ববর্তীদের মত পিতৃতুল্য ও সামন্ততান্ত্রিক নমনীয়তা যা জনগণকে ধবংস থেকে রক্ষা করত। ক্যালকাটা রিভিউ লেখে যে, ঊনিশ শতকের প্রথম ভাগে এক ইংরেজ আমলা বলেন, বাংলার প্রতিটি জেলায় জমিদাররা ফরাসী বিল্পব কালীন রবেসপিয়েরীয় যুগের কাছাকাছি সন্ত্রাসী শাসন রেন অব টেরর চালায়। ফরাসী সন্ত্রাসী শাসনের মত জমিদারদের ভিত্তি হল মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাদের ওপর কর্তৃত্ব, এমন ট্রাইব্যুনাল যাতে নেই কোন 'চেক' যা একটি আদালতকে কসাইয়ের কসাইখানা থেকে আলাদা করতে পারে।

ড. এ আর মল্লিক লিখেছেন,

> 'জমিদাররা পত্তনিদার অর্থাৎ ঠিকাদারদের জমি দিয়ে অর্থ নেয়, পত্তনিদাররা আবার পাতি-পত্তনিদারকে, এ ভাবে পাতি-পাতি পত্তনিদারদের জমি পত্তন দিয়ে, এভাবে খামারের ভিতরে খামার হয়ে পড়ে ব্যবস্থা, অর্থ হল স্ক্রু, তারপর শেষ স্ক্রুটি সবার চাপ নিয়ে রায়তের উপর এসে পড়ে।[৮]

১৮৩২ সালে রেভিনিউ বোর্ডের প্রধান হিউস্টক বলেন,

'একটা ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রায়তরা চার স্তরের পত্তনিদারের চাপে থাকত। একটা স্থানীয় পত্রিকা ও ১৮৩৩ সালে স্বীকার করে বলে, চার থেকে পাঁচ স্তরের পত্তনিদার প্রায় সব জমিদারিতে ছিল। লড মেটকাফ মন্তব্য করেছেন যে, জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এমন এক

৮ Dr. A. R. Mallick, *British Policy & the Muslims of Bengal*, Ibid, pp. 51-52

*Dhaka University Institutional Repository*

ঢালাও জুলুমবাজ কার্যক্রম যাতে জমাজমি চলে যায় এমন এক শ্রেণি বাবু অর্থাৎ হিন্দুদের নিকট যারা ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ হাসিল করেছে।’[৯]

১৮৪৪ সালে বাংলার পুলিশ প্রধান নিজের পুলিশকেই (যারা প্রায় সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের) দোষারোপ করেন জুলুমবাজ জমিদারদের সঙ্গে গুটি চালাতে দুদু মিয়ার আন্দোলনে হিন্দু জমিদার-বিরোধী উপাদান যুক্ত হয়। এ সময়ে হিন্দু জমিদাররা গরীব মুসলিমগণের উপর শুধু ধর্মীয় নয় অর্থনৈতিক জুলুমও করে। ফরিদপুরের রায়ত জনগণের উপর কত ধরনের কর-খাজনা আরোপ করা হতো তার একটা তালিকা পাওয়া গেছে। ফরিদপুরের ১৮৭২ সালের কালেক্টরের (বর্তমানের ডেপুটি কমিশনারের মত) এক প্রতিবেদন থেকে এটা পাওয়া যায়। কালেক্টর ডব্লিউ এ ওয়েলস বাংলা প্রাদেশিক সরকারের সচিবকে জানান যে, নিচের উল্লিখিত বে-আইনী ‘সোস’ (কর) আদায় করা হচ্ছে ফরিদপুর জেলাতে।[১০]

| ক্রমিক | করের নাম | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০১ | মুরুচা | বিয়ের কর। |
| ০২ | আগমনী খরচা | জমিদার স্থানীয় কাচারিতে এলে তাকে দেয় কর। |
| ০৩ | বিবাহ খরচা | জমিদার পরিবারে কোনো বিয়ে শাদী হলে তার জন্য দেয় কর। |
| ০৪ | শ্রাদ্ধ কর | জমিদার পরিবারে বাবা, মা বা অন্য কোনো প্রবীণ সদস্য মারা গেলে এ উপলক্ষে দেয় কর। |
| ০৫ | পৈতা খরচা | জমিদারের ছেলেরা যখন ধর্মীয় পৈতা গ্রহণ করে তখন দেয় কর। |
| ০৬ | ভুরা খরচা | জমিদারের পুত্রদের যখন বাহু ছিদ্র করা হয়, তখন এ কর আদায় করা হত। |
| ০৭ | তর্পণ | ১৮৮৪ সালের ঝড়ের পরে জারি করা কর। |
| ০৮ | মুকাদ্দমা খরচা | আদালতে জমিদারের মুকাদ্দমা চালানোর খরচ চালানো কর। |
| ০৯ | জরিমানা | রায়ত প্রজাগণের ভিতর বিবাদে আদায় করা কর। |
| ১০ | দরখাস্তের রুছুম | জমিদারের নিকট প্রতিটি দরখাস্ত জমা দেয়ার জন্য রায়তকে এ কর দিতে হত। |
| ১১ | বাইন সেলামী | গুড় বা নালী তৈরি (খেজুর গাছ থেকে) করতে দেয়া কর। |
| ১২ | সেলামী | গুড় বা নালী তৈরি (আখ থেকে) করতে দেয়া কর। |
| ১৩ | রথ খরচা | হিন্দু জমিদারের রথ যাত্রা পূজার জন্য দেয়া কর। |
| ১৪ | বাট্টা | রায়ত প্রজা কর দিতে কথিত তারতাম্যে এটা আদায় করা হত। |
| ১৫ | পেয়াদা খরচা | কর, খাজনা আদায়ে পিওনের ফি। |
| ১৬ | তহুরি | জমিদারের কর-খাজনা আদায়কারী আমলা কর-খাজনা আদায়ের জন্য এটা পেত। |
| ১৭ | ভেট | রায়তের পরিবারে শ্রাদ্ধ হলে জমিদারকে দেয় উপহার। |
| ১৮ | মৎস্য জোগাড় | বিনামূল্যে জেলেদের থেকে মাছ প্রদান। |

৯ John William Kaye, *Selections from the Papers of Lord Metcalfe*(London : Smith, Elder and Co., 1855), p. 254

১০ Board of Editors, *Journal of the Asiatic Society of Bengal*(Dacca : Asiatic Society of Bengal, 1894), Vol. LXIII, part II, p. 58

Dhaka University Institutional Repository

| | | |
|---|---|---|
| ১৯ | পিউরা খরচা | অস্পষ্ট। |
| ২০ | গুজি খরচা | শীত ঋতুতে জমিদারের শীতবস্ত্র ক্রয়ে রায়ত কর্তৃক দেয় কর। |
| ২১ | মালিকানা সরঞ্জামি খরচা | জমিদারের আমলার বেতন। |
| ২২ | ছাতা বা ছত্র খরচা | জমিদারের ছাতা বাহকের জন্য দেয় কর। |
| ২৩ | ইমাম খরচা | মুহহরম উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলিম জমিদারগণ কর্তৃক ধার্যকৃত দেয় চাঁদা।[১১] |

হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ নীলকররাও জুলুমবাজ ছিল। ড. মুঈন লেখেন, যদিও নীলকররা শিল্পপতি তবে গ্রামের সমাজে তারাও জমিদার। তারা নীল চাষের মৌসুমের শুরুতেই অক্টোবরে কৃষকের জমিগুলোতে চিহ্ন দিয়ে নীল চাষ করতে যায়। তিনি আরও লেখেন, নীলচাষে ১৮৫০ এর দিকে চাষীরা পাঁচ থেকে সাতগুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয় ধান চাষের পরিবর্তে নীলচাষে। তিনি লেখেন, নীলকররা রায়ত কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করত আর রায়তদের দাদন (অগ্রিম অর্থ প্রদান) দিয়ে আটকে রাখত সকলকে।

নদীয়ার এ স্কোনস ১৮৫৪ সালে মন্তব্য করেন যে রায়তরা হল, শুধুমাত্র খাটার জীবজন্তু, তারা লাভের জন্য এ শ্রমে জড়িত হয়নি। একই বরাতে জানা যায় যে, নীলকররা নদীয়াতে রায়তদের আড়াই বিঘা জমিকে এক বিঘা ও দুই বান্ডিল নীল গাছকে এক বান্ডিল হিসেবে ধরে রায়তদের ঠকাত। সামান্য কিছু মানবতাবাদী বিচারক পর্যন্ত নীলকরদের জুলুমের ব্যাপারে সামান্য কিছু সত্য প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি সৎ নীলকর স্বীকার করবেন যে কোনো রায়ত নীলকরদের নিকট থেকে দাদন (অগ্রিম) টাকা নিত না, যদি তার আর অন্য কোনো উপায় থাকত, আর যে একবার নীলকরদের খাতায় নাম লিখিয়েছে সে তা থেকে মুক্ত হতে পারত না। ঋণ খাতায় নাম রায়ত থেকে তার ছেলে পর্যন্ত চলতে থাকে রায়তের মৃত্যু বা জুলুমের কারণে পলায়ন করলেও, অবিরত ঋণের জালে রায়তরা জড়িয়ে পড়ে। ড. এ. আর. মল্লিক লেখেন, ১৮৬১ সালের নীল কমিশন রিপোর্ট দেয় যে, ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট সবসময় তার দেশী (নীলকরদের) পক্ষ নেন। উল্লেখ্য যে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর আন্দোলন দমন করতে হিন্দু জমিদাররা দলবদ্ধ হল। তারা কিছু প্রভূভক্ত অদূরদর্শী মুনশি-মৌলভী ও ধর্ম ব্যবসায়ী পীরকেও তাদের দলে নিতে সমর্থ হল। এ জন্যই সম্ভবত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী নিরদ চৌধুরী ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুমিত এ দুর্দিনের সাধারণ মুসলিমগণের 'লাইভস্টক' (গৃহপালিত পশু) বলেছেন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তাঁর পুত্র দুদু মিয়া প্রমুখের ফরায়েযী আন্দোলন চলে জুলুমবাজ হিন্দু জমিদার ও ইংরেজী নীলকরদের এ অনৈতিকতার বিরুদ্ধে। এর সঙ্গে রয়েছে সাধারণ মুসলিম কৃষকরা হিন্দু প্রভাবে তাদের সংস্কৃতিতে প্রভাবন্বিত হওয়া। সাধারণ কিছু মুসলিম কৃষক হিন্দু সংস্কৃতি পালন করলেও তারা হিন্দু জমিদারদের কোন উদারতা পায়নি। ড. মুঈন উদ্ দীন আহমদ খানের সংগৃহীত 'দুররি

১১ 'ফাইল-১৮৭২-৭৩, ফরিদপুর জেলা কালেক্টরেট। বৈধ করের ১নং তালিকা ফাইলে পাওয়া যায়।' দ্র. ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬-১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ’ পুঁথিতে হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা রয়েছে।[১২]

“সহর মে এমাম হাছেন হোছেনের॥
হায় হায় জারি ছিল মশরেকগণের।
পাঁচ পীরের নামেতে মোকাম উঠাইয়া।
উপবাস করিত সে সকলে মিলিয়া।
প্রথম হায়েজ যদি হইতো কাহার॥
কলাগাছ গাড়িত বাড়ির চারিধার।
সে সব বেদাত এবে হইল মেছমার ॥
উঠিল এছলামি সূর্য গগণ মাঝার।
হাজী শরিতুল্লা হেথা তশরিফ আনিয়া ॥
দীন জারি করিলেন বাঙ্গালা জুড়িয়া।

হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) হানাফি ফিক্বাহর অনুসারী ছিলেন। তবে হানাফি সম্প্রদায়েও যে সন্দেহজনক কার্যক্রম হিন্দু প্রভাবে ও সাধারণ কৃষকদের নিরক্ষরতার কারণে ঢুকে পড়েছিল তা সংস্কারে তিনি প্রচেষ্টা চালান। জনাব আব্বাস আলী খান লেখেন, তৎকালীন হিন্দু সমাজের মনোভাব হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর প্রতি কতখানি বিদ্বেষাত্মক ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৩৭ সালের ২২ এপ্রিল তারিখের ‘সমাচার দর্পণে’ প্রকাশিত একখানি পত্রে। পত্রটি নিম্নে উদ্বৃত হল :[১৩]

‘ইদানিং জেলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুরপুর গ্রামে সরিতুল্লা নামক একজন বাদশাহী লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক বার হাজার জোলা ও মুসলমান দলবদ্ধ করিয়া নতুন এক শরা জারি করিয়া নিজ মতালম্বী লোকদিকের মুখে দাড়ি, কাছা খোলা, কটিদেশে চর্মের রজ্জুভৈল করিয়া তৎচতুর্দিগস্থ হিন্দুদিগের বাটি চড়াও হইয়া দেবদেবী পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে- এ জিলা ঢাকার অন্তঃপতি মতলবগঞ্জ থানার রাজনগর নিবাসি দৌয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোড়াগাছ গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাটিতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্বস্ব হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভষ্মরাশি করিলে একজন যবন মৃত হইয়া ঢাকায় দওরায় অর্পিত হইয়াছে। আর শ্রুত হওয়া গেল, সরিতুল্লার দলভূক্ত দুষ্ট যবনেরা ঐ ফরিদপুরের অন্ত:পাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিণী চরণ মজুমদারের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাহার বাটিতে দেব-দেবীর পূজায় আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম উপস্থিত করিয়ে মজুমদার বাবু যবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া-ঐ সকল দৌরাত্ম ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরের জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্বক কয়েকজন যবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এ

১২ দুররি মুহাম্মদ (আনুমানিক ১৯০৩ সালে লিখিত)। দ্র. ফাহমিদুর রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*(ঢাকা : বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১), পৃ. ২৯১

১৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*(কলিকাতা : শতাব্দী পরিক্রমা, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ); ফাহমিদুর রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১-২৯২

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। হে সম্পাদক মহাশয়, দুষ্ট যবনেরা মফঃস্বলে এ সকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচারগৃহে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুত হওয়া গেল, ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে যে সকল আমলা ও মোক্তার-কারেরা নিযুক্ত আছে, তাহারা সকলেই সরিতুল্লা যবনের মতাবলম্বী-তাহাদের রীতি এ যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয়, তবে কেহ ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষী হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে সুতরাং ১২০০০ লোক দলবদ্ধ। ইহাতে ফরিয়াদীর সাক্ষীর ক্রুটি কি আছে । আমি বোধ করি, সরিতুল্লা যবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর উত্তর প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দুধর্ম লোপ পাইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লার চোটপাটের শত অংশের এক অংশ তিতুমীর করিয়াছিল না।'

পত্রখানির প্রতিটি ছত্রে মুসলিমগণের প্রতি হিন্দু সমাজের মানসিকতা পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি লেখেন, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে বাংলাদেশ থেকে বহু মুজাহিদ, যাকাত, ফিৎরা, লিল্লাহ থেকে সংগৃহীত বহু অর্থ এবং নানা প্রকার সাহায্য পশ্চিম ভারতের সিত্তানা কেন্দ্রে পাঠাতেন। ঢাকা জেলার নয়াবাড়ী নামক স্থানে প্রথমে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর নতুন কর্মক্ষেত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু হিন্দু জমিদারদের চরম বিরোধিতার ফলে তাকে আপন গ্রামে ফিরে গিয়ে তাঁর প্রচারকার্য শুরু করতে হয়। তাঁর আন্দোলনে ঢাকা, বরিশাল, নদিয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় বিস্তার লাভ করে। নিরক্ষর, চাষী, তাঁতি ও অন্যান্য সাধারণ মুসলিমগণের মধ্যে নামায-রোযার প্রচলন, ধুতির পরিবর্তে তহবন্দ-টুপির ব্যবহার, মসজিদগুলির সংস্কার প্রভৃতি কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকে। তিনি নিজে মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি ও গায়ে জামার উপরে ছদরিয়া পরতেন, যে পোশাক সাধারণতঃ কোনো মুসলিম ব্যবহার করত না। ১৮৪০ সালে তাঁর ইন্তিকালের পর যোগ্য পুত্র দুদু মিয়া এ আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর পুত্র মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া ১৮৩১ সালে হজ্জ পালনের জন্য মক্কা গমন করে পাঁচ বছর অবস্থান করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পর পিতার কাজে সাহায্য করেন। পিতার ন্যায় দুদু মিয়া ও অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। জমিদারদের সঙ্গে তাঁর বার বার সংঘর্ষে আসতে হয়। ১৮৪২ সালে তিনি ফরিদপুরের জমিদার বাড়ি আক্রমণ করেন এবং মদন নারায়ণ ঘোষকে বন্দী ও পরে হত্যা করেন। পুলিশ তাকেসহ ১১৭ জন ফরায়েযীকে গ্রেফতার করে। বিচারে ২২ জনের কারাদণ্ড হয়। কিন্তু দুদু মিয়াকে প্রমাণের অভাবে খালাস দেয়া হয়।[১৪]

১৮৪৬ সালে এনড্রিও এন্ডারসন এর গোমস্তা কালি প্রসাদ মনিবের আদেশে সাত-আটশ লোক নিয়ে দুদু মিয়ার বাড়ি চড়াও করে এবং প্রায় দেড় লাখ টাকার মূল্যের অলংকারাদি সহ বহু ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়েও কোন ফল হয়নি। জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হয়ে কোন সুবিচার না পেয়ে দুদু মিয়া

১৪ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

Dhaka University Institutional Repository

এবার নিজ হাতে শত্রুদের উচিত শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। ১৮৪৬ সালের নভেম্বর মাসে, তাঁর গৃহ লুণ্ঠিত হওয়ার একমাস পরে, তিনি শত্রুদের অত্যাচার-উৎপীড়নে ইন্ধনদাতা নীলকর ডানলপের কারখানা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে দেন এবং গোমস্তা কালী প্রসাদকে হত্যা করেন। দুই বছর পর্যন্ত মামলা চলার পর দুদু মিয়া তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান। জনসাধারণের মধ্যে দুদু মিয়ার অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে সরকার বিব্রত হয়ে পড়েন।

১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলন চলাকালে দুদু মিয়া উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারেন এ অজুহাতে তাঁকে কারাগারে আটক করে রাখা হয়। প্রথমে আলিপুরে এবং পরে তাঁকে ফরিদপুর জেলে রাখা হয়। ১৯৫৯ সালে মুক্তিলাভ করে তিনি ঢাকায় আসেন এবং এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুদু মিয়া পিতার আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করেছিলেন বটে। কিন্তু নীতির দিক দিয়ে তিনি পিতার আদর্শের কিছুটা পরিবর্তন করেছিলেন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) যে ছয়টি বিষয়ের উপরে তাঁর আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তা হচ্ছে,[১৫]

(১) মুসলমান শাসিত দেশ ব্যতীত অন্য কোথাও জুমু'আ ও 'ঈদের নামায বৈধ নয়।
(২) মুহররমের পর্ব ও অনুষ্ঠান পালন ইসলাম বিরোধী ও পাপকার্য।
(৩) পীর ও মুরীদ পরিভাষাদ্বয়ের স্থলে উস্তাদ ও শাগরেদ পরিভাষাদ্বয়ের ব্যবহার। কারণ মুরীদ তার যথা সর্বস্ব পীরের কাছে সমর্পণ করে যা ঠিক নয়। পক্ষান্তরে শাগরেদকে তা করতে হয় না।
(৪) এ আন্দোলনে যারাই যোগদান করবে তাদের মধ্যে উঁচু-নিচু, আশরাফ-আতরাফ, কোন ভেদাভেদ থাকবে না। বরং সকলের মধ্যে সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।
(৫) পীরপূজা ও করবপূজা ইসলাম বিগর্হিত বলে এসবের তীব্র প্রতিবাদ জানান। তৎকালে পীরের হাত হাতে রেখে 'বাই'আত' করার যে প্রথা প্রচলিত ছিল, তার পরিবর্তে ফরায়েযী আন্দোলনে যোগদানকারী শুধুমাত্র সকল পাপ কাজ থেকে খাঁটি দিলে তওবা করে পরিপূর্ণ ইসলামি জীবনযাপন করার শপথ গ্রহণ করবে।
(৬) ধাত্রী কর্তৃক নবপ্রসূত সন্তানের নাড়ি কর্তনকেও ইসলাম বিরোধী বলে ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, এ কাজ পিতার, বেগানা ধাত্রির নয়।[১৬]

জেমস টেইলার বলেন যে, কুরআনকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই ফরায়েযী আন্দোলনের উদ্দেশ্যে এবং কুরআন যেসব অনুষ্ঠানাদি সমর্থন করে না তা সবই বর্জনীয়। মুহররমের অনুষ্ঠান পালনই শুধু নিষিদ্ধ নয়, এ অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ দেখাও নিষিদ্ধ। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর মৃত্যুর পর আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য দুদু মিয়া সমগ্র পূর্ববাংলা কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক এলাকায় একজন করে খলিফা নিযুক্ত করেন যাদের কাজ ছিল আন্দোলনের দিকে মানুষকে আহ্বান করা, কর্মী সংগ্রহ করা ও সংগঠন পরিচালনার জন্য

১৫ Muin Uddin Ahmad Khan, *History of the Foraidi Movement- Muslim Struggle for Freedom in Bengal*, Ibid, p. 64

১৬ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত, *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*(ঢাকা : বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১), পৃ. ২৯৩

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ সংগ্রহ করা। এভাবে যে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি হলো তার মাথায় দুদু মিয়া, 'পীর' রূপে বিরাজমান হলেন যে পীর প্রথাকে তাঁর পিতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[১৭]

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর জীবদ্দশায় যে আন্দোলন পরিচালিত ছিল, তা ছিল মুখ্যত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। অত্যাচারী জমিদারদের প্ররোচনায় দু'একটি সংঘর্ষ ব্যতীত কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে, তাঁর আন্দোলনে সংঘর্ষ হয়নি। কিন্তু দুদু মিয়ার সময়ে আন্দোলন অনেকটা রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। সকল জমিদার ও নীলকরগণ তাঁর আন্দোলনের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়। তাই দুদু মিয়ার সারা জীবন তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই কেটে গেছে। একদিকে গরীব প্রজাদের উপর জমিদার-নীলকরদের নানা প্রকার উৎপীড়ন এবং তাদের দুঃখ মোচনে দুদু মিয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তাদেরকে দুদু মিয়ার নেতৃত্বে একতাবদ্ধ করে। দুদু মিয়ার সাংগঠনিক যোগ্যতাও ছিল অসাধারণ।[১৮]

বাংলার জমিদারগণ ছিল প্রায়ই হিন্দু এবং নীলকরগণ ছিল ইংরেজ খ্রিষ্টান ও তাদের গোমস্তা কর্মচারী ছিল সবই হিন্দু। এ কারণেও কৃষক প্রজাগণ জমিদার-নীলকরদের বিরুদ্ধে দুদু মিয়ার নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়েছিল। দুদু মিয়াকে সারা জীবন জমিদার-নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেই কেটে গেছে। নিত্য নতুন মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমায় তাকে জড়িত করা হয়। এসবের জন্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত দরিদ্রতা বরণ করতে হয়। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ছিলেন হানাফি ফিক্বাহ্র অনুসারী। তবে তিনি আরবের ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রভাবেও প্রভাবান্বিত হন। আর ওয়াহাবী আন্দোলন মুসলিমগণের অন্যান্য আন্দোলনের মতই স্বীকৃত। ফরায়েযী আন্দোলনের ফলে বাংলার পূর্ব অঞ্চলে সাধারণ মুসলিমগণ ইসলামের ফরয বিষয়গুলো পালনে উৎসাহ পায়। ফরায়েযীদের ফাত্ওয়া পথহারা মুসলিমগণের পথের দিশা দেয়, এটা ছিল বাংলার মুসলিমগণের তৃণমূলের আন্দোলন।[১৯]

ফরায়েযী বিপ্লবের প্রকৃতি, অংশ গ্রহণকারী বিপ্লবীদের সামাজিক অবস্থান ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য বাংলার ওয়াহাবী ও ফরায়েযী বিদ্রোহ ঘটেছিল পাশাপাশি সময়ে। এ ধরনের বিদ্রোহ বা আন্দোলন নব্য বৃটিশ ঔপনিবেশের বিরুদ্ধে গোটা ভারতবর্ষেই শুরু হয়েছিল। সমসাময়িক উপনিবেশ সরকারের আমলা ও সামন্তরা এ জনরোষকে কখন বিচ্ছিন্নতাবাদী, কখন ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে প্রচার করেছে। একই সঙ্গে ইংরেজ লেখকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাঙালি লেখক ও ঐতিহাসিকগণ কেউ কেউ এসব কৃষক-প্রজা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত রূপটি অনুধাবন করতে না পেরে উপনিবেশ শাসন উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনকে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন বলে গ্রন্থাদি রচনা করেছেন।

কিন্তু ড. এম. এ রহিম, ড. এ আর মল্লিক, ড. মুইন উদ্ দীন আহমদ খান যারা এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন তারাও ওয়াহাবী-ফরায়েযী আন্দোলনের বাহ্যিক প্রসঙ্গকে বৃহৎভাবে দেখে একে কেউ মুসলিম সংস্কার আন্দোলন, কেউ মুসলিম পুনর্জাগরণ বলে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু

---

১৭ Dr. A. R. Mallick, *British Policy & the Muslims of Bengal*, Ibid, p. 69

১৮ Board of Editors, *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Ibid, p. 50

১৯ এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*(ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৭), ২০১-২০৫

*Dhaka University Institutional Repository*

সরাসরি কৃষক-প্রজা আন্দোলন কিংবা উপনিবেশ শাসন উচ্ছেদকল্পে সরাসরি বিদ্রোহ বলে জোর দিয়ে বিচার করতে চায়নি। এম. এ রহিম তাঁর বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনাম মুসলিমগণের ধর্মসংস্কার আন্দোলন, মুঈন উদ-দীন আহমদ খান তাঁর History of the Foraidi Movement গ্রন্থের Chapter-II তে একে Islamic Revivalism বলে তিতুমীরও ফরায়েযীদের Islamic Reforms বলেই অধিক জোর দিয়েছেন।[২০]

A. R. Mallick তাঁর বিখ্যাত British Policy and the Muslims of Bengal নামক গ্রন্থে এদের বিদ্রোহকে ইসলামে প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কার আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করেছেন যে, এগুলিতে রাজনৈতিক কোন কর্মসূচি বা পরিকল্পনা ছিল না।[২১] বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ইতিহাসবিদ সিরাজুল ইসলামের সম্পাদনায় বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ডে বাংলা-ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থে ফরায়েযী ও ওয়াহাবী আন্দোলন বা বিদ্রোহের ইতিহাস স্থান পায়। এগুলিকে বৃটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন না দেখিয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অথচ রাজনৈতিক অধ্যায়ে প্রতিরোধ ও কৃষক বিদ্রোহ নামে রতন লাল চক্রবর্তীর একটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এখানে এ প্রতিরোধ আন্দোলনে তিতুমীরের কিংবা শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও দুদু মিয়ার বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস স্থান পায়নি। সমসাময়িক জমিদার সামন্তরা ঊনিশ শতকে গড়ে উঠা কৃষক আন্দোলন বা গণ অসন্তোষকে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হিসেবে প্রচার করেছে। এদের সঙ্গে প্রচারকের ভূমিকা পালন করেছেন ঊনিশ শতকের বাঙালি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ।

এ পর্যায়ে প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনায় এসেছে আঠারো শতকের শেষার্ধে এবং ঊনিশ শতকে গড়ে উঠা উপনিবেশ বিরোধী গণপ্রজা বিদ্রোহকে সমকালীন কলকাতার সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নবজন্ম অষ্টদশ শতকের শেষার্ধ থেকেই। ঔপনিবেশিক সরকারের রাজধানী কলকাতা থেকে সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত। স্বাভাবিকভাবেই এসব কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ইংরেজ ও তাদের সামন্ত ও জমিদার। এরাই কলকাতার নব্য বাবু। বাম ধারার লেখক স্বপন বসু এদের আকস্মিক উত্থান পর্বকে মনে রেখে 'হঠাৎ বাবু' নামকরণ করেছেন।[২২]

১৮৩১ সালে যখন তিতুমীরের নেতৃত্বে বারাসাতের বিদ্রোহ জ্বলে ওঠে, তখন ঈশ্বরগুপ্তের নেতৃত্বে কলকাতার বুদ্ধিজীবী একে 'হেঙ্গেমা' এবং রানীর প্রতি 'মহা অকৃতজ্ঞ' বলে প্রচার করেছেন। ঐ বছরই কলকাতা থেকে বিখ্যাত দৈনিক প্রভাকর প্রকাশিত হয়। এ সময় গড়ে উঠা নানা কৃষক-প্রজার বিদ্রোহ কলকাতার কবি বুদ্ধিজীবীর লেখায় স্থান পায়নি। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর বলেছিলেন 'ভগবান যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি স্বাধীনতা চাও, না ইংরেজ

---

২০ নরহরি কবিরাজ, *অসমাপ্ত বিপ্লব অপূর্ণ আকাঙ্খা*(কলকাতা : কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৭), পৃ. ২৮-২৯

২১ এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০১-২০৫; Dr, A. R. Mallick, *British Policy & the Muslims in Bengal*, Ibid, p. 69

২২ ড. এমরান জাহান, *ক্লিও জার্নাল*(ঢাকা : ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮), সংখ্যা ২৫, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

অধীনে থাকিতে চাও, আমি মুক্তকণ্ঠে ইংরেজের অধীনতাই বর বলে গ্রহণ করিব।' রাজা রামমোহন রায়ও ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন এ মর্মে যে, তিনি ইংরেজদের ভারতবর্ষে পাঠিয়েছেন। যাই হোক কোম্পানির সহায়তায় কলকাতার হঠাৎ বাবুরা ছিলেন এসব লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীর পৃষ্ঠপোষক। ফলে ১১৭৬ সালের মনন্তর যেখানে সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী বলা হল বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারায়। কিন্তু সমকালীন বাংলা সাহিত্যে এর কোন প্রভাব পড়েনি। এরা বাল্য বিবাহ, ব্রহ্ম আন্দোলন ইত্যাদি সমাজ সংস্কার নিয়ে যতটুকু ভাবত, ব্রিটিশ শাসন অবসানকল্পে সে সময়ে সংঘটিত সংগ্রামে ততখানি ভাবত না। এ সময়ের কৃষক বিদ্রোহ, সাওতাল বিদ্রোহ, ফকির সন্ন্যাসি বিদ্রোহকে সাহিত্যে ধরে রাখার মনোযোগ দেননি। তিতুমীরের কিংবা দুদু মিয়ার সংগ্রাম মুসলিম যুবক দ্বারা পরিচালিত ছিল। এরূপ চিন্তা চেতনা পোষণের পশ্চাতে মূল কারণ হলো শ্রেণি চরিত্র।[২৩]

গণআন্দোলন ও উনিশ শতকে বাঙালি সমাজ গ্রন্থে স্বপন বসু এদের সম্পর্কে বলেন, এ পর্বের অধিকাংশ সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা ইংরেজি শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত, পেশার দিক দিয়ে চাকুরিজীবী, জমিদারির আয়ে অথবা জমিদারের বদান্যতায় পালিত। রাজভক্ত এসব মানুষগুলোর ইংরেজ চরিত্রে ছিল গভীর আস্থা, অত্যাচারের প্রতিবিধান রাজাই করবেন এ ছিল তাদের মনোভাব, জমিদার প্রীতিতে এদের অধিকাংশ ছিলেন আকণ্ঠ নিমজ্জিত। জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হবার দরুণ জনগণের আশা-আকাঙ্খার সাথে তারা শরিক হতে পারেননি। ধর্ম ভাবনার দিক দিয়ে কেউ ছিলেন ষোলআনা হিন্দু, কেউ বা হিন্দু ব্রাহ্মণ। কাজেই আঠার-ঊনিশ শতকের দিকে কোম্পানি রাজ বিরোধী গণঅসন্তোষের প্রতি হিন্দু বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা কী ছিল তা অনুধাবনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনলে সহজবোধ্য হবে। আঠার শতকের শেষার্ধ এবং উনিশ শতকের মধ্যভাগের সকল কৃষক কিংবা কোম্পানি শাসক-বিরোধী সংগ্রামকে আলাদা করে বিশ্লেষণ করার সুযোগ নেই।

১৭৬৩ সালের ফকির সন্ন্যাসি বিদ্রোহ, ১৭৬৬ সালে মেদিনীপুরের বিদ্রোহ, ১৭৬৭ সালে সমসের গাজীর বিদ্রোহ, ১৭৭০ সালে সন্দ্বীপের বিদ্রোহ, ১৭৭৬ সালে চাকমা বিদ্রোহ, ১৭৮৩ সালে রংপুর বিদ্রোহ এবং ১৭৯৮ সালে চোঁয়াড় বিদ্রোহ। এরই ধারাবাহিকতায় ঊনিশ শতকের বারাসাতের তিতুমীরের কৃষক বিদ্রোহ এবং পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে হাজী শরী'অতুল্লাহ ও দুদু মিয়ার ফরায়েযী আন্দোলন একই সূত্রে গ্রন্থিত। এসব জমাটবদ্ধ ক্ষোভ-অসন্তোষের ফলাফল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ বা প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। প্রাথমিক উদ্দেশ্য ও চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবগুলো সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানি শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তিলাভ করা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা কেন্দ্রিক লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের রচনায় বৃটিশ রাজ ও জমিদার-বিরোধী আন্দোলনগুলো প্রতিফলিত হয়নি।[২৪] তা ছিল একেবারেই শ্রেণি স্বার্থের ব্যাপার। কিন্তু বিষয়টি যে গ্রামীণ সমাজ স্তরের গভীরে রেখাপাত করেছিল এবং অখ্যাত লেখক কবিদের প্রভাবিত করেছিল তার সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে বিশেষ করে তিতুমীরের

---

২৩ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*(কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৭৫), খ.৩, পৃ. ৩৯৮-৪০০

২৪ এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*(ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৪), পৃ. ২৯৪

Dhaka University Institutional Repository

বারাসাতের ও দুদু মিয়ার ফরিদপুরের বিদ্রোহের কিছু তথ্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যেসব লেখক এসব বিদ্রোহের বীরত্বগাঁথা লিখেছেন তাদের জন্য ব্যাপারটি কঠিন ছিল। কারণ শাসক ইংরেজ-বিরোধী বিদ্রোহীদের সংগ্রাম নিয়ে গ্রন্থ রচনাকারীকে সরকার স্থানীয় জমিদার কিংবা ইংরেজভুক্ত কলকাতার লেখকরা সন্দেহের নজরে দেখত। নারকেল বেড়ের জঙ্গ শীর্ষক নামবিহীন এক লেখকের একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। চারআনা মূল্যের ৩৮ পৃষ্টার ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি কলকাতা থেকে ১৮৩৩-১৮৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়টি ছিল বারাসাতের তিতুমীর ও তার সহযোদ্ধাদের বীরত্ব গাঁথা।[২৫]

প্রসিদ্ধ তিতুমীর শিরোনামে ‘বান্ধব’ পত্রিকায় (সম্পাদক কালী প্রসন্ন ঘোষ) একটি লেখা প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে লেখক তিতুমীর কেন বিদ্রোহী হলেন তা বর্ণনা করেন। লেখকের মতে জমিদারদের অত্যাচারেই তিতুমীরকে বিদ্রোহের পথে নামতে হয়েছে। লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘বান্ধব’ পত্রিকার বাংলা ১২৮৮ সনের নবম সংখ্যায়। তিতুমীর বিদ্রোহের পর ১৮৮৮ সালে তিতুমীর শীর্ষক ‘সখা’ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক ছিলেন, ভূবন মোহন রায় কিশোর। তিনি ডব্লিউ হান্টার রচিত 'The Indian Musalmans' গ্রন্থ পড়ে প্রবন্ধটি লিখেন। তখন লোকমুখে প্রচলিত ছিল তিতুমীরের কাহিনী। এমনই একটি প্রচলিত ছড়া সংগ্রহ করা হয়েছে, ছড়াটির কিছু অংশ নিম্নরূপ: [২৬]

নারিকেল বেড়ের তীতুমীর বুজরুগি করিল,
যতসব মিঞা মোল্লা
বানায়ে বাঁশের কেল্লা
ফিরিঙ্গী বাদসার সাথে লড়াই জুড়িল।

শহীদ নারকেল বেড়ে  নামক অপর একটি গ্রন্থ ১৮৮৫ খ্রি. প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির লেখক ইলালউদ্দিন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটিতে লেখক তিতুমীর ও তার শিষ্যদেরকে শহীদ বলে মর্যাদা দিয়েছেন। অথচ কখনও তিতুমীর তার শিষ্যরা সরকারের নিকট ও কলকাতার শক্তিশালী বুদ্ধিজীবী মহলে চরম ঘৃণার পাত্র বা বিদ্রোহি বলে সমালোচিত। এ সময় কলকাতার সকল পত্র-পত্রিকা তিতুমীরকে অত্যাচারী যুবক রূপে প্রচার করে আসছে। সমসাময়িক লেখক নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত ‘বিশ্বকোষে’ (৭ম খণ্ড) তিতুমীরের জীবনকর্ম স্থান পায়। কিন্তু এখানে তিতুমীর ও তার সংগ্রামকে ধর্মের দিক থেকে বিবেচনা করা হয়েছে। সমকালীন কৃষক-প্রজার বিদ্রোহ বলে মূল্যায়ন করার বিষয় অনুধাবন করতে পারেননি। সাজন নামে তিতুমীরের এক সহযোদ্ধা  তিতুমীরের গান  রচনা করে। লোক মুখে প্রচলিত গান খুবই জনপ্রিয় ছিল। সাজন বারাসাতের বিদ্রোহের সময় বন্দী হয়েছিল। কয়েক বছর জেল-জুলুম খেটে বের হয়ে এ গান রচনা করেন। ৪৫ বছর বয়সী সাজনের গান যুগ পরম্পরায় মৌখিকভাবে হস্তান্তর হয়। গানের একটি অংশ নিম্নরূপ :

---

২৫ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

Dhaka University Institutional Repository

নামায পড়ে দিবারাতি
কি তোমার করিল খেতি
কেন কল্লে দাড়ির জরিপানা
খেপেছে যতক দেড়ে
কেষ্টদেবের লক্ষী ছেড়ে
পুঁড়োয় কল্লে পীরির কারখানা।[২৭]

কাঁচা হাতের লেখায় গানের ভাষায় জমিদার কর্তৃক দাঁড়ির ওপর করারোপের বিবরণ। জমিদারদের অত্যাচার এবং এর বিরুদ্ধেই যে তাদের বিদ্রোহ তা গানে তুলে ধরা হয়েছে। তিতুমীরের হত্যাকাণ্ডের পর বিজয়ী ইংরেজ ও জমিদাররা তিতুমীরের সঙ্গে বিদ্রোহী কৃষক, জোলা, তাঁতিদের উপর অকথ্য নির্যাতনের খবর সমসাময়িক গানে প্রতিফলিত হয়। এ সময় দাঁড়িওয়ালা লোক পেলেই গ্রেফতার করা হতো। তাই অনেকেই গ্রেফতার-নির্যাতন এড়াবার জন্য দাঁড়ি ফেলতে শুরু করে। এ সময় নাপিতরা দাঁড়ি কাটার মজুরি সেকালে ১ টাকা ধার্য করে। এ নিয়ে একটি গান :

জোলানী উঠিয়া বলে উঠরে জোলা ঝাট।
হাজাম বাড়ী গিয়া শীঘ্র গোঁপ দাঁড়ি কাট ॥
তিতুমীরের গল ধরি নসরদ্দি কর।
তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকিলাম একি দায়।
এসেছে রাঙ্গা গোরা উর্দিপরা জাতের টোপ মাথায় ॥
এরা মারছে গুলি, ভাঙছে খুলি, হজরৎ গুলি মানলে না।
মারলে ইংরেজের মামু।
এবার আর জানে রাখলে না।

অপর একটি গান :

উত্তরে এক গ্রাম ছিল, নামে নারিকেল বেড়ে
তাতে হাজার দুই নেড়ে
ওরে বুড়ো, ওরে বুড়ি, আজকে গাঁয়ের হাট
কেস্তে দিয়ে দাঁড়ি কাট।[২৮]

এসব গান ও পুঁথিতে গ্রাম্য কবি-লেখকরা কৃষক-প্রজা বিদ্রোহের মহানায়ক তিতুমীরের বীরত্ব গাঁথা গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেন। বিপরীতে সেকালের শক্তিশালী লেখক বুদ্ধিজীবীরা তিতুমীরের চরিত্র হনন করে এদের চোখে মহাত্মা ইংরেজ সরকারের পোষ্য সেজেছে। এদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ না থাকায় একটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হল। এতে অনুধাবন করা যাবে সেকালের ইংরেজ ও জমিদার-বিরোধী স্বাধীনতাকামী ওয়াহাবী ও ফরায়েযীদের প্রতি এদের কিরূপ বিদ্বেষ ছিল। এতে আরও ধরা পড়বে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে এদের মনোভাব কী ছিল? বিহারী লাল সরকার ছিলেন সেকালের বিখ্যাত লেখক-

২৭ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪
২৮ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

*Dhaka University Institutional Repository*

সাংবাদিক। তিনি 'বঙ্গবাসী' সাময়িকীর সহ-সম্পাদক। তিনি ১৩০৪ বাংলা সালে 'তিতুমীর' শিরোনামে তিতুমীরকে উদ্দেশ্য করে একটি গ্রন্থ লিখেন। এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ রাজার গুণকীর্তন করা আর তিতুমীরের সংগ্রামকে মানুষের কাছে সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস ঘাতক বলে প্রচার করা, যাতে তিতুমীরের আদর্শের প্রতি পাঠকের ঘৃণার সঞ্চার হয়। কেন গ্রন্থটি প্রকাশ করলেন সে সম্পর্কে তিনি লিখেন,

> 'তিতু বড়ই দুর্বুদ্ধি তাই তিতু বুঝিল না, ইংরেজ কত ক্ষমাশীল কত করুণাময় এবং এমন পরম করুণাময় ইংরেজ রাজত্বে পরম সুখে বাস করে কোটি কোটি প্রজার মধ্যে কাহারও হয়তো কখন কুকল্পনার আবেশ হইতে পারে। ... তাদের চৈতন্য উদ্রিক্ত করিবার জন্য আর ভবিষ্যতে কুলাঙ্গারদিগকে সতর্ক করিবার জন্য তিতুর জীবনী প্রকাশিত হইল।'[২৯]

বিহারী লাল কিছু বিকৃত তথ্য সংগ্রহ করেন। The Calcutta প্রকাশিত জেমস ও কেনলির The Yahhabis in India শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে। আলোচ্য প্রবন্ধের প্রসঙ্গ ফরায়েযী আন্দোলন হলেও এখানে ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা কৃষক তিতুমীরের সংগ্রামের সম্বন্ধে সেকালের লেখক-সাহিত্য কাব্যে মনোভাব চিত্রটি অপরদিকে সাধারণ মফস্বল লেখকদের চিন্তা, ধারাটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো এ জন্য যে, একই সময়ে সংঘটিত বাংলায় দু'টি সংগ্রামের উদ্দেশ্যই ছিল ধর্মীয় আবরণে কৃষক-প্রজাদের সংগঠিত করা এবং বৃটিশ শাসন অবসান করে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা। উভয় সংগ্রামেরই শক্তির উৎস ছিল শোষিত কৃষক ও বেকার তাঁতি, আর বিরোধী পক্ষ ছিল স্থানীয় জমিদার ও নীলকর। এরা স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব পালন করত। কাজেই তিতুমীরের ন্যায় ফরায়েযীদের নিয়েও সমকালীন কবি-সাহিত্যিকরা নীরব থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও দুদু মিয়ার কৃষক আন্দোলনে বিত্তবান মুসলিমগণ আগ্রহ প্রদর্শন করেনি আর হিন্দু জমিদার এবং লেখক-বুদ্ধিজীবীরা সীমাহীন ঘৃণা ও বিরাগ মনোভাবের পরিচয় দেন। তবে ১৮৫৭ সালে মহা বিদ্রোহের সময়ে দুদু মিয়াকে আটক করা হলে কলকাতার পত্রপত্রিকা ও বুদ্ধিজীবীরা নিরাপদ ও স্বস্তি প্রকাশ করে। বিখ্যাত সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর হিন্দু পেট্রিয়েট, সংবাদপত্রে এরূপ স্বস্তিবোধ করে সংবাদ প্রকাশ করেন। তবে মফস্বলে প্রচুর লোক-গাঁথা পুঁথি সাহিত্যে ফরায়েযীদের বিবরণ রয়েছে। ফরিদপুর ও মুন্সিগঞ্জে এরূপ অনেক পুঁথি রয়েছে। সেখানে অনেক ফরায়েযী গ্রাম ও বংশ রয়েছে। ধর্মীয় দিক দিয়ে বিশাল কর্মী বাহিনী বিশ্বাস করত যে, ফরায়েযী আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশ শাসন উচ্ছেদ করে বাংলায় মুসলিম শাসন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।[৩০]

ফরিদপুরের নীলকর ডানলপের সঙ্গে এক সংঘর্ষে মিথ্যা মামলায় দুদু মিয়া গ্রেফতার হন। ফরিদপুরের সেশন জজ তাঁর জামিন নাকচ করেন। কিন্তু নিজামত আদালতে তিনি এবং তার কৃষক অনুসারীরা মুক্তি পান। এ বিজয় নিয়ে গ্রামে দুদু মিয়ার নামে গান বাঁধে-

---

২৯ প্রাগুক্ত।

৩০ Pran Nath Chopra, *Indian Muslims in Freedom Struggle*(New Delhi : Light & Life Publishers, 1979), p. 3

Dhaka University Institutional Repository

দুদু মিঞা নিয়া তাগো দিল বস্ত্রদান।
তোমরা চল্যা ঘরে ঘাত, কবিলা নাও, কইত মুখের বাণী।
এই মত জানরে ভাই ওস্তাদের নিশানা।
ওস্তাদ দুদু মিঞা। দুদু মিঞা তাম দিয়া রাজ্য ভালা করে।
ছোট লোকের হাতে লাঠি-ফাল ফারিয়া ফিরে।
তাতে কমলা ছোছা পোক্কা মোছা ছদরী বাড়ি যায়।
লাল মনিয়ার পুকুরেতে হামেশা ঘুরায় ॥
তাতে কব মষে মত কত ঘর পাড়া
দুদু মিঞা শিমুলিয়ার গাঁও কইরা দিল ছাড়া।[৩১]

গানের কথা আঞ্চলিক ও দুর্বোধ্য। তবে দুদু মিঞাকে কেন্দ্র করে গ্রামে-গঞ্জে গান রচিত হয়েছিল। এছাড়া সমসাময়িক বাঙালি কবি নবীন চন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) তার আত্মজীবনী আমার জীবন (১৩১৪-১৩২০) গ্রন্থে ফরায়েযীদের বিবরণ আছে। তিনি দুদু মিয়ার পুত্র আব্দুল গাফফার নয়া মিয়ার (১৮৫২-১৮৮৪) সহায়তা পেয়েছিলেন, যখন তিনি মাদারিপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পূর্ববঙ্গের কবি নবীন চন্দ্র সেন ফরায়েযীদের একটি চিত্র পাঠকের কাছে তুলে ধরেন। কাজেই কথিত বাঙালির নবজাগরণ এবং বাংলা সাহিত্যের জাগরণকালে সাহিত্য কর্মে সমকালীন কৃষক-সংগ্রাম কোনো মর্যাদা পায়নি। এক্ষেত্রে দীন বন্ধু মিত্র (নীলদর্পণ) এবং মীর মোশাররফ হোসেন (জমিদার দর্পণ) ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করেন।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও দুদু মিয়ার ফরায়েযী আন্দোলনে প্রায় ৮০ হাজার সক্রিয় কর্মী ছিল। সরকারি নথিপত্রেই এর প্রমাণ দেয়া আছে। ১৮৪০-১৮৫০ সালের দিকে পূর্ববাংলার মোট জনসংখ্যার দিকটি বিবেচনায় আনলে ৮০ হাজার (শুধু মুসলিম) সংখ্যাটি অনেক বেশি।[৩২] এখন প্রশ্ন জাগে এসব ফরায়েযীরা জনসংখ্যার কোন্ স্তরের মানুষ। কোনো তথ্য-উপাত্ত ছাড়াই বলা যায় এরা নিপীড়িত, শতভাগই কৃষক-শ্রমিক। অর্থাৎ সমাজের নিম্নস্তরের প্রান্তিকজন। আর পূর্ববাংলার (বাংলাদেশের) কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলিমগণই যে সংখ্যাগরিষ্ঠ তা ইতিহাস স্বীকৃত। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও দুদু মিয়া ঘোষণা করলেন যারা জমি চাষ করে তারা জমির মালিক। জমি আল্লাহর দান। তিনি মানুষকে তা ভোগ করার অধিকার দিয়েছেন। এ কারণে জমিদারদের কৃষক শোষণের কোন অধিকার নেই। নিপীড়িত বেকার কৃষক ও শ্রমিকদের কাছে একদিকে উপরোক্ত সাম্যের বাণী অপরদিকে অত্যাচারী জমিদার নীলকরদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা, এরূপ অর্থনৈতিক টানেই ফরায়েযী দলে স্থানীয় লোকজন অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। কৃষক নিপীড়িত ছিল বলে তারা ফরায়েযীদের দলে যোগ দেয়। কিন্তু কিরূপ অবস্থায় এবং কেন দিন দিন নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল এর একটি চিত্র আংশিকভাবে উপস্থাপন করা দরকার। পাশাপাশি এও বলা দরকার যে, ১৭৬৫ সালের দেওয়ানি লাভ এবং ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কৃষক ও শ্রমিকের অবস্থা চরম আকার ধারণ করে। ১৮৪৬ সালে ফরায়েযী আন্দোলনের আগ পর্যন্ত কোম্পানি শাসন-

৩১ Ibid.
৩২ Board of Editors, *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* Ibid, p. 50

*Dhaka University Institutional Repository*

বিরোধী যত সংগ্রাম হয়েছে সবগুলোই অঞ্চল ভেদে কৃষকের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে। গোটা বাংলা জুড়েই কৃষক বিদ্রোহে কোম্পানি সরকার অস্থির ছিল।

কাজেই ফরায়েযী আন্দোলনে কৃষকের সম্পৃক্ততা কোন আকস্মিক বা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। বরং ১৭৬৩ সালের ফকির সন্ন্যাসি থেকে ১৮৪৬ সালের ফরায়েযী আন্দোলন পর্যন্ত ছোট বড় প্রায় ২৩টি কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সুপ্রকাশ রায় তাঁর গবেষণা গ্রন্থে সবগুলো বিদ্রোহ ও আন্দোলনকে কৃষক সংগ্রাম বলে প্রমাণ দেখিয়েছেন। যদিও এ বিদ্রোহগুলো বিভিন্ন নাম ধরে পরিচালিত হয়েছে। কাজেই ফরায়েযী আন্দোলনকে কেন পূর্ববঙ্গের কৃষক বিদ্রোহ বলতে হবে, কেন এতে কৃষক যুক্ত হলো তার অন্তর্নিহিত চরিত্র ও প্রকৃতি বুঝতে হবে। তার জন্য ১৭৬৫ সালের দেওয়ানি লাভের পর থেকেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের রূপটি আলোচনা করা দরকার। এ ব্যাপারে বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব থেকে বেশ কিছু গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। কোম্পানি শাসনপূর্ব মোগল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় মধ্যস্বত আবভোগী কোনো শ্রেণি গড়ে ওঠেনি। মোগল ভূমি ব্যবস্থায় বংশানুক্রমিক জমিদারি সত্ত্বেরও সুযোগ ছিল না। একইভাবে দখলি স্বত্বের ভিত্তিতে মোগল আমলে কোনো অভিজাত শ্রেণিও স্থায়ী হয়ে উঠেনি। ১৭৬৫ সালে নবাব মীর কাসিমের পরাজয়ের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে।

দিল্লির মোগল সম্রাট থেকে রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করলেও মোগল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কোম্পানি ছিল একটি বিদেশী বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং তারা যখন ইউরোপ থেকে আসে ততক্ষণে শিল্প বিল্পব ও পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে। কাজেই তারা জানে কিভাবে পুঁজি সংগ্রহ ও বিনিয়োগ করতে হয়। মুনাফা অর্জন ও লুন্ঠনই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সীমাহীন লুটতরাজ ও মুনাফা লাভের জন্য দেশীয় একটি মুৎসুদ্দী দলকে সঙ্গে নেয়। ১৭৬৫ থেকে ১৭৭৬ সাল মাত্র ১১ বছরের লাগামহীন শোষণে বাংলায় দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। যাকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয় (বাংলা ১৭৭৬)। শাসকরা একে প্রাকৃতিক কারণে দেখালেও মূলত এ মহা দুর্ভিক্ষ ছিল মানব সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। এ মহা বিপর্যয়ের পূর্বে বাংলাদেশের রাজস্ব আদায় হত ১,৫২,০৪,৮৫৬ টাকা (১৭৬৮ খৃ.), আর ১৭৭০-১৭৭১ খৃস্টাব্দে বাংলায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হলেও মোট রাজস্ব আদায় করা হয় ১,৫৭,২৬,৫৭৬ টাকা। এতে অনুধাবন করা যায় অর্ধমৃত মানুষের কাছ থেকে কোনো প্রক্রিয়ায় রাজস্ব আদায় করা হয়েছিল।[৩৩] তারপর আসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যুগ। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে (Permanent Settlement) জমিদারকে জমির মালিকানা প্রদান করে। পূর্বে সরকারের এজেন্ট হিসেবে কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতো। এবার কৃষকের প্রভূ হয়ে অধীনস্ত কৃষকের নিকট থেকে কর বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করলো। এতে স্থির হলো আদায়কৃত রাজস্বের নয়-দশমাংশ রাজস্ব কোম্পানি সরকারকে প্রদান করবে। এ হিসাব মতে একটা নির্দিষ্ট অংক জমিদার সরকারকে দিতে হবে। বছরের নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করলে বংশানুক্রমে জমিদার জমির মালিক হয়ে যাবে অর্থাৎ সে বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী। এ ব্যবস্থায় জমি লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল। পূর্ব থেকেই যে সকল বর্ণ-হিন্দু কোম্পানির সঙ্গে যোগসাজশে কেরানী ও মৃৎসুদ্দী করে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ

৩৩ বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক*(ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯২), পৃ. ২০-২১

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল-তারাই নগদ টাকা বিনিয়োগ করে নতুন জমিদারী লাভ করে। তাদের অধিকাংশের বসবাস ছিল কোম্পানি গড়া রাজধানী কলকাতায়। এরাই কলকাতার নববাবু বলে পরিচিত। এদের দ্রুত উত্থানে অনেকেই এদেরকে 'হঠাৎ বাবু' বলতেই ইচ্ছুক। কলকাতায় বসবাস করে হঠাৎ বাবুরা তাদের জমিদারি আবার অন্যকে ইজারা দিতো। এভাবে জমিদারদের পরবর্তী স্তরে পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, সে পত্তনিদার, গাঁতিদার ইত্যাদি ছোট ছোট জমিদারের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ পিরামিডের ন্যায় বাংলার কৃষক সমাজের মাথার ওপর অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব বজায় থাকে। এর ফলে প্রতিটি জেলায় অসংখ্য পেটি-জমিদারি সৃষ্টি হয়। তাদের সমবেত শোষণ ও শাসনের একমাত্র বস্তু হলো বাংলার হীন-দরিদ্র কৃষক। এ নির্যাতিত কৃষকই বৃটিশ উচ্ছেদকল্পে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৮৫৪ সালে শুধু যশোর জেলায় ৪,৫৪৭টি জমিদারি ছিল।[৩৪]

ফরায়েযী বিপ্লবের সময় কালে তখন বাংলাদেশে বড় বড় জমিদার ছিলেন সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের। সরকারও এমনটি চেয়েছিনে। লর্ড কর্ণওয়ালিস জমিদারদের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে বলেন, আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এদেশে ভূস্বামীগণকে আমাদের সহযোগী করে নিতে হবে। অন্যদিকে কৃষক-বিদ্রোহ মোকাবিলায় জমিদারকে কি করণীয় তাও সরকার ঠিক করে রাখেন। এ সম্পর্কে লর্ড বেন্টিংকের ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ঘোষণাটি ছিল এরূপ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বিপুল সংখ্যক ভূস্বামীর সৃষ্টি হয়েছে, যারা কোম্পানির শাসনকে হেফাজত করতে বিশেষ আগ্রহশীল। এসব জমিদাররা কর বৃদ্ধির পাশাপাশি কর আদায়েও কঠোর শারীরিক নির্যাতন করত।[৩৫]

১৮৫০ সালের অক্ষয় কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি তালিকায় ১৮ প্রকারের নির্যাতনের ইতিহাস পাওয়া যায়। শুধু ফরায়েযী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ফরিদপুরে জমিদারগণ নির্ধারিত খাজনা বাদে ২৩ রকমের 'সোস' আদায় করতো। বিভিন্ন পূজা-পার্বণের নামে এরূপ চাঁদা জোরপূর্বক আদায় করা হত। সমসাময়িককালে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত কৃষকবন্ধু কাঙাল হরিণাথ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' কৃষক নির্যাতনে সোচ্চার ছিল। গ্রামবার্তার একটি সম্পাদকীয় থেকে ধারণা করা যায় কৃষক উৎপীড়নের নমুনা। পত্রিকাটি লিখে, সর্দার দিয়া প্রজা ধরে আনা হয়, জুতা লাঠি প্রহার করা হয়, জরিমানা করা হয়, পিতৃ-মাতৃ উচ্চারণ বর্ণ করে গালি দেয়া, কখনও কখনও প্রজার মা-বোন, স্ত্রী প্রভৃতিকে কাছারিতে ধরে আনতে আদেশ করা হয়, এদিকে চাঁদা প্রভৃতি আবওয়াব আদায় করতেও ত্রুটি করে নাই। আমিনগণ বিশেষ প্রণামি পেলে বিশ কাঠার বিঘা নতুবা পনের কাঠার বিঘা গণনা করেন। কোনো প্রজার এতবড় মাথা এর প্রতিবাদ করবে। বস্তুত: এক একটি জমিদারি নায়েবাদির আত্মীয় প্রতিপালনের বেগুন ক্ষেত।[৩৬]

এতে সরকারের নিকট অভিযোগ করে কোনো লাভ হতো না। কারণ ইতিপূর্বে দেখেছি জমিদারকে কোম্পানি-সরকারের এজেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। নিজের এলাকায়

---

৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৩৬ কাঙাল হরিণাথ মজুমদার সম্পাদিত *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা*(কুষ্টিয়া : জুন ১৮৭২), সম্পাদকীয় পাতা; ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

*Dhaka University Institutional Repository*

জমিদারই ছিল জজ-ম্যাজিস্ট্রেট। অনেক ক্ষেত্রে জমিদাররা বে-আইনীভাবেই জমিদারিতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার আদালত বসাত। প্রজাদের শাস্তি ও আটক করা হতো। নড়াইলের রায় ও রানাঘাটের পাল চৌধুরীদের গারত ঘরের কুখ্যাতি ইতিহাস আলোচিত। তিতুমীরের বিদ্রোহ-এলাকা বারাসাতে এক কৃষক জমিদার নিজস্ব আদালতে শাস্তি ও অর্থদণ্ড দেন। বারাসাত বিদ্রোহের সরকারি তদন্ত কমিশনের প্রধান ছিলেন জে আর কলভিন। তিনি তদন্ত রিপোর্টে জমিদার আর প্রজার মধ্যে বিরোধই মুসলিম কৃষকের বিদ্রোহের মূল কারণ উল্লেখ করে দেখান যে, গ্রামের মধ্যে জমিদার সরকারের ভরসাস্থল, তার পুলিশি দায়িত্ব রয়েছে, দারোগা জমিদারের আজ্ঞাবহ।

তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখেন যে, জমিদারের সীমাহীন ক্ষতমাই তাদের সীমাহীন অত্যাচারী হিসেবে পরিণত করে। ফলে উৎপীড়ন ও বেআইনি কর রায়তদের জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুযোগ এনে দেয়। এরূপ শোষণ ও শাসনের মাত্রায় কৃষক জনসাধারণকে নিয়ে যখন কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছে তখনই তাদের জমাটবদ্ধ ক্ষোভ গণবিপ্লবে রূপ নিয়েছে। এরূপ ক্ষোভ এবং বিপ্লব উনিশ শতকে বারবার দেখা দিয়েছে। এরমধ্যে তিতুমীরের নেতৃত্বে বারাসাতের বিদ্রোহ ফরিদপুরে দুদু মিয়ার ফরায়েযী বিদ্রোহ এবং পাবনা ও রংপুরের কৃষক-প্রজা বিদ্রোহ।[৩৭] আক্রমণ শুধু জমিদার ও মধ্যসত্বভোগীর পক্ষ থেকেই আসতো না, সঙ্গে ছিল মহাজন ও নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচার। এদের অত্যাচারের চিত্র আলোচনা প্রাসঙ্গিক। অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে চড়া সুদে ঋণ দেয়ার জন্য ওৎ পেতে থাকত একদল মহাজন। গ্রাম্য এ মহাজন শ্রেণির নিকট থেকে সুদ নিয়ে বছরান্তে দেখা গেল মহাজন হয়েছে জমির মালিক, আর কৃষক হয়েছে বর্গাচাষী। নিপীড়িত-অভাবে জর্জড়িত কৃষক-সমাজকে কি পরিমাণ চড়াসুদে টাকা দিতো তা নিয়ে সংখ্যাটিতে বোঝা যায়। ঢাকা ও ফরিদপুরের মহাজনরা ৭৫% হারে টাকা খাটাত। বীরভূমে ও ২৪ পরগণা এলাকায় ৫০% হারে বন্ধকী জমির ওপর সুদ নিত। এখানে জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেভাবে কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করতে পারত- সেভাবে গ্রাম্য মহাজনের বিরুদ্ধে সম্ভব ছিল না। কারণ কৃষকের শেষ ভরসাস্থল ছিল গ্রাম্য মহাজন। তাদের কাজকর্ম ছিল নিরবে শব্দ বিহীন। এ বিষয়ে A.C. Das লিখেন,

'It is a notorious fact that, almost all the ryots are entirely in the hands of the Money-lenders.'[৩৮]

সমসাময়িক সাঁওতাল বিদ্রোহের একটি কারণ ছিল মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচার। কৃষকের উপর আরেকটি বর্ম ছিল নীলকর অত্যাচার। এ সম্পর্কিত বহু গবেষণা ও পুস্তকাদি হালে প্রকাশিত হয়েছে। সরকার জমিদার মহাজনের সঙ্গে এবার যুক্ত হয় নীলকরের শোষণ। কোম্পানি-শাসনের শুরুতেই লুই বন্নো নামক এক ফরাসি চন্দন নগরে (হুগলি) নীল চাষের ব্যবসা প্রথম শুরু করেন। তাদের হাত ধরে ক্যারল রুম নামে এক ব্যক্তি ১৭৭৮ সালে বাংলাদেশে প্রথম নীলকুঠির স্থাপন করে নীল চাষের সূত্রপাত ঘটায়। ইউরোপ নীলের চাহিদা ব্যাপক থাকায় কোম্পানি-সরকারও এ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। জমিদাররা নীলকরকে বড়

৩৭ নরহরি কবিরাজ, *অসমাপ্ত বিপ্লব অপূর্ণ আকাঙ্খা*(কলকাতা : কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৭), পৃ. ২৮-২৯

৩৮ Abhay Charan Das, *The Indian Ryot*(Howrah : A C Dutt, 1881), p. 316

*Dhaka University Institutional Repository*

অংকের বিনিময়ে জমি ইজারা দিত। এদের মধ্যে রানাঘাটের জয়চাঁদ পাল চৌধুরীসহ কবি রবীন্দ্রনাথের জমিদার পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (যিনি কলকাতার হঠাৎ বাবুর একজন এবং লন্ডনে প্রিন্সের মত জীবন যাপন করত) আধুনিক বাঙালি নবজাগরণের উদ্ভাবক রাজা রামমোহন রায়, প্রসন্ন কুমার অন্যতম। কৃষক প্রজা সংগ্রাম প্রতিরোধে জমিদার-নীলকররা তাদের কায়েমী স্বার্থের কারণেই একত্রিত হয়ে যেত, যা তিতুমীর এবং ঢাকা ও ফরিদপুরের ফরায়েযী সংগ্রামের সময়ে দেখতে পাওয়া যায়।[৩৯]

ফরিদপুরের স্থানীয় জমিদার গোপী মোহন দত্ত পাঁচ্চর কুঠির অত্যাচারী নীলকর ডানলপের সঙ্গে ৭শ'-৮শ' লাঠিয়াল নিয়ে ফরায়েযী নেতা দুদু মিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল।[৪০] এছাড়া ১৭৭৮-১৮০০ খ্রি. পর্যন্ত নীল ও নীলচাষীর সংগ্রামের গতি প্রকৃতি বা চরিত্রটি বস্তুনিষ্ঠভাবে উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন। নীলকরদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্য ঢাকার নাজিমুদ্দিন নামে একজন ভূক্তভোগী ১৮২৩ সালে ঢাকার জজ সাহেবের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন। নীলকরদের অত্যাচার আর কৃষকের দুর্দশার চিত্র বর্ণিত হয়েছে সমসামিয়িক কৃষক দরদী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে। নীলচাষ ছিল কৃষকের জন্য অলাভজনক। ফলে কৃষক নীলচাষে মোটেই আগ্রহী ছিল না। নীলচাষী কৃষকের উপর নানারূপ অত্যাচার হত। এগুলির মধ্যে ছিল চাষীদের জোরপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করা, নীল জমিতে অন্যান্য ধান-পাট চাষাবাদ না করা, নীলকর চাষে আড়াই বিঘাকে এক বিঘা ধরে হিসাব করা, ২ বান্ডিল নীলকে ১ বান্ডিল ধরে গণনা করা, অন্যান্য ফসল কেটে নেয়া, মিথ্যা মামলায় রায়তকে সর্বস্বান্ত করা, নীলচাষে বাধ্য না হলে মাথায় কাদা লেপে সেখানে নীলের বীজ বুনে দেয়া, যখন তখন নীলকুঠিতে নিয়ে আটক রাখা।[৪১]

এসব নীলকর নব্য জমিদার মহাজনের অত্যাচারে বহিঃপ্রকাশই তিতুমীর, হাজী শরী'অতুল্লাহ, দুদু মিয়া, মজনুশাহের বিদ্রোহ। তারা আদালতে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে যখন সংগ্রামের ডাক দেন তখনই নিপীড়িত কৃষক চাষী একজোট হয়ে তাদের সঙ্গে সংগ্রামে মিলিত হয়। প্রসঙ্গত ডানলপের সঙ্গে দুদুর ঘটনাটি আসে। ফরিদপুরের নীলকর ডানলপের পাঁচ্চরে নীলকুঠি ছিল, কিন্তু বসবাস করতেন কাশিমপুর কুঠিরে। পাঁচ্চরে তার কুঠির পরিচালনা করতেন কালীপ্রসাদ কঞ্জিলাল। তার অত্যাচারে কৃষকরা ফরায়েযী দলে যোগ দেয়। ফলে ডানলপের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হয় দুদু মিয়ার। ডানলপ লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে দুদু মিয়ার বাহাদুরপুরের বাড়ি লুণ্ঠন করে। ১২ লক্ষ টাকার সম্পদ লুণ্ঠনসহ ৪ জন কর্মচারীকে হত্যা করা হয়। উপরন্তু দুদু মিয়ার নামে আদালতে মামলা করা হয়। ফরায়েযীরা ডানলপের নীলকুঠি আক্রমণ করে তা ধবংশ করে দেন এবং অত্যাচারী গোমস্তা কালিপ্রসাদ আক্রমণে নিহত হন। ডানলপের পূর্বের

---

৩৯ Muin Uddin Ahmed Khan, *History of the Faraidi Movement in Bengal*(Karachi : Pakistan Historical Society, 1965), p. 114

৪০ Session Judge, *Trial of Dudu Miyan*(Translation of the proceedings held in two cases Tried in 1847 before the Session Judge of Dacca in which Doodoo Meea and his followers belonging to the sect of Hadjees or Frazees were charged with Wounding, Plunder, Arsan etc.)(Calcutta : 1848, 1920), p. 47-48

৪১ Charles Edward Buckland, *Bengal under the Lieutenant Governors*(West Bengal : S. K. Lahiri & Company, 1901), vol. i, pp. 238-242

*Dhaka University Institutional Repository*

আক্রমণের প্রতিকার চেয়েছিলেন দুদু মিয়া আদালতে। কিন্তু কোন প্রতিকার পাননি। এবার ফরায়েযী কৃষকদের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে ইংরেজ আদালত সমন জারি করে দুদু মিয়াকে গ্রেফতার করে এবং একই সঙ্গে তাঁর ৬৩ জন অনুসারীর বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। এতে তৎকালীন নব্য বাবুরা আদালতকে ধন্যবাদ জানায়। যদিও দোষ প্রমাণিত না হওয়ায় ফরিদপুরের উচ্চ আদালত দুদু মিয়াকে মুক্তি দেন। উপরোক্ত ঘটনায় তৎকালীন সরকার, জমিদার, নীলকর, গোমস্তাদের সঙ্গে কৃষক ও কৃষক-প্রজা আন্দোলন সম্পর্কটি কেমন ছিল তা বেরিয়ে আসে।[৪২]

বাংলাদেশে যখন নব্য উপনিবেশ বিরোধী কৃষক বিদ্রোহ স্থানীয় বিদ্রোহী নেতাদের নেতৃত্বে দানা বেঁধে উঠে একই সময়ে ইউরোপে ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯ খ্রি.) সংঘটিত হয়। এ বিপ্লব প্রথমে কৃষক-শ্রমিকের নেতৃত্বে গড়ে উঠেনি। বিপ্লব শুরু করে প্রথম ভার্সাই ও প্যারিসের বুর্জোয়া লেখক, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী  শ্রেণি। এদের হাত থেকে বিপ্লব ছড়িয়ে পরে প্যারিসের শ্রমিকের হাতে, সেখান থেকে বিপ্লবের বিস্তার ঘটে নিপীড়িত কৃষক সমাজের মধ্যে, যাদের সঙ্গে শ্রমিক সম্প্রদায়ের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। বিপ্লবে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হলো, রাজা-রাণীর মৃত্যুদণ্ড হল, ফরাসি নাগরিক অধিকার ঘোষিত হল। সেখান থেকে ইউরোপে জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত। কিন্তু এ সময় বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের চিত্র তার উল্টো। বাংলাদেশে নবাব সিরাজ উদ্-দ্দৌলা এবং মীর কাসিমের প্রতিরোধ ব্যর্থ হলে ফ্রান্সের প্রতিবেশী বৃটিশরা এখানে উপনিবেশ সৃষ্টি করে। এখানকার বর্ণ, হিন্দু, সামন্ত, জমিদার ও ব্যবসায়ী দল কোম্পানি শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসে। আর উভয়ের যৌথ অত্যাচার, নিপীড়নের শিকার কৃষক, তাঁতি বিপ্লব প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে নিজেদের স্বাধীন সরকার ঘোষণা করে।[৪৩]

তৎকালীন কোম্পানি রাজধানীতে বসবাসকারী বুদ্ধিজীবী, লেখক, বুর্জোয়া গোষ্ঠি উপনিবেশ বিরোধী বিপ্লব শুরু করেনি বরং নিচু স্তরের কৃষকরা শুরু করেছিল। কিন্তু কলকাতার বুর্জোয়া শ্রেণী এগিয়ে এলো না। তারা নেতৃত্বে এগিয়ে এলে গোড়াতেই উপনিবেশ সরকারের উচ্ছেদ হয়ে যায়। এ কথা বলার উদ্দেশ্য বিপ্লবের নেতৃত্ব শুরু হয় সমাজ বা রাষ্ট্রের উপরি স্তর থেকে আর অংশগ্রহণকারী জনতা হলো কৃষক-শ্রমিক সম্প্রদায়। স্থানীয়ভাবে কেউ কেউ তিতুমীর, দুদু মিয়া, ফকির মজনু শাহ, সাঁওতাল নেতা সিধু'র নেতৃত্বে স্থানীয় কৃষক-প্রজারা একত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের মত এখানকার বুর্জোয়া শ্রেণি এগিয়ে না আসায় তা সফল হয়নি। ধর্মের বা সাম্প্রদায়িক দিক থেকেও এখানে বিভক্তি করণ হয়ে যায়। কারণ বাংলায় তথা ভারতবর্ষে আন্দোলন-বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল বঞ্চিত ও ক্ষমতা হারানো মুসলিমগণের পক্ষ থেকে। আর বর্ণ-হিন্দুরা ছিল পলাশির পর থেকে কোম্পানি শাসনের দেশীয় রক্ষক। কলকাতায় ইউরোপীয় ধাঁচে এদের ব্যাপক জাগরণ ঘটেছিল। সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও লেখকগণ আঠার শতকে উদ্ভূত এসব বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের চরিত্র ও প্রকৃতি অনুধাবনে সক্ষম হননি, নয়ত মানসিকতার অভাবহেতু বিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চরিত্রটি বুঝতে

৪২ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত, *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

৪৩ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পারেননি। তখন ছিল বাংলাসহ ভারতবর্ষে সামন্ত বাদ সমাজ। এখানে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিষয়াবলী ও শাসক শ্রেণির অত্যাচারের বিষয়বস্তু ছিল।[৪৪]

প্রথমে ধর্মীয় ভাবাবেগ নিয়ে সংগ্রাম শুরু হওয়াই স্বাভাবিক। আর ওয়াহাবী ও ফরায়েযী সংগ্রাম এরূপ ধারণা দিয়েই শুরু হয়েছিল, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত কারণ ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। শিল্প কারখানা পুঁজিবাদের সৃষ্টি করে। ইউরোপে আঠার শতকে শিল্প বিপ্লবের ফলেই সেখানে পুঁজিবাদের সৃষ্টি। কিন্তু একই সময়ে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেনি। এখানে সামন্ত প্রথা বিরাজমান। এ অবস্থায় উপনিবেশ বিরোধী কোনো সংগ্রাম উত্থানের পেছনে প্রধান বৈশিষ্ট্য ধর্ম ভিত্তিক হবে সেটা স্বাভাবিক। ভারত বর্ষে বিশ শতকের গোড়ায় যখন খানিকটা শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয় তারপর থেকে সৃষ্ট গণ সংগ্রামগুলি ধর্মের প্রভাবমুক্ত হতে থাকে। তারপরও বলা যায় স্বদেশী আন্দোলন ও ১৯৩০ সালের সূর্যসেনদের বিপ্লব ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করা, ওয়াহাবী ও ফরায়েযীদের মধ্যে নিম্নস্তরের হিন্দুও ছিল। এ বিষয়টি সুপ্রকাশ রায় উল্লেখ করেন এভাবে ফরায়েযী আন্দোলন মুসলিম ধর্মের সংস্কার আন্দোলন রূপে আরম্ভ হলেও এটা কেবল মুসলিম জনসাধারণকেই সংঘবদ্ধ ও সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেনি, এ আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্থানীয় হিন্দু কৃষকদের একটি বৃহৎ অংশকেও সংগ্রামে টেনে আনতে পেরেছিলেন এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলিমগণের আংশিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[৪৫]

এটা ছিল বৃটিশদের বিতাড়িত করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এখন প্রশ্ন আসতে পারে কেন এবং কোনো প্রকার সরকার ফরায়েযীরা চেয়েছিলেন? তারা মুসলিম শাসন পুনরুদ্ধারই চাইবে তা স্বাভাবিক। কারণ তাতো ইতিহাস স্বীকৃত যে, আঠার শতকের মধ্যভাগে বৃটিশরা যে শোষণ ও শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল তার শিকার হয়েছিল সংখ্যাধিক্য মুসলিম চাষী। শাসন সম্পত্তি হারাতে হয় মুসলিমগণকেই। মুর্শিদাবাদের নবাবকে পতন ঘটিয়ে বাংলা-বিহার দখল, আবার ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে দিল্লির মোগল সম্রাটকে নির্মমভাবে ক্ষমতাচ্যুত করে দখল করে নিলো গোটা ভারতবর্ষ। স্বাভাবিক ভাবেই মুসলিমগণ বৃটিশ শাসনকে নির্বিবাদে মেনে নিল না। তারপর ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফলের শিকার হলো সাধারণ মানুষ। আর বাংলা বিহার অঞ্চলে মুসলিম কৃষকই ছিল অধিক। মুসলিমগণের অনবরত বিদ্রোহ ও সংগ্রামে অতিষ্ঠ হয়েই লর্ড ওয়ো দুঃখ করে বলেছিলেন মহারানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই কি ভারতীয় মুসলিমগণের ধর্মের অনুশাসন। এ বিষয়টি অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বৃটিশ আমলা W W Hunter কে। তাঁর তদন্তের ফলাফলই হলো The Indian Musalmans গ্রন্থখানা। আসলেই বৃটিশ সরকারকে উৎখাত করা মুসলিমগণ ধর্মীয় অনুশাসন হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। এ অনুভূতিই ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জমিদার মহাজন বিরোধী শ্রেণি সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল। দেখা গেছে বাংলার ওয়াহাবী ও ফরায়েযীরা ইংরেজ উৎখাত কল্পে স্থানীয়ভাবে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। ওয়াহাবীগণ ২৪ পরগনা, নদীয়া আর ফরায়েযীরা

৪৪ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত, *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩

৪৫ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, যশোর, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জকে ইংরেজ শাসন অগ্রাহ্য করে নিজেদের স্বাধীন অঞ্চল ঘোষণা করে। বিপ্লবী নেতারা স্বাধীন বিচারালয়, নিজস্ব আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। বাহ্যিক ভাবে বাঙালী চাষী, যুবক, তিতুমীর ও দুদু মিয়ার স্বাধীনতার সংগ্রাম ব্যর্থ হল কিন্তু পরবর্তী সংগ্রামী মানুষের জন্য এদের ত্যাগ ও দেশপ্রেম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। সংগ্রাম মোটেই সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ডে সীমাবদ্ধ ছিল না। ঐতিহাসিকদের এটি দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা, এদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল ব্যাপক।[৪৬]

যেহেতু সরকারের খাজনা দিতে অস্বীকার করা, সরকারের মনোনীত সামন্ত জমিদারদের বিরোধিতা করা, এক ধরনের রাজনৈতিক বিদ্রোহ। তখনকার সময়ে জমিদারগণ স্থানীয় সরকারের দায়িত্বও পালন করতেন। ফরায়েযী নেতা দুদু মিয়া যে ঘোষণা করেছিলেন, জমি সৃষ্টিকর্তার সুতরাং জমিদার খাজনা আদায় করার কোনো অধিকার রাখে না। এ রূপ ঘোষণা রাজদ্রোহ এবং অসহযোগ আন্দোলনমূলক রাজনৈতিক কর্মকান্ড। এখানে মনে রাখতে হবে, ঊনিশ শতকের তিরিশ-চল্লিশ দশকে বৃটিশ ভারতে আধুনিক রাজনৈতিক চর্চা ছিল না। ছিল না কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠি। কাজেই আধুনিক রাজনীতি বলতে যা বোঝায়, তা ছিল অনুপস্থিত। এ দিকটি বিবেচনায় রেখে ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় উদ্ভূত তিতুমীর ও দুদু মিয়ার রাজনৈতিক চিন্তা বিশ্লেষণ করতে হবে। বিশ শতকের বিশ দশকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে এম কে গান্ধী একই ধারায় অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন। কাজেই তার শত বছর পূর্বে দুদু মিয়ার অসহযোগ আন্দোলন বিশ শতকের আন্দোলনের পূর্বসূরি। ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে তা অধিক রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করে।[৪৭]

১৮৩১ সালে একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতে সংঘটিত বারাসাত বিদ্রোহ শতবছর পরে ১৯৩১ সালে সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিপ্লবের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর সি মজুমদার এ প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যেতে পারেননি।[৪৮] তিনি লিখেন বিংশ শতাব্দীর অসহযোগ আন্দোলনের অনেক পূর্বাভাস দুদু মিয়ার আন্দোলনে পাওয়া যায়।[৪৯] এছাড়া অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরেরা দুদু মিয়ার কর্মসূচীর প্রচারে ভীষণ ভয় পায় এবং তাকে হয়রানি ও দুর্বল করার জন্যে তাঁর নামে লুটপাট ও অসহযোগ আন্দোলনের জন্য বহুবার সরকারি আদালতে মামলা রুজু করা হয়। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করতে না পারায় তিনি প্রতিবার খালাস পান বটে, তবে এতে ক্লান্ত ও নিঃস্ব হয়ে পড়েন। ফরায়েযী আন্দোলনের নেতা দুদু মিয়া কোম্পানি সরকারের জন্য যে ভীষণ বিপদজনক তা বোঝা যায় যখন বৃটিশ সরকার কর্তৃক ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের সময় তাঁকে রাজনৈতিক বন্দীরূপে আটক রাখা হয়। এত স্পষ্টত যে এ দুটি আন্দোলন ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পটভূমি রচনা করে।

৪৬ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত, *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

৪৭ প্রাগুক্ত।

৪৮ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদনায়, *সংবাদ পত্রে সেকালের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-১৯৫

৪৯ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ফরায়েযী ও ওয়াহাবী আন্দোলকে আধুনিক সমাজবাদী লেখকগণ ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রথম জাতীয় আন্দোলন বলে মনে করলেও আর সি মজুমদার তা গ্রহণ করতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, মুসলিম সম্প্রদায়ের দিক হইতে ইহা সত্য হইলেও হিন্দু সম্প্রদায় যে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে অন্য চোখে দেখেছে এ পত্রখানি হইতে তাহার সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে।[৫০] উল্লেখ্য, স্থানীয় অত্যাচারী জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে উৎপীড়িত প্রজা ও বেকার তাঁতি দল আক্রমণ করেছিল। এ ঘটনার প্রতিকার চেয়ে সরকারের নিকট এক শিক্ষিত হিন্দু পাঠক সমাচার দর্পন পত্রিকায় যে চিঠি লিখেছিল তার উদ্ধৃতি দিয়ে আর সি মজুমদার বলতে চান যে, হিন্দুর কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। এ চিঠি লেখক সাধারণ হিন্দু প্রজা বা কৃষক ছিল না।

তিনি ঢাকার বাসিন্দা এবং কলকাতার সমাচার দর্পণের পাঠক। অবশ্যই তিনি সেকালের ঢাকার ভদ্রলোক বা বাবু। কাজেই ঊনিশ শতকে গড়ে উঠা সেকালের হিন্দু ভদ্রলোকের ভূমিকা কী ছিল তা সমসাময়িক গ্রন্থ ‘হুতোম পেঁচার নকসা’ বা ‘নববাবু বিলাস’-এ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কাজেই ওই চিঠি লেখক আর জমিদারদের চরিত্র সমভাবে পরিচালিত ছিল। এছাড়া শতবছর পরে আধুনিক ও প্রগতিশীল নেতাদের দ্বারা গড়ে ওঠা স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনে সাধারণ মুসলিমগণের সম্পৃক্ততা কেন ছিল না বা কেন তাদের সম্পৃক্ত করা হয়নি তার উত্তর ঐ একই। তবে ফরায়েযী আন্দোলনে জড়িত অধিকাংশই ছিল হিন্দু জমিদার কর্তৃক উৎপীড়িত প্রজা এবং বাংলার শিল্প ধবংশ হওয়ার ফলে বেকার শ্রমিক দল। একথা আর সি মজুমদার স্বীকার করেছেন।[৫১] তাহলে কী এটাই প্রমাণিত হয় যে, উৎপীড়িত প্রজা আর বেকার শ্রমিক বলতেই সবাই বাঙালী মুসলিম? যদি তাই হয়, তবে এটা খুবই স্বাভাবিক এ অসহায় প্রজাই উপনিবেশ সরকার এবং তার ডানহাত জমিদার সামন্তদের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল এবং উপনিবেশ শাসনের অবসান কামনা করেছিল।[৫২]

জাতির বদ্ধমূল ধারণা, বঞ্চিত, শোষিত ও বেকার কৃষক প্রজার অধিকাংশ মুসলিম হলেও এর মধ্যে হিন্দুও ছিল। ফরায়েযীদের ধর্মীয় চরিত্রের সঙ্গে তাদের মিল না হওয়ার ফলে অসহযোগ ও কৃষক আন্দোলনে তারা যুক্ত হতে পারেনি কিন্তু এ কথা ভাবা ঠিক হবে না যে, তারা অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের পক্ষে ছিল। ইতিপূর্বে ফকির সন্ন্যাসী, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানীর কর্মকাণ্ডই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আর ফরায়েযীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তারা হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে অত্যাচার শুরু করে আসলে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধ নয়।[৫৩] সেই সকল অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে যারা হিন্দু ধর্মের পূজা উৎসবের নামে নানা প্রকার চাঁদা বা করারোপ করেছিল। তারাই মুসলিম প্রজার দাঁড়ির ওপর তিন টাকা বারো আনা (৫ শিলিং) কর আরোপ করেছিল।[৫৪] তিতুমীরের বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল পশ্চিম বাংলার বারাসাত ও নদীয়া

৫০ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৫২ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত, *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

৫৩ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৫৪ Sir William Wilsion Hunter, *The Indian Musalmans*(London : Trubner and Company, 1871), p. 33

Dhaka University Institutional Repository

জেলার আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে। আর হাজী শরী'অতুল্লাহ এবং দুদু মিয়ার বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল পূর্ব বাংলার ফরিদপুর, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জের গ্রাম ও চরাঞ্চলে। এসব এলাকায় ছিল দরিদ্র কৃষক ও বেকার শ্রমিকদের বসবাস। তারা জমিদারের রায়ত এবং কিছু নীলকরদের শ্রমিক-চাষী। তাই ছিল অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীদের সামাজিক অবস্থান।

### ৭.১.৩ হাজী শরী'অতুল্লাহর বহুমাত্রিক মুক্তি সংগ্রাম

আন্তর্জাতিক ইতিহাসে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের নাম। আজ বাংলাদেশ নামের যে স্বাধীন রাষ্ট্রের গর্বিত নাগরিক, সে রাষ্ট্রের বিবর্তনের ইতিহাসে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)এর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার দাবীদার। একটি দেশের জনজীবনে মুক্তি ও স্বাধীনতার মর্ম বাণীকে সার্থক করে তুলতে যত ধরনের কাজ অপরিহার্য বিবেচিত হতে পারে, তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। এ কারণেই তিনি বহুমাত্রিক মুক্তি সংগ্রামী আখ্যায় ভূষিত হওয়ার যোগ্য। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরের অন্তর্গত শামাইল নামক গ্রামে ১৭৮১ সালে। তাঁর পিতা আব্দুল জলিল তালুকদার শরী'অতুল্লাহর আট বছর বয়সেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর মা ইন্তেকাল করেন আরো আগে। কৈশোরেই পিতা-মাতা হারিয়ে তিনি তাঁর চাচা আজিমউদ্দিনের পরিবারে লালিত-পালিত হতে থাকেন। তাঁর চাচা তাঁকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। তবুও পিতা-মাতার স্নেহের যে কোনো বিকল্প হতে পারে না তার প্রমাণ মিললো তাঁর জীবনে। একদিন চাচার সাথে অভিমান করে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) গৃহত্যাগ করে সোজা কলিকাতা গিয়ে হাজির। তখন তাঁর বয়স মাত্র বার বছর। কিশোর শরী'অতুল্লাহর জীবনের এ করুণ অনিশ্চয়তা ঘেরা দিনগুলোতে দেশের অবস্থা ছিল আরও করুণ, আরও অনিশ্চিত, আরও হতাশাব্যঞ্জক। তাঁর জন্ম হয় এমন এক সময়ে, যার ২৪ বছর আগে পলাশির আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্-দৌলার দরবারের কতিপয় বিশ্বাসঘাতক আমলার চক্রান্তে আমাদের ইতিহাসে এ বিপর্যয় নেমে আসে। উপমহাদেশের কয়েক শতাব্দীর দীর্ঘ মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। দেশ সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে আসা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পদানত হয়।[৫৫]

মধ্যযুগের মুসলিম বিদ্বেষী ক্রুসেডের ঐতিহ্যবাহী ইউরোপের অন্যতম শক্তি ইংরেজরা এদেশ থেকে মুসলিম শাসন অবসানের লক্ষ্যে প্রথম যোগাযোগ করে মারাঠাদের সঙ্গে। পরে তারা কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লি থেকে বহুদূরে অবস্থিত বাংলা থেকেই তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে তারা প্রথমেই বাংলার নবাব সিরাজ উদ্-দৌলার দরবারের জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, উর্মিচাঁদ প্রমুখ হিন্দু অমত্যদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করে। এসব বৈঠকে অনুকূল সাড়া পেয়ে নবাবির প্রলোভন দেখিয়ে সিরাজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও প্রধান সেনাপতি মীর জাফরকে এ চক্রান্তে শামিল করতে সমর্থ হয়। পলাশির ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নবাব সিরাজ উদ্-দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর মীর জাফরকে নবাবের মসনদে বসানো হয়। নবাব হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই মীর জাফর টের পেলেন তার হাতে কোনো ক্ষমতা নেই, ক্ষমতা চলে গেছে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তাদের সমর্থক জগৎশেঠ, রাজবল্লভ ও

৫৫ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত, *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬

*Dhaka University Institutional Repository*

উর্মিচাঁদ প্রমুখ হিন্দু অমাত্যদের হাতে। মীর জাফর নবাবি ফলাতে গিয়ে মসনদ হারিয়ে বসেন। বাংলার শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করার পর ইংরেজদের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় সুপরিকল্পিত পন্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে মুসলিমগণের উৎখাত করে তাদের একটি অসহায় জনগোষ্ঠিতে পরিণত করা। প্রশাসন, প্রতিরক্ষা বাহিনী, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারি, আয়মাদারী সকল ক্ষেত্র থেকে মুসলিমগণকে উৎখাত করে সে সমস্ত স্থানে হিন্দুদের বসানোর অভিযান এত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা হলো যে, মাত্র অল্পদিন আগেও যাদের দরিদ্র হওয়ার কথা কল্পনা করা সম্ভব ছিল না, তাদের স্বচ্ছল থাকাটাই অসম্ভব হয়ে উঠল।[৫৬] তাদের জমিদারি, আয়মাদারি সম্পত্তির সাথে সাথে লাখেরাজ ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি কেড়ে নেয়ার ফলে এসব সম্পত্তির আয়ে পরিচালিত দেশের অসংখ্য মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল।

এর ফলে পলাশি বিপর্যয় অল্প দিনের মধ্যে এক কালের উন্নত, সমৃদ্ধ মুসলিম জাতি শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয়, সবদিক দিয়েই এ অসহায় জনগোষ্ঠিতে পরিণত হয়। পলাশি বিপর্যয়ের মাত্র ৩৬ বছরের মাথায়ই ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ইংরেজ শাসকরা একটি ইংরেজভক্ত নব্য জমিদার গোষ্ঠি গড়ে তুলল, যাদের প্রায় সবাই ছিল হিন্দু এবং ঘোরতর মুসলিম বিদ্বেষী। এসব জমিদারদের হাতে এমনভাবে প্রজা নিপীড়নের সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয় যে তারা প্রজাদের ক্রীতদাসের মত খাটাতেও দ্বিধা করত না। এসব প্রজাদের অধিকাংশ ছিল মুসলিম অথচ হিন্দু জমিদারদের পূজা-পার্বণের গায়ে খাটতে এমনকি দাঁড়ি রাখার জন্য চাঁদা দিতে বাধ্য করা হতো।

একদিকে পলাশি পরবর্তী যুগে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে এ বর্বর নিপীড়ন ও অসহনীয় দারিদ্র তো ছিলই, অন্যদিকে লাখেরাজ ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয়ে পরিচালিত সারা দেশব্যাপী যে সকল মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, সেগুলো বন্ধ হয়ে গেলে মুসলিম জনগণের ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মুসলিম সমাজে ইসলাম বিরোধী নানা কুপ্রথা ও কুসংস্কার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য মনসা পূজা, বসন্ত থেকে বাঁচার জন্য শীতলা পূজা প্রভৃতি এসব কুপ্রথার মধ্যে অন্যতম ছিল। এছাড়াও প্রতিবেশী হিন্দুদের অনুকরণে ধুতি পরিধান করা, হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার অনুকরণে মুসলিম সমাজেও কুলিন ও অকুলিন ভেদাভেদ প্রকটভাবে দেখা দিল। ইংরেজরা এ দেশ দখল করার পর এদেশের জনগণের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্যে একদিকে নব্য জমিদারগোষ্ঠির মাধ্যমে কৃষক প্রজাদের উপর অকথ্য নিপীড়ন চালানো শুরু হয়, অন্যদিকে অনিচ্ছুক চাষীদের নীল চাষে বাধ্য করা হয়। ইংরেজ মালিকানায় বড় বড় নীল কারখানা গড়ে তোলা হয়। এর পাশাপাশি মসলিনসহ বাংলার বিশ্ববিখ্যাত বস্ত্রশিল্প ধবংশ করে ইংল্যান্ডের বস্ত্রের জন্য বাজার সৃষ্টি করা হয়।[৫৭]

১৭৮৭ সালে শুধু ঢাকা থেকেই ৩০ লক্ষ টাকার মসলিন ইংল্যান্ডে রফতানি হয়েছিল। সেখানে ১৮১৭ সালের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে বাংলার কৃষক ও বস্ত্র শিল্পীদের

---

৫৬ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত, *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

৫৭ প্রাগুক্ত।

*Dhaka University Institutional Repository*

(তাঁতী) জীবনে অসহনীয় বিপর্যয় নেমে আসে। সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে মনে হবে কৈশরেই এতিম হয়ে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর জীবনের দুর্ভাগ্যের সাথে পাল্টা দিয়ে যেন সেদিন পলাশি পরবর্তী বাংলার মুসলিমগণের দুর্ভাগ্য সব সীমা ছাড়িয়ে যেতে বসেছিল। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)র সৌভাগ্য বলতে হবে, কলিকাতায় তিনি মাওলানা বাশারত আলী নামে একজন সুযোগ্য আলেমের সন্ধান লাভ করেন। তিনি তাঁর মক্তবে শরী'অতুল্লাহকে ভর্তি করে নেন। এখানে কুরআন শিক্ষা শেষ করার পর হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তার ওস্তাদের পরামর্শে হুগলী জেলার ফুরফুরা যান। সেখানে তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি মুর্শিদাবাদে তাঁর আরেক চাচা মুফতি আশিক মিয়ার কাছে যান এবং আরবি ও ফারসি ভাষায় আরও দক্ষতা অর্জন করেন। এর মধ্যে এক দুর্ঘটনায় তাঁর চাচার মৃত্যু হলে তিনি ভগ্ন হৃদয়ে কলিকাতায় তাঁর ওস্তাদ বাশারত আলীর কাছে ফিরে আসেন। এসময় মাওলানা সাহেব ইংরেজদের কোপ দৃষ্টিতে পড়ে ১৮৯৯ সালে মক্কায় হিজরত করলে তাঁর সঙ্গী হন।[৫৮]

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) যখন মক্কা যান, তার বয়স মাত্র আঠারো বছর। আরব দেশে তিনি একটানা বিশ বছর অবস্থান করেন। দীর্ঘকাল সেদেশে অবস্থানের পেছনে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন। এর শেষ চৌদ্দ বছর তিনি তাহের সোম্বল নামের এক বিখ্যাত হানাফী আলেমের কাছে ইসলাম সম্বন্ধে গভীর পান্ডিত্য অর্জনের পাশাপাশি তাসাউফ ও তরিকত সম্পর্কেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন। এরপর এক পর্যায়ে তিনি তাঁর ওস্তাদের অনুমতি নিয়ে মিশরের কায়রোয় গিয়ে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছুকাল দর্শন ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। কায়রো থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তনের পর মদিনা মুনাওয়ারাতে সংক্ষিপ্তকাল অবস্থানের পর ১৮১৮ সালে তিনি দেশে ফিরে আসতে মনস্থ করেন। দেশে ফিরেই হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ইসলাম সম্পর্কে তাঁর অর্জিত প্রগাঢ় জ্ঞানের আলোকে সর্বাত্মক সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্রতী হন। এ আন্দোলনই ইতিহাসে 'ফরায়েযী আন্দোলন' নামে খ্যাতি লাভ করেছে।[৫৯]

মুসলিম হিসেবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে যা অবশ্য পালনীয় তার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তোলাই ফরায়েযী আন্দোলনের কাজ। পলাশি পরবর্তী যুগে আমাদের জাতীয় জীবনে যে সর্বমুখী অমানিশার অভিশাপ নেমে আসে তার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সুপরিকল্পিত মুক্তি সংগ্রামই ছিল এ ফরায়েযী আন্দোলন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) চোখে আমাদের সেদিনকার বিপর্যয়ের বহুমুখী চিত্রটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল বলে ফরায়েযী আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই হয়ে উঠে এক বহুমাত্রিক মুক্তি সংগ্রাম। ফরায়েযী আন্দোলন যেমন ছিল রাজনৈতিক দিক, তেনি ছিল তার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় দিক। তবে তার আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয়। 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা'।[৬০] এ সম্বন্ধে তার দ্ব্যর্থহীন প্রত্যয় ছিল। তিনি ঘোষণা করেন এদেশ বিধর্মীদের দ্বারা শাসিত হবার ফলে এদেশ এখন দারুল হরব-এ পরিণত হয়েছে, একে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত করাই ঘোষিত হলো ফরায়েযী আন্দোলনের লক্ষ্য।

---

৫৮ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত, *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

৫৯ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০৭), পৃ. ৭৩

৬০ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلَامُ ۚ قف দ্র. আল কুরআন, ৩ : ১৯

Dhaka University Institutional Repository

ফরায়েযী আন্দোলনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, ইসলাম এক আল্লাহ ছাড়া কারো প্রভূত্ব মেনে নিতে পারে না, তাই পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রামে অংশগ্রহণ মুসলিমগণের অবশ্য কর্তব্য। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে আরও ঘোষণা করলেন, যতদিন দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে ততদিন দেশে জুমু'আ ও 'ঈদের নামায পড়া সার্থক হবে না।

পলাশি বিপর্যয়ের পর ইংরেজ ও হিন্দু জমিদারদের প্রভাবে মুসলিম সমাজে যেসব বিজাতীয় কুপ্রথা ও কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করে, সেসবের বিরুদ্ধে তো তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করেনই, উপরন্তু হিন্দুদের পূজা-পার্বণে অংশগ্রহণও মুসলিমগণের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মুসলিমগণের ধুতি ছেড়ে মুসলিম লেবাস পরিধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অতীতের সব পাপ ও বিভ্রান্তি থেকে তওবা করে ইসলামের আদর্শে জীবন গড়ে তোলার উপর জোর দেন তিনি। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ঢাকা জেলার নয়াবাড়ি নামক স্থানকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। মুসলিমগণ দলে দলে এসে তার নির্দেশনা ও পরামর্শ মোতাবেক নতুন জীবন ও সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন। ইংরেজ শাসনে সবচাইতে অসহায় অবস্থায় পতিত হয় এদেশের কৃষক ও তাঁতী সম্প্রদায়। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর আন্দোলনে এরাই অধিক সংখ্যায় অংশ গ্রহণ করেন। ফরায়েযী আন্দোলন দ্রুত গতিতে শক্তি সঞ্চয় করে চলে। অল্প দিনের মধ্যেই বার হাজার কৃষক এ আন্দালনে সংগঠিত হয়। এ দেখে জমিদারদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।[৬১]

জমিদাররা দেখলো মুসলিম কৃষকরা যদি এভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের শোষণ ও নিপীড়নের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তারা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আটঁতে থাকে। ১৮৩১ সালে বৃটিশভক্ত হিন্দু জমিদারদের অভিযোগে তাঁকে প্রথমে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়। পরে তাকে নয়াবাড়ি থেকে বহিষ্কার করা হয়। বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর জন্মভূমি ফরিদপুর জেলার শামাইল গ্রামে চলে যান। এতসব করেও কুচক্রিরা তাঁর আন্দোলনকে দমাতে পারল না। শামাইল গ্রামই এবার হয়ে উঠলো তার আন্দোলনের নতুন কেন্দ্রবিন্দু। দলে দলে জনগণ এখানে এসে তার আন্দোলনে শামিল হতে লাগল। তাঁর ব্যক্তিত্ব এমনি আকর্ষণীয় ছিল যে, একবার যে তাঁর সান্নিধ্যে আসতো সে-ই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে পড়তো এবং তাকে নিজ পিতার ন্যায় ভক্তি করা শুরু করত। ফরায়েযী আন্দোলন দ্রুত গতিতে প্রসার লাভ করতে থাকলেও তিনি তার আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্য দেখে যেতে পারেননি। সারা জীবন অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। অবশেষে ১৮৪০ সালে নিজ গ্রাম শামাইলে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর আরদ্ধ কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব লাভ করেন তার সুযোগ্য পুত্র মোহসিন উদ্দিন আহমেদ দুদু মিয়া।[৬২]

দুদু মিয়ার বয়স যখন মাত্র ২১ বছর তখন তিনি ফরায়েযীদের বড় বড় খলিফাদের সর্বসম্মতিক্রমে গণতান্ত্রিক পন্থায় এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পিতা হাজী

---

৬১ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত, *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

৬২ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সল, *হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফারায়েযী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর মতো ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী না হলেও তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল অসাধারণ। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)র নেতৃত্বাধীন ফরায়েযী আন্দোলন ছিল প্রধানত ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলন এবং কিঞ্চিৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। অন্যদিকে দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েযী আন্দোলন দ্রুত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক (কৃষক) আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। দুদু মিয়া সমগ্র পূর্ববঙ্গকে কাজের সুবিধার জন্য কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করেন এবং একেক এলাকার জন্য একেক খলিফা নিযুক্ত করেন। এ খলিফাদের কাজ ছিল আন্দোলনের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা, এলাকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে কেন্দ্রকে জানানো, কোনো জমিদার অত্যাচার করলে তা মোকাবেলা করা এবং অত্যাচারিত প্রজাকে অর্থ সাহায্য প্রদান করা। দুদু মিয়ার নির্দেশ ছিল ইংরেজের আদালত বর্জন করে যে কোনো মামলা নিজেরা মিটিয়ে ফেলা।[৬৩]

দুদু মিয়ার চিন্তাধারা ছিল খুবই বিপ্লবাত্মক। তিনি বলতেন, জমির প্রকৃত মালিক আল্লাহ। তাই সরকারের অধিকার নেই জমির জন্য ট্যাক্স বসানো আর জমিদারেরও অধিকার নেই কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা নেয়ার। বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন, 'লাঙ্গল যার জমি তার'। এ ধরনের চিন্তাধারার অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে কায়েমী স্বার্থের ধারক বাহক সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার এবং তাদের আশীর্বাদপুষ্ট জমিদারদের বরদাস্ত করার কথা নয়। তারা বরদাস্ত করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ মামলা থেকেই তিনি বেকসুর খালাস পেয়ে যান। দুদু মিয়ার সাংগঠনিক ক্ষমতা নিয়ে আতংকে ভুগতো বৃটিশ সরকার। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবে সমগ্র উপমহাদেশ প্রকম্পিত হয়ে উঠলে আতংকিত ইংরেজ সরকার দুদু মিয়াকে দীর্ঘদিন গৃহবন্দী করে রাখে। সারা জীবন নানারূপ হয়রানির শিকার হবার ফলে অল্প বয়সেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। অবশেষে ১৮৬২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি ঢাকা শহরের ১৩৭নং বংশাল রোডের বাড়িতে ইন্তিকাল করেন। সেখানেই এ বিপ্লবী নেতার কবর দেয়া হয়।[৬৪]

দুদু মিয়ার মৃত্যুর পরও ফরায়েযী আন্দোলন দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল। কিন্তু উপযুক্ত সংগঠকের অভাবে এ আন্দোলন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা অন্যান্য সংগঠন ও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সাংগঠনিক দক্ষতার প্রমাণ রাখেন। ফরায়েযী আন্দোলন আজ অতীত ইতিহাসে পরিণত হলেও এ আন্দোলনের ঐতিহ্যের ধারক রসে সিঞ্চিত হয়ে এদেশে যেসব আন্দোলন জন্মলাভ করেছে সেসবের মধ্যেই ফরায়েযী আন্দোলনের সার্থকতার সন্ধান পাওয়া যায়। ফরায়েযী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা সবাই পরবর্তী কালে মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এ মুসলিম লীগেরই একাংশ পরবর্তীকালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নাম ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করে। এ আওয়ামী লীগই পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব প্রদান করে। সুতরাং আমাদের আজকের স্বাধীনতার পেছনে তাদের ঐতিহাসিক অবদান অনস্বীকার্য।

---

৬৩ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত, *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

৬৪ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সল, *হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফারায়েযী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

ফরায়েযী আন্দোলনের দ্বিতীয় নেতা দুদু মিয়ার ‘লাঙ্গল যার জমি তার’ শ্লোগানকে ভিত্তি করেই জমিদারি বিরোধী কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফরায়েযী আন্দোলনই এদেশে প্রথম সুসংগঠিত ইসলামি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল। সে নিরিখে এদেশে বর্তমানে প্রচলিত সকল ইসলামি আন্দোলনই উত্তরসূরি হিসেবে ফরায়েযী আন্দোলনের কাছে ঋণী।

*Dhaka University Institutional Repository*

# ৭.২ ফরায়েযী আন্দোলনের মূল্যায়ন

## ৭.২.১ হাজী শরী'অতুল্লাহর বহুমাত্রিক সংস্কারের আহ্বান

বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই ধর্মপ্রাণ। সব ধর্মের অনুসারীরাই জ্ঞান অনুযায়ী ও সাধ্যমত নিজ নিজ ধর্ম অনুসরণ করেন। ঐতিহাসিক কারণে এ দেশে আন্তঃধর্ম বোঝাপড়াও বেশি। আবার প্রভাবিত হওয়ার মাত্রাও প্রবল। বিশেষত একত্ববাদ ও বহু ঈশ্বরতন্ত্র দীর্ঘদিন পাশাপাশি চলার কারণে আচার-আচরণ প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা স্বাভাবিক। এ স্বাভাবিকতা দীর্ঘদিন মেনে নিলে বিচ্যুতি এসে ভর করে, সামাজিক সঙ্কট বাড়ে। ধর্মের নামে অনাচার বৃদ্ধি পায়, তখন সংস্কার জরুরী হয়ে পড়ে। নয়তো নানামুখী আগ্রাসন ধর্মীয় জীবনকে আড়ষ্ট করে দেয়। কুসংস্কার, নানা ধরনের অনাচার ও বিকৃতি ধর্মের নামে জায়গা করে নেয়, তখন মূলে প্রত্যাবর্তনের তাগিদ বাড়ে। নানা ধরনের কুসংস্কার যখন ধর্মের নামে চালু হয় তখন একত্ববাদী চিন্তায় বিচ্যুতির মাত্রা বেড়ে যায়। ইবাদতের নামেই শিরক ঢুকে পড়ে। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ধরনও ছিল সুফিবাদী ধরনের। তাতে মরমিবাদের নামে ঠাঁই করে নেয় ইবাদত বন্দেগীর ছদ্মবরণে বিভ্রান্তি। সেই বিভ্রান্তি স্থান করে দেয় দেবত্ববাদী বহু ঈশ্বরতন্ত্রের ধারণাকে। এর ফলে একত্ববাদের ধারণায় শিরক ও কুসংস্কার ঠাঁই পেতে থাকে। বাংলাদেশে এ প্রবণতা প্রবল। আবার সংস্কারের ধারাও কম জোরদার নয়। আঠার শতকে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)এর সংস্কার আন্দোলন সেই ধারাবাহিকতারই অংশ। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত সংস্কারক। তার নামানুষারেই শরীয়তপুর জেলার নামকরণ করা হয়েছে। এটি বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অংশ।[৬৫]

তিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি মক্কা গমন করেন। ফিরে আসেন ১৮১৮ সালে। দেশে ফিরে আরবের সংস্কারক আব্দুল ওয়াহাব নজদির মতো ইসলামি সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তার শুরু করা আন্দোলনই পরে ফরায়েযী আন্দোলন নামে পরিচিতি পায়। আরব ও মক্কায় হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) আব্দুল ওয়াহাব নজদির একত্ববাদী সংস্কার আন্দোলনের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন, তার জীবনে এর প্রভাবও ছিল অপরিসীম। প্রথম দিকে তাঁর সংস্কার আন্দোলন ছিল মূলত ধর্মীয়। পরে সমাজের অন্য বেশ কিছু দিকও এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ফলে তাঁকে একই সাথে ইসলামি পুনর্জাগরণের রাহবার, সমাজ সংস্কারক ও কৃষকনেতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সময়টা ছিল আমাদের স্বাধীনতা হারানোর প্রেক্ষাপটে নানামুখী শোষণ-বঞ্চনায় অতিষ্ঠ হওয়ার কাল।[৬৬]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুশাসন, দুঃশাসন, শোষণ ও অত্যাচারে তখন সারা বাংলার জনগণের নাভিশ্বাস উঠেছিল। ক্ষমতার পালাবদলে মুসলিম হয়ে পড়েছিল নিঃস্ব ও দিশেহারা। প্রভূ সুলভ আচরণকারী নীলকরদের নির্যাতন ও অত্যাচারে নির্যাতিত মানুষ ছিল অসহায়। সে নির্বাক, মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট অসহায় জনগণকে তিনি স্বপ্ন, আশা ও ভরসা জোগাতে চেয়েছেন। সে সময়টিতে নীলকরদের পাশাপাশি সংঘবদ্ধ মাড়োয়ারি সম্প্রদায় চিরস্থায়ী

---

৬৫ মাওলানা আবদুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৬৬ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬), পৃ. ২২৮

*Dhaka University Institutional Repository*

বন্দোবস্ত ব্যবস্থার সুফলভোগী হতে চাইল। উল্লেখ্য ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে তারা বড় বড় জমিদারি ক্রয় করে শোষণ ও বঞ্চনা বাড়িয়ে তুলেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবস্থায় নিয়োজিত গোমস্তরাও ছিল মধ্যস্থতাকারী ও মধ্যস্বত্বভোগী। এরা ছিল প্রধানত মাড়োয়ারি বাঙালি সহযোগি। এ গোমস্তাদের ছিল সারা দেশের হাটবাজার ও নদীবন্দরের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। তাদের যৌথভাবে পরিচালিত শোষণ, হিংস্রতা ও অত্যাচার সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের অবস্থা ইউরোপের ক্রীতদাসদের পর্যায়ে উপনীত করেছিল। এ ভয়াবহ সামাজিক পরিবর্তন ছিল অসহনীয়। বিশেষত মুসলিমগণ ক্ষমতা হারিয়ে হয়ে পড়েছিল অসহায়। এর বিপরীতে নব্য দালাল হিসেবে অন্য ধর্মাবম্বীরা শাসক পাল্টানোর আমোদে ছিল আত্মহারা। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মক্কায় অবস্থান কালে তৎকালীন বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদদের তত্ত্বাবধানে প্রায় দুই দশক ধরে ধর্মীয় শিক্ষা ও আরবি সাহিত্য অধ্যায়ন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। আরবে তার অবস্থানকালে শাসক শক্তির উত্থান-পতন ও মাওয়াহিদুন বিপ্লবের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল। তখনই ইব্রাহিম পাশার নেতৃত্বে মিসরীয় অভিযান ঘটে। সে সময় পুনরুজ্জীবনের বিপ্লবী চেতনা ও একত্ববাদের উদ্দীপনা আরবদের হৃদয়কে স্পন্দিত ও সজীব করে তুলেছিল। এ পুনরুজ্জীবনের শিক্ষা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর জীবনকেও আলোড়িত ও উজ্জীবিত করেছিল।[৬৭]

বাংলাদেশে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে বহু ঈশ্বরবাদের একটি বার্তাবরণে সুফিদের ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে। সুফিরা সাধারণত ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর ফলে নিখাদ জীবনবোধ ও কর্মময় জীবন কিছুটা উপেক্ষিত হয়। তাদের উপস্থাপনায় এবং মানুষের নির্ভেজাল তৌহিদী বোধের সাথে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি ও বিবাদের একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। সেটাই সেই সময়ে বাংলাদেশে চালু ছিল। এটা ছিল নির্ভেজাল তৌহিদ ভাবনা ও তাঁর শিক্ষার সাথে অনেকটা সাংঘর্ষিক। এ অবস্থায় তিনি দ্বিতীয়বার মক্কায় গমন করেন। ফিরে এসে তিনি অধ্যাত্মবাদী চেতনা, সুফিবাদ ও ফরজ চিন্তার সমন্বয় ঘটানোর উদ্যোগ নেন, যা জনগণ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেন।[৬৮] হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ইসলামের মৌলিক নীতি ফরজের ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতেন। ধর্মের নামে কুসংস্কার বর্জন করতেন। এ কারণে তার পরিচিতিটা ও এভাবে গড়ে উঠেছিল। এ পর্যায়ে তিনি ও তার আন্দোলন ফরায়েযী নামে পরিচিতি পায়। তাঁর এ সংস্কার আন্দোলন দূর-দূরান্তে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফরিদপুর ছাড়াও বৃহত্তর ঢাকা, বরিশাল ও কুমিল্লা জেলায় তার ভাবধারা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। তাওহিদ বা আল্লাহর একত্বের ওপর বিশ্বাস স্থাপন এবং একত্ববাদকে নির্ভেজাল রূপের ওপর প্রতিষ্ঠাই ছিল তার লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সা. এর প্রবর্তিত নয় এমন সব স্থানীয় আচার অনুষ্ঠানকে তিনি 'শিরক' বলে প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানালেন।[৬৯]

---

৬৭ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া(৬)*(ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১১১

৬৮ মাহবুবুর রহমান, *বাংলার ইতিহাস(১২০০-১৯৭১খ্রি.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

৬৯ ড. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফি-সাধক*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৩), পৃ. ২২০

*Dhaka University Institutional Repository*

তাছাড়া ইসলামের অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য বা 'ফরয' পালনের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিলেন। দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, দারিদ্র বিমোচনের জন্য ধর্মীয় কর বা যাকাত প্রদান করা, রমজান মাসে রোযা রাখা, হজ পালন করার মতো মৌলিক ইবাদতে তার প্রেরণা ছিল বেশি। এ থেকেই হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর আন্দোলন 'ফরায়েযী আন্দোলন' নামে খ্যাতি পায়। সাধারণ ভাবে তিনি সব মুসলিমগণের ভ্রাতৃত্ববোধ, একতা ও সব মানুষের সমতার ওপর জোর দিতেন। তিনি সমাজ দূষণকারী বর্ণপ্রথা ও শ্রেণি বিদ্বেষ এবং বৈষম্যের নিন্দা করতেন। অমুসলিম প্রতিবেশীদের প্রথা-পদ্ধতির প্রভাবে মুসলিম সমাজে ধীরে ধীরে প্রচুর পরিমাণে অনৈসলামিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও বহু ঈশ্বরবাদী ধ্যান-ধারণা প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি সেগুলোরও তীব্র নিন্দা করতেন। আব্দুল ওয়াহাব নজদির সংস্কার অনুসরণে তিনি উপমহাদেশের মুসলিমগণের কাছে অধিকতর পরিচিত সামাজিক রীতিনীতি হিসেবে আজো বিদ্যমান ফাতিহা, কবরপূজা, ওরস ও প্রচলিত মিলাদ মাহফিল আয়োজনেরও নিন্দা করতেন। তিনি এগুলোতে বিদ'আত বা বাহুল্য হিসেবে চিহ্নিত করে দূর করার চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন একশ্রেণির মানুষ ধর্মের আসল শিক্ষা কর্মময় জীবন ও মৌলিক আবেদন বাদ দিয়ে এসব নিয়ে বাড়াবাড়িতে মেতে উঠেছিল। তারা ভাবত এসবই আসল ধর্ম কর্ম, তাই এসব আচার বর্জনের ডাক দেয়াকে  তিনি কর্তব্য জ্ঞান করেছেন।

হিদায়াতে উল্লিখিত মুসলিম আলেমদের শরী'আ অনুসারে তিনি বৃটিশ ভারতকে 'দার-উল-হারব' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। একই ফাত্ওয়া দিয়েছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)। দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সাময়িক অপ্রস্তুত অবস্থা ও অক্ষমতা থেকে তিনি ফতোয়া প্রদান করেছিলেন বলে গবেষকরা মনে করেন। তিনি মনে করতেন, মুসলিম শাসনের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের মুসলিমগণ সমবেত ভাবে জুমু'আ ও ঈদের নামায আদায় থেকে বঞ্চিত।[৭০] স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া এ বঞ্চনা থেকে মুক্তির কোনো বিকল্প নেই। তাই স্বাধীনতার লড়াইকেও তিনি অন্যতম কর্তব্য ভেবেছিলেন। সে লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। কিছু আলেমের মধ্যে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর এ দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তারা এসব অনুষ্ঠান উদযাপন করা অব্যাহত রাখেন। তাদের শঙ্কা ছিল এগুলো বিলুপ্ত হলে মুসলিম সমাজে অনৈক্য ও অমিল দেখা দেবে। সাময়িক বর্জন ও পরিহার অভ্যাসে পরিণত হবে। তার সমসাময়িক মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী এ বিষয়ে তাঁর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন।[৭১]

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা অনুযায়ী কুরআনের নির্দেশ অনুসারে নিজস্ব সংগ্রামের ফল ছাড়া মানুষের আর কিছুই নেই। তাই যিনি জমি চাষ করেন তার উৎপাদিত ফসলের ওপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে সৃষ্ট জমিদারদের কোনো অধিকার নেই। তিনি তার অনুসারীদের নির্দেশ দেন তারা যেন ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বাজায় রেখে অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালন করেও হিন্দু প্রতিবেশীদের বহু ঈশ্বরবাদী পূজা উৎসবে অংশ না

৭০ ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী, *বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও মতাদর্শ*(ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, আগস্ট ২০০৯), পৃ. ৩৬-৩৭

৭১ মওলানা কেরামত আলী *যখীরা-ই- কেরামত*(দিল্লি : মাকতাবাতে কারামাতিয়া, ১৩৪৪ হি.), পৃ. ৮৫-১২৪

Dhaka University Institutional Repository

নেয়। তিনি জমিদার কর্তৃক তাদের ওপর আরোপিত যে কোনো ধরনের ফসলি করও না দেয়ার নির্দেশ দেন। তার অভিমত ছিল সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আইনানুগ রাজস্বই কেবল প্রদান করা যাবে। এ নীতি সদ্য সৃষ্ট হিন্দু ভূস্বামীদের স্বার্থের হানি ঘটায়। তারা তাঁর আন্দোলনের বিরোধীপক্ষ হিসেবে উদ্ভব হয়। হিন্দু ভূস্বামীরা ইংরেজ বেনিয়াদের সহায়তায় কৌশলে কিছু সুবিধাভোগী কৃষকসহ তাদের পৃষ্ঠপোষক শক্তিগুলোকে একত্র করেন এবং নীলকরদেরও তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন।

এমন পরিস্থিতি সাংঘর্ষিক অবস্থার জন্ম দেয়। এরই ফলে ১৮৪০ সালে উভয়পক্ষ ক্রমেই সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যায়। দুর্ভাগ্য ১৮৪০ সালেই হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ইন্তিকাল করেন।[৭২] সৌভাগ্যের বিষয় ছিল তার সুযোগ্য ছেলে দুদু মিয়া ফরায়েযী নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ফরায়েযীদের এ আন্দোলন ছিল একদিকে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। অন্যদিকে এটি ছিল সংঘবদ্ধ প্রজা আন্দোলন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, তাদের গোমস্তা, নীলকর ও নব্য জমিদারদের বিরুদ্ধে ফরায়েযী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। বাংলার এ প্রজা ও কৃষক আন্দোলন এক সময় বৃটিশ সম্রাজ্যের টনক নড়িয়ে দিয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় অনেক আন্দোলন সংগ্রামের ফসল হয়ে অধরা আজাদি ধরা দিয়েছিল।

### ৭.২.২ হাজী শরী'অতুল্লাহর একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক মূল্যায়ন

বাংলার নবাবি আমলের নানা মতের অবসানে এ দেশের কৃষক সমাজ যখন বৃটিশ কোম্পানীর দুঃশাসনে প্রথমে মেয়াদি এবং পরে স্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্তের কারণে প্রজাস্বত্ব হারালো, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জঙ্গল কেটে আবাদ করা জমিতে চাষের কোনো অধিকার থাকলো না, তার রইলো শুধু ভূমিদাসের ভূমিকা, তখন সারা দেশ জুড়ে বিক্ষিপ্ত কৃষি বিদ্রোহের পটভূমিকায় আবির্ভুত হয়েছিলেন জালেমি প্রতিরোধের অগ্রনায়ক, সমাজ সংস্কারক হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। মুসলিম কৃষকের ধর্মীয় আচারে ব্রাহ্মণ্য কুসংস্কারের প্রভাব দূর করে তিনি যেমন পল্লী সমাজে লোকসংস্কৃতির একটি আত্মমর্যাদা সচেতন ধারার প্রতিষ্ঠা করলেন, তেমনি নিম্ন বর্নের হিন্দু সমাজকেও জমিদারের জুলুম প্রতিরোধে কোথাও সক্রিয়ভাবে কোথাও নীরব সহযোগিতা দিয়ে সম্পৃক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি আমরা দেখেছি বৃটিশরাজাদের প্রস্থানের সময় বর্ণবাদী হিন্দু গোষ্ঠির দ্বারা নিগৃহীত তৎকালীন পুর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র সমাজের মুক্তি কামনায়। পরিতাপের বিষয়, ঔপনিবেশিকোত্তর কালে পাকিস্থানের নেতৃত্ব এ গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু সমাজের সমর্থন ও জাতিগঠনে অংশগ্রহনের ভুমিকাকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে ধরে রাখতে মনোযোগী হননি। অথচ হাজার বছর ধরে সুফি নেতৃত্বে বাংলাদেশের বদ্বীপাঞ্চলে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, নদীর ভাঙ্গাগড়ার খেলা আর বন্যা-বাদ্যা সমুদ্রের গর্জনের মধ্যে যে স্বনির্ভর কৃষি সভ্যতার বিস্তার ও বিশাল জনপদ গড়ে উঠেছে, তার কৃতিত্ব হাজী সোলাইমান এর মতো সর্দারের পিছনে দলে দলে পশ্চিমাগত আশেকে রসূল কৃষিজীবি, তন্তুজীবীদের

৭২ James Taylor, *A Skectch of the Topography and Statistics of Dacca*(Calcutta : G.H. Huttmann, Military Orphan Press, 1840), p. 192

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি উত্তারাঞ্চল থেকে আগত আদি বৌদ্ধ, নমঃশূদ্রে পরিণত দাস শ্রেণির বহুসংখ্যাক নিম্ন বর্ণের মানুষের, যারা সত্যপীর, পাঁচপীরের ভক্ত হয়ে মুসলিম কৃষকের সুখ-দুঃখের সাথী হিসেবে বদ্বীপাঞ্চলে সমাজ শৃঙ্খালা রক্ষা করে চলেছে। মধ্যযুগীয় কাব্য আর পুঁথি সাহিত্যে তার সক্ষিপ্ত বর্ণিত। অধুনা পদ্মানদীর মাঝি গ্রন্থেও একই ভুবাসন প্রক্রিয়ার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।[৭৩]

যুগের প্রভাবে মক্কা-মদিনা প্রত্যাগত হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। প্রথমে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লী সমাজে ধর্মীয় আচার-আচারণের পবিত্রতা পুনরুদ্ধার। এদিক থেকে তার চিন্তা ধারায় ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্য দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা আলেমদের ভাবধারার অনেক মিল ছিল, তবে অমিলও ছিল। মুসলিম নিপীড়ক রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ বা অসম যুদ্ধে শাহাদত বরণে তার উৎসাহ ছিল না। কোম্পানি আমলের নৈরাজ্য এমন যুদ্ধ অনেক ঘটেছে। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা, ফকির বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, রংপুর বিদ্রোহ এসবই ছিল সমসামিয়িক ঘটনা। এসব খণ্ড যুদ্ধের প্রায় কোনোটিই বৃথা যায়নি। আন্যায়-অত্যাচার কিছুটা কমেছে, কৃষক সমাজের প্রতিরোধ চেতনাকেও জাগ্রত করেছে এসব ঘটনার প্রভাব। ফকির বিদ্রোহের গুপ্ত তৎপরতা ক্ষীণ ফল্গুধারায় প্রান্তক অবস্থানে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত হয়তোবা টিকে ছিল, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পর আর মাথা তুলতে পারেনি। তবে স্মৃতিটুকু ছাড়া তেমন কোনো টেকসই অবদান ঐসব বিদ্রোহীদের আত্মত্যাগ থেকে আদায় হয়নি। কারণ নামমাত্র হলেও কোম্পানি আমল ছিল দিল্লির মসনদের বৈধ উত্তরাধিকারীর বাদশাহী সনদপ্রাপ্ত রাজশক্তি। সে রাজশক্তির বৈধতা বা অবৈধতার পশ্নে কোনো পক্ষ নেননি হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)।[৭৪]

বহিঃশক্তি আরোপিত অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে ছিল তার নৈতিক বলের প্রতিরোধ, আর সেই প্রতিরোধকে তিনি প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন ফরায়েযী আন্দোলোনের সংঘশক্তির অসহযোগ কর্মসূচি দিয়ে। কৃষকের অসহযোগের জিদ নানাভাবে ভাঙবার ফন্দি, উৎখাতের নানা কারসাজি করেও শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছে অনেক জমিদার। জমি-জিরাত হারিয়ে স্থানীয় প্রশাসনে নিযুক্ত বৃটিশ কালেক্টরের কাছ থেকে খাস জমি পত্তন নিয়েছে অনেক ফরায়েযী, তাতে জমিদারের লোকশান ঘটেছে। এভাবে ফরায়েযী আন্দোলনের নৈতিক বলের প্রভাব অক্ষুন্ন থেকেছে সিপাহী বিদ্রোহের পরেও আজ পর্যন্ত। তখন পল্লী সমাজের বিত্তবান বা জমিদার, তালুকদার মুসলিম পরিবার গুলির সন্তানদের ও ইংরেজি স্কুলে শিক্ষা নিতে খুব কমই পাঠানো হয়েছে। কারণ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার কোম্পানির নাজামত জারির পর মুসলিম কৃষক সমাজের আনুগত্য আদায়ে বৃটিশের জমিদাররা ইসলামি ব্যক্তি মর্যাদা ও অবাধ ধর্ম চর্চায় যে আঘাত

৭৩ মানিক বন্দোপাধ্যায়, *পদ্মা নদীর মাঝি*(ঢাকা : বর্ণায়ন, ২০০৪), পৃ. ৯০
৭৪ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত, *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

*Dhaka University Institutional Repository*

হানতে শুরু করে, তাতে এ অঞ্চলকে দারুল হারব বা যুদ্ধাক্রান্ত দেশ বলে ঘোষণা করেছিলেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। তার জের ১৮৭০ সলে পর্যন্ত চলছে। ইতিমোধ্যে সিপাহি বিদ্রোহের অবসানে ১৮৫৮ সালে একাধারে কোম্পানির নাজামত জব্দ করে এবং দিল্লির ভগ্যাহত কবি সম্রাট বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠিয়ে বৃটিশ সম্রাজ্ঞী সরাসরি বৃটিশ ভারতের শাসনভার হাতে তুলে নিয়েছেন।[৭৫]

ভগ্ন হৃদয় মোগল বাদশাহ গজল লিখেছেন, 'লগাতা নেহি হায় জি মেরা গুজরে দিওয়ার মে।'[৭৬] কিন্তু বাংলার কৃষকের অসহযোগের মনোবল ভাঙেনি। ফলে কিছুদিন বাদে পল্লী সমাজের কর্তা হিসেবে আরোপিত ক্ষামতা জমিদারের কাছে থেকে কেড়ে নিয়ে স্থানিয় প্রশাসনের অধীনে গ্রামে গ্রামে চৌকিদার নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে। তাতে জমিদারের নায়েব, গোমস্তা, পাইক, বরকান্দাজের দাপট সব জায়গায় তেমন না কমলেও অন্যয়ভাবে কোনো প্রজাকে ফুঁসলিয়ে তার নালিশ আর সাক্ষ্যের একটা জায়গা হয়েছে। আর জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে ছাতা মাথায় পথে চলা যাবে না বা আযান দিয়ে নামায পড়া যাবে না এমন অন্যায় নিষেধাজ্ঞা না মানলে বিশেষ করে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় মুসলিম চাষিদের অর হাঙ্গামার ভয়ে মাথা নিচু করে থাকতে হত না। এসব পরিবর্তনের হাওয়া পল্লী সমাজের সর্বত্র পৌঁছাবার আগেই বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বৃটিশ গভার্নরের আমন্ত্রণে ও আশ্বাসে মওলানা কেরামত আলী বিহার থেকে আরো কিছু আলেম সহকারে এসে কলকাতায়, ফরিদপুরে, ঢাকায়, আর দারুল হারব নয়, যুদ্ধাবস্থা শেষ হয়েছে, ইংরেজরা ওয়াদা দিয়েছে অবাধ ধর্মচর্চায় মুসলিমগণের কেউ বাধা দেবে না, সরকার তাদের সংস্কৃতি ও ধর্ম চর্চার নির্বিশেষে বর্তমান বাংলাদেশের মুসলিম ও নমঃশূদ্র কৃষক সমাজ ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সহযোগিতা শুরু করে, সন্তানদের ইংরেজি স্কুলে পাঠাতে শুরু করে।[৭৭]

এদিক থেকে বলা যায়, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ছিলেন এদেশের সর্বপ্রথম সংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী অসহযোগ আন্দোলনের সার্থক পথপ্রদর্শক। সিপাহী বিদ্রোহের সময় হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী দুদু মিয়াকে কোম্পানির রাজশক্তি বাংলার কৃষক সমাজের বিদ্রোহ বিস্তারের ভয়ে গ্রেফতার করে ইংরেজকে সহযোগিতা করেননি আবার অযোগ্য মোগল বাদশাহরও পক্ষ নেননি। কারণ বাংলার কৃষক কোন মুক্তির বাণী পায়নি বিদ্রোহী সিপাহীদের তরফ থেকে। মীর কাসিম আলী খানের পতনের পর নির্যাতিত বাংলার কৃষকের মুষ্টিভিক্ষায় পরাজিত নবাবের পলতক সৈন্যরা ফকির বিদ্রোহের যে গেরিলা যদ্ধ কয়েক দশক

---

৭৫ www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg, visited on 20.11.2012
৭৬ www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg, visited on 20.11.2012
৭৭ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত, *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

*Dhaka University Institutional Repository*

ধরে চালিয়ে যেতে পেরেছিল, মোঘল বাদশাহের মুখাপেক্ষী জনসমাজ বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহী সিপাহীরা এক বছরও তেমন প্রতিরোধ টিকিয়ে রাখতে পারেনি।

আবার সিপাহী বিদ্রোহের পর আত্মসর্মপন করে মোঘল আমির-ওমরাহরা এবং বাংলারও কিছু কিছু শরিফ পরিবার যেভাবে ইংরেজের পেনশন বা অন্য অনুগ্রহ লাভ করে কেউ লক্ষ্নৌ, কেউ কলকাতায় 'শতরাঞ্জ কি খিলাড়ি' অলস ভোগ সর্বস্ব জীবন যাপন করেছের, দুদু মিয়া কিংবা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর কোনো অনুচরই সেভাবে ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। অবাধ ধর্মচর্চা ও সাংস্কৃতির অধিকার এবং কৃষকের আত্মসম্মানের স্বীকৃতি আদায়ের শপথে তারা আরো এক যুগ বা বারো বছর অসহযোগ বজায় রেখেছেন। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে মিলিয়ে শতবর্ষ ব্যাপী বাংলার কৃষকের এ অসহযোগকে বলা চলে বিংশ শতাব্দীতে উপনিবেশিকোত্তর কালে একাত্তরের পহেলা মার্চ থেকে শুরু অসহযোগ এবং পরবর্তী পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময় দখলদার পশ্চিমা সৈন্যদের সঙ্গে বাংলাদেশের কৃষক সমাজের সক্রিয় অসহযোগের সমতুল্য। সেই অসহযোগ থেকেই সংগঠিত হয়েছে, প্রেরণা লাভ করেছে বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মুক্তিযোদ্ধারা। সেদিক থেকে বলা যায়, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) বাংলাদেশের আদি মুক্তিযোদ্ধা, এদেশ 'পিপল পাওয়ার' বা গণশক্তির প্রথম পথপ্রদর্শক। প্রায় তিনশো বছরের স্বধীন সুলতানি আমলে এমন গণশক্তির ঐক্য দিয়েই ঘোড়াঘাটে একতাল দূর্ঘ থেকে নদীর ওপাড়ে দিল্লির বিশাল সৈন্যদলকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন শাহী বাংলার প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস শাহ্। তুঘলকি সৈন্যদল নদী পার হতে নৌকার মাঝি খুঁজে পায়নি।[৭৮]

গণশক্তির সে ঐক্যের মনোবলকে ধরে রাখতে পারেনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে সুলতান মাহমুদ শাহ্, পরবর্তীতে বারো ভুঁইয়ারা ও ধরে রাখতে পারেননি, একে অপরকে পুরোপুরি আস্থায় না নিয়ে মোগলদের দোসর, রাজপুত মানসিংহের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ করে হেরে গেছেন। তাদের পরাজয় রণকৌশলের দুর্বলতার  অভাবের কারণে ঘটেনি, ঘটেছে গণঐক্যের অভাবের কারণে। গণঐক্যের পুনরুদ্ধার ইতিহাস দেখেছে বাংলার কৃষি সমাজের ঐতিহ্য ও মর্যাদা লঙ্ঘনকারী ফরায়েযী আন্দোলনে, অতঃপর আবারও দেখেছে ঊনিশ শত একাত্তরের মার্চ মাসে অসহযোগ আর তার ধারাবাহিকতায় প্রায় সালতামামি পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে। মধ্যযুগীয় সুফি সাধকেদের বংশানুক্রমিক উত্তরসূরিরা মোগল ও নবাবি আমলে এসে দরবারি চাল-চলনের সংস্পর্শে চরিত্রবলের অবক্ষয়ের শিকার হয়েছিলেন। পীরেরা তাদের মুরিদদের বা খানকায় আগত দোয়া প্রার্থীদের অধস্তন সেবক গণ্য করে আমজনতাকে আচারসর্বস্ব বোকা বানাতেন,

৭৮ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত, *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

*Dhaka University Institutional Repository*

তুচ্ছজ্ঞান করতেন। ধর্মীয় সদাচারের জন্য সর্বসাধারণের মধ্যে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর আবির্ভাব তাদের জন্য বিব্রতকর ছিল বৈকি।

পীর-মাশায়েখদের সঙ্গে ফরায়েযী সমাজের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক বিরোধকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট ছিল বৃটিশরাজ, কিন্তু তারা সফলকাম হতে পারেনি। কারণ কৃষকের আত্মমর্যাদা ও স্বজত্যাভিমানের যে বীজ তিনি বপন করেছিলেন, তার ব্যাপকতা অনুভব করে পীর-মাশায়েখরাও ইংরেজের কালচারের সঙ্গে তাল মেলানোর চেষ্টা না করে আশেকে রাসূলের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় মনোযোগী হয়েছেন। বিশেষ করে সিপাহী বিদ্রোহের পর হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর উত্তরাধিকারী দুদু মিয়ার সঙ্গে এক পা বোঝাপড়ার বদৌলতে সূফি প্রভাবিত বাংলাদেশের কৃষি সভ্যতার কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের তাগিদে ইংরেজি কায়দা-কানুন এড়িয়ে চলার এক ধরনের আধ্যাত্মবাদী দেয়াল পীর-মাশায়েখরাও খাড়া করেছেন। ফরায়েযী আন্দোলনের চোখ ঝলসানো আলোর জগতে প্রবেশ করতে ইংরেজের রাজকর্মচারী বা অনুরক্তি যারা রাজ রোষের ভয়ে ভীত হয়েছেন, তারাও পীরের খানকা বা দরগার খোলা দরজায় এসে ঐ আধ্যাত্মকাদি দেয়ালে হেলানো কিছুটা স্বজাত্যাভিমানের প্রসাদ লাভ করেছেন।[৭৯]

ধর্মনিষ্ঠ সমাজসংস্কারক হিসেবে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)এর ভূমিকা, তার জীবন বৃত্তান্ত ও আদর্শ নিয়ে অন্যান্য জ্ঞানী-গুণী গবেষকরা আলোকপাত করেছেন। ইতিহাস পাঠ্য ও সাধারণ জ্ঞানের উপলব্ধি থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক দাসত্ব আবদ্ধ বাংলার স্বনির্ভর জেলে, চাষি, কামার, কুমার ও কৃষিসমাজে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) আবির্ভাব ও তৎপরতার ঐতিহাসিক রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে এ সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন পেশ করা হল।

### ৭.২.৩ ফরায়েযী আন্দোলন প্রসঙ্গে জেম্স ওয়াইজের মূল্যায়ন

ঊনিশ শতক বাংলার বিশেষত পূর্ব বাংলার মুসলিমগণের আর্থ-সামাজিক জীবনে এক চরম অমানিশার যুগ। ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর থেকে এ যুগের শুরু। এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইংরেজ শক্তি ক্ষমতা দখল করেছিল মুসলিমগণের কাছ থেকে। ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই ইংরেজ শাসন ও তাদের নিয়ে আসা সংস্কৃতি মুসলিমগণের পক্ষে মেনে নেয়া কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য এটা ছিল ক্ষমতার পালাবাদল মাত্র। তারা ইংরেজ শক্তিকে সর্বতোভাবে সহায়তা করতে থাকে। ইংরেজদের বেনিয়া ও মুৎসুদ্দিগিরী করে হিন্দু সমাজের একাংশ প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হয়। অন্যদিকে ব্যবসা-বানিজ্য, সরকারি চাকুরি একের পর এক মুসলিমগণের হাতছাড়া হতে থাকে।[৮০]

---

৭৯ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত, *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

৮০ মোঃ আনোয়ার হোসেন, *ইতিহাসের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

১৭৯৩ সালে ইংরেজ শক্তির প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগ গ্রহণ করে হিন্দু দালাল, বেনিয়া ও মুৎসুদ্দি শ্রেণিটি নতুন জমিদার শ্রেণিতে পরিণত হয়। জীবন ও জীবিকার সব পথ হারিয়ে মুসলিম সমাজ পরিণত হয় রায়ত শ্রেণিতে। এ সময় থেকে বাংলার মুসলিম সমাজ দু'দিক থেকে চরমভাবে শোষিত হতে থাকে। শোষণ-নিপীড়নের শিকার হয় একদিকে ইংরেজ শক্তির এবং অপরদিকে হিন্দু জমিদার শ্রেণির। এ দ্বৈত শাসন-শোষণে বিশেষত পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ একটি হতদরিদ্র শ্রেণিতে পরিণত হয়। হিন্দু জমিদার শ্রেণি মুসলিম সমাজকে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করে। অধিকাংশ জমিদার মুসদর দাঁড়ির উপর খাজনা আরোপ করে। তাদেরকে পূজামণ্ডপে নাচতে বাধ্য করা হয়। হিন্দুদের অনুসরণে অনেক হিন্দু প্রথা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে। এক কথায় বলা যেতে পারে পলাশির যুদ্ধের অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যে পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ একটি হতদরিদ্র শ্রেণিতে পরিণত হয়। একই সঙ্গে তাদের জীবন ও সমাজ থেকে হারিয়ে যায় ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ইসলামের মৌলিক নীতিমালা। পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের এ চরম দুর্দিনে মুসলিমগণের মুক্তি সংগ্রামে এগিয়ে আসেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের নাম ফরায়েযী আন্দোলন। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলার মুসলিমগণের জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া কুরআন ও সুন্নাহ্র নীতিমালা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ফিরিয়ে আনা।[৮১]

১৮১৮ সাল থেকে শুরু হয়ে এ আন্দোলন চলতে থাকে গোটা ঊনিশ শতক ধরে। বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলন চলাকালে ঢাকার ইংরেজ সিভিল সার্জন ছিলেন জেমস ওয়াইজ। তিনি কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন এ আন্দোলন। তার লেখা একটি গ্রন্থে ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। নিচে ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কে জেমস ওয়াইজের ভাষ্য কয়েকটি পর্যায়ে পর্যালোচনা করা হল।

**প্রথম পর্যায় :** জেমস ওয়াইজের লেখা গ্রন্থটির নাম Notes on the Races, Castes and Traders of Eastern Bengal, বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়- পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ। গ্রন্থটি পাঠ করলে এটা বুঝা যায় যে একজন পেশাদার চিকিৎসক হিসেবে তিনি পূর্ববঙ্গের মানুষের বিভিন্ন পেশার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। জাতি, বর্ণের বিষয়টি হিন্দু সমাজের বেলায় প্রযোজ্য হলেও মুসলিম সমাজের বেলায় প্রযোজ্য নয়। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে অর্থে, বিত্তে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর ও অজ্ঞ মুসলিমগণকে হিন্দু সমাজের অনেক প্রথা তাড়িত করেছিল। জাতি ও বর্ণভেদ প্রথার বিষয়টি মুসলিমগণের মাঝে প্রবল না হলেও শ্রেণীভেদের বিষয়টি বর্তমান ছিল। জেমস ওয়াইজের বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৪ সালে লন্ডনের সেন্ট মার্টিন লেনের হ্যারিসন এন্ড সন্স থেকে।

---

৮১ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 20

*Dhaka University Institutional Repository*

লেখক জেমস ওয়াইজের নাম এবং প্রকাশকের নামের মাঝে মুদ্রিত আছে অপ্রকাশিত। পাশেই হাতে লেখা গ্রন্থটির মাত্র ১২ কপি মুদ্রিত হয়েছিল। মুদ্রিত বইয়ের একটি কপি জেমস ওয়াইজ তৎকালীন নামকরা ইংরেজ ঐতিহাসিক হেনরি বেভারিজকে দিয়েছিলেন, আর বেভারিজ ১৬ এপ্রিল ১৯২৩ সালে গ্রন্থের সে কপিটি লন্ডন মিউজিয়ামকে দেন। বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত গ্রন্থের এ কপিটির ফটোকপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। জেমস ওয়াইজ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুধু তার কর্মপরিচিতি পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন ঢাকার সিভিল সার্জন। ইতিহাসবিদ প্রফেসর শরীফউদ্দীন আহমেদ প্রদত্ত দুটি রিপোর্টে (১৮৬৬-১৮৬৮) প্রতীয়মান হয় যে তিনি উনিশ শতকের ষাটের দশকে ঢাকার সিভিল সার্জন ছিলেন। ১৮৭১ সালে জেমস ওয়াইজ হেনরি ম্যানকে ঢাকা থেকে আরবি ও ফারসি শিলালিপি পাঠিয়েছিলেন।[৮২]

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের জনক হিসেবে খ্যাত স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম লিখেছেন যে, তিনি মধ্যযুগের বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও এর প্রত্নিদর্শন পরিদর্শনকালে জেমস ওয়াইজ শুধু যাতায়াতের ব্যবস্থা করেননি, তার সাথে পরিদর্শনেও গিয়েছিলেন। এ তথ্যগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে জেমস ওয়াইজ ইতিহাসে ব্যাপকভাবে আগ্রহী ছিলেন। প্রফেসর মুনতাসীর মামুন লিখেছেন যে ষাটের দশক থেকে ঢাকা শহরের পুনরুজ্জীবন শুরু হয়, অন্তত বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে। এ সময় সংবাদ সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়, সভা-সমিতির বিকাশ ঘটে, স্কুল প্রতিষ্ঠা ও মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়। তাই স্পষ্টতই বলা যায় যে জেমস ওয়াইজ ছিলেন এ ঘটনাপ্রবাহ ও সমাজ বিবর্তনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। উনিশ শতকে ঢাকায় তিনজন ওয়াইজের নাম পাওয়া যায়।[৮৩]

১. একজন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ওয়াইজ।
২. অপরজন সিভিল সার্জন ওয়াইজ।
৩. তৃতীয় ওয়াইজ হলেন অত্যাচারী জমিদার ও নীলকর ওয়াইজ।

পূর্ববঙ্গে ছিল তার বিশাল জমিদারি। প্রচুর সম্পদের মালিক এ অত্যাচারি ওয়াইজের নামেই ঢাকার ওয়াইজ ঘাটের নামকরণ করা হয়েছে। এ নীলকর ওয়াইজের বাড়ি ছিল সদরঘাটে। পরবর্তীকালে এ বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত হয় বুলবুল ললিতকলা একাডেমী। ঢাকার সিভিল সার্জন ওয়াইজ পরবর্তী সময়ে এ নীলকর ওয়াইজের বাড়িতেই থাকতেন। জেমস ওয়াইজের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় বেরিয়ে আসে। তিনি পেশায় চিকিৎসক হলেও ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের প্রতি তার ছিল গভীর আগ্রহ। এজন্য হেনরি কিংবা স্যার আলেকজান্ডার কানিংহামের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এটাও অনুমান করা যায় যে ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত Notes on the Races, Cates and Traders of Eastern Bengal গ্রন্থটি জেমস ওয়াইজ লেখা সমাপ্ত ও প্রকাশ করেছিলেন অবসর

---

৮২ Board of Editors, *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* Ibid, p. 55

৮৩ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

*Dhaka University Institutional Repository*

গ্রহণের পর। পেশায় ডাক্তার হলেও ভারতে এসেছিলেন বৃটিশ সরকারের চাকরি নিয়ে। তৎকালীন ভারতে আগত বৃটিশ অফিসারদের কর্মক্ষেত্রে যোগদানের গড় বয়স ছিল একুশ/বাইশ। এ বিষয়টি জেমস ওয়াইজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকলে বলা যায় যে তিনি বাংলায় চাকরি নিয়ে এসেছিলেন ঊনিশ শতকের চল্লিশের দশকে। পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের জাতি, বর্ণ, পেশার বিবরণ তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি যখন বাংলায় আসেন এবং কর্মে নিয়োজিত তখন বাংলায় চলছে ফরায়েযী আন্দোলন। এ গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ফরায়েযী আন্দোলনের বিবরণ, আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং এ আন্দোলনের মূল চরিত্র উদঘাটনের প্রয়াস।

ওয়াইজের পক্ষে এ আন্দোলনের সামগ্রিক ঘটনাপ্রবাহ ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। তবুও ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস লেখার এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে জেমস ওয়াইজের বিবরণের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের অনুষঙ্গে জেমস ওয়াইজ বাংলার মুসলিম ইতিহাস নিয়েও আলোকপাত করেছেন। এটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে জেমস ওয়াইজ ছিলেন একজন অনুসন্ধানী মানুষ। মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গে চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রচুর মুসলিমগণের সাথে তার মেলামেশার সুযোগ ঘটে।[৮৪] স্বভাবত এ অবহেলিত মুসলিমগণের মাঝে তিনি লক্ষ্য করেন যে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস, ঐতিহ্য নিয়ে তাদের মাঝে বিষাদের ছায়া বিরাজমান। কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক বিধান তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়ায় তারা বেদনাহত। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে বাংলার মুসলিম সমাজ ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রিয়। তারা তাদের হারিয়ে যাওয়া ইসলামি ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে মরিয়া। প্রধানত এ পর্যবেক্ষণ থেকেই জেমস ওয়াইজ বাংলার মুসলিম সমাজের অতীত ইতিহাসের দিকে চোখ মেলে তাকান। বাংলার ইতিহাসের দিকে আলোকপাতে তিনি লক্ষ্য করেন যে এ গোটা অঞ্চলে রয়েছে মুসলিমগণের সুদীর্ঘ ইতিহাস। বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, প্রশাসন, অর্থনীতি, ভূমি ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলিমগণের রয়েছে মৌলিক অবদান। তবুও তিনি বাংলার ইতিহাসে ইসলাম প্রচারের বিষয়টি নিয়ে এক বিভ্রান্তিকর অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন।[৮৫]

তিনি বলেন যে বাংলায় ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতকে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে তরবারির জোরে।[৮৬] বস্তুত এ ব্যাধিতে জেমস ওয়াইজ একাই আক্রান্ত ছিলেন না, বাংলায় কিংবা ভারতে তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে, এ বক্তব্যটি ধারণ ও প্রচার করার বিষয়টি ভারতীয়

---

৮৪ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

৮৫ প্রাগুক্ত।

৮৬ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 1

*Dhaka University Institutional Repository*

হিন্দু ও ইংরেজ শিক্ষিত মহলের মানসিক রোগে পরিণত হয়েছিল। তারা ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও যুক্তি দিয়ে কখনোই বিষয়টি দেখার চেষ্টা করেননি। ভারতীয় হিন্দু পণ্ডিতদের একটা বড় অংশ ভারতীয় মুসলিমগণকে বহিরাগত মনে করেন। একই সঙ্গে তারা ইতিহাসের এ মহাসত্যটি ভুলে যান যে আর্যরাও ভারতে বহিরাগত। দ্রাবির, অস্টিক, কোল, বিল, সাঁওতাল আর হরিজনরা হল ভারতের আদি বাসিন্দা।[৮৭]

**দ্বিতীয় পর্যায় :** 'বাংলায় তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে'- জেমস ওয়াইজের এ বক্তব্য ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়। বাংলায় ইসলাম প্রচারিত হয়েছে আদর্শের জোরে। ইসলাম সমাজ জীবনের সর্বস্তরের ধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার দিয়েছে। ইসলামের এ সাম্য-মৈত্রীর বাণী এখানকার সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করেছে। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হলো, বাংলায় কিংবা ভারতে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে সূফী, দরবেশ, আওলিয়া, ওলামা-মাশায়েখগণ। এ ইসলাম প্রচারকদের জীবনে অর্থ ও বিত্তের প্রতি কোনো প্রকার লোভ-লালসা বা ঝোঁক একেবারে ছিল না। আর বাংলায় কিংবা ভারতে ইসলাম প্রচারে শাসকদের ভূমিকা ছিল একেবারে গৌণ। কখনো কখনো শাসক ইসলাম বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছেন, যেমন সম্রাট আকবর। তাই বলা যায় যে, বাংলায় তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে এ কথাটি জেমস ওয়াইজ বলেছেন অনেকটা প্রথানুগ ধারায় আবেগের বশবর্তী হয়ে। আবার উনিশ শতকে ইংরেজ শাসনের উপর দাঁড়িয়ে পূর্ব বাংলার জন জীবনের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করেন যে তখনো হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।[৮৮] তিনি বলেন যে এখনো হিন্দুদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণের কারণ হলো ইসলামের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ।[৮৯] এখানে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ মানেই হল ইসলামের আদর্শ, নীতি ও জীবনধারার প্রতি আকর্ষণ।

অধিকাংশ হিন্দু ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানীর মতে, মুসলিম শাসকদের হস্তক্ষেপে হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এটা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য নয়। জেমস ওয়াইজ বলেন যে, হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণি মুসলিম শাসনামলে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের যে সকল কারণ উল্লেখ করে থাকেন, ইংরেজ শাসনামলে তা সবই দূরীভূত হয়েছে, তবু কেন হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করছে।[৯০] এখানে জেমস ওয়াইজ আবেগবর্জিত হয়ে যুক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। কেন বাংলার মানুষ ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণ করেছে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করে জেমস ওয়াইজ লেখেছেন যে, বাংলায় কখনো পরিপূর্ণভাবে আর্য শাসন ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিভিন্ন

---

৮৭ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

৮৮ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 5

৮৯ Ibid.

৯০ Ibid.

*Dhaka University Institutional Repository*

সময়ে ভারত আক্রমণকারী  বিভিন্ন জাতির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গঙ্গানদীর পথ ধরে পূর্ব দিকে সরে এসেছে। ক্রমে বাংলা অঞ্চল আদিবাসী মানুষের একটি শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ বাংলা অঞ্চলে আর্যরা কখনো স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে অবনমিত নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। স্থানীয় জনগোষ্ঠির অনেক ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণকে বৈদিক ব্রাহ্মণরা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ফলে বাংলায় বৈদ্যিক ধর্ম কখনো শক্ত ভিত্তি অর্জন করতে পারেনি।

স্থানীয় জনগোষ্ঠির এ সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ সংগ্রামের মুখে বৈদিক ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণ গণমানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করত না। তাদের সাথে ব্রাহ্মণদের সামাজিক আদান-প্রদান ছিল না। উপরন্তু অত্যাচার, নিপীড়ন এবং অমানবিক আচরণ ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। ফলে বাংলার আদি জনগোষ্ঠির সাথে বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রেণির কোনো সামাজিক সম্পর্কই গড়ে উঠেনি।[৯১] জেমস ওয়াইজ বর্ণিত এ আর্থ-সামাজিক অবস্থা মুসলিম আগমণের পূর্বে বাংলায় বিরাজমান ছিল। অনুসন্ধানী মনের মানুষ জেমস ওয়াইজ বাংলায় মুসলিম সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন বাংলায় মুসলিম আগমনের প্রারম্ভিক পর্বে। বাংলায় মুসলিম বিজয়ের সময় ব্রাহ্মণ আর নিম্নবর্ণের মানুষের ভূমিকা ছিল পরস্পর বিপরীতমুখী। কুয়া এবং জলাশয়ের মালিক উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। মুসলিম সেনাদের আনন্দের সাথে বরণ করে নেয় এখানকার নিম্নবর্ণের মানুষ চণ্ডাল, কৈবর্ত ও আদিবাসীরা। অত্যাচারী, নিপীড়ক শাসকদলকে যারা আক্রমণ ও পরাভূত করেছে এখানকার সাধারণ মানুষ ছিল সে আক্রমণকারী মুসলিমগণের পক্ষে। বাংলায় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের মানুষদের নির্বাসিত করেছে গ্রাম থেকে। তাদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ মানবেতর জীবন যাপনে ছিল বাধ্য। দীনতা, হীনতা ছিল তাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন আর জন্তু-জানোয়ারের জীবনের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। মুসলিমগণের নিয়ে আসা ইসলাম ধর্মে ধনী, দরিদ্র, প্রভু, ভৃত্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামের মূল দর্শন হলো আল্লাহর কাছে সবাই সমান। ইসলামের দর্শন অনুযায়ী ইহকালের কর্মকাণ্ডের বিচার পরকালে হবে। এখানে জেমস ওয়াইজ ইতিহাসের গভীর সত্যটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন।[৯২]

মানব সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করলে এ সত্যটি বেরিয়ে আসে যে বহিরাক্রমণ মোকাবেলায় সাধারণ জনগণের সার্বিক সমর্থন ছাড়া যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। মুসলিমগণের বাংলা বিজয়ের ইতিহাসের এ সত্যটি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। হিন্দু ব্রাহ্মণ শাসক শ্রেণির সাথে সাধারণ মানুষের কোনো প্রকার সম্পর্ক ছিল না। অত্যাচারিত সাধারণ মানুষ দলে দলে মুসলিম

---

৯১ Ibid.

৯২ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, pp. 5-6

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমণকারীদের পক্ষ অবলম্বণ করেছে, তাদেরকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছে, নবাগতদের রাস্তা-ঘাট চিনিয়ে দিয়েছে। উপরন্তু মুসলিমগণের নিয়ে আসা ইসলাম গ্রহণ করেছে দলে দলে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মূল কারণটিই হলো সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তি। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান, ধর্মের উপর প্রত্যেকের সমান অধিকার, রাজা প্রজা একসঙ্গে বসার রীতি, বর্ণভেদ প্রথার অনুপস্থিতি, ধনী-গরিবের বৈষম্যহীনতা প্রভৃতি বাস্তব বিষয়াবলী বাংলার সাধারণ মানুষকে ইসলামের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। জেমস ওয়াইজ বাংলার দূর ইতিহাসের মূল সত্যটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

**তৃতীয় পর্যায় :** জেমস ওয়াইজ বাংলার মুসলিমগণের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে বেশ কিছু জায়গায় নিজের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে পারেননি। ফলে বেশ কিছু বিষয়ে তিনি অনুদার ভাবনায় আক্রান্ত ছিলেন। তিনি লিখেছেন যে উত্তর ভারত থেকে ব্যাপক হারে মুসলিম বাংলায় আসেনি এবং মুসলিম ইতিহাসে এটার উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৯৩] এখানে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মুসলিমগণের বাংলা বিজয়, বাংলায় বসতি স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত মূল ফরাসি পান্ডলিপি সমূহ তার হস্তগত হয়নি কিংবা তিনি ফারসি ভাষা জানতেন না। বাংলার ইতিহাসে এটা সুবিদিত যে বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের পর থেকে শুধু উত্তর ভারত নয়, ইরান, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মুসলিম বাংলায় এসে স্থানয়ভাবে বসতি স্থাপন করেছে। এটা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকার করতে হবে যে, বাংলার মুসলিমগণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হিন্দু বা লৌকিক ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হয়েছে। কিন্তু ধর্মান্তরিত মুসলিমগণ বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠির বিপুল অংশ কখনোই পরিণত হয়নি। যদিও ধর্মান্তরিত মুসলিমগণ তাদের ইসলাম গ্রহণপূর্ব জীবনের সমাজ সংস্কৃতির বিন্দুমাত্র ধারণ করেনি। ইসলামের উন্নততর জীবন দর্শন ও সংস্কৃতিতে অবস্থান করে তা ধারণ করা সম্ভবও ছিল না। বস্তুত বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর থেকে উত্তর ভারত, ইরান, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, আরব, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মুসলিম আগমনের যে ধারা শুরু হয় তা অব্যাহত ছিল ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ পর্যন্ত। বাংলায় মুসলিমগণের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ইংরেজ ও হিন্দুদের ঐতিহাসিকেরা উত্তর ভারত, ইরান, আফগানিস্তান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বাংলায় মুসলিমগণের আগমন ও বসতি স্থাপনের বিষয়টিকে অনেকটা এড়িয়ে যেতে চান। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা এটা করে থাকেন সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা থেকে। আর ভারতীয় হিন্দু ঐতিহাসিকেরা এ মনোভাব পোষণ করে থাকেন মানসিক দৈন্য এবং মুসলিমগণের কাছে পরাজয়ের ও শাসিত হওয়ার গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। ইংরেজ ও হিন্দু ঐতিহাসিকদের এ মনোভাবের একটি কড়া জবাব দিয়েছেন খন্দকার ফজলে রাব্বি।[৯৪]

১৮৯১ সালে প্রকাশিত 'হকিকতে মুসলমানে বাঙ্গালা' (বাংলার মুসলিম) গ্রন্থে তিনি তথ্য-প্রমাণ সহকারে উপস্থাপন করেছেন বহিরাগত মুসলিমগণের সংখ্যা। অবশ্য এ গ্রন্থটি জেমস ওয়াইজের গ্রন্থের পরবর্তী সময়ে লিখিত। ইতিহাসের কাল পরম্পরায় বহিরাগত মুসলিম এবং

---

৯৩ Ibid, p. 2

৯৪ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলিম উভয়ে মিলে আজ একাকার হয়ে আছে। আট শতকের অধিক কাল ইসলামের পতাকাতলে অবস্থান করে আজ বাংলার মুসলিম সমাজ একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে। সক্ষম হয়েছে একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠায়। তাই বাঙ্গালী মুসলিমগণের জীবনে এ সকল বিতর্ক আজ অপ্রাসঙ্গিক। বাংলার মুসলিমগণের ইতিহাস লিখতে গিয়ে জেমস ওয়াইজ উল্লেখ করেছেন যে দাস প্রথা ছিল মুসলিম শাসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এ দাস প্রথার মাধ্যমে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি করা হতো।[৯৫] প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে ইসলাম দাস প্রথা কোনো ক্রমেই অনুমোদন করেননি। খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে দাস প্রথা ছিল না। পরবর্তী মুসলিম শাসনে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, কোনো কোনো শাসকের আমলে দাস প্রথা চালু ছিল। এগুলো ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র। ইসলামের মৌলিক নীতিমালায় দাস প্রথার কোনো স্থান নেই। আর নবী মুহাম্মদের পরবর্তী অল্প সময়ে মধ্যেই ইসলাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকায় হাজার হাজার মানুষ ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল কিংবা বাংলা ইতিহাসের এ ধারার বাইরে ছিল না। কাজেই ক্রীতদাস বানিয়ে ইসলামে ধর্মান্ত করণের বিষয়টি ইসলাম বিস্তারের ইতিহাসে একটি হাস্যকর ব্যাপার। জেমস ওয়াইজের চিন্তা এখানে আবর্তিত হয়েছে খ্রিস্টান মিশনারীদের কর্মকান্ডের অভিজ্ঞতা থেকে। আরও একটি বিষয় জেমস ওয়াইজের চিন্তায় কাজ করেছে। সেটি হলো ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তার অজ্ঞতা। ইসলাম ধর্ম, এর দর্শন, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকলেও ওয়াইজ মধ্যযুগের বাংলার মুসলিম ইতিহাসের বিষয়ে এ জাতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন না।

জেমস ওয়াইজ বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কে লেখার পূর্বে বাংলার বিশেষত পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। বর্তমান আলোচনার অনুষঙ্গে তার প্রদত্ত জনসংখ্যার এ তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জেমস ওয়াইজ লিখেছেন যে এইচ ওয়ালটারের উদ্যোগে ১৮৩০ সালে ঢাকা শহরে প্রথম আদম শুমারি অনুষ্ঠিত হয়। এ জরিপে দেখা যায় যে, ঢাকা শহরের মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৬,৬৬৭ জন। এর মধ্যে মুসলিম ৩৫,২৩৩ জন এবং হিন্দু ৩১,৪২৯ জন।[৯৬] ঢাকা শহরের জনসংখ্যার এ হিসাব শিক্ষিত হিন্দু মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। কারণ হিন্দুদের ধারণা ছিল যে, ঢাকায় হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি। ১৮৩৯ সালের শেষের দিকে জেমস টেলর জানাচ্ছে যে, ঢাকা জেলায় হিন্দু-মুসলিম প্রায় সমান, কিন্তু ঢাকা শহরে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি। ১৮৭২ সালে ইংরেজ সরকার পরিচালিত সেন্সাস শুধু বাংলার নয় গোটা ভারতীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। এ সেন্সাস প্রতিবেদনে বেরিয়ে আসে যে পূর্ববঙ্গ মুসলিম প্রধান এলাকা। ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল মুসলিম প্রধান এলাকা। ঢাকা জেলায় হিন্দু জনসংখ্যা ৪৩.৩%। অন্যান্য জেলার অবস্থা একই রকম। জেমস ওয়াইজ ১৮৩০ সাল থেকে জনসংখ্যার এ হিসেবটি সম্ভবত এ কারণে উপস্থাপন করেছেন যে, ফরায়েযী আন্দোলনের মূল ঘাটি ছিল পূর্ববঙ্গ এবং বিশেষত উপরে উল্লেখিত মুসলিম প্রধান জেলাগুলো। এ সেন্সাসে বেরিয়ে আসে যে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর,

---

৯৫ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 3

৯৬ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 4

*Dhaka University Institutional Repository*

দিনাজপুর প্রভৃতি জেলাসমূহ মুসলিম প্রধান এলাকা। গোটা ঊনিশ ও বিশ শতকে পূর্ব ভারতে মুসলিমগণের আন্দোলন সংগ্রামের কেন্দ্র ছিল এ পূর্ববাংলা।

**চতুর্থ পর্যায় :** বাংলায় মুসলিম ইতিহাসের এ সুদীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনায় জেমস ওয়াইজ অনেক পীর দরবেশের কথাও বলেছেন। এটা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের মূল পটভূমি তৈরি হয়েছিল পলাশি যুদ্ধোত্তর কালে। জেমস ওয়াইজও এ আন্দোলন সংগ্রামের পটভূমি হিসেবে আলোচ্য সময়কালকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন যে, পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই বাংলার মুসলিমগণের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়। ১৭৬৫ সালে বাংলার দেওয়ানি শাসন বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা কোম্পানির হাতে আসার পর এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। মুসলিমগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ কাজীর পদ থাকলো নামে মাত্র।[৯৭] প্রকৃতপক্ষে তারা হলেন ক্ষমতাচ্যুত। কাজীদের সামাজিক মর্যাদা বহাল থাকলো না। তারা থাকলেন শুধু ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে। পীর, ফকির, আলেম, ওলামাদের প্রভাব হয়ে পড়লো সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ।

পঞ্চান্ন বছরের জন্য বাংলার মুসলিম সমাজ এতিম হয়ে পড়ল। পূর্ব বাংলার মুসলিমগণের দর্শীয় অবস্থা ম্রিয়মান। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে একটি দুর্বল শ্রেণিতে পরিণত হওয়ায় হিন্দু ধর্মের অনেক আচার-আচরণ মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। এ পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার মুসলিমগণের মাঝে আত্মপরিচয় ও নিজেদের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে আন্দোলনের দাবানল জ্বলে উঠে। বাংলায় মুসলিম সমাজের এ দুর্দিনে ইসলামের সুপ্ত মশাল প্রজ্জ্বলিত করে জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এগিয়ে আসেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)।[৯৮] এখানে জেমস ওয়াইজ ফরায়েযী আন্দোলন শুরুর ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন আন্দোলনের ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্বিক প্রয়োজনীয়তা। তারপর জেমস ওয়াইজ হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর পারিবারিক ও জীবনী তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন যে, তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন জোলা কিংবা তাঁতির ঘরে।[৯৯] এখানে জেমস ওয়াইজ তাঁর পূর্ণাঙ্গ পারিবারিক পরিচয় তুলে ধরতে পারেননি। হতে পারে এ বিষয়ে তিনি তথ্য পাননি কিংবা লোকমুখে প্রচলিত গল্প শুনে তিনি এ পরিচিতি লিপিবদ্ধ করেছেন। আঠারো শতকের শেষদিকে মাদারিপুর মহকুমায় একজন ছোট মুসলিম জোতদার ছিলেন, তার নাম আব্দুল জলিল তালুকদার। উল্লেখ্য যে এ মুসলিম তালুকদারদের সংখ্যা ছিল কম এবং এরা মুসলিম জমানার অভিজাত শ্রেণির শেষ ভগ্নাংশ। তখন মাদারীপুর মহকুমা ছিল বাখেরগঞ্জ জেলার অধীন। ১৮৭৩ সালে ইংরেজ সরকার এক আদেশ বলে মাদারিপুর মহকুমাকে ফরিদপুর জেলার অধীনে নিয়ে আসে। মোগল যুগে এলাকাটির নাম ছিল বন্দরখোলা পরগণা।

**পঞ্চম পর্যায় :** জেমস ওয়াইজ হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)এর মক্কায় গমণের পূর্ববর্তী জীবনকাল এবং মক্কায় অবস্থানকালে তার কর্মকান্ড সম্পর্কে খুব একটা আলোকপাত করতে পারেননি। এর মূল কারণ তাঁর সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাননি। জেমস এটা

৯৭ বদরুদ্দীন ওমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৯৮ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 21
৯৯ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 22

*Dhaka University Institutional Repository*

লিখেছেন যে মক্কায় অবস্থান করে তিনি ওয়াহাবী নেতাদের শিষ্যে পরিণত হন এবং বিশ বছর মক্কায় অবস্থান করে তিনি যখন দেশে ফিরে আসেন তখন তিনি একজন উঁচু মানের তর্কবাগীশ এবং খুবই উঁচুমানের আরবি পন্ডিত। তার বাংলায় ফিরে আসার সময়কাল ১৮২৩ সাল।[১০০] এখানে হাজী শরী'অতুল্লাহর মক্কায় অবস্থানকালে তার কর্মকান্ড সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। মক্কা শরীফে এসেই তার সাথে দেখা হয় মওলানা মুরাদের। মওলানা মুরাদ ইতিপূর্বে বাংলা ছেড়ে মক্কায় এসে বসবাস করতে থাকেন। তিনিও বাংলার মুসলিমগণের দূরাবস্থার বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। মওলানা মুরাদ মওলানা বাশারত আলী ও তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান এবং এখানেই স্থায়ীভাবে থাকার জন্য অনুরোধ করেন। এখানে অবস্থান করে হাজী শরী'অতুল্লাহ পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। ইসলামের ইতিহাস, সভ্যতা, ইসলামি আইন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মওলানা মুরাদের সাথে দুই বছর অবস্থান করে এ সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন।[১০১] এ সময়ে মাওলানা তাহির সম্বল আল মক্কী ছিলেন হানাফী ধারার একজন শক্তিমান পণ্ডিত। হাজী শরী'অতুল্লাহ তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তার নির্দেশে পড়ালেখা চালিয়ে যান। পরবর্তী একটানা চৌদ্দ বছর তিনি মওলানা মুরাদ ও মাওলানা তাহির সম্বলের অধীনে লেখাপড়ায় নিমগ্ন থাকেন। মক্কা শরীফে অবস্থানকালে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে আগত ইসলামি চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ, আলেম-ওলামা প্রমুখের সাথে মুসলিম বিশ্বের চলমান সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও ব্যাপক মতবিনিময় করেন। এ মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে অটোমান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দেশে দেশে মুসলিমগণের দূরাবস্থা এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এশিয়া আফ্রিকাতে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের স্বরূপ অনুধাবনের ব্যাপক প্রয়াস চালান। এ পর্যায়ে মক্কায় তার শিক্ষক মওলানা তাহির সম্বলের অনুমতি নিয়ে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গমণ করেন।

তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটানা দুই বছর অধ্যয়ন করেন। কায়রো থেকে তিনি ফিরে আসেন মক্কায় শিক্ষক তাহির সম্বলের কাছে। ইতিমধ্যে তার মক্কায় অবস্থানের ঊনিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি বাংলায় ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। ১৮১৮ সালে তিনি জেদ্দা থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। তখন তার বয়স ৩৭ বছর। জেমস ওয়াইজ লিখেছেন যে, তিনি ১৮২৩ সালে মক্কা থেকে ফিরে আসেন।[১০২] এটা সাধারণ তথ্যগত বিভ্রান্তি। তিনি লোকমুখে প্রচারিত গল্প থেকে এ তথ্যটি লিপিবদ্ধ করেছেন। জেমস ওয়াইজ তাঁর জীবনের একটি চমকপ্রদ কাহিনী তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। বর্ণিত কাহিনীতে জানা যায় বাড়ী ফেরার পথে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ডাকাত দলের হাতে পতিত হন। ডাকাতরা তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নেয়। মক্কা শরীফ থেকে নিয়ে আসা মূল্যবান গ্রন্থ, অনেক স্মৃতিচিহ্ন এবং অর্থ নিয়ে নেয়। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে তার নিয়ে যাওয়া সম্পদ ডাকাত দলের কাছ থেকে উদ্ধার করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয় তখন তিনি ডাকাত দলের সাথে মিশে যান। তাদের সাথে ডাকাতিতেও অংশ নিতে থাকেন। তার সহজ-সরল জীবন যাপন, সততা, নিষ্ঠা এবং ধর্মীয়

---

১০০ Ibid.

১০১ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

১০২ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 22

*Dhaka University Institutional Repository*

নিয়ম-নীতি পালনের নিয়মানুবর্তিতা ও কঠোরতা দেখে ডাকাত দলের সকলে তার শিষ্যে পরিণত হয়।[১০৩] এটা বলা বাহুল্য যে জেমস ওয়াইজ এ তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন লোক মুখে প্রচলিত গল্প থেকে। বিষয়টিকে একটি কাহিনী হিসেবেও ধরে নিলে বলা যায় যে জীবন সংগ্রামে হাজী শরী'অতুল্লাহর জীবনের সাথে এবং জীবন পথে চলার সাথে এ কাহিনীর অনেক মিল আছে। এ জাতীয় ঘটনা তার জীবনে খুব স্বাভাবিক বলেই প্রতীয়মান হয়। এ গল্পমূলক তথ্য থেকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে এ ঘটনা থেকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে তরুণ সমাজের মানবিক গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন। একই সঙ্গে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ইসলামের মৌলিক দর্শন ও চেতনা দিয়ে যুব সমাজকে আন্দোলিত করা সম্ভব। তিনি যখন বাড়ী আসেন তখন গ্রামের মানুষ তাকে চিনতে পারেননি। একমাত্র মৃত্যুপথযাত্রী চাচা আজিমউদ্দীন তাকে চিনতে পারেন। এরপর মাগরিবের নামাজের সময় হলে তিনি নামাজের আযান দেন। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে একজন মানুষও আযানে সাড়া দিয়ে নামায পড়তে আসেনি। নামাজের পর খবর নিয়ে তিনি জানতে পারেন যে মুসলিমগণ নামায পড়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কুরআন সম্পর্কে কিছুই জানে না। নামায পড়া তারা ভুলে গেছে। এ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শুরু হয় তাঁর সংগ্রামী জীবন।

মুসলিমগণের এ চরম দূরবস্থার কারণ জানার জন্য তিনি চলে আসেন কলকাতায় তার প্রবীণ শিক্ষক মওলানা বাশারত আলীর কাছে। তাঁর এ শিক্ষকের সাথে আলাপ-আলোচনায় জানতে পারেন যে বাংলার মুসলিমগণের এ দূরবস্থার জন্য দায়ী ইংরেজ শাসক ও হিন্দু জমিদার শ্রেণি। ৩৭ বছর বয়সে যখন তিনি দেশে ফিরে আসেন তখন শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানের সাধনায় তিনি একজন বড় মাপের আলিম। মুসলিম বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত একজন আলোকিত মানুষ। পূর্ববঙ্গের বেশ কয়েকটি অঞ্চল তিনি পরিদর্শন করেন মুসলিমগণের অবস্থা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য। তিনি মুসলিমগণের সাথে মিশে, তাদেরকে প্রত্যক্ষ করে এটা দেখতে পান যে বাংলার মুসলিম সমাজ ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। হিন্দুদের হাতে জমিদারী, অর্থনীতি এবং সামাজিক ক্ষমতা। হিন্দু জমিদার আর ইংরেজ শাসক সমাজের মাঝে গভীর স্বার্থের বন্ধন। মুসলিম সমাজ চরম দরিদ্র, অবহেলিত রায়ত শ্রেণি।[১০৪]

হিন্দু জমিদারের অত্যাচার, নির্যাতন এবং ধর্মীয় জীবনে হস্তক্ষেপের ফলে মুসলিমগণ ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গোটা অঞ্চলে গরু জবাই নিষিদ্ধ করেছে হিন্দু জমিদার শ্রেণি। মুসলিমগণের দাড়ি রাখার উপর কর আরোপ করেছে হিন্দু জমিদারগণ। হিন্দু জমিদাররা পূজার জন্য বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায় করছে মুসলিমগণের কাছ থেকে। মুসলিমগণকে পূজামন্ডপে নাচতে বাধ্য করছে। একই সঙ্গে হিন্দু জমিদারগণ অপকৌশলে অনেক হিন্দু সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ বাড়িয়ে দিয়েছে। মুসলিমগণ হিন্দুদের মত ধূতি পরিধান করে। তাদের মাথায় টুপি-দাড়ি অনুপস্থিত। মুসলিমগণ দেখা হলে একে অপরকে সালাম দেয় না। হিন্দু মুসলিমগণের মাঝে পার্থক্য নিরূপন করা কঠিন। মুসলিম সমাজের এ সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে হাজী শরী'অতুল্লাহ

---

১০৩ Ibid.

১০৪ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

*Dhaka University Institutional Repository*

(রহ.) এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মুসলিমগণের ইসলামের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে না পারলে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ সম্ভব নয়। তিনি এ সিদ্ধান্তে ও আসেন যে, কাজটি অত্যন্ত কঠিন। চারদিকে বিধর্মীয় হিন্দু প্রতাপশালী জমিদারদের মাঝে তাকে মিশন নিয়ে এগুতে হবে সর্বাত্মক সতর্কতার সঙ্গে। শুরুতেই কোনো সংঘাতে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না। আর কাজে নামতে হবে তাকে একাই। শুরুতেই মিলবে না কোনো সহযোদ্ধা। ইস্পাত কঠিন ঈমানের বলে বলীয়ান, আত্মপ্রত্যয়ী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তিনি একাই নেমে পড়েন তার মিশনে। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর পরিচালিত আন্দোলনের নাম ফরায়েযী আন্দোলন। ফরজ শব্দ থেকে ফরায়েযী শব্দের উদ্ভব। নামেই বুঝা যায় কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক ফরজ কাজগুলো মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজকে ইসলামের মূল ধারায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা ছিল এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

জেমস ওয়াইজ লিখেছেন যে তিনি তাঁর এলাকা ও আশপাশের মুসলিমগণের মাঝে নিঃশব্দে কয়েক বছর কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। এখানে মিশন পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি চরম প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন এবং সাফল্যের সাথে এ প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করে একদল মানুষকে তার মতে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন।[১০৫] জেমস ওয়াইজ নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন পূর্ব বাংলার হিন্দু জমিদারদের দাপট আর অত্যাচার। এ প্রতিকূল পরিবেশে আন্দোলন পরিচালনা করে তাঁর শিষ্যদের কাছে একজন আদর্শ মানুষে পরিণত হন। প্রসঙ্গ বলা প্রয়োজন যে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মক্কা শরীফে থাকা কালীন ওয়াহাবী ধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন। সাউদি আরবের আবদুল ওয়াহাব পরিচালিত এ ধারার মূল লক্ষ্য ছিল কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সকল কর্মকান্ড পরিচালনা। মুসলিম সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় অজ্ঞতা, ধর্মের নামে বহুমুখী কুসংস্কার, পীরপজা, করবপূজা প্রভৃতি সকল প্রকবার ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডকে ওয়াহাবী ধারা বর্জন করে। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ কুরআন ও সুন্নাহ ধারার মানুষ। তিনিও মনে করতেন যে বাংলা ও ভারত হলো দারুল হরব। তাই তিনি এখানে জুম'আর নামায, দুই ঈদের নামায এবং জাঁকজমকপূর্ণভাবে মহররম পালন বন্ধ করে দেন।[১০৬] একই সঙ্গে তিনি পীর ও মুরিদ শব্দ দুটির প্রয়োগ বন্ধ করে দেন এবং এর বদলে ওস্তাদ ও সাগরেদ শব্দ চালুর নির্দেশ প্রদান করেন।[১০৭] বস্তুত এ শব্দের সাথে প্রচলিত ছিল ইসলাম, কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী পীরপূজার আবরণ। একই সঙ্গে পীরের সামনে নতজানু হয়ে বসার প্রথা রহিত করেন।[১০৮] ইসলামের বিধান মোতাবেক একমাত্র আল্লাহর কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে নতজানু হওয়ার বিধান নেই। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তথ্য ও যুক্তি দিয়ে সাধারণ মুসলিমগণকে এটা বুঝাতে সক্ষম হন যে এ সকল প্রথা, কর্ম সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ তার এ বক্তব্যকে মেনে নেয় এবং দলে দলে বিদ'আতি কর্ম ছেড়ে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)এর নির্দেশিত পথে মূল ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকেন।

---

১০৫ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 22
১০৬ Ibid.
১০৭ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 22
১০৮ Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

**ষষ্ঠ পর্যায় :** ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইসলাম, কুরআন ও সুন্নাহর ধারায় পরিচালিত আন্দোলন পরিচালনার পাশাপাশি হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মুসলিমানগণের সমাজ জীবনে প্রচলিত কিছু কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও আন্দোলন পরিচালনা করেন। তখন বাংলার মুসলিমগণের ঘরে ঘরে নবজাতক সন্তানের নাভির নাড়ি কাটতো ধাত্রীরা। তিনি এ প্রথার তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, এ প্রথা হিন্দু সমাজ থেকে এসেছে। ধাত্রী দিয়ে নবজাতক শিশুর নাভীর নাড়ি কাটাকে পাপ বলে অভিহিত করেন।[১০৯] তাঁর এ ঘোষণা নিয়ে মুসলিমগণের মাঝে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ উত্তেজনায় হিন্দুরা ইন্ধন যোগায়। কিন্তু হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর কুরআন ও সুন্নাহর প্রশ্নে কঠোর অবস্থানের কারণে এ উত্তেজনা দূর হয়ে যায়। তিনি ঘোষণা করেন যে নবজাতক সন্তানের নাভির নাড়ি কাটা পিতার পবিত্র দায়িত্ব। তাঁর এ সিদ্ধান্তকে মুসলিম সমাজ মেনে নেয়। তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে মুসলিম সমাজকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দীক্ষিত করে তোলেন। গোটা এলাকাজুড়ে মুসলিমগণের মাঝে শুরু হয় নবজাগরণ। গ্রাম বাংলার মুসলিমগণ দলে দলে তার অনুসারী হতে থাকে। এ অবস্থায় হিন্দু জমিদার শ্রেণি ভীত-কম্পিত উঠে। হিন্দু জমিদার শ্রেণীর অর্থ দিয়ে, শত্রু লেলিয়ে দিয়ে, মুসলিম সমাজকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কর্মকান্ড পরিচালনার প্রয়াস চালায়। অর্থ দিয়ে ইংরেজ পুলিশকে হাত করে তার কাজের বাধার সৃষ্টি করে। জমিদারদের এ অপতৎপরতার মুখে তিনি শরিয়তপুর-মাদারিপুর অঞ্চল ছেড়ে ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ অঞ্চলের নয়াবাড়ীতে চলে আসেন।[১১০] নয়াবাড়ীকে ঘিরে তিনি কর্মতৎপরতা চালিয়ে যান। ফলে ঢাকা অঞ্চলে ফরায়েযী আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। জমিদারদের ষড়যন্ত্র তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের জন্য হয়ে উঠলো আশীর্বাদ।

হিন্দু জমিদার শ্রেণি ফরায়েযী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বহুমুখী তৎপরতায় লিপ্ত হলে তিনি সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে পুনরায় চলে আসেন মাদারিপুরে। তার কর্মতৎপরতা শুরু হয় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। গ্রামের কৃষক মুসলিমগণ দলে দলে তার অনুসারী হতে লাগলেন। ক্রমে ফরায়েযী আন্দোলনের এলাকা হয়ে দাঁড়ায় ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারিপুর, শরিয়তপুর, বাখেরগঞ্জ, নোয়াখালী, চাঁদপুর, কুমিল্লা, মোমেনশাহী, পাবনা, সিলেটসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

ঊনিশ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যেই ফরায়েযী আন্দোলন পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজকে কুরআন ও সুন্নাহর পথে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) পরিণত হন পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের অবিসংবাদিত নেতায়। মুসলিম গণমানুষের উপর তার প্রভাব অসশ এবং তার আদেশকে মুসলিমগণ শিরোধার্য মনে করতো। তিনি ছিলেন তৎকালীন একজন বড় মাপের আলেম। আরব দেশে সুদীর্ঘ অবস্থানের কারণে তার আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।[১১১]

ফলে তিনি খুব সহজেই সাম্রাজ্যবাদী ও হিন্দু জমিদারদের পারস্পরিক স্বার্থের বন্ধন এবং তাদের সম্মিলিত মুসলিম বিরোধিতার বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন

---

১০৯ Ibid.

১১০ Ibid.

১১১ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

*Dhaka University Institutional Repository*

একজন জ্ঞানী, বিচক্ষণ ব্যক্তি। অত্যন্ত ভেবেচিন্তে এবং সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতেন। মুসলিমগণের মাঝে কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে তারা ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে সরে আসতে থাকে। বিশেষত পূজামন্ডপে নৃত্য, পূজার জন্য চাঁদা প্রদান ইত্যাদি বিষয়কে ঘৃণা করতে থাকে এবং সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে। মুসলিমগণ ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি পরতে থাকে। একই সঙ্গে তাদের মাঝে দাঁড়ি রাখার প্রথা পুনরায় চালু হয়। সমাজ জীবনে একে অন্যকে দেখলে পুনরায় সালাম বিনিময় শুরু করে। মুসলিমগণের এ নতুন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং আত্ম পরিচয় খুঁজে পায়। এ পটভূমিতে পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন এবং ইসলামবিরোধী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে থাকে। এভাবে সময়ের বিবর্তনে ফরায়েযী আন্দোলন ধর্মীয় আন্দোলন থেকে ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। ঐতিহাসিক দিক থেকে বলা যায় যে পূর্ব বাংলার মুসলিমগণের জীবনে মাইল ফলক অধ্যায়ের সূচনা এখান থেকে।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে জেমস ওয়াইজ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। তার সময়ের ইংরেজ অফিসারদের মুসলিমগণের প্রশংসা কিংবা মুসলিমগণের কাজের ইতিবাচক মূল্যায়ন একটি ব্যতিক্রমী কাজ। এখানে জেমস ওয়াইজ তার মানসিক পরিপক্কতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তখনকার ইতিহাসের পাতায় হাজী শরী'অতুল্লাহর নাম সবিস্তারে উল্লিখিত হয়নি। অথচ তখনকার সময় ও বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে তার জীবনী পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে অবাক হতে হয়। নদী, খাল-বিলের দেশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজে কুসংস্কার ও ইসলাম ধর্মের বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সফলতা অর্জন সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন মুসলিম সমাজে ধর্মীয় ও নৈতিক বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে আনার জন্য। আর মুসলিম সমাজে শিক্ষা অভাবে, আর্থিক দৈন্যতা এবং অজ্ঞতার সুযোগে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অচলায়তন তৈরি হয়েছিল হিন্দু ধর্মের অসংখ্য দেবদেবী, অসংখ্য পূজা-পর্বন ও সামাজিক কুসংস্কারের প্রভাবে। পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ ইসলাম, কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রায় পুরো দেশ সরে গিয়েছিল। এটা অবাক ব্যাপার যে পূর্ববঙ্গের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে একেবারে পিছিয়ে পড়া অশিক্ষিত, নিরীহ, সহজ, সরল মুসলিমগণকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একত্রিত করে ইসলামের আলোয় উজ্জীবিত করে তোলেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। এ জন্য প্রয়োজন ছিল সৎ, চরিত্রবান ও দৃঢ়প্রত্যয়ী মানুষের, যিনি হবেন সাধারণ মুসলিমগণের একজন আপনজন এবং তাদের সুখ-দুঃখের প্রতি গভীর সহানুভূতি সম্পন্ন। পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজ তাঁকে কে পেয়েছিল সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে তাদের আপনজন হিসেবে। সাধারণ মুসলিমগণ তাকে বিশ্বাস করত এবং তার উপর ভরসা রাখত।[১১২]

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এবং তার পরিচালিত ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কে জেমস ওয়াইজের মূল্যায়ন নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ। এ মূল্যায়নের পেছনে কাজ রেছে জেমস ওয়াইজের

১১২ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 23

*Dhaka University Institutional Repository*

চিন্তার উদারতা এবং ঘটনা প্রবাহের নিকট পর্যবেক্ষণ। পেশায় একজন চিকিৎসক হওয়ার কারণে তিনি সাধারণ মানুষের সাথে সহজেই মেশার সুযোগ লাভ করেন। উপরন্তু ছিল তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চরম দুর্দশা। একটা বিশাল জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির লড়াইয়ে সফল নেতৃত্ব দিয়ে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) হয়ে উঠেছেন সত্যিকার অর্থেই ইতিহাসের নায়ক।[১১৩]

**সপ্তম পর্যায় :** হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মৃত্যুবরণ করেন ১৮৪০ সালে। তার মৃত্যুর পর ফরায়েযী আন্দোলনের হাল ধরেন পুত্র মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন দুদু মিয়া নামে। জেমস ওয়াইজ বলেন যে দুদু মিয়া ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। মানুষ হিসেবে একেবারে সাধারণ হলেও পূর্ব বাংলার মুসলিম জনসাধারণের উপর তার প্রভাব ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন পিতার চেয়েও প্রভাবশালী। আজও ফরিদপুর, মাদারিপুর, শরিয়তপুর, চাঁদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা, পাবনা, বরিশাল অঞ্চলে তার নাম কিংবদন্তি হয়ে আছে। পূর্ব বঙ্গে সুন্নি মুসলিমগণের সংখ্যা দেখলেই বুঝা যায় পিতা-পুত্র ইসলামের ভাবাদর্শ প্রচার করেছিলেন কতটা নিখুঁতভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে।[১১৪] এক কথায় বলা যায় যে, জেমস ওয়াইজের এ মূল্যায়ন যথাযথ।

দুদু মিয়া ১৮১৯ সালের শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মক্কা শরীফে চলে যান ছোটবেলায়। তিনি পড়ালেখা সম্পন্ন করেন মক্কা শরীফে। মক্কা শরীফ থেকে দেশে ফিরে পিতার পরিচালিত আন্দোলনে শামিল হন। পিতার মৃত্যুর পর দুদু মিয়া ফরায়েযী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তার সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ফরায়েযী আন্দোলনের বিস্তৃতি। তিনি পিতার পরিচালিত এ আন্দোলনকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। জেমস ওয়াইজের বিবরণে পাওয়া যায় যে, দুদু মিয়া ফরায়েযী আন্দোলনের অঞ্চল গুলোকে কতগুলো ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য নিয়োগ করা হয় একজন খলিফা। খলিফার মূল দায়িত্ব ছিল তার অঞ্চলের ফরায়েযীদের খোঁজ-খবর রাখা, তাদের কোনো সমস্যা হলে মোকাবিলা করা, নতুন নতুন অঞ্চলের মুসলিমাগণের ফরায়েযী ভাবাদর্শে দীক্ষিত করা, কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা, কেউ অসুস্থ হলে বা মহামারী দেখা দিলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সংগঠন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা এবং সংগঠনের সামগ্রিক বিষয়ে দুদু মিয়াকে সার্বক্ষনিক ভাবে অবহিত করা।[১১৫] জেমস ওয়াইজের প্রদত্ত এ তথ্য থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে দুদু মিয়া ফরায়েযী আন্দোলনকে পরিপূর্ণভাবে সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসেন। ফরায়েযীরা তাকে মৌলভী হিসেবে অভিহিত করতেন।[১১৬]

---

১১৩ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

১১৪ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 23

১১৫ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 23

১১৬ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

*Dhaka University Institutional Repository*

ফরায়েযী আন্দোলন গোটা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর বিরুদ্ধে হিন্দু জমিদার ও নীলকর শ্রেণি বহুমুখি ষড়যন্ত্র করতে থাকে। বস্তুত তখন থেকে হিন্দু জমিদার ও নীলকররা এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু হাজী তাঁর কৌশলের কাছে জমিদারদের এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দুদু মিয়া ফরায়েযী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলে জমিদার শ্রেণি পুনরায় ষড়যন্ত্র শুরু করে। জেমস ওয়াইজ লিখেছেন যে দুদু মিয়ার কোনো অনুসারীর উপর জমিদার তার অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করলেই জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয়া হতো, নতুবা তাকে শায়েস্তা করার জন্য লোক পাঠানো হত, তারা জমিদারের সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করত।[১১৭] জেমস ওয়াইজ প্রদত্ত এ তথ্য বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টি বেরিয়ে আসে তা হলো- তিনি হিন্দু জমিদারদের প্রদত্ত তথ্য থেকে এ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন কিংবা লোকমুখে প্রচলিত গল্প থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে সারা পূর্ব বাংলা হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের সহিংস অত্যাচারে জর্জরিত, অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের সমর্থক ইংরেজ সরকার, সাধারণ মানুষের উপর নীলকর ও জমিদারদের জুলুম, অত্যাচার চালানোর মূল শক্তি ছিল সরকারি পুলিশ বাহিনী-এ বাস্তব পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ফরায়েযীদের দ্বারা জমিদারকে হামলার বিষয়টি বা সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের বিষয়টি কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটা ঠিক যে পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজ ফরায়েযী আন্দোলনের ভিত্তিতে সংগঠিত-কিন্তু তাদের না ছিল শিক্ষা, না ছিল বিত্ত। তারা সকলেই ছিল রায়ত শ্রেণির। তাদের উপর জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার ছিল নিয়মিত। এমনকি জেমস ওয়াইজ প্রদত্ত তথ্য- ফরায়েযীরা জোরপূর্বক মুসলিম রায়তদেরকে দলভূক্ত করত, দলভূক্ত না হলে মারধর করা হত।[১১৮] এটা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এবং দুদু মিয়া সাধারণ মুসলিমগণের মাঝে কুরআন ও সুন্নাহর বাণী প্রচার করতেন, ইসলামের পতাকাতলে আসার আহ্বান জানাতেন, তাদের সামনে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরতেন। ফরায়েযীদের দলে যোগদান করা না করার বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। ফরায়েযী আন্দোলন নিয়ে প্রামাণ্য গবেষণায় জেমস ওয়াইজের প্রদত্ত এ তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় না বরং জেমস ওয়াইজের এ বক্তবের উল্টোটাই ছিল সত্য।

**অষ্টম পর্যায় :** হিন্দু জমিদার ও নীলকররা পূর্ব বাংলার মুসলিম প্রজাদের ফরায়েযী আন্দোলনে যোগদানে বাধা দিতেন। তাদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন করা হতো। জেমস ওয়াইজ লিখেছেন রায়তদের দাঁড়ির গুচ্ছ  শক্ত করে বেঁধে রাখা হত এবং নাকের মধ্যে মরিচের গুঁড়া ঢুকিয়ে দেয়া হত।[১১৯] বস্তুত হিন্দু জমিদার ও নীলকর শ্রেণি ফরায়েযী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিকভাবে বিরোধিতা করে চলতেন। ফরায়েযী আন্দোলনে যোগদানের কারণে রায়তদের উপর নিয়মিত অত্যাচার চলতো। কিন্তু দুদু মিয়ার বহুমুখি কৌশল, মুসলিম রায়তদের মানসিক দৃঢ়তা, ইসলামি আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা প্রভৃতি কারণে জমিদারদের বলপ্রয়োগ সম্পূর্ণ

১১৭ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 24

১১৮ Dr. Muin Uddin Ahmed Khan, *History of the Faraidi Movement in Bengal*(Dacca : 1961), p. 114

১১৯ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 24

Dhaka University Institutional Repository

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[১২০] দুদু মিয়া নতুন নতুন সাংগঠনিক কৌশল প্রয়োগ করে গ্রামের পর গ্রামে ফরায়েযী আন্দোলনকে বিস্তৃত করেন। এ পর্যায়ে প্রায় সমগ্র পূর্ববঙ্গ ফরায়েযী আন্দোলনের আওতায় চলে আসে। আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে চট্টগ্রাম এবং সিলেট অঞ্চলে। দুদু মিয়ার অনুসারীদের সকলেই ছিলেন গ্রামের কৃষক, রায়ত, মজুর। তাদের উপর দুদু মিয়ার প্রভাব ছিল ব্যাপক। জেমস ওয়াইজ বলেন যে, মানুষের মাঝে সমতাই ছিল দুদু মিয়ার কাম্য। ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় নির্বিশেষে মানবকল্যাণই ছিল তার আদর্শ। প্রতিবেশীদের বিপদে-আপদে, দুঃখে-কষ্টে তাদের খোঁজ-খবর নেয়া, দেখাশোনা করা সবারই কর্তব্য। এটাই সামাজিক বন্ধনের ভিত্তি, এর অন্যথা অপরাধ।[১২১] মূলত এটাই হলো ইসলামের মূলনীতি। কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)এর প্রবর্তিত ধারাকে দুদু মিয়া সাংগঠনিক ভাবে শক্তিশালী করে তোলেন। বলা যেতে পারে ঊনিশ শতকের চল্লিশের দশকে দুদু মিয়া ছিলেন পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের জননেতা।

দুদু মিয়ার অনুসারী বা পরায়েজীদেরকে সমাজে সাধারণভাবে হাজী নামে অভিহিত করা হতে জেম্‌স ওয়াইজ লিখেছেন যে, দুদু মিয়া সাধারণ মুসলিমগণের আদর্শিকভাবে এতটাই সংগঠিত করে তোলেন যে ইংরেজ জমিদার শ্রেণি ফরায়েযীদের ভয় করতো। জমিদার ও নীলকরগণ মুসলিম প্রজাদের বিরুদ্ধে মামলা করলে দুদু মিয়া নির্ভয়ে প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করতেন।[১২২] হিন্দু জমিদারদের মুসলিমগণের উপর অন্যায় আচরণ, অবিচার ও নির্যাতনের সবচেয়ে গুরুতর দিকটি হলো তাদের ধর্মীয় বিধি-নিষেধের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ। এ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে জেমস ওয়াইজ লিখেছেন যে হিন্দু জমিদার শ্রেণি তাদের দুর্গাপূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুসলিম রায়তদেরকে জোর পূর্বক চাঁদা দিতে বাধ্য করতে এবং তাদের উপর যে জোর-জুলুম করতেন তা ছিল চরম অন্যায়। এদিক থেকে বিচার করলে এটা বলতেই হবে যে হিন্দু জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে দুদু মিয়ার গ্রহীত মোকাবিলার পদক্ষেপ ছিল আত্মরক্ষা মূলক। মুসলিম সমাজ কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করবে এটা খুবই স্বাভাবিক। কুরআন, সুন্নাহ, ইসলাম মুসলিমগণের মৌলিক আদর্শ এবং জীবন পথের দর্শন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় দুদু মিয়া হাজার হাজার মাইল এলাকার মুসলিম সমাজের মৌলিক অনুভূতির সঙ্গে সাড়া দিয়ে তাদের পক্ষে মাঠে নামতেন।[১২৩]

এখানে অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে ঊনিশ শতকে দাঁড়িয়ে জেমস ওয়াইজ হলেন একমাত্র ইংরেজ কর্মকর্তা যিনি মুসলিমগণের ধর্মীয় বিষয়ে হিন্দু জমিদারদের হস্তক্ষেপকে চরম অন্যায় হিসেবে অভিহিত করেছেন। একজন চিকিৎসক হিসেবে সাধারণ মানুষের সাথে মিশে তিনি লক্ষ্য করেছেন এ বিষয়ে মুসলিমগণের ক্ষোভ এবং প্রতিশোধ পরায়ণতার দিকটি। মুসলিমগণ তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি অনুসারে জীবন-যাপন করবে এটাই স্বাভাবিক।[১২৪] কিন্তু হিন্দু জমিদারদের মুসলিমগণের সমাজ জীবনে অবারিত হস্তক্ষেপের বিষয়টি ছিল চরম নীতি ও

---

১২০ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 24
১২১ Ibid.
১২২ Ibid.
১২৩ Ibid.
১২৪ Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতা বিরোধী।[১২৫] আর এ বিষয়টির সূত্র ধরেই বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের যে অবনতির ধারা সূচিত হয় তা চলতে থাকে পরবর্তী দশকের পর দশক ধরে। দুদু মিয়া হিন্দু জমিদারদের সামাজিক অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, এ দুনিয়ার মালিক আল্লাহ। জমির উপর কর ধার্য করার অধিকার কারো নেই। তাঁর এ ঘোষণা সাধারণ মুসলিম সমাজকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। খাস জমির উপর কৃষকরা বসতি গড়ে তুলতে থাকে।[১২৬] দুদু মিয়ার এ ঘোষণা জমির মালিকানার উপর জমিদার, নীলকরদের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলিম সমাজকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে তোলে।

ফরায়েযী আন্দোলনের নেতা দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অজুহাতে, বিভিন্ন অভিযোগ এনে হিন্দু জমিদার শ্রেণি রায়ত ও কৃষকদেরকে উত্তেজিত করে তুলতে থাকে। কিন্তু হিন্দু জমিদার শ্রেণি মুসলিম জনসাধারণকে তার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। পরিশেষে হিন্দু জমিদার শ্রেণি কৌশল পরিবর্তন করে তার বিরুদ্ধে একটির পর একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করতে থাকে। দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে গ্রামের কয়েকটি বাড়িতে লুটপাটের অভিযোগ এনে ১৮৩৮ সালে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু হিন্দু জমিদারগণ এ ঘটনার পক্ষে আদালতে কোনো সাক্ষি হাজির করতে পারেনি। ফলে মামলা বাতিল হয়ে যায়।

১৮৪১ সালে কয়েকজন হিন্দু জমিদার মিলে দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করে। কিন্তু ইংরেজ সেসন কোর্টে এ হত্যা মামলা প্রমাণিত হয়নি। ফলে বেকসুর খালাস পেয়ে যান দুদু মিয়া। পরপর তিনটি মামলায় হেরে যাওয়ার পর হিন্দু জমিদাররা তাকে ঘায়েল করার জন্য কৌশল পরিবর্তন করে। অবৈধ সমাবেশ করার অভিযোগে দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা করা হয় ১৮৪৪ সালে। হিন্দু জমিদারদের ধারণা ছিল অবৈধ সমাবেশ করার বিষয়টি ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কঠোরভাবে গ্রহণ করবে, কেননা অবৈধ সমাবেশ প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ শক্তিকেই চ্যালেঞ্জ করে। কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে এ মামলাও কার্যকর করা যায়নি। ১৮৪৬ সালে তাঁর বিরুদ্ধে লুটপাট ও মানুষ হত্যা করে গুম করার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়।[১২৭] ইংরেজদের প্রচলিত আইনে এ অভিযোগ ছিল গুরুতর অপরাধ। কিন্তুএ অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য কোনো প্রকার তথ্য-প্রমাণ বা সাক্ষী পাওয়া যানি। কোর্ট থেকে বেকসুর খালাস পান দুদু মিয়া। ১৮৪৮ সালে  তাঁর বিরুদ্ধে হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঙ্গার অভিযোগ সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে বাতিল হয়ে যায়।

**নবম পর্যায় :** হিন্দু জমিদার শ্রেণি দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা করার কারণটি ছিল তাকে বিপদাপন্ন অবস্থায় ফেলতে পারলে ফরায়েযী আন্দোলনকে নেতৃত্বহীন ও দুর্বল করা যাবে। কিন্তু দুদু মিয়ার সততা, নিষ্ঠা, আন্দোলন ও কর্মকান্ড পরিচালনায় বাস্তব কৌশল এবং মুসলিম জনসাধারণের মাঝে তার অসাধারণ জনপ্রিয়তা হিন্দু জমিদারদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেয়। তার নিবাস বাহাদুরপুর গ্রামে ছিল শক্ত অবস্থান। প্রত্যেকটি মানুষ ছিল দুদু মিয়ার ব্যাপারে আপোষহীন। তিনিও সাধারণ মুসলিমগণের ভালোবাসতেন আপনজনের মত। এত

১২৫ বদরুদ্দীন ওমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

১২৬ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 24

১২৭ Ibid, p. 25

Dhaka University Institutional Repository

ষড়যন্ত্র মূলক মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে দুদু মিয়ার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যায়। ফরিদপুর জেলার পঞ্চচূড়া অঞ্চলের অত্যাচারী নীলকর এম. এ. ডানলপ ছিলেন দুদু মিয়ার চরম শত্রু। ডানলপ ফরায়েযী আন্দোলনের গতি থামিয়ে দেয়ার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ডানলপ কয়েকবার দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে সরকারি আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন।[১২৮] এ ডানলপের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দুদু মিয়া ১৮৪৬ সালে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে নীলকর ডানলপের কুটির সম্পূর্ণ ধবংশ করে দেন। ডানলপের ব্রাহ্মণ গোমস্তা দুদু মিয়ার বাহিনীর হাতে নিহত হন। ডানলপের মামলায় দুদু মিয়া ও তার ৬০ জন সহযোদ্ধাকে ফরিদপুরের দায়রা আদালত শাস্তি দেয়। কিন্তু দুদু মিয়া দমে থাকার পাত্র নন। ফরিদপুরের দায়রা আদালতের বিরুদ্ধে ১৮৪৭ সালে তিনি সদর আদালতে আপিল করেন। সদর আদালত উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে এবং ত্রুটিপূর্ণ মামলা পরিচালনার কারণে দায়রা আদালতের এ রায় বাতিল করে দেয়। দুদু মিয়া পিতা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)র আদর্শের পথ ধরে ফরায়েযী আন্দোলন পরিচালনা করেন।

১৮৫৭ সালে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। বিশাল বাহিনী নিয়ে দুদু মিয়া ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন, এ আশঙ্কায় সরকার ১৮৫৭ সালে তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেয়। এ যুদ্ধকালীন দুদু মিয়া সর্বদাই ইংরেজ সরকারের কড়া নজরে ছিলেন। লড়াকু জীবনের দীর্ঘ পথ চলতে চলতে এক পর্যায়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন জীবনযোদ্ধা দুদু মিয়া। জেমস ওয়াইজ লিখেছেন তার মৃত্যু হয় ১৮৬০ সালে বাহাদুরপুরে এবং তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গনে তার কবর ও বাসস্থান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[১২৯] দুদু মিয়ার মৃত্যু সম্পর্কে জেমস ওয়াইজের কাছে পূর্ণাঙ্গ তথ্য ছিল না বলেই মনে হয়। লোকমুখে শোনা গল্পের উপর ভিত্তি করে জেমস ওয়াইজ এ মন্তব্য করেছেন। প্রকৃত ঘটনা হলো এ যে ১৮৫৭ সালে ভারতীয় প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের দিনগুলোয় ইংরেজ সরকার তাকে বার বার গ্রেফতার করে চলছিল। এ সময়টিতে দুদু মিয়া ঢাকা শহরের বংশালে নিজ বাড়িতে অবস্থান করতেন। তার জীবনের শেষ দিনগুলো এখানেই অতিবাহিত হয়। ১৮৬২ সালে দুদু মিয়া নিজ বাড়িতে ইন্তিকাল করেন এবং বাড়ীর প্রাঙ্গণেই তাকে সমাহিত করা হয়। এখনও ঢাকার বংশালে দুদু মিয়ার কবর আছে।[১৩০]

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) থেকে দুদু মিয়া পর্যন্ত (১৮১৮-৬২) পূর্ব বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের মূল অধ্যায়। এ সময়কালের পরেও ফরায়েযী আন্দোলন চলতে থাকে। তবে আন্দোলনের গতি ও তীব্রতা কমে আসে। এ ফরায়েযী আন্দোলনের ধারা চলতে থাকে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ পর্যন্ত। বাংলাদেশ পর্যায়েও ফরায়েযী আন্দোলনের একটি ধারা অব্যাহত আছে। পূর্ব বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের মৌলিক অবদান হলো মুসলিম সমাজের মাঝে কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামের মৌলিক নীতিমালা পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এ আন্দোলন বাঙালি মুসলিম সমাজকে ইসলামের ইতিহাস, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করিয়ে দেয়।

১২৮ James Wise, *Notes on the Races custes and trades of Eastern Bengal*, Ibid, p. 25

১২৯ Ibid, p. 26

১৩০ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনুঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ জুন ২০০৭), পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

পলাশির যুদ্ধের পর থেকে বাংলার মুসলিম সমাজ জীবনে যে মারাত্মক অবনতির সূচনা হয়েছিল তা রোধ করে দেয় ফরায়েযী আন্দোলন। ফরায়েযী আন্দোলনের সময়ে পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ ছিল শিক্ষা-দীক্ষায় একেবারে পিছিয়ে। ফলে এ আন্দোলনের কোনো বিবরণ মুসলিমগণের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। শিক্ষিত হিন্দু সমাজ এবং হিন্দু পত্র-পত্রিকা ফরায়েযী আন্দোলনকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছে এবং এ আন্দোলন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করেছে। শিক্ষিত হিন্দু শ্রেণীর মূল লক্ষ্য ছিল এ আন্দোলন সম্পর্কে ইংরেজ শাসকদেরকে ক্ষিপ্ত ও নেতিবাচক করে তোলা। ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য বিবরণ হলো জেমস ওয়াইজের বর্তমান গ্রন্থটি। জেমস ওয়াইজ তুলে ধরেছেন পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজে এ আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তৃতি, প্রভাব এবং ফলাফল। তার লেখনীতে উঠে এসেছে হাজী শরী'অতুল্লাহ ও পীর দুদু মিয়াদের চরিত্রের অসাধারণ নেতৃত্বের গুণাবলী, ধৈর্য, সাহস এবং ঈমানের বলে এগিয়ে চলার দিকটি। তিনি দেখিয়েছেন হিন্দু জমিদারদের মুসলিমগণের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ এবং এ হস্তক্ষেপের ফলেই মুসলিম সমাজে ফরায়েযী আন্দোলনের সৃষ্টি। জেমস ওয়াইজ সামগ্রিকভাবে এ আন্দোলনকে ইতিবাচক হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। আন্দোলন সম্পর্কে মৌলিক তথ্যের অভাবে কিছু কিছু জায়গায় জেমস ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এগুলো অবশ্যই তার ইচ্ছাকৃত নয়।

ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কে সমকালীন ভাষ্য প্রায় নেই বললেই চলে। পূর্ব বাংলার জনজীবনের সাথে অবস্থান করে তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন ফরায়েযী আন্দোলন, আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি, আন্দোলনের নেতাদের কর্মকাণ্ড, সাধারণ মানুষের আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং সর্বোপরি আন্দোলনের আদর্শে বলীয়ান হয়ে লাখ লাখ মানুষের এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি। ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কে জেমস ওয়াইজের ভাষ্য একটি বস্তুনিষ্ঠ ও প্রামাণ্য দলিল।

*Dhaka University Institutional Repository*

# ৭.৩ বর্তমান প্রেক্ষাপট ও হাজী শরী'অতুল্লাহ

## ৭.৩.১ হাজী শরী'অতুল্লাহর লড়াই ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে দিগ্বিজয়ী সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির আগমনের মধ্য দিয়ে এ বঙ্গদেশে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়েছিল। অবিলম্বে এ অঞ্চলের সমাজ জীবনে ইসলামি সংস্কৃতির বিপুল বিকাশ বিস্তার ঘটে এবং ইসলামই হয়ে ওঠে এর প্রধান সমাজ ধারা। পরবর্তী সাড়ে পাঁচ শতাধিক বছর সময়কালে নানা প্রতিবন্ধকতা, ষড়যন্ত্র সত্তেও মুসলিমগণই রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে এ ভূভাগের প্রধান সামাজিক গোষ্ঠি হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বহু বিচিত্র কূটকৌশল ও সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে ক্রমশ সমগ্র ভারত বর্ষকে তাদের পদানত করে ফেলে। বৃটিশদের এ আগ্রাসন ও দখলদারিত্বের সূচনা হয়েছিল নানা সম্পদ সম্ভারে পরিপূর্ণ বাংলাকে সর্বাগ্রে কাজ করার মধ্য দিয়ে।

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পরে বাংলার মুসলিমগণের সার্বিক অবক্ষয় ও পরাজয়ের সূত্রপাত হয়। অতিদ্রুত মুসলিমগণ রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে, অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দখলদার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তাদের দেশীয় দালাল বা অনুচরদের প্রবল প্রতাপ ও চাপের মুখে মুসলিমগণ সামাজিক ও ধর্মীয় দিক থেকেও কোনঠাসা হয়ে পড়ে বলা যায়, অষ্টাদশ শতকের শেষ তিন-চার দশকের মধ্যেই বাংলার মুসলিমগন একটি অবদমিত, নির্যাতিত ও হতদরিদ্র সম্প্রদায়ে পর্যবসিত হয়। আকস্মিকভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া মুসলিমগণের একটি ভগ্নাংশের মধ্যে ঐতিহ্য চেতনা, আত্মবিশ্বাস, ধর্মীয় প্রেরণা ও স্বাধীনতার আকাঙ্খা তখনও জাগ্রত ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধার ও সামাজিক অবস্থান সংহত করার জন্য তারা বিচ্ছিন্নভাবে হলেও নানামূখী চেষ্টা চালিয়ে যায়। বিদেশী বণিক ও স্থানীয় হিন্দুদের সম্মিলিত চক্রান্ত ও সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে মুসলিমগণ কখনো সশস্ত্র লড়াই, কখনো সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। প্রথমদিকে প্রতিরোধ যোদ্ধার চেহারায় দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন নবাব নুরুদ্দীন, ফকির মজনু শাহ, টিপু পাগলা প্রমুখ। পরে সংস্কারকের বেশে আত্মপ্রকাশ করেন হাজী নিসার আলী তিতুমীর, হাজী শরী'অতুল্লাহ ও তাদের উত্তরসূরিগণ।[১৩১]

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যারা এ অঞ্চলে বিদেশীদের দখলদারিত্বের অবসান ও বেপরোয়া অর্থনৈতিক শোষন-লুন্ঠনের প্রতিবাদে এবং বিশেষভাবে মুসলিমগণের উপর শাসকগোষ্ঠির জুলুম নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তাদের অন্যতম হলেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) (১৭৮১-১৮৪০)।[১৩২] সে দুঃসময়ে বাংলা নিষ্পেষিত মুসলিমগণের রাজনৈতিক আকাঙ্খা, ধর্মীয়-আধ্যাত্মচেতনা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। চূড়ান্ত বিবেচনায় তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও ঔপনিবেসিক লুন্ঠনের

১৩১ ড. মোহাম্মদ আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, *হাজি শরিয়তুল্লাহর লড়াই ও আজকের প্রাসঙ্গিকতা*(ঢাকা : বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ২০১১), ২০৫

১৩২ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, ২০৬

*Dhaka University Institutional Repository*

বিরুদ্ধে এক দুর্ধর্শ প্রতিরোধ যোদ্ধা হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর কর্মধারাকে বুঝতে হলে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। পলাশির যুদ্ধের পূর্বে শতবর্ষ ধরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য ইউরোপীয় বণিত গোষ্ঠিগুলোকে পরভূত করে নিজেদের বাণিজ্যিক-অর্থনৈতিক প্রাধান্যকে অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছে। আর কৌশলে সুবাহ-বাঙালার শাসক গোষ্ঠিকে তাদের বানিজ্যের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করার তৎপরতায় লিপ্ত থেকেছে। সেই সাথে স্থানীয় দেশপ্রেমহীন অর্থগৃধনু একটি গোষ্ঠিকে তারা নানা সুবিধা প্রদান করে ও প্রলোভন দিয়ে হাত করে নিয়েছে। বিশেষভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুকে ঘিরে অবস্থানকারী স্বার্থান্ধ হিন্দু এলিট শ্রেণিটিকে বৃটিশ বনিকচক্র তাদের সহকর্মী-সহযোদ্ধা হিসেবে পাশে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। এদের সহায়তায় এদেশের দরবার রাজনীতির মধ্যে অনুপ্রবেশের আটঘাটও তারা বুঝে নিয়েছিল। মুসলিম জনসাধারণ এবং বিশেষভাবে মুসলিম শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে এসব ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বরাবরই ছিল গভীর বিদ্বেষ, সূক্ষ্ম প্রতিহিংসা ও ঐতিহাসিক আক্রোশ।

বিদেশী বণিকদের উপস্থিতি ও আশ্বাস, প্ররোচনা ও প্রেরণা স্থানীয় অমুসলিম এলিটদের শক্তি ও সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা গোপনে গোপনে হয়ে ওঠে বেপরওয়া, ষড়যন্ত্র পরায়ন ও প্রতিশোধ স্পৃহায় অদম্য। অন্যদিকে, দেশীয় এলিট শ্রেণির প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা লাভ করে শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা এ দেশীয় রাজনীতি তথা নবারে দরবারের উপর ক্রমশ নিজেদের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার স্পর্ধা দেখায়। এক পর্যায়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকদের দুঃসাহস, দৌরাত্ম এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মুখে দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজ-উদ্-দ্দৌলাহ পরাজিত ও নিহত হন। এ ঘটনা ছিল বাংলায় মুসলিমগণের গৌরবময় সাড়ে পাঁচশত বছরের শাসনের অবসান পর্ব। বস্তুত এ অঞ্চলের মুসলিমগণের রাজনৈতিক পতন, সামাজিক অবদমন, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও ধর্মীয় বিকৃতি-বিভ্রান্তির চূড়ান্ত দশা সূচীত হয় পলাশির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। অত:পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে বাংলায় একটি নব্য জমিদার শ্রেণির উদ্ভব হয়। এদের প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু এবং তাদের কেউ কেউ আবার ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হতে আগত ব্যবসায়ী, মহাজন প্রভৃতি। এ নব্য জমিদার শ্রেণিটি কৃষক প্রজা পীড়নে ছিল সদা খড়গহস্ত।

ততদিনে রাজনৈতিকভাবে উৎখাত হয়ে যাওয়ায় মুসলিমগণ শুধু অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্থ হয় নাই শিক্ষা-দীক্ষায়ও পিছিয়ে পড়েছিল। এ সময় মুসলিমগণের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে পথভ্রষ্ট ও নিশ্চিহ্ন করার চালায় প্রক্রিয়াও শুরু হয়। মূলত রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে মুসলিমগণের শিক্ষা ও স্বধর্ম বিমুখ করার সুচতুর প্রয়াস প্রতি পক্ষগুলো। মুসলিমগণের উপর তৌহিদবাদী চিন্তাচেতনা জীবনধারার বিপরীত সিদ্ধান্ত বা পৌত্তলিকতার ধ্যান-ধারণা আচার উপকরণ চাপিয়ে দেয়া হতে থাকে। শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত মুসলিমগণ ক্রমশ বিভ্রান্তির কবলে পতিত হয়। ইত্যবসরে পৌত্তলিকতা ও ইসলামের মধ্যে এক ধরনের সংশ্লেষণ সমন্বয়ের ধারণা হাজির করা হয়। অর্থাৎ ইসলামের বিশ্বাস ও আচরণের সঙ্গে পৌত্তলিকতার মিশ্রণের চেষ্টা চলে। ইসলামের মৌলিক - আমল আকিদা, আদব-কায়দা, ধ্যান-ধারণা ও দৈনন্দিন জীবনাচার এতে কুলষিত হয়ে পড়ে। বহুদিন শিরক, বিদ’আত, কুসংস্কারের অনুপ্রবেশের ফলে ইসলামি

Dhaka University Institutional Repository

জীবনযাত্রা ঢাকা পড়ে যেতে থাকে।[১৩৩] সমুজ্জ্বল ইসলামি ভাবধারা থেকে ছিটকে পড়ে মুসলিমগণ। অনতিবিলম্বে মুসলিমগণ ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক বিভ্রান্তি বিকৃতির মধ্যে পতিত হয়। প্রতিবেশী মূর্তিপূজারীদের নানা আচার, প্রথা, উৎসব, ভ্রান্ত বিশ্বাস, কুসংস্কার মুসলিমগণের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। বাংলার মুসলিমগণের বিশ্বাসে, আচরণে, উৎসবে-আয়োজনে অনৈসলামিক রীতিকরণ, ধ্যান-ধারণা একাকার হয়ে মিশে যায়।

ইংরেজ অনুগৃহীত, নব উত্থিত হিন্দু এলিট সম্প্রদায় তাদের ঐতিহ্যগত বৈদিক-পৌত্তলিক যোগযজ্ঞ ও রীতি-প্রথার সাথে ইসলামি তৌহিদবাদী ভাবধারা সমন্বয়ের এক অদ্ভূত বাতাবরণ তৈরি করে ফেলে। ক্রমশ মুসলমানিত্বের সাথে হিন্দুত্বের মিশ্রণে এক অদ্ভূত জগাখিচুড়ী সাংস্কৃতিক ধারা গড়ে উঠতে থাকে। বাংলায় ইসলামের সাথে অনৈসলামিক বিশ্বাস ও আচরণের সমন্বয়ের প্রক্রিয়া সূচীত হয়েছিল আরো দুই শতাব্দী পূর্বে। বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে এ ভূখন্ডে ইসলাম  দ্রুত কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিব্যপ্ত হয়ে পড়ে। ইসলামের উদার বৈষম্যহীন ও মানবিক ভাবধারায় বিমুগ্ধ হয় দেশের জনসাধারণ। তারা আদি প্রকৃতিবাদী (Animist) আচার বিশ্বাসকে পরিহার করে দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। পুন্ড্রের সেন শাসকদের দ্বারা উৎপীড়িত অনেক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীও আশ্রয় নেয় ইসলামের ছায়াতলে। জাত-পাতের ভেদ বৈষম্য ক্ষুদ্ধ প্রপীড়িত কিছু কিছু হিন্দুও ইসলামে দীক্ষিত হয়ে থাকতে পারে। অনতিবিলম্বে অন্য সব কিছুকে ছাপিয়ে এখানে ইসলামি জীবনধারা হয়ে উঠেছিল সমাজের মূল স্রোত। বখতিয়ার খলজি হতে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসন শুরুর সময় পর্যন্ত প্রায় দুই শতাব্দীকাল ধরে ইসলাম ধর্ম এ ভূখন্ডে অব্যাহত গতিতে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু স্থানীয় হিন্দু সমাজপতি ও ধর্মাধিকরণেরা এ অবস্থা মেনে নিতে পারেনি। নবাগত ইসলামের প্রভাব, প্রতাপ ও বিপুল জনপ্রিয়তার মোকাবেলায় তারা প্রকাশ্য প্রতিবাদ গড়ে তোলার সাহস করে নাই। প্রাচীন প্রকৃতিবাদী ও বৌদ্ধানুসারীদের তুলনায় বৈদিক ধারার অনুসারী হিন্দুর সংখ্যা বাংলায় তখনও ছিল সামান্যই।

সামাজিক ভেদাভেদ ও বর্ণ বৈষম্যমূলক হিন্দুধর্ম প্রাচীন এ জনপদে গণ-গ্রহণযোগ্যতা লাভের আগেই লক্ষণ সেনের পতনের মধ্য দিয়ে ১২০৪ সালে হিন্দু শাসনের অবসান ঘটে, তাতে হিন্দু ধর্মের বিস্তারও থেমে যায়। এ অঞ্চলে মুসলিম বিজয়ের ফলে এবং তৃণমূল পর্যায়ে ইসলামের বিস্তার ও জনপ্রিয়তার কারণে পৌত্তলিকতার অনুসারীরা সমাজের একটি গৌণ ধারা হিসেবে টিকে থাকে। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময়কাল ১৪৯৩-১৫১৯ সালে এ পরিস্থিতি বদলে যায়। বাংলার ইতিহাসে একজন বিতর্কিত মুসলিম শাসক ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। তার পৃষ্ঠপোষকতা অথবা উদাসীনতার ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলায় হিন্দু নবজাগরণের সূচনা ঘটে। এ হিন্দু জাগরণের পুরোধা পুরুষ শ্রী চৈতন্যদেব হোসেন শাহের অকৃপণ আনুকূল্য লাভ করেন।

---

১৩৩ 'আরবি শিরক শব্দের অর্থ অংশীদারিত্ব, অংশীবাদ, বহু-ঈশ্বরবাদ, অংশ, ভাগ ইত্যাদি।' দ্র. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ১৩, সেপ্টেম্বর, ২০০৫), পৃ. ৫৯৯
বিদ'আত শব্দের অর্থ নতুনত্ব ও নতুন মত।' দ্র. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন শাহ স্বয়ং চৈতন্যের একজন ভক্ত হয়ে উঠেন। শ্রী চৈতন্য বৈষ্ণব ভক্তিবাদী ধারায় হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণের সূচনা করেন। এ সময়েই বাঙলায় ইসলামি ভাবধারা প্রথম ধাক্কা খায়। মুসলিমগণ সম্প্রদায় হিসেবে আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক কুজ ঝটিকায় পতিত হয়। রাষ্ট্রীয় আনুকুল্যে ও অনুমোদনে শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণববাদ হোসেন শাহের দরবার বা প্রসাদ থেকে নিভৃত পল্লী পর্যন্ত ছড়িয়ে পরে। এ অবকাশে হাজারো শিরক, বিদ'আত এবং বহুত্ববাদী বিশ্বাস, আচার, অর্চনা, কুপ্রথা, কুসংস্কার হিন্দুত্বের বলয় অতিক্রম করে মুসলিম সমাজকেও সংক্রমিত করে, দ্রুত আচ্ছন্ন করতে থাকে ইসলামি সমাজ-সংস্কৃতিকে। হিন্দু-মুসলিম মিলেমিশে একাকার হয়ে অভিন্ন বাঙালী হয়ে যাবার প্রণোদনা ছিল চৈতন্যের প্রচারণার মধ্যে। তার তৎপরতা অভিহিত হতে থাকে ভক্তি, প্রেম, ক্ষমা, সর্বজনীনতা হিসেবে। এ সময় হিন্দু সমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিকগণ তাকে 'হিন্দু রেনেসাঁ' বলে অভিহিত করেছেন।[১৩৪]

যদুনাথ সরকারের মতে শ্রী চৈতন্যের 'আবির্ভাব ও প্রারে বাঙালী মনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তার প্রেম ও ক্ষমার বাণীতে সমগ্র ভারতের মানুষ বিমোহিত হন। বাঙালীর হৃদয় মন সকল বন্ধন ছিন্ন করে রাধাকৃষ্ণের লীলা গীতিকার দ্বারা সম্মোহিত হয় বৈষ্ণব ধর্মের আবেগ-অনুভূতিতে, কাব্যে, গানে, সামাজিক সহনশীলতা ও ধর্মীয় অনুরাগে। এ মনের উচ্ছ্বাস পরবর্তী দেড় শতাব্দী যাবত অব্যাহত ছিল। আর এর মধ্যে দিয়ে সুষ্টি হয় হিন্দু রেনেঁসা। শুধু মধ্যযুগে বাংলায় নয় পরবর্তীকালে বিশাল ভারত বর্ষের অন্যত্রও এহেন সমন্বয়ের নামে বিভ্রান্তি বিকৃতির অনুমোদন, অনুশীলন, চর্চা চলছে। ইসলামকে আচ্ছন্ন করার চক্রান্ত হয়েছে বার বার। শুধু শ্রী চৈতন্য নন-নানক কবির দাদু একলব্য প্রমূখ সাধু পুরুষগণও ভারতে নানাভাবে সমন্বয়ের সংস্কৃতি প্রচলনের চেষ্টায় নিবেদিত ছিলেন। এরা এক জাতি, এক দেশ, এক বিশ্বাস- এ দর্শনের আলোকে হিন্দুত্ব ও মুসলমানিত্বের সংমিশ্রণের পক্ষে কাজ করছেন। কার্যত তারা ইসলামকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছেন।[১৩৫]

মোগল সম্রাট আকবর দিল্লীর প্রাসাদের অভ্যন্তরে তার পৌত্তলিক পত্নীর জন্য মন্দির নির্মাণ করেন, পূজা-অর্চনার বন্দোবস্ত করেছিলেন। মরমিবাদী হিন্দু দাদুর প্রভাবে এহেন সমন্বয়ের প্রেরণা থেকেই সম্রাট আকবর 'দ্বীনে ইলাহী' নামক এক উদ্ভট ধর্ম প্রবর্তন করেন যা ছিল ইসলামের মূলে রাষ্ট্রীয়ভাবে কুঠারাঘাত করা শামিল। আকবরের পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরও পিতার পদাঙ্ক অনেকটাই অনুসরণ করেন। ইসলামের আচরণগত ও আধ্যাত্মিক বিকৃতিতে জাহাঙ্গীর নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ বংশের শাহজাদা দারাশিকোহ 'মাজমাউল বাহরাইন' রচনা করে হিন্দু মসিলমগণের ধর্মীয় সমন্বয়ের প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। এহেন ইসলাম বিমুখতার তথা ধর্মনাশা সমন্বয়ের ঢেউ দিল্লির দরবার থেকে সুদূর বাংলার জমিন পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। এর বহু সাক্ষ্য প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। আঠারো শতকে সুবাহ বাঙলার নবাব আলিবর্দী খাঁর নিকট আত্মীয় শাহজাদা শাহমত জং প্রমূখ হিন্দুদের প্রভাবে ঢাকার মতিঝিল

১৩৪ আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৭), পৃ. ১৯৯

১৩৫ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস : মধ্যযুগ*(কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৩৮০ বাং), পৃ. ৮৮-৯০

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রাসাদে দোল যাত্রার আয়োজনে সহায়তা করতেন, তাতে স্বয়ং সাড়ম্বরে অংশগ্রহণ করে আনন্দ-ফূর্তিতে মত্ত হতেন। দোলযাত্রা হচ্ছে ভগবানের অবতার শ্রী কৃষ্ণের স্মারক একটি হিন্দু লোক-উৎসব।

যুগে যুগে বাংলায় (ভারতেও) ইসলামকে বিকৃত করার নানা ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে পলাশি যুদ্ধ পর্যন্ত কোনোমতে মুসলিমগণ গা বাঁচিয়ে চলেছে। পলাশি পরবর্তী বাংলায় হিন্দুত্বের সরব উত্থান ঘটে। তারা লাভ করে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব। গভীর মিতালী হয় শাসক ইংরেজদের সাথে। অনুকূল পরিবেশে নব নব আঙ্গিকে পূজা অর্চনার আয়োজন হতে থাকে সমগ্র বাংলা জুড়ে। দখলদার ইংরেজরা এতে মিত্র হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে নানাভাবে। এমনকি লর্ড ক্লাইভ স্বয়ং কলকাতার বিশেষ বিশেষ ধনাঢ্য ব্যক্তিদের পূজা মন্ডপে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে সমর্থন ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন।[১৩৬]

অন্যদিকে হিন্দু জমিদার, জোতদার, ইংরেজ কুঠিয়াল ও কোম্পানির শাসকদের যৌথ দমন-পীড়নের মুখে মুসলিমগণ নিঃস্ব, পতিত, ধিকৃত গোষ্ঠিতে পরিণত হতে থাকে। মুসলিমগণ যেন আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেজন্য দখলদার ইংরেজদের পলিসি ছিল মুসলিমগণকে ধবংশ করা। হিন্দুরা তাতে সহায়তা করে এবং ফাঁক বুঝে নিজেদের ভাগ্য গড়ে নেয়। সর্বত্র মুসলিমগণকে হটিয়ে দিয়ে তাদের স্থানে হিন্দুরা অধিষ্ঠিত হয়। মাত্র তিন-চার দশকের মধ্যে বিদেশী শাসক ও বৈরী প্রতিবেশীর প্রবল চাপের মুখে নাভিশ্বাস ওঠে বাংলার মুসলিমগণের। তখন কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলর হিন্দুদের নবজাগৃতি সৃষ্টি হয়। এ সময় সমাজে পৌত্তলিক ও বৈষ্ণব মতবাদের প্রবল বন্যা মুসলিমগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে ভাসিয়ে নিয়ে তাদের সাথে একাকার করে দিয়েছিলো, তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মুসলিম সমাজের ছিল না। এ রকম চরম প্রতিকূল পরিবেশে বাংলার বিশাল মুসলিম সম্প্রদায় সামাজিক ও ধর্মীয় বিশৃঙ্খলার এবং নৈতিক অধঃপতনের এক শোচনীয় পর্যায়ে নেমে যায়। এভাবে পলাশির বিপর্যয়ের পরে মাত্র চার দশক সময়ের মধ্যে বাংলার মুসলিমগণ চরম রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দুর্দশা ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের অতল গহবরে নিক্ষিপ্ত হয়। চারিদিকে প্রকাশ্যে ও গোপন শত্রু বেষ্টিত মুসলিমগণ তখন হতাশ, দিশেহারা, তারা নিশানা বিহীন, নেতৃত্বহীন। এ ঘোর দুঃসময়ে ঊনিশ শতকের সূচনালগ্নে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন বিশিষ্ট আলেম হাজী শরী‘অতুল্লাহ(রহ.) যেন গহীন আঁধারে এক উজ্জল বাতিঘর। বাংলার মুসলিমগণ তখন ইসলামের মর্মবাণী বিস্মৃতপ্রায়। হিন্দু-বৈদিক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক আচরণ ধারা তাদের সমাচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

ইসলামকে পৌত্তলিকতার ছাঁচে ঢেলে এক অদ্ভূত সমন্বয়বাদী ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে যা তৌহিদবাদী বিশ্বাস পরিহার বা ইসলাম ধ্বংসের নামান্তর। অন্যদিকে বিদেশী শাসক ও দেশীয় জমিদারদের আক্রোশের প্রধান লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠেছে মুসলিমাগণ। রাজনৈতিকভাবে পরাজিত ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক দিক থেকে পথভ্রষ্ট বাংলার মুসলিমগণের উদ্ধার করাই ছিল হাজী শরী‘অতুল্লা(রহ.)এর মূল লক্ষ্য। তিনি বাংলায় এক ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর এ প্রয়াস ইতিহাসে ‘ফরায়েযী আন্দোলন’ নামে অভিহিত হয়েছে। কথিত আছে

১৩৬ ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*(ঢাকা : আবরার প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

যে, তিনি ইংরেজদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং যৌবনের দ্বারপ্রান্তে পৌছে ক্ষোভে, হতাশায় দেশ ত্যাগ করে পবিত্র মক্কা শরীফে গমণ করেন।[১৩৭] হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) প্রায় দু'দশক কাল মক্কা শরীফে অবস্থান করেন (১৭৯৯-১৮১৮)। এ সময় তিনি শুধু ইসলামি ধর্ম-দর্শনের বিভিন্ন শাখায় গভীর পাণ্ডিত্যই হাসিল করেন নাই সেই সাথে বিপ্লবী রাজনৈতিক দীক্ষাও গ্রহণ করেন। সেই সময়কালে জাজিরাতুল আরবে ইসলামি পিউরিটান ধারার নবপ্রবক্তা আব্দুল ওয়াহাব নজদি ও তার ভাবানুসারীগণ ইসলামের সর্বাত্মক সংস্কার আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ সামাজিক বিপ্লব 'ওয়াহাবী আন্দোলন' নামে সমধিক পরিচিত।[১৩৮] ততদিনে আরব জাহানে ইসলামের আমল, আকিদার আদব-আখলাকের মধ্যে যেসব আনাচার, কদাচার, বিদ'আত ও জাহিলিয়াতের আলামত, উপকরণ ঢুকে পড়েছিল তা থেকে ইসলামকে মুক্ত করার প্রয়াসে ওয়াহাবীগণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। যুবক হাজী শরী'অতুল্লাহ সম্ভবত, সেই সব প্রচেষ্টা থেকে অনুপ্রাণীত হয়েছিলেন। নিজ দেশে স্বজাতির মধ্যেও অনুরূপ শিরক-বিদ'আতের, কুপ্রথা-কুসংস্কারের যে কলুষ, কালিমা ঢুকে পড়েছিল তার অবসানকল্পে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকবেন। দীর্ঘ প্রবাস জীবনের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করে (১৮১৮) হাজী শরী'অতুল্লাহ লক্ষ্য করেন বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, ভাসানযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, যাত্রাপালা, মনসাপূজা, সত্যনারায়ণের পূজা, পাঁচপীরের পূজা, মাজার পূজা, চড়ক পূজা, গাজনের মেলা প্রভৃতির প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। আর এগুলো মুসলিমগণের জীবনের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। এমনকি বিভিন্ন পূজা অর্চনার মুসলমানি সংস্করণ যেমন, শিতলা, ওলা বিবি, সত্য পীরের পূজা চালু হয়েছিল। একদিকে সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে বিদ'আত, শিরক, কুফুরি, কুসংস্কারের পুঞ্জিভূত ক্লেদ, কালিমা অন্যদিকে শাসক শ্রেণির ব্যাপক শোষণ, লুণ্ঠন, পীড়ন এ দু'য়ের মাঝখানে জনসাধারণ তখন বিধ্বস্ত দশায়। ততদিনে উত্তর ভারতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর উত্তরসূরী সৈয়দ আহম্মদ বেরেলভী প্রমূখ তাদের সম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তাদের চিন্তাধারার দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বাংলার মুসলিমগণের অধঃপতনকে প্রতিহত করার জন্য তিনি দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন। ওয়াহাবী আন্দোলনের অনুরূপ সংস্কারমূলক আন্দোলনের কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শিরক ও বিদ'আতে পরিবৃত্ত ও হতবঞ্চিত বাংলার মুসলিম সমাজ সংস্কারের তথা ইসলামের পরিশুদ্ধির লক্ষ্যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তার এ আন্দোলনের মূল শ্লোগান ছিল- সকলে আল্লাহর একত্বের দিকে ফিরে এসো। তৌহিদের মূল বাণীর দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য বাংলার বিভ্রান্ত মুসলিমগণের তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান। তাওবা করে ইসলামের পরিশুদ্ধ ধারায় শামিল হওয়ার জন্য নির্ভিক কণ্ঠে ডাক দেন তাদের। অনতিবিলম্বে ব্যাপক সাড়াও পান তিনি। তাদের সংগঠিত করে গড়ে তোলেন প্রতিরোধ আন্দোলন। তার নিজ এলাকা ফরিদপুর শুধু নয়

১৩৭ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১৩৮ 'মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহাব প্রতিষ্ঠা করেন 'মুওয়াহহিদুন আন্দোলন'। তাঁর বিরোধীরা তাকে ও তাঁর আন্দোলনকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে নাম দেয় ওয়াহাবি আন্দোলন।' দ্র. ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সল, *উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দোলন*(কুষ্টিয়া : সেন্টার ফর ইসলামিক দা'ওয়াহ্ এন্ড কালচার, ফেব্রুয়ারী ২০১১), পৃ.৩

*Dhaka University Institutional Repository*

চট্টগ্রাম, ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, নদীয়া, যশোর, পাবনা, ময়মনসিংহ অঞ্চলেও হাজী শরী'অতুল্লাহর বিপুল সমঝদার সমর্থক শ্রেণি তৈরি হয়। তাঁর বিপুল গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে পরবর্তীকালের প্রধান সেন্সাস কমিশনার জেমস ওয়াইজ বলেন, যে স্থানেই তিনি গিয়েছেন সে স্থানেই বহু সাধারণ মুসলিম বিশেষত মুসলিম কৃষকেরা তার সরল ধর্মমতে মুগ্ধ হয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কৃষকদের মধ্যে তাঁর ব্যাপক প্রভাব এবং তার নেতৃত্বে মুসলিম কৃষকগণের অর্ভতপূর্ব ঐক্য লক্ষ্য করে হিন্দু জমিদাররা ভীত হয়ে উঠেন। তৎকালীন বাংলার গ্রামীণ সমাজে বিদ্যমান বহুবিধ সামাজিক শ্রেণি গোষ্ঠিগুলোর মধ্যে কৃষক ও তাঁতিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দু'টি গোষ্ঠি। আরো ছিল জেলে, মাঝি মাল্লা, বেপারি ও নানা ক্ষুদ্র পেশাদার গোষ্ঠি। এসবের উপর ছিল জমিদার, জোতদার, গোমস্তা, নায়েব, পাইক ও নীলকর সাহেবেরা। আর সবার উপর কোম্পানির শাসকবর্গ, শ্বেতাঙ্গ কর্তারা। জমিদার শ্রেণির প্রায়ই সবাই হিন্দু আর প্রজাদের অধিকাংশই মুসলিম।[১৩৯]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হর্তাকর্তা, ইংরেজ নীলকর, কুঠিয়াল ও নব্য জমিদারদের দ্বারা কৃষক ও তাঁতিরা হয়েছে নিরন্তর শোষিত, নিষ্পেষিত ও নিগৃহীত। জমিদারকে কৃষকেরা নানা কর, খাজনা, আবওয়াব দিয়ে নিঃস্ব, আর তাঁতিদের কাপড়ের বাজার ততদিনে আমদানি করা বিলেতি কাপড়ের নিচে চাপা পড়ে গেছে। তাদের জীবন-জীবীকা করা হয়েছে তছনছ। সেই সাথে হিন্দু জমিদার, পুরুতপাণ্ডা ও সমাজপতিরা মুসলিম প্রজাদের উপর নানা পূজা-অর্চনা, উৎসবের নামে অভিনব কর আরোপ ও আদায় উসূল করছিল নিষ্ঠুরভাবে। দুর্গোৎসব, রথযাত্রা, কালী পূজা প্রভৃতি পূজা-অর্চনার বাবদে সক্ষম মুসলিমগণের কাছ থেকে নগদ চাঁদা আদায় এবং মন্ডপ তৈরিতে বেগার খাটা দরিদ্র মুসলিমগণের জন্য একরকম বাধ্যতামূলক করে ফেলা হয়েছিল। নানা দেবদেবীর পূজার আয়োজনকে অভিহিত করা হতো 'সর্বজনীন' উৎসব হিসেবে, আর মুসলিমগণের এসব আয়োজনে যোগ দিতে বাধ্য করা হতো। উপরন্তু মুসলিমগণের ধর্ম-কর্মে বাধাদান যেমন আযান, কুরবানি, 'ঈদের জামাত প্রতিহত করাও অনেকটা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। তেমনি দাঁড়ি, টুপি, খাৎনা বাবদ মুসলিম প্রজাদের কাছ থেকে জরিমানামূলক অর্থ আদায় করা হতো। সন্তানদের ইসলামি রীতিমাফিক নাম রাখার ক্ষেত্রেও ছিল জমিদারদের তরফ থেকে বাধা-নিষেধ। হিন্দু জমিদার ও সমাজপতিদের ইচ্ছায় মুসলিমগণের তাদের সন্তানের নাম রাখতে হতো কালা, কানাই, গোপাল, ভোলা, কানু, সাধু, নাদু, পাঁচু ইত্যাদি। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে মুসলিমগণ দাঁড়ি চাঁছতে ও ধুতি পরিধান করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) লক্ষ্য করেন ইঙ্গ-হিন্দু শাসক গোষ্ঠির সম্মিলিত চক্রান্তে ইসলামকে ধ্বংশ করার চেষ্টা চলছে।[১৪০]

রাজনৈতিক পরাভবের সুযোগে দুশমনরা মুসলিমগণের তাহজিব, তামদ্দুন বিকৃত ও দলনের প্রকাশ্য মহড়ায় লিপ্ত। মুসলমানিত্বকে পায়ের নিচে দাবিয়ে ধরে হিন্দুত্বের নবজাগরণের

---

১৩৯ আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

১৪০ মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মুসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*(ঢাকা : আজাদ প্রকাশনী, ১৩৭২ বাং), পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

জয়ডঙ্কা বাজানোর কাজ তখন জোরদার। বাংলার মুসলিমগণের এহেন গল্লানিকর পরিস্থিতি বিচার করে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এ ভূ-ভাগকে 'দারুল হারব' ঘোষণা করেন।[১৪১] তার বিবেচনায় তখন জাতি শত্রু কবলিত, দেশে যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান। এ অবস্থায় জুম'আর নামায মসজিদে আদায় ও ঈদের জামায়াত করার কোনো অবকাশ নেই। তিনি এ উভয় ধরনের ইসলামি সমাবেশকে আপাতত স্থগিত রাখার ফতোয়া জারি করেন। সেই সাথে তিনি মুসলিমগণের শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার থেকে ফিরে দাঁড়াবার আহবানই জানালেন না, জমিদারদের অন্যায় সব দাবিদাওয়া, কর, আবওয়াব, চাঁদা দেয়া বন্ধ করার নির্দেশও প্রদান করেন। মূর্তিপূজার কোনো আয়োজনে সহায়তা দান বা অংশগ্রহণ না করার নির্দেশ দেন। হুকুম প্রদান করেন অবিচলভাবে ফরজসমূহ পালন ও সুরক্ষা করার। ধুতি, লেংটি ছেড়ে মুসলিমগণকে তহবন্দ, টুপি পরার তাগিদ প্রদান করেন। আহবান জানালেন জুলুমবাজ জমিদার ও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার। তার আহবান ছিল শতাব্দী ব্যাপী বিজাতীয়দের ধর্মীয় দলন ও ঔপনিবেশিক শোষণের বিপরীতে এক অলৌকিক ঘোষণার মতো। তিনি বিদেশি শাসক ও দেশিয় অত্যাচারী, লুটেরা, শোষক জমিদার, জোতদার, নীল কুঠিয়ালাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে থাকেন জনসাধারণকে। ডা. জেমস ওয়াইজের পর্যবেক্ষণ অনেকটাই যথার্থ ছিল। বহু দেবদেবী অধ্যুষিত হিন্দু ধর্মের সাথে দীর্ঘকালের সংযোগ থেকে উদ্ভূত অসংখ্য কুসংস্কার ও বিকৃতি হতে মুসলিম জনসাধারণকে মুক্ত করার জন্য প্রথমে প্রচার আরম্ভ করেছিলেন। তিনি যে নির্বিকার, নিরৎসাহ কৃষক জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ, উদ্দীপনার সঞ্চার করতে পেরেছিলেন তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ ঘটনা। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)এর ডাকে বিভ্রান্ত মুসলিমগণ সম্বিত ফিরে পেয়েছিল, নিপীড়িত কৃষক, তাঁতি, জেলে, মজুরেরা উঠে দাঁড়িয়েছিল। এসবের মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন একাধারে এক মহান সমাজ সংস্কারক, ইসলামের নিশান বরদার। সেই সাথে আধিপত্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক নির্ভিক সিপাহসালার।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে শুধু একজন ধর্মপ্রাণ মোল্লা বা শুদ্ধাচারী মুসলিম সমাজ সংস্কারক হিসেবে দেখার কোনো অবকাশ নেই। বরং তাকে বিদেশীদের দখলদারিত্ব ও ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে একজন আপোষহীন যোদ্ধা হিসেবে দেখাই সমীচিন।[১৪২] তাঁর আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল বাংলার মুসলিম সমাজকে শিরক, কুফুরী ও বিদ'আতের কলুষমুক্ত করা। সমাজে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের পরিশুদ্ধ রূপের পুনঃপ্রবর্তন করা। এর পাশাপাশি অর্থনৈতিক শোষণ, পীড়ন থেকে প্রজা সাধারণকে রক্ষা করা। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল দেশ থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটানো। ইংরেজদের বিতাড়িত করে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা, ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা। দৃশ্যত তার

---

১৪১ মাওলানা আবদুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

১৪২ Md. Delwar Hussain, *A. Study of Nineteenth Century, Historical Works on Muslim Rule in Bengal*(Dhaka : Pritom Publishers, 1987), p. 97

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের উদ্দেশ্য প্রকৃত মোহাম্মদি ইসলামের চর্চা হলেও এটা ছিল বিশেষ কর্মপন্থা, তথা প্রাথমিক রণকৌশল। এভাবেই তিনি দেশের মানুষদের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার এবং স্থানীয় জমিদার, জোতদার, দালাল, গোমস্তা, নায়েব, পাইক-পেয়াদাদের জুলুম, শোষণকে প্রতিহত করার লড়াই সূচনা করেছিলেন। বলা যায় পলাশি পরবর্তীকালে বাংলায় যেসব প্রতিরোধ লড়াই সূচিত হয়েছিল হাজী শরী'অতুল্লাহর আন্দোলন ছিল তারই ধারাবাহিকতায় এক নবতর পর্ব, এক প্রতিরোধ যুদ্ধের সূত্রপাত। তাই তার 'দারুল হারব'-এর ঘোষণাকে কেবলই একটি ধর্মীয় ফতোয়া হিসেবে দেখা যথার্থ হবে না। বরং এটা ছিল দেশী-বিদেশী দখলদার, লুটেরাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার নামান্তর।

দৃশ্যমান ধর্মীয় বহিরা বরণ ভেদ করে এ আন্দোলন প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক অর্জন করতে থাকে। অর্থাৎ 'ফরায়েযী আন্দোলন' ধর্ম সংস্কারের গন্ডি অতিক্রম করে রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের কৌশল হয়ে ওঠে। আর তার লক্ষ্য হয় এদেশ থেকে বৃটিশ আধিপাত্যবাদীদের বিতাড়িত করা। হাজী শরী'অতুল্লাহর প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ একে স্রেফ একটি ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মসূচি হিসেবে, বড়জোর স্থানীয় জোতদার, জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে দেখেছে। আবার কয়েকজন ঐতিহাসিক তার কর্মকাণ্ডের মধ্যে বৃটিশ বিতাড়নের আলামত দেখতে পেয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে অন্যতম গবেষক আহমেদ খানের বিবেচনায় হাজী শরী'অতুল্লাহ মূলত বাংলায় ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য কাজ করেছেন। গভীর প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্যের অধিকারী একজন আালেম হিসেবে তিনি মুসলিম সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। স্থানীয় মুসলিমগণের মধ্যে অবিলম্বে তিনি বিপুল আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তার আহবানে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও দলে দলে তাঁর আন্দোলনে যোগ দেয়। তবে এর অর্থ মোটেই এমন নয় যে, তার কোনো রাজনৈতিক অভিপ্রায় ছিল না।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) কে সাধারণ একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে, কোন 'ভয়ঙ্কর' বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব নয়। বরং হাজী শরী'অতুল্লাহর প্রকৃত মনোভঙ্গিটি গড়ে উঠেছিল ওয়াহাবী ধ্যান-ধারণার আদলে এবং তিনি সেখান থেকেই বিল্লবী প্রেরণা লাভ করেন যা পরবর্তীতে আরেক বিপ্লবী সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর সান্নিধ্য ও প্রেরণায় শাণিত হয়েছে। অন্যদিকে, তাঁর আন্দোলনকে হাশেমি একটি 'বৃটিশ বিরোধী' তৎপরতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ও শরী'অতুল্লাহর কার্যকলাপকে স্পষ্ট 'রাজনৈতিক লক্ষ্রে পরিচালিত একটি বিষয় হিসেবে দেখেছেন। ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে তিনি ক্রমশ তার কর্মতৎপরতাকে রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে চালিত করেন। এর মধ্য দিয়ে মুসলিমগণের বৃটিশদের কাছে হারানো ক্ষমতা ফিরে পাবার আকাঙ্খাই প্রস্ফুটিত হয়েছে। ড. মজুমদারের ভাষায়,

Dhaka University Institutional Repository

'There was a general feeling that the real objective of the 'Faraidis' was expulsion of the Bitish and the restoration of Muslim power.' [১৪৩]

সাম্প্রতিক কালের অন্যতম সামাজিক ইতিহাস গবেষক অমলেন্দু দে'র ভাষায় হাজী শরী'অতুল্লাহ(রহ.)এর এসব প্রচেষ্টা, প্রয়াস প্রথমে ধর্মীয় আন্দোলন রূপে আরম্ভ হলেও অল্প সময়ের মধ্যে ইহা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত এ আন্দোলন গ্রাম বাংলার মুসলিমগণের এক নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। বলা যায়, তিনি তাঁর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন তলে তলে রূপ পাল্টিয়ে তার আসল লক্ষ্য ভেদ করে উঠতে থাকে, রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং দক্ষিবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে প্রবল গণজাগরণ সৃষ্টি করে। শুধু মুসলিমগণই নয়, নব্য জমিদার শ্রেণি ও উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিগৃহীত বহু প্রান্তিক হিন্দুও এক পর্যায়ে আন্দোলনে সমর্থন দান করে। তাই ফরায়েযী আন্দোলন স্রেফ ধর্ম সংস্কারের গণ্ডি অতিক্রম করে প্রচ্ছন্নভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে থাকে। দেশীয় লুটেরা, দালাল শ্রেণিগুলোর বিরুদ্ধে প্রকৃত প্রতিরোধ সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে থাকে। নির্দ্বিধায় বলা যায়, ফরায়েযী আন্দোলন জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক রূপ দান করেছিল।[১৪৪]

হাজী শরী'অতুল্লাহর কোন কার্যকলাপের মধ্যে এমন কোন নির্দশন পাওয়া যায় না। যেখানে বৃটিশ শাসন উচ্ছেদ করে মুসলিম শাসন প্রবর্তন করার কথা বলেছেন। যথার্থই তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের বিলুপ্তি ঘোষণা বা কোন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রদর্শন করেননি কিংবা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন প্রকাশ্য ঘোষণাও প্রদান করেননি। কিন্তু তার কার্যকলাপ ও এর ধারাবাহিকতা আপনা থেকেই প্রতিপন্ন করে যে, শুধু সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যেই নয় শ্বেতাঙ্গদের বিতাড়ন ও মুসলিমগণের রাষ্ট্র ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে তিনি সক্রিয় ছিলেন। চৌধুরী নুরুল আনোয়ারের ভাষায়, তাঁহার জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়িতে থাকে। তাহার আবেদন ও কর্মসূচি জনপ্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এতে ফরায়েযী আন্দোলন কারীদের সাথে হিন্দু জমিদারদের বিরোধ ও সংঘর্ষ বাধে। এ তথ্য থেকে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তাঁর যে রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাই তাঁর কোন রাজনৈতিক পরিকল্পনা ছিল না, শুধু ধর্মীয় সংস্কারই তার লক্ষ্য ছিল এ ধারণা সঠিক নয়। কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তিনি ঔপনিবেশিক শক্তিকে বিতাড়িত করতে চেয়েছেন এবং দেশকে 'দারুল হারব' ঘোষণার মধ্য দিয়ে তার সেই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে

১৪৩ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস : মধ্যযুগ*(কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১২৫

১৪৪ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪.

Dhaka University Institutional Repository

তার সে অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তিনি একভাবে যুদ্ধের ঘোষণা প্রদান করেছেন বৈকি। তবে তিনি কৌশলগত কারণে এ যুদ্ধকে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে নিয়েছেন।[১৪৫]

প্রথমথ: বিভ্রান্ত মুসলিমগণের শুধরিয়ে অবিমিশ্র ইসলামি বিশ্বাস ও আচরণ ধারায় স্থাপন করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় পর্বে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের বিষয়টির দিকে নজর দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে প্রাথমিক প্রতিরোধ রচনার প্রেরণা দান করেছেন এবং ভবিষ্যতের যোদ্ধাদের বাছাই করেছেন।

দ্বিতীয়ত: এসব যোদ্ধাদের তৈরি করে চূড়ান্ত লড়াই বা দুশমনের উপর শেষ আঘাত হানার জন্য অগ্রসর হতে চেয়েছেন। তার অকাল মৃত্যু সেই শেষপর্বের বাস্তবায়নের সুযোগ দেয়নি। যা হোক, হাজী শরী'অতুল্লাহর এ আন্দোলন স্রেফ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ছিল না, এর প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল মুসলিমগণের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার। অন্তত তিনটি যুক্তিগ্রাহ্য কারণ বা সুস্পষ্ট দিক খুঁজে পাওয়া যায়, যা থেকে এ ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে-

**প্রথমত:** তিনি 'দারুল হারব' ঘোষণার মাধ্যমে এ অঞ্চলের মসজিদে সাপ্তাহিক জুম'আর নামায ও দুই ঈদের জামায়াতের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন। অর্থাৎ যত দিন 'দারুল ইসলাম' কায়েম না হয় ততদিন এ দুই ধরনের ফরজ ও ওয়াজিব ধর্মীয় সমাবেশ স্থগিত রাখার ফতোয়া প্রদান করেন। তিনি ঘোষণা করেন, এ দেশ দারুল হারব-যা বিদেশীরা জবর দখল করে আছে। এজন্য জুমু'আ ও 'ঈদের নামায পড়া জায়েজ নয়। হাজী শরী'অতুল্লাহ একজন উচ্চস্তরের আলেমে দ্বীন, ইসলামের একজন একনিষ্ঠ খাদেম ছিলেন।[১৪৬] সমাজে ফরজ প্রতিষ্ঠার একজন প্রবক্তা হিসেবে নিশ্চয় খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য এসব জরুরি ধর্মীয় আরকান-আহকাম তিনি স্থগিত রাখতে চাইবেন না, বরং অনতিবিলম্বে একটি সর্বাত্মক ও সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এসব ধর্মীয় সমাবেশের প্রতিবন্ধক গুড়িয়ে দিয়ে যথা শিঘ্রই সম্ভব ফরজ বা ওয়াজিব পুনঃপ্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তা আন্দাজ করা যায়।

**দ্বিতীয়ত:** এ অভিমতই যথেষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সামনে নিয়েই অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং তা হচ্ছে মুসলিমগণের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার। তার ঘোষিত 'দারুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠা যে বেশি দূরে ছিল না তাই প্রতীয়মান হয়। তা না হলে তিনি অনন্ত কালে জন্য জুম'আর ফরজ নামায আদায় ও দুই ঈদের ওয়াজিব জামাত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিতে পারেন না। অর্থাৎ হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ)র নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র প্রতিলোধ লড়াই যে আসন্ন হয়ে উঠেছিল, একটি গণযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল তা সহজে অনুমেয়।

---

১৪৫ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *শরিয়তুল্লাহ*(ঢাকা : ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, ১৯৯৭), খ.২৩, পৃ. ৪৫৫

১৪৬ ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, *বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও মতাদর্শ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

*Dhaka University Institutional Repository*

**তৃতীয়ত:** উত্তর-পশ্চিম ভারতে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর নেতৃত্বে বৃটিশ দখলদার ও তাদের দেশীয় মিত্রদের (শিখ প্রভৃতি) হটিয়ে ইসলামি রাষ্ট্র বা খিলাফত প্রতিষ্ঠার যে সশস্ত্র লড়াই চলছিল হাজী শরী'অতুল্লাহ তাতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। বাংলা থেকে অর্থকড়ি পাঠিয়ে সেই জিহাদে আন্‌জাম দিয়েছেন। তদুপরি নিজের অনুসারীদের মধ্য থেকে অনেক যুবককে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করেছেন। উল্লেখ্য, সে সময়ে ফরিদপুরে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর বহু ভক্ত অনুসারী ছিল। সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর মতোই হাজী শরী'অতুল্লাহ ও বাংলাকে 'দাররুল হারব' ঘোষণা করে বিজাতীয় বিদেশীদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। বিদেশী দখলদারদের বিতাড়ন ও 'দারুল ইসলাম' কায়েমের মধ্য দিয়েই কেবল সে লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে।[১৪৭]

**চতুর্থত:** হাজী শরী'অতুল্লাহর ইন্তিকালের দীর্ঘ ১৭ বছর পর ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তার হাজার হাজার অনুসারী অকুতোভয়ে জ্বলে উঠে। তারা সশস্ত্র মোকাবেলার জন্য তৈরি হন। এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে, তারা ইসলামের জন্য দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল এবং তাদের সুদৃঢ় মানসিক প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ ছিল বলেই এমনটা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর ভবিষ্যতে একটি বৃহত্তর লড়াইয়ের জন্যে তাদের তৈরি করেছিলেন তা বিশ্বাস করা যায়। এ বিষয়ের চূড়ান্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ কেবলই একজন মামূলী মোল্লা ছিলেন না। বরং তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলেন একজন সাহসী মুজাহিদ। তার রাজনৈতিক অভিপ্রায় ছিল স্পষ্ট। 'দারুল হারব' ঘোষণা করে তিনি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার পাত্র ছিলেন না নিশ্চয়। কেননা তার সামনে আরেকজন 'দারুল হারব' ঘোষণাকারী সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর টাটকা উদাহরণ বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি 'দারুল হারব'-কে গুড়িয়ে দিয়ে তার অভীষ্ট 'দারুল ইসলাম' কায়েম করার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন তা বিশ্বাস করা যায়।

বাংলার হিন্দু অভিজাত শ্রেণি ও সমাজপতিরা বিষয়টি সঠিকভাবে আঁচ করতে পেরেছিলেন। সে সাথে বিদেশী নীলকর সাহেবরা উৎকুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল, আতঙ্কিত হয়েছিল বেনিয়া ফিরিঙ্গীরা এবং সর্বোপরি তাদের ছত্রছায়ায় দৌরাত্মকারী জমিদার, জোতদার শ্রেণিও হয় ক্ষিপ্ত। তাঁর এ নয়া ধর্মবিধি বাংলার মুসলিম চাষা ভূষাদের একাট্টা করে ফেলে। বিশেষত: হিন্দু জমিদার শ্রেণি এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তিনি অস্ত্র প্রদর্শন করেননি বটে তবে তার পিছনে অগণিত কৃষক, তাঁতি, মজুর, জেলে তথা সাধারণ মানুষ সমবেত হওয়াকে সহজভাবে নিতে পারেনি শাসকগোষ্ঠি। বস্তুত তার আন্দোলন অবিলম্বে রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। বিদেশি শাসকবর্গ যেমন তা অনুধাবন করে তেমনি তাদের মদদপুষ্ট দেশীয় এলিট শ্রেণি, জমিদার, মহাজনেরাও বুঝতে পারে। এ শ্রেণি গোষ্ঠিগুলো বেড়ে উঠেছিল ও টিকে ছিল

---

১৪৭ 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পীর বাদশাহ মিয়া নারায়ণগঞ্জে ফরায়েযী সম্প্রদায়ের এক সম্মেলন আহ্বান করে পাকিস্তানকে 'দারুল ইসলাম' বলে ঘোষণা দেন।' দ্র. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া(৬)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

*Dhaka University Institutional Repository*

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলদারদের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে। তাই এ উভয় গোষ্ঠির স্বার্থ একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছিল। এরা তাঁকে প্রকাশ্যে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে, সাক্ষাৎ প্রতিপক্ষ হিসেবে গণ্য করে। কোম্পানির কর্তারা, নীলকর সাহেবরা, হিন্দু জমিদার শ্রেণি, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকগণ তাঁর কর্মকাণ্ড ও জনপ্রিয়তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে এবং তারা নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে তার বিরুদ্ধে তৎপরতা শুরু করে।

বিশেষভাবে তখনকার দিনের সংবাদপত্র বা সাংবাদিক শ্রেণি হাজী শরী'অতুল্লাহকে উদীয়মান হিন্দুস্বার্থ তথা কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসনের ভয়ঙ্কর এক প্রতিপক্ষ হিসেবে চিত্রিত করে। সেই সময় বহুল প্রচারিত কতিপয় সংবাদপত্র যেমন সংবাদ চন্দ্রিমা, সংবাদ কৌমুদি, সংবাদ প্রভাকর, হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ব্রামিনিক্যাল ম্যাগাজিন প্রভৃতি তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। এরা তার বিরুদ্ধে হিন্দু নব্য অভিজাতবর্গ ও বিদেশি শাসকদের সতর্ক করা ও ক্ষেপিয়ে তোলার কাজে লিপ্ত হয়। কেননা এদের আশঙ্কা ছিল তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মকান্ড বাংলায় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়লে মুসলিমগণের রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রত্যাবর্তন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারে। ঔপনিবেশিক শক্তি ও তাদের অনুগৃহীত দেশীয় গোষ্ঠিগুলো ক্ষমতার মঞ্চ থেকে উৎখাত হয়ে যেতে পারে। তাই তাঁর নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলের মানুষের উঠে দাঁড়ানোর প্রবণতা দেখে জমিদার, জোতদাররা ভড়কে যায়। নানা রকম জুলুম, অত্যাচার করে, ভয়ভীতি দেখিয়ে উদ্বেলিত জনসাধারণকে থানামোর চেষ্টা করে, তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা করে তার অনুসারীদের নিরস্ত করার চেষ্টা চালায়। হাজী সাহেবের অনুগামী ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণের লম্বা দাঁড়িতে দাঁড়িতে গিট বেঁধে দিয়ে তাদের নাকে শুকনো মরিচের গুড়া লাগিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড হাঁচি দিতে বাধ্য করা, খালি গায়ে বিষাক্ত পিঁপড়া লাগিয়ে দেয়ার মত জঘন্য তামাশা করতেও কুণ্ঠিত হতো না। কিন্তু হাজী শরী'অতুল্লাহ এর বিপুল জনপ্রিয়তাকে ক্ষুন্ন করার সব চেষ্টাই বৃথা হয়। তার সমসাময়িক ঢাকার তৎকালীন সিভিল সার্জন ডাক্তার জেমস টেইলার বলেছেন যে, এক অসম্ভব দ্রুততার সাথে সাধারণ মানুষ হাজী তাঁর পিছনে জড়ো হতে থাকে। তার আহবানে ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর অঞ্চলের অন্তত ছয় ভাগের এক ভাগ মানুষ এবং ঢাকা শহরের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ তার ভাবশিষ্য হয়ে যায়। তার আহবানে এরা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ রচনার জন্য তৈরি হয়েছে। তাঁকে প্রতিহত করার অভিপ্রায় অন্যান্য কৌশলের পাশাপাশি তার চরিত্র হননের চেষ্টাও চালায় প্রতিপক্ষ। দেশীয় নেতা ও রাজন্যবর্গের চরিত্র হনন করা সাম্রাজ্যবাদী দখলদারদের একটি পুরোনো কৌশল। তাঁর ক্ষেত্রেও তারা একই পন্থা অবলম্বন করে। তাকে খারিজি হিসেবে অভিহিত করা হয়। তুচ্ছ জোলা পরিবারের সন্তান, এমনকি তাকে ভাটি অঞ্চলের পেশাদার ডাকাতদলের সর্দার হিসেবে চিত্রিত করার জঘন্য প্রয়াসও চালানো হয়। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা থেকে তাকে নানাভাবে হয়রানিও করা হতে থাকে। প্রথমে নিজ এলাকা থেকে তাকে বিতাড়িত করা হয়। পরে ভিন্নমতালম্বী সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয়, ঢাকার নয়াবাড়ীর ঘটনা এর একটি উদাহরণ। অবশেষে ১৮৩৯ সালে তাঁকে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রেফতার করা হয়। শাসকরা তাকে কারারুদ্ধ করে তার জনপ্রিয়তাকে খর্ব করতে চায়, তার আন্দোলন স্তব্ধ করতে চায়।[১৪৮]

হাজী শরী'অতুল্লাহর ও তাঁর অনুসারীগণ ছিলেন জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত। কোনো প্রকার ভয়ভীতি, জুলুম, নিপীড়ন তাদের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ রচনায় বিরত করতে পারেনি। ঊনিশ শতকের প্রথমদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় তাদের শাসন পাকাপোক্ত করে ফেলে। তারা অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্র ও বিলাতি পণ্যের বাজার বানিয়ে ফেলে এ অঞ্চলকে। প্রায় নির্বিশেষে হিন্দুরা ইংরেজ শাসনকে 'ঈশ্বরের আশির্বাদ' হিসেবে মাথা পেতে নিয়েছে। নব্য জমিদার প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, শিক্ষাবিদ রাজা রামমোহন রায়, সমাজ সংস্কারক পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবি-সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত, পত্রিকা সম্পাদক গৌরীমোহন ভট্টাচার্য, সিভিল সোসাইটির অন্যতম মুখপাত্র দক্ষিণামোহন মুখোপাধ্যায়, কিশোর চাঁদ মিত্র প্রমূখ এবং কলকাতা ভিত্তিক হিন্দু এলিট, বিদ্বান, বুদ্ধিজীবীগণ তখন ইংরেজ তোষণে ব্যস্ত, ইংরেজদের সাথে মিত্রতা করে চাকুরি, ব্যবসা, অনুকম্পা লাভের জন্য ব্যাকুল।

আর সেই একই সময় ফরিদপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাজী শরী'অতুল্লাহর ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের জন্য বিদ্রোহ, বিপ্লবের পরিকল্পনায় ব্যাপৃত ছিলেন। স্পষ্টত তাঁর ফরায়েযী আন্দোলন কেবল ধর্ম সংস্কারমূলক কোনো আন্দোলন ছিল না, তা ছিল জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক দুর্ধশা ঘোচানোর সংগ্রামও। সর্বোপরি ছিল স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের রণপ্রস্তুতি স্বরূপ। সেই সময়কার বাংলার গ্রাম সমাজের দু'টি প্রধান শ্রেণি কৃষক ও তাঁতিরা ছিল ঔপনিবেশিক শাসনে সব থেকে বেশি নির্যাতিত। এসব নিপীড়িত মানুষদের মুক্তির জন্যই হাজী শরী'অতুল্লাহর গড়ে তোলেন তার আন্দোলন, এরাই হয়ে উঠে তার আগুয়ান অনুসারী। তাই তাঁকে যদি একজন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াকু হিসেবে অভিহিত নাও করা হয়, অন্তত একজন গণবিপ্লবী নেতা হিসেবে গণ্য করা যায়। দরিদ্র কৃষকদের সামন্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রামে সার্থক রূপে সংগঠিত করেছিলেন।[১৪৯] এরকম দূরদর্শী একজন গণ-নায়কের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না, তা বলা ইতিহাসসিদ্ধ বা যুক্তিযুক্ত কোনো ধারণা নয়। শেষ বিবেচনায় ফরায়েযী আন্দোলনকে গণমানুষের মধ্য হতে সমুত্থিত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের এক লড়াই হিসেবে দেখা যেতে পারে যার নেতৃত্ব দিতে পুরোভাগে দাঁড়িয়েছিলেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। বাংলার লক্ষ লক্ষ নিগৃহীত, অবদমিত মানুষ বিশেষত বিভ্রান্ত মুসলিমগণের মধ্যে তাঁর নতুন আশার সঞ্চার করেন, তাদের নব চেতনায় জাগ্রত ও ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি এক দুঃসাহসী বিপ্লবী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। তার অসাধারন নেতৃত্বে গ্রাম অঞ্চলের মানুষ দ্রুত একটি প্রতিরোধ যুদ্ধের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এ কথা সত্য যে, তিনি যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন কিন্তু তা শেষ করে যেতে পারেনি। তবে রাজনৈতিকভাবে উৎখাত হয়ে যাওয়া বাংলার মুসলিমগণের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার ষড়যন্ত্রকে বানচাল করতে

১৪৮ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪.

১৪৯ মাওলানা আব্দুল বাতেন নো'মান, *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বহুলাংশে সফলকাম হয়েছিলেন। হাজী শরী'অতুল্লাহর আকস্মিক ইন্তেকালের ফলে তার সূচীত সামাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই কিছুটা স্তিমিত হলেও এর অবসান ঘটেনি। তার নির্দেশনায় যারা তৈরি হয়েছিল তারা জিহাদী প্রেরণায় ছিল অবিচল, প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায় ছিল অটল। তারা গভীর আত্মপ্রত্যয়ে উড্ডয়ন রাখে তাঁর ঝান্ডা, জারি রাখে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই। তাই ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁর হাজার হাজার অনুসারী তার পুত্র দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধে প্রস্তুত হয়। অন্তত পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা গোপনে তৈরি হচ্ছে এ সংবাদ জেনে ইংরেজরাও তৎপর হয়ে উঠে। তারা দুদু মিয়াকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করে। এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, হাজী শরী'অতুল্লাহ জনমনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক কঠিন জযবা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তার শিক্ষা ও প্রেরণা বাংলার মুসলিমগণের মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।

কখনো কখনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। বিখ্যাত ইতিহাসের দার্শনিক আর্নল্ড টয়েনবি বলেছেন, ইতিহাসের ঘটনাবলি আপনা থেকেই ঘুরে ফিরে পুনঃসংঘটিত হয়। চিরায়ত বাংলার ইতিহাসেও এহেন পুনরাবৃত্তির উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। ১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধ পরবর্তী চার দশকের মাথায় অর্থাৎ ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে আকস্মিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলার মুসলিমগণ নিজেদের সর্বস্ব লুণ্ঠিত, দুশমন পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখতে পায়। তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সামাজিক অবক্ষয়, অবনতি, সাংস্কৃতিক বিকৃতি ও বিভ্রান্তির আবর্তে। ইতিহাসের এহেন দ্বন্দ্বপূর্ণ পালাবদলের মধ্যে প্রধানত চারটি বিষয় রাষ্ট্র ও সমাজের উপরিভাগে উঠে আসে। এগুলো হচ্ছে,

**এক.** বিদেশী বণিকদের ব্যাপক লুটতরাজ ও সম্পদ পাচার,

**দুই.** হিন্দুদের ক্ষমতায়ন ও পুনর্জাগরণ,

**তিন.** মুসলিমগণের দ্রুত সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও

**চার.** সমন্বয়ের সংস্কৃতির নামে মুসলমানিত্বের বিবৃতি ও বিভ্রম।

নানা চড়াই-উৎড়াই অতিক্রম শেষে ঠিক দুই শতাব্দী পরে ইতিহাসের নতুন মোড়ে এসে আজকে ঘটছে সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। বাংলাদেশের মুসলিমগণ আবারও গোলক ধাঁধায় নিক্ষিপ্ত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ঠিক চার দশক পরে, একুশ শতকের সূচনালগ্নে প্রতীয়মান হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের মুসলিমগণে অবস্থাও যেন অনেকটাই পলাশি পরবর্তী অবস্থার দিকে মোড় নিচ্ছে। পুনরাবৃত্তি ঘটতে শুরু করেছে একই রকম দৃশ্যাবলীর। পলাশির চল্লিশ বছর পরের দিকের পরিস্থিতি আজকে যেন আবার এ রাষ্ট্র ও সমাজের পুরোভাগে সমুপস্থিত। ইতিমধ্যে কতিপয় বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি ও বহুজাতিক কোম্পানী এদেশের উপর তাদের থাবা বিস্তার করেছে। তারা করায়ত্ব করতে চাইছে এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদরাজি, লুটপাট পাচার হয়ে যাচ্ছে দেশের ধন-সম্পদ, অর্থ-কড়ি। সম্প্রদায় হিসেবে সমাজের প্রধান গোষ্ঠি মুসলিমগণের ছাপিয়ে অলক্ষ্যে সূচীত হয়েছে হিন্দুদের ক্ষমতায়ন ও পুনর্জাগরণ প্রক্রিয়া। মুসলিমগণ শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি দিক থেকেও বিকৃতি ও বিভ্রান্তির কবলে পতিত হয়েছে, সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে সংগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজ, সম্প্রদায়। আর এসবের মধ্য

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে চলছে সার্বিকভাবে মুসলিমগণের পরাভূত করার সূক্ষ্ম চক্রান্ত। জনগণের নৃতাত্ত্বিক সত্ত্বা বাঙালীত্বকে করে তোলা হচ্ছে জাতির মূল পরিচয়। এর প্রতিফলন ঘটছে সমাজ কাঠামো ও সংস্কৃতির বিন্যাসে। মুসলমানিত্ব ও বাঙালিত্বের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে এক অদ্ভূত সাংস্কৃতিক বাস্তবতা রূপ পরিগ্রহ করছে। কথিত সমন্বয়ের সংস্কৃতির চর্চার বার্তাবরণ হচ্ছে প্রসারিত। ক্ষীয়মাণ হচ্ছে হাজার বছর ধরে গড়ে উঠা মূল সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারাটি।

দুই শতাব্দীর পরে বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে কিভাবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে তার উপর যৎকিঞ্চিত আলোকপাত করা যায়। সেকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিসহ ফরাসি, দিনেমার, পর্তুগিজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠি বাংলায় লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করে। বিশেষভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের সম্পদ দু'হাতে লুটতরাজ ও পাচারে ব্যপৃত ছিল। এসবের পাশাপাশি মুসলিমগণের অবদমন ও দুর্বল করে রাখার জন্য তারা শিক্ষা, সংস্কৃতিতেও হস্তক্ষেপ করে। তখনকার দিনে বিদেশী বণিক, নীলকর কুঠিয়াল, কোম্পানির লোকজন ও তাদের দেশীয় দালাল, চর, অনুচরেরা মুসলিম সমাজে বিকৃতি ও ভাঙ্গনের প্রক্রিয়ায় মদদ দিয়েছে। তারা লুটপাট, শোষণ ও নিগ্রহ নির্যাতনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি বা পরিবর্তনের লক্ষ্যে নানা স্তরে কাজ করেছে। তারা মুসলিমগণের আত্মবিস্মৃতি, হীনমন্যতা ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করার কুটিল ও জটিল ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে নিরন্তর। আজও এর ব্যতিক্রম নেই। আজকে কুঠিয়াল নেই, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নেই, নেই ইংরেজ শাসন ।

কিন্তু দেশী-বিদেশী নানা সংস্থা, এনজিও, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ, কর্পোরেট হাউজ, ফ্যাশন হাউজ, বহুজাতিক কোম্পানি, টেলি-কমিউনিকেশন কোম্পানি, খ্রিষ্টান মিশনারী প্রভৃতি মিলে পুনর্বার ঘিরে ফেলেছে এ মুসলিম সমাজ ও জনপদকে। এরা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, করছে অর্থ-সম্পদ, সে সাথে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি তথা পুরো জীবনধারাও তাদের প্রথম টার্গেট বটে। প্রচলিত ইসলামি লেবাস, লেহাজ, আদব-কায়দাকে এরা প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, চ্যালেঞ্জ করছে। জীবনের ভিন্নতর ও অসঙ্গত মডেল হাজির করছে সামনে। এরা নিজেদের মতলব হাসিলের পথে ইসলামি মূল্যবোধকেই প্রধান প্রতিপক্ষ, তাদের সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধক জ্ঞান করছে। তাই ইসলামকে চাতুর্যের সাথে কোণঠাসা ও হেয় প্রতিপন্ন করতে তারা তৎপর। কৌশলে ইসলামকে এরা পরিত্যাজ্য, সেকেলে বলে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে। ইসলামি জীবনধারার বিপরীত চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে তারা গ্রহণ করছে নানা কর্মসূচি, নতুন প্রজন্মের মুসলিমগণের মগজ ধোলাই করার জন্য ঢালছে অঢেল টাকা। যাতে তারা মুসলিম বলে পরিচয় দিতে হীনমন্যতা বোধ করে, ইসলামি সংস্কৃতিকে ধারণ ও চর্চা করতে দ্বিধা ও সংকোচবোধ করে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহ আধ্যাত্ম্যবোধহীন, নৈতিক মূল্যবোধ বিবর্জিত, উদ্দামভাবে বেড়ে উঠবার পক্ষে আমাদের সাংস্কৃতিক বিকৃতি বিভ্রান্তিতে নিরন্তর অর্থ, বুদ্ধি, আয়োজন, প্রচারণা দ্বারা এরা সহায়তা করে চলেছে। মুসলমানিত্বকে অস্বীকার করার ও ভোগবাদী, নগ্নতাবাদী হয়ে উঠবার জন্য নানান হুজুগও ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।

*Dhaka University Institutional Repository*

ঊনিশ শতকে এদেশের রাজা, জমিদার, পুরুত, পণ্ডিত, মহাজন, সমাজপতিরা ছিল বিদেশী শাসক, শোষকদের স্বার্থের পাহারাদার। আজও এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, নেতা, সাবাদিক, সংস্কৃতি তৎকর্মী, রাজনীতিবিদ ও কমিশনখোরেরা নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের আড়াল করে রাখছে, তাদের লুটপাটে প্রচ্ছন্ন সহায়তা দান করছে। এরাই পুরোভাগে থেকে সমাজকে বিপথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বিদেশী বণিক, লুটেরা, সাম্রাজ্যবাদীরা এ জনপদের মানুষকে একবার সম্পদহীন, ক্ষমতাহীন, অসহায় জনগোষ্ঠিতে পরিণত করেছিল। আবার নয়া-সাম্রাজ্যবাদীরা, বিদেশী কোম্পানি, কর্পোরেশনসমূহ ভিন্ন চেহারায় দৃশ্যপটে উপস্থিত। এরা লুটপাট করে এ জাতি-রাস্ট্রকে অকার্যকর দশায় ঠেলে দিতে তৎপর রয়েছে। এদের চক্রান্তে এ জাতি অবশেষে পুনরায় ক্ষমতাহীন, রাষ্ট্রহীন আশ্রিত গোষ্ঠিতে পর্যবসিত হতে পারে। পলাশি যুদ্ধোত্তরকালে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুবাদে হিন্দুদের ব্যাপক ক্ষমতায়ন ঘটে।[১৫০] রাষ্ট্রীয় দৃশ্যপট থেকে যাবতীয় পন্থায় মুসলিমগণের পিছনে হটিয়ে দেয়া হয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ আসন সমূহ হিন্দুদের দখলে চলে যায়। সরকারি ও কোম্পানির ছোট, বড় সব চাকরিতে তারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র প্রসাশনে হিন্দুদের প্রাধান্য ও সমাজে হিন্দু নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। আজকেও প্রায় অভিন্ন আলামত চোখে পড়ছে। ক্ষমতায়নের পাশাপাশি হিন্দু জাগরণের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমগণের এড়িয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ আসনে হিন্দুদের অধিষ্ঠিত করা হচ্ছে। প্রশাসন, পুলিশ, আমলাতন্ত্র, বিচার, শিক্ষা, গণমাধ্যমসহ আরো বহু ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান চোখে পড়ার মতো। এসব তাদের ক্ষমতায়নেরই স্পষ্ট আলামত। অন্যদিকে সনাতনী হিন্দু পূজা-অর্চনা, পালা-পার্বন, উৎসবাদি অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও জাঁকজমকে প্রতি বছর দেশের শহর, বন্দর, গ্রামে উদযাপিত হচ্ছে। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশে প্রতি বছর বিশ হাজারের বেশি দূর্গামণ্ডপ স্থাপিত হয়। অর্থাৎ গড়ে প্রতি তিন বর্গমাইলে স্থাপিত হয় একটি পূজা মণ্ডপ। উল্লেখ্য, এসব পূজা মণ্ডপের দর্শণার্থী বা অংশগ্রহণকারীদের একটি বিরাট অংশ মুসলিম এবং তারা স্বেচ্ছায় এগুলোতে অংশগ্রহণ করে। এসব উৎসব আয়োজনের বিপুল সংখ্যা ও আড়ম্বর নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, কি বিপুল রূপান্তর ঘটেছে সমাজের অভ্যন্তরে।

ঊনিশ শতকের মতোই দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সূচিত হয়েছে নীরব নবজাগরণ। এরই আরেকটি দিক হিসেবে হিন্দুদের নিকট অতীতের গৌরব ও কৃতিত্বের নিদর্শন নতুন করে সমাজের সামনে আনা হচ্ছে। সূচিত্রা সেন, উপেন্দ্র কিশোর রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অশ্বিনী কুমার দত্ত, মুকুন্দরায়, জ্যোতি বসু, সুকান্ত ভট্টচার্য্য, প্রীতিলতা, সূর্য সেন, ইলা মিত্র প্রমুখকে বানানো হচ্ছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নতুন আইকন। একুশ শতকের সূচনালগ্নে এসব কর্মকান্ড ঊনিশ শতকের অনুরূপ উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ তথা 'বাংলার নব জাগৃতি'র ধারণাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। পলাশির বিপর্যয়ের পরে ক্ষমতাহীন হতদরিদ্র মুসলিমগণ বহুক্ষেত্রে হিন্দুদের অনুকরণে বাধ্য হয়েছিল। ইদানিং বাংলাদেশে মুসলিমগণের নিজেদের গৌরবোজ্বল ঐতিহ্য,

---

১৫০ ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনূঃ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক-আধ্যাত্মিক অঙ্গন ছেড়ে স্বেচ্ছায় প্রতিবেশীদের ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের নিষিদ্ধ ধারার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। সেকালে বাংলার মুসলিমগণ বাধ্য হয়ে নিজেদের নামের পূর্বে 'শ্রী' সংযুক্ত করতো আর স্থানীয় কর্তাবাবুদের চাপের মুখে নিজেদের সন্তান-সন্ততির নাম রাখতো প্রতিবেশীদের মতো করে। আর আজকে দেড়শত বছর পরে বাংলাদেশের মুসলিমগণ নিজেদের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে কথিত বাঙালিত্বকে জাহির করার অভিলাষে নিজেদের সন্তানদের নাম রাখছে হিন্দু বৈদিক ধারা অনুসারে বাঙালিত্বের এক অদম্য উচ্ছ্বাসে এসব 'বাংলা নাম' রাখা হচ্ছে মুসলিমগণের ঘরে ঘরে। এগুলো প্রচলিত ইসলামি সংস্কৃতিকে অস্বীকার করার নামান্তর, সামাজিক অবক্ষয়ের জ্বলন্ত বহিঃপ্রকাশ বৈকি। এতে সামাজিক সংহতি হচ্ছে বিপন্ন, ধর্মীয় আধ্যাত্ম সিলসিলা হচ্ছে বিনষ্ট, সমাজ কাঠামোয় ধরছে ভাঙ্গন। কখনো সচেতনভাবে, কখনো হুজুগে বশবর্তী হয়ে মুসলিমগণ ঐতিহ্যগত ইসলামি ভাবধারাকে পাশ কাটিয়ে চলছে।[১৫১]

লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, সেকালে এ রকম কলুষ কালিমা মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়েছিল অনেকটা রাজনৈতিক চাপের মুখে, আর খানিকটা অজ্ঞানতা প্রভৃতির ফাটল বেয়ে। আর আজকে এসব চর্চা ও আত্মস্থ করা হচ্ছে সচেতনভাবে; সাগ্রহে। আজকে শাসকবর্গ বাঙালীত্বকে আয়ত্ব ও বরণ করার জন্য প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ নানা চেহারায়, নানা ভাষায়, বোলচালে মুসলমানিত্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলার কাজ করে যাচ্ছে। সামাজিক আচার-উৎসব থেকে রাষ্ট্রাচার পর্যন্ত অনৈসলমিক ভাবধারার চর্চা বাড়ছে। ঐতিহ্যগত ইসলামি ভাবধারাকে প্রকাশ্যে নানাভাবে অস্বীকার করা হচ্ছে। মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে রাষ্ট্রীয় আয়োজনের সূচনা এরকমই একটি উদাহরণ। বিদেশী মেহমানদের সম্মানে আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় একতারা, খঞ্জনী হাতে গেররুয়াধারী হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে শিল্পকে হাজির করা হয় আমাদের সংস্কৃতিকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য। দেশের ভিতরের বাইরের নানান মঙ্গল থেকে ইসলামি ভাবধারাকে প্রতিহত করার প্রকাশ্য ও গোপন প্রচেষ্টা চলছে। মুসলিম মেয়েদের হিজাব ধারণকে করা হচ্ছে বাধাগ্রস্ত, দাঁড়ি-টুপিধারী ও পরহেজগার মুসলিমগণের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও কখনো হামলার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হচ্ছে। ইসলামি বইপত্রকে প্রায়ই 'জিহাদী' হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। ইসলাম ধর্ম শিক্ষার কেন্দ্র মাদরাসাগুলোকে বলা হচ্ছে জঙ্গিবাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। অন্যভাবে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ থেকে তরুণদের বিরত রাখতে চালানো হচ্ছে নানান নগ্ন প্রচেষ্টা। ইসলামকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে মুসলিম বালক-বালিকাদের নাচ-গান, যাত্রা-থিয়েটারে যুক্ত হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে সরকারিভাবে। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনাকেও ঢেলে সাজানো হচ্ছে একই লক্ষ্যে। অন্যদিকে, আন্তঃধর্ম বিবাহে দেয়া হচ্ছে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন। এভাবে চতুর্দিক থেকে সামাজিক অবক্ষয় ত্বরান্বিত করে তোলা হয়েছে। অতীতে ইঙ্গ-হিন্দু শাসকবর্গ বরাবরই ইসলাম আতঙ্কে ভুগেছে।[১৫২]

---

১৫১ ড. মোহাম্মদ আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, *হাজি শরিয়তুল্লাহর লড়াই ও আজকের প্রাসঙ্গিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

১৫২ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা কেড়ে নেয়ায় মুসলিমগণ আবার রুখে দাঁড়াতে পারে এ আশঙ্কায় তারা মুসলিমগণের প্রতি সর্বদা প্রতিহত করার মনোভঙ্গি পোষণ করেছে, সন্দেহের চোখে দেখেছে। সেদিন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)কে একজন বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা চলেছে। এখনও ইসলামপন্থিদের সম্পর্কে সেই দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ ব্যতিক্রম নেই। বিগত চল্লিশ বছর ধরে যারা এদেশ শাসন করেছে, তারা সবাই কম বেশি ইসলাম ফোবিয়ায় ভুগেছে। বস্তুত এক বিপরীত স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে আজকের বাংলাদেশের মুসলিমগণের ঐতিহ্যগত জীবনধারা। দেশের বিশিষ্ট আলেম-উলেমাগণ মনে করেন বাংলাদেশে ইসলাম আজকে বিপন্ন দশায়। উগ্র জাতীয়তার হুজুগে সামাজিক বিপর্যয়, ধর্মীয় আধ্যাত্মিক বিভ্রান্তি ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। মাথাচাড়া তিয়ে উঠছে ইসলাম বিদ্বেষ, প্রবলতর হচ্ছে বাঙালিত্বের উচ্ছ্বাস। অথচ বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার অন্যতম প্রধান শর্তই হচ্ছে তার ইসলামি পরিচয়, বাঙালিত্ব নয়। এ জনপদের ইসলামি স্বাতন্ত্র্য মুছে গেলে শুধু সমাজ-সম্প্রদায় নয় রাষ্ট্রও ডুবে যেতে পারে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার মুসলিম সমাজ তার পরিশুদ্ধ আচরণ ধারা থেকে বিচ্যুৎ হয়ে এক মিশ্র ধর্মীয় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে প্রবেশ করেছিল। একুশ শতকের সূচনালগ্নে এসে বাংলাদেশের মুসলিমগণ যেন তেমনি বিশ্বাস, রীতিনীতি ও আচরণগত বিপর্যয়, বিভ্রান্তির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বাঙালি সংস্কৃতি চর্চা ও ধারণ করার নামে ইসলামের বিপরীত রীতি, প্রথা, ধ্যান-ধারণা আত্মস্থ করা শুরু হয়েছে।

ইসলামি ও বৈদিক সংস্কৃতির অদ্ভূত সংমিশ্রণের প্রবণতা প্রবলতর হয়ে উঠছে, চলছে সমন্বয়ের সংস্কৃতির চিন্তা, চর্চা। সমন্বয়ের সংস্কৃতির মর্মকথা হচ্ছে হিন্দুয়ানী ও মুসলমানিত্বকে গুলিয়ে ফেলা, তৌহিদবাদ ও বহুত্ববাদ মিলেমিলে একাকার করে এক ধরনের 'সহজিয়া ইসলাম' চালু করার চেষ্টা। আর একে অভিহিত করা হচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতা, সার্বজনিন, ধর্মনিরপেক্ষ প্রভৃতি অভিপ্রায়। ইসলামকে কুলষিত করে ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে ঠেলে দেয়ার চক্রান্তেড়র আরেক নাম সমন্বয়ের সংস্কৃতি। কথিত সমন্বয় বা ঐক্যের সংস্কৃতির বহু বিচিত্র উপলক্ষ্য সমূহের কয়েকটি হচ্ছে বাংলা নববর্ষবরণ, বর্ষাবরণ, শারদ উৎসব, পৌষ মেলা, বসন্তবরণ, চৈত্র সংক্রান্তি ও অনুরূপ নানা পালা-পার্বণ-মেলা ইত্যাদি। এর সঙ্গে আরো যুক্ত হয়েছে বাউল উৎসব, রবীন্দ্র উৎসব, কথিত 'আদিবাসী' উৎসব প্রভৃতি। কিছুদিন ধরে বাউল লালন শাহকে নিয়ে করা হচ্ছে যথেষ্ট মাতামাতি; রাষ্ট্র ও একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবি লালন চর্চায় অতিশয় উৎসাহ দেখাচ্ছে। লালন মূলত বাংলায় ধর্মীয় সমন্বয়বাদীদের অন্যতম পুরোধা পুরুষ। ইসলামের সাথে বহুত্ববাদী নানা বিকৃত মত, পথ, বিশ্বাসের সমন্বয় বা তালগোল পাকানোর চেষ্টা করেছেন তিনি। শরিয়ত বিচ্যুতি এ বাউলকে নিয়ে বেশি নাচানাচির অর্থই হলো ইসলামি ভাবধারায় প্রবেশের নয়া সুযোগ করে দেয়া, প্রকৃত ইসলামি আধ্যাত্মবোধকে কলুষিত করে সমন্বয়ের চোরাগলিতে ঠেলে দেয়া।

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ ইতিমধ্যেই কতখানি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে, কতটা সমন্বয়ের দর্শনে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে তা বাংলা নববর্ষ বরণের উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা দেখে অনুমান করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম নামধারীদের বৈদিক সংস্কৃতি চর্চা তথা সমন্বয়ের সংস্কৃতির এ হচ্ছে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। নববর্ষকে উপলক্ষ্য করে বাংলাদেশের এক শ্রেণীর মুসলিম কথিত 'শিকড়ের সন্ধানে'র নামে নিজেদের পরিচয় মুছে ফেলে বহুত্ববাদী ভাবনা-চেতনার মধ্যে একাকার হয়ে যেতে চাইছে। বাঙালিত্ব চর্চার নামে 'শাশ্বত বাঙালি' হওয়ার আকাঙ্খয় মুসলিম পরিবারের সন্তানেরা এদিন প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক কিছু অনুকরণ করে। উৎসবের আমেজে হলেও অনৈসলামিক ভাবধারাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে, গা সওয়া করে নিতে চাইছে। পোশাকে, সাজগোজে, আচরণে সেদিন তারা একাকার, মুসলিম-অমুসলিম প্রভেদ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

মুসলিম নবযুবকেরা ধুতি, ফতুয়া, খড়ম পরে কপালে চন্দন তিলক কেটে, ঢোল, ঢাগর, খঞ্জনি, একতারা হাতে নেচে গেয়ে বেড়ায়। মুসলিম তরুণীরা শাঁখা, সিঁদুর, টিপ পরে সাজুগুজু করে খোঁপায় ফুল গুঁজে রাধিকার ঢঙে পথে বের হয়। আর এমন নববর্ষ বরণকে অভিহিত করা হচ্ছে খাঁটি বাঙালী উৎসব হিসেবে। বাস্তবে বাংলা নববর্ষ হচ্ছে ফসল কাটার পর কৃষকের খাজনা পরিশোধ করার দিন। দোকানদার, মহাজনের হালখাতা খোলার দিন। এ দিনকে বানানো হয়েছে বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতীক, বাঙালীত্বকে চাঙ্গা করার যথেষ্ট উপলক্ষ্য। কার্যত নববর্ষের নামে ইসলামি আদর্শ ও সংস্কৃতির পরিসীমাকে অতিক্রম করে পৌত্তলিকতার দিকে বেপরোয়াভাবে ঝুঁকে পড়ছে এক শ্রেণীর মানুষ। রাষ্ট্রও এতে বিপুল উৎসাহ প্রদান করছে। ফলে কথিত এ 'অসাম্প্রদায়িক উৎসব' আজ কেবল শিক্ষিত নগরবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না, ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে প্রত্যন্ত পল্লী পর্যন্ত। অনৈসলামিকরণের এক অপ্রতিরোধ্য দাবানল যেন শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এ নববর্ষ বরণকে ঘিরে যেসব আয়োজন, আচার-আনুষ্ঠানিকতা ও জীবনবোধ চর্চা আত্মস্থ করার চেষ্টা চলছে তাকে বলা হচ্ছে 'সর্বজনীন' বা ধর্মনিরপেক্ষ। অথচ এর প্রতিটি পরতে পরতে বৈদিক ভাবনার, বহুত্ববাদী আচার-রীতির, পৌত্তলিকতার ছাপ স্টষ্ট। নববর্ষের শোভাযাত্রায় উপস্থাপিত প্রতিটি প্রত্যয়, প্রতীক যেমন পেঁচা, হনুমান, সাপ, হাতি কিংবা উলূধ্বনি, টিপ, সিঁদুর, আরতির ঢঙে নর্তন, কুর্দন, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সাজ সবই হিন্দুত্বের প্রকাশ।

ইসলামি চেতনা বা তাওহিদবাদী সাংস্কৃতিক ধারণা থেকে এসব বহুদূরের এবং স্পষ্টত বিপরীত চেতনার বা বিশ্বাসের বিষয়। আর জাতীয় ঐক্যের কথা বলে, বাঙালি সংস্কৃতির জিগির তুলে, একশ্রেণির মুসলিম সাগ্রহে, সমন্বয়ের ছাইভস্ম গায়ে মাখছে। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের 'সত্যপীর' প্রতিষ্ঠা যেমন হিন্দু-মুসলিমগণের অভিন্ন সংস্কৃতি ও জাতিগত একাত্মতা সৃষ্টির এক ভ্রান্ত প্রয়াস ছিল, তেমনি বাংলা নববর্ষ বরণকে খাঁটি বাঙালিত্বের উৎসব ও একজাতি তত্ত্বের উপলক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠাও তদ্রূপ একটি অসঙ্গত ধারণা। এ উভয় উদ্যোগই ইসলামকে বিকৃত করার, মিথ্যা সমন্বয়ের প্রয়াস মাত্র। এমনি সমন্বয়ের স্রোতধারায় গা ভাসানোর আরো বিস্তার আলামত চোখে পড়ে। নববর্ষ ছাড়াও কয়েক দশক থেকে মহা উৎসাহে বর্ষা বরণ, বসন্ত বরণ, পৌষ মেলা প্রভৃতি আয়োজন করা হচ্ছে। দিন দিন বাড়ছে

Dhaka University Institutional Repository

আগ্রহ, উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাচ্ছে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও। অর্থাৎ ছড়িয়ে পড়ছে তৃণমূল পর্যন্ত। এগুলো অনেকটাই রবীন্দ্রভাবনা প্রসূত বিষয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তি নিকেতনে এসব প্রকৃতি বন্দনামূলক, ঋতুভিত্তিক আয়োজনের সূত্রপাত ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এগুলোকে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ও সার্বজনীন উৎসব বলে জ্ঞান করতেন। কবি স্বয়ং এতে অংশগ্রহণ করতেন। প্রকৃতি পূজার এসব আয়োজনে বৈদিক ভাবনা-চেতনা, বন্দনা রীতি, আচার-অনুষঙ্গ পদে পদে রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকলেও এগুলোকে অভিহিত করা হয় সকল বাঙালির প্রাণের উৎসব হিসেবে। শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্লাসিক্যাল বা পৌরাণিক ধারার হিন্দু জীবন ও শিক্ষা চর্চার উদ্দেশ্যে। আর সেই শান্তি নিকেতন সূচীত উৎসব নিয়ে আজ মাতোয়ারা বাংলাদেশের আত্মপরিচয় বিস্মৃত মুসলিমগণ। স্পষ্টত এসব আয়োজনের আবাহনের রঙেঢঙে, নাচেগানে ইসলাম শুধু অনুপস্থিত নয়, হিন্দুত্বই এর পুরোভাগে। বৈদিক ধারণাই এগুলোর প্রাণ প্রবাহ। আর এগুলোকে উপস্থাপন করা হচ্ছে হিন্দু-মুসলিমগণের ঐক্যের উপলক্ষ্য হিসেবে, তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের সেতুবন্ধন হিসেবে।[১৫৩]

এসব বরণ উৎসবের গোড়ার কথা বোঝা যাচ্ছে, আর এগুলোকেই বাঙালিত্ব, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি চটকদার মোড়কে পুরে হাজির করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষও তা লুফে নিচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নিশানা হিসেবে। তৌহিদ ও শিরকের এমন সমন্বয়ের বিকার কার্যত ইসলামকে পেছনে ফেলে অনৈসলামি স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়ার আকাঙ্খারই বহিঃপ্রকাশ। বৃটিশ শাসনামলে রাজনৈতিক-সামাজিক চাপে মানুষ সমন্বয়ের ভুল পথে পা বাড়িয়েছিল, তখন তাদের প্রতিরোধের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। আর আজকে তথাকথিত আত্ম পরিচয়ের খোঁজে, বাঙালিত্বের সাধনায় বাংলাদেশের মুসলিমগণ সেসব বৈদিক ধোঁয়াশার মধ্যে মাতামাতি করেছে। মধ্যযুগের ইতিহাসবেত্তাদের মতে বাঙালিত্বের প্রথম ও প্রবল বিকাশ ঘটে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময় আর তা সম্ভব হয়েছিল শ্রী চৈতন্যের প্রচারনায়। শ্রী চৈতন্যের আহবান, উৎসাহ ও প্রচারণায় বাঙালী সত্তার প্রকৃত ও স্বার্থক উন্মোচন হয়। শ্রী চৈতন্যের নিরন্তর প্রচেষ্টায় কেবল বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনেরই উদ্ভব ঘটেনি, শ্বাশত বাঙালিত্বেরও মহা উদ্বোধন হয়েছে। তার ভাবনার ডাকে তখন বাঙালিত্বের এমন জোয়ার সৃষ্টি হয় যে, সব পরিচয় ছাপিয়ে বাঙালিত্বই উপরে উঠে আসে। ভাষা বিজ্ঞানী দীনেশ চন্দ্র সেনের ভাষ্যমতে এ বাঙালায় মুসলিম, ইরান, তুরান যে স্থান হতে আসুক না কেন এদেশে এসে সম্পূর্ণ বাঙালী হয়ে পড়েছিল। শ্রী চৈতন্যের তিরোধানের বহুকাল পরে সেই ‘বাঙালি মনের পরিপূর্ণ বিকাশের ব্যাকুলতা যেন পেয়ে বসেছে আজকের বাংলাদেশের মুসলিমগণের। অথচ সিলেটি ব্রাহ্মণ শ্রী চৈতন্যের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মের সংগঠন ও সংস্কার এবং তাকে ধ্বংসের পথ থেকে নব যৌবনের পথে নিয়ে যাওয়া। সৈয়দ মুজতবা আলী,  তিনি বাহ্যত ভক্তি, প্রেম, ক্ষমা ও শান্তির বার্তা প্রচার করলেও কার্যত হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার মিশনে অবতীর্ণ হন। এসবের

১৫৩ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪-২২৫

*Dhaka University Institutional Repository*

মধ্য দিয়ে মুসলিমগণের বিকৃতি বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দেয়ার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী শ্রী চৈতন্যের মূল বাণী ছিল পাষন্ডি সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার। এক্ষেত্রে পাষন্ড বলতে যে যবন বা মুসলিমগণেরই বুঝায় ইতিহাস তার সাক্ষী।

বাংলাদেশের মুসলিগণের ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে সেই শ্রী চৈতন্যের প্রেরণা সঞ্জিত বাঙালিত্বের জন্য লালায়িত, ব্যাকুল প্রাণ। আর সেই বাঙালীত্বকে হাসিল করার জন্যই তাদের নববর্ষ বরণ, বর্ষা বন্দনা, পৌষ-পার্বণ, বসন্ত বরণ, চৈত্র সংক্রান্তি নিয়ে যত কাণ্ড। ইদানিং শ্রী চৈতন্যকে অভিহিত করা হচ্ছে 'বাঙালি প্রত্নপ্রতীক' হিসেবে অন্যথায়, তিনি হচ্ছেন বাঙালিত্ববোধের আদি উদগাতা, বাঙালির একটি 'অখণ্ড আদর্শ' প্রতিষ্ঠার মুখপাত্র। অর্থাৎ, বাঙালি চেতনার গোড়ায় রয়েছেন শ্রী চৈতন্য। আজকের বাংলাদেশের মুসলিমগণ কি 'সম্পূর্ণ বাঙালি' হওয়ার আগ্রহে শ্রী চৈতন্যের ধ্বজাধারী হতে চায়! অথচ তিনি তো হিন্দুত্বের 'নবযৌবন' ফিরিয়ে আনার জন্য ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তবে কী বাংলাদেশের মুসলিমগণ শ্রী চৈতন্যের আরাধ্যকর্ম সমাপ্ত করতে, 'অখণ্ড' বাঙালি হওয়ার বাসনায় এতখানি উদ্বেলিত, এত মাতামাতি! হোসেন শাহের জামানা ফিরিয়ে আনার সাধনায় এরা যেন উদগ্রীব। শ্রী চৈতন্যের একনিষ্ঠ ভক্ত ও বাঙালিত্বের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক সুলতান হোসেন শাহ মুসলিমগণের অবিশ্বাস করতেন। তাই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলোতে তিনি অমুসলিমগণের আসীন করেছিলেন, সম্মানিত করেছিলেন হিন্দু পন্ডিত, পুরোহিত, কবি, বুদ্ধিজীবিদের। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যের রচয়িতা কবি মালাধর বসুকে তিনি ভূষিত করেছিলেন 'গুণরাজ খান' উপাধিতে। আর তার ভাই গোপীনাথ বসুকে (পূরন্দর খান) নিযুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। কবি বিদ্যাবাচস্পতি ছিলেন তার বিশেষ অনুগৃহীতদের একজন।[১৫৪]

এমনকি 'মক্কী' উপাধিধারী হোসেন শাহের ব্যক্তিগত প্রধান দেহরক্ষীও ছিলেন একজন অমুসলিম। আর তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন মুকুন্দ দাস। আর টাকশাল অধিপতি ছিলেন শ্রী অনুপ। রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী নামক বৈষ্ণবভক্ত দুই ভাই ছিলেন তার পরিষদ। রূপ ছিলেন হোসেন শাহের ব্যক্তিগত সচিব আর সনাতন একজন প্রভাবশালী মন্ত্রি। হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণের সময়কালে এক ভয়ংকর মুসলিমগণ হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করেন। এতে বহু মুসলিম সেনানায়ক, যোদ্ধা, আলেম-উলেমা, আমির-উমরাসহ বিপুল সংখ্যক সাধারণ মুসলিম নিহত হয়েছিলেন। তখন থেকে হোসেন শাহ রাষ্ট্র প্রশাসনে অমুসলিমগণের দিকে ঝুঁকে পড়েন। আর হিন্দুরাও তাকে পরিবৃত্ত করে রাখে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে তৎকালীন বাংলার মুসলিম সমাজের উপর। সে ইতিহাসের অনেক কিছুরই পুনরাবৃত্তি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আজও হয়ত খুঁজে পেতে পারেন। ১৫১৯ সালে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের বিদায় হতে ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ উদ্ দৌলাহর পলাশি প্রান্তরে শাহাদত বরণ পর্যন্ত কমবেশি এ দুই শতাব্দীকালের অলক্ষ্যে বাংলায় ইসলামি সংস্কৃতি হয়েছে ক্রমশ কলুষিত আর

১৫৪ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

*Dhaka University Institutional Repository*

সমন্বয়ের সংস্কৃতি হয়েছে বিস্তৃততর।[১৫৫] এ সময় ইসলামের দুশমনরা গোপনে গোপনে হয়ে উঠেছে তপ্ত থেকে তপ্ততর।

মুসলিম শাসনের আকস্মিক অবসানের পর ১৭৫৭ অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ঘটে তাদের ইসলাম বিদ্বেষের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ। মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই বাংলার মুসলিমগণ আর্থ-সামাজিক অবক্ষয় ও দুঃখ দুর্ধশার অতলে হারিয়ে যায়। আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির বিবেচনায় আজকে বাংলাদেশের মুসলিমগণ যেন ঊনিশ শতকের প্রথমভাগে দাঁড়িয়ে। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর জামানা যেন আবার ফিরে এসেছে। তখন বিদেশি ফিরিঙ্গি বণিকেরা চালিয়েছে শোষণ, লুণ্ঠন, আজও নয়া সাম্রাজ্যবাদীরা ভিন্ন চেহারায় একই কাজ করছে। সেদিন বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমগণের সামাজিক অবক্ষয় ও সাংস্কৃতিক বিকৃতি অতল গহনে পৌছে গিয়েছিল, আজও এর ব্যতিক্রম নেই। সেদিনের মুসলিমগণের মতোই এখনকার মুসলিমগণও ক্রমশ পরিচিতি সংকটের মধ্যে নিমজ্জমান। তবে তৎকালীন বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমগণের সৌভাগ্য এ যে সেই ঘোর অন্দকারের মধ্যে হাজী নিসার আলী তিতুমীর, হাজী শরী'অতুল্লাহর মতো সাহসী পুরুষেরা আলোকবর্তিকা হাতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বিভ্রান্ত বিপর্যস্ত মুসলিমগণের তারা সংগঠিত করেছিলেন, পথ দেখিয়েছিলেন। পতিত মুসলিমগণের তারা পুনরুত্থানের প্রেরণা যুগয়েছেন, পুরোভাগে থেকে সিপাহসালারের মতো লড়েছেন। দুশমনদের প্রতিহত করার মতো ঈমানী জোশ, জযবা জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন মানুষের মনে। আজকের সামাজিক অবক্ষয় ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি, বিভ্রান্তির গোলক ধাঁধাঁ থেকে বাংলাদেশের মুসলিমগণকে বের করে আনতে, অবিচল ঈমানী উপলব্ধি জাগ্রত করতে চাই তেজদীপ্ত আপোষহীন নেতৃত্ব। মুসলমানিত্বকে নিশ্চিহ্ন করার নানা ষড়যন্ত্রকে বানচাল করতে প্রয়োজন 'ফরায়েযী আন্দোলনের' মতো সামাজিক আন্দোলন, গণজাগরণ। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)র মতো অক্লান্ত নির্ভীক একজন মর্দে মুজাহিদ আজ বড়ই প্রয়োজন।

## ৭.৩.২ ফরায়েযী আন্দোলনের অবিস্মরনীয় নেতা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ এর আর্বিভাবের আগে আরবরা মানুষের ইতিহাসে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন জনগোষ্ঠি ছিল না। মানবজাতির সর্বমূখী উন্নয়নের অভিযাত্রায় এ জনগোষ্ঠিকে বিশ্বনবী (সা.) নিজের কাছে পেয়েছিলেন বলেই ইতিহাসে তাদের এত খ্যাতি। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, মানবজাতির সামগ্রিক উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়ন ও তাদেরকে অভাবিতপূর্ব সম্ভাবনার দিকে পরিচালনার জন্য আল্লাহ তাকে রসূল হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।[১৫৬] জাহেলিয়াতের বিরুপ পরিবেশে তার মত সর্বমূখি প্রতিভার ও মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব

১৫৫ মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মুসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

১৫৬ মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির* ইতিহাস(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২য় প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৭৪), পৃ. ২৭-৩২

Dhaka University Institutional Repository

না হলে আরবদের পক্ষে সহসা জেগে উঠা, বিশ্ব ইতিহাসে চমক সৃষ্টি করা এবং বিস্ময়কর অবদানে রাখা সম্ভভ হতো না। আরবরা তার কাছ থেকেই পেয়েছিল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নয়নের দিক নির্দেশ। স্রষ্টা ও সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা গবেষণার তাগিদ দিয়ে তিনি একদল আল্লাহর অনুগত বান্দা তৈরি করতে চেয়েছিলেন যারা সকল পার্থিব প্রতিবন্ধকতা দূর করে টেকসই উন্নয়নের পথ দেখাবার যোগ্যতা রাখেন। মক্কায় নবুয়তী জীবনের ১৩ বছর এবং মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১০ বছর তিনি মানুষের ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় বিস্ময়কর সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতিহাসে এমন সাফল্যের দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ভারতের সিন্ধু প্রদেশ আরব সাম্রাজ্যের বিজিত অঞ্চলে পরিণত হয় ৭১১ খ্রিস্টাব্দে।[১৫৭] উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবন আব্দুল মালিকের সেনাপতি মোহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্দু জয় করবার বিষয়টি ছিল সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আরবদের এ বিজয়ের ফলে বিজিত জনপদে একটি নতুন সংস্কৃতির উদ্ভব হতে থাকে। মধ্য এশিয়ায় এক সময় বৌদ্ধদের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। তাদের এ অঞ্চলে অনেকগুলো বিহার বা জ্ঞানকেন্দ্র ছিল। ইসলামি শক্তির আগমনে বৌদ্ব ও অন্যান্য ধর্মের আচার-আচারণ সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। অষ্টম শতকে ইসলাম ভারতের একটি প্রান্ত স্পর্শ করলেও বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন হয় ত্রয়োদশ শতকে, তুর্কি বিজয়ের পর। অচেনা-অজানা জনপদে শসক শ্রেণি বাস করতেন দুর্গের ভিতরে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের সংযোগ ছিল না। ইসলাম প্রচার ও ইসলামি সংস্কৃতির বিস্তরে পীর, ফকির, দরবেশ শ্রেণির লোকেরা যুগান্তকারি ভুমিকা পালন করেন। নবাগত শাসক ও ধর্মপ্রচারক শ্রেণির ভাষা ছিল আরবি ও ফারসি। শাসক ও শসিতের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা ও মধ্যস্থতাকারী শ্রেণি তৈরি হতে কিছুটা সময় লেগেছিল। প্রথমে নিজের গরজে শাসকদের বিজিতের ভাষা শিখতে হয়েছে, অথবা দোভাষির সাহায্য নিতে হয়েছে। ধর্মান্তরিত হিন্দু,বৌদ্ধ অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলিম সমাজের নানা সাংস্কৃতিক উপাদান সঙ্গে নিয়ে আসে। তার বহু উপাদান মিশে যার ইসলামি জীবন ধারার সঙ্গে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে পীর, ফকির, সুফীরা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ছিলেন অন্যদের চেয়ে উদার প্রকৃতির লোক।

মোগল শাসকদের মধ্যে যেমন ছিলেন সমন্বয়বাদী শাসক, তেমনি ছিলেন সংকীর্ণতাবাদী শাসক। বৃটিশ শাসনের অধীনে যাওয়ার আগে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭) ধর্মনীতি ছিল যথেষ্ট গোঁড়া। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাঠ্য ষড়যন্ত্রের কারণে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পরাজিত হলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়াপত্তন হয় বিরান ভুমিতে। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিলে তার ফলাফল হয়

---

১৫৭ মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনূঃ মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও অন্যান্য, *ইসলামের ইতিহাস*(ঢাকা : ইফাবা, সং.২, জুন ২০০৮), খ.২, পৃ. ১৬২

*Dhaka University Institutional Repository*

সুদূরপ্রসারী। নতুন শাসকদের লক্ষ্য ছিল এ দেশের সম্পদ লুণ্ঠন। মোঘল, পাঠান, তুর্কি, আরবরা ভারত জয় করে ভারতেই থেকে যায়। এ দেশের সম্পদ নিয়ে তারা তাদের জন্মভূমিকে সমৃদ্ধ করেনি। ভোগ-বিলাস যা করেছে তা এ দেশে থেকেই করেছে। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিংবা বৃটিশ শাসকরা ভারতবর্ষ থেকে সম্পদ নিয়ে তাদের দেশ গ্রেট ব্রিটেনকে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের দেশের শিল্পের কাঁচামাল যোগান দিতে হয়েছে উপনিবেশগুলোর জনগণকে।

ঔপনিবেশিক শক্তির লুণ্ঠন-লালসা চরিতার্থ করার কাজটি শক্তি প্রয়োগ করেই তাদের করতে হয়েছিল। তবে অনক ক্ষেত্রে তারা হিসেব করে প্রতিটি পা ফেলেছিল। সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করেই তাদের পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজি ভাষা চালু করতে বেশ সময় নিয়েছিল। অবশ্য প্রতিরোধ আগা গোড়া কম বেশি অব্যহত ছিল। ১৮৫৭ সালে সর্বাত্মক প্রতিরোধের স্ফুলিঙ্গ বাংলায় জ্বলে উঠলেও বাংলার অভিজাত শ্রেণি সে বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি। আঠারো শতকের মধ্যভাগে যখন বাংলার রাষ্ট্রবিপ্লব হয়, তাখন সামগ্রিকভাবে বাংলা ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ধর্ম চর্চায় ভাটা পড়ে গিয়েছিল। আর্থ-রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে সংস্কৃতিসেবীর একটি দল কবিওয়ালা হিসেবে নতুন শহর কলকাতয় ভিড় করেন আর অপর একটি দল বৈরাগ্যের পথ ধরে বাউল গানের জন্ম দেন। অপর একটি দল দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের সৃষ্টি করে। এ দোভাষি পুঁথি গ্রাম ও শহরে সমান প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ পুঁতি-সাহিত্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতির পিপাসা নিবারনের মূল্যবান ভূমিকা রেখেছিল। সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যারা বাংলা ভাষা চর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তারা ঊনিশ শতকে পৌঁছাবার আগেই তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। ইতিহাসের এ বিচিত্র গতি নিয়ে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ একাধিক কবিতা লিখেছেন। এ রকম একটি কবিতা হচ্ছে- ‘ওরা কাজ করে’। এ কবিতায় তিনি বলেছেন-[১৫৮]

‘কতকাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে চয়োদ্ধত প্রবল গতিতে
এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল
এসেছে মোগল বিজয় রথের চাকা
উড়ায়েছে ধুলিজাল, উড়িয়াছে বিজয় পতাকা
শূণ্য পথে যতদূর চাই
আজ তার কোন চিহ্ন নাই।
আবার সেই শুন্য তলে আসিয়াছে দলে দলে
লৌহ বাঁধা পথে অনলনিশ্বাসী রথে প্রবল ইংরেজ
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ- বেড়াজাল।

১৫৮ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

*Dhaka University Institutional Repository*

জানি তার পণ্যবাহি সেনা
জ্যোতিষ্ক লোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবেনা।'

১৯৪১ সালে তিনি এ ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। তার এ ভবিষ্যৎ বাণী সত্য প্রমাণিত হতে খুব বেশি সময় লেগেছিল বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের চোখে এ সত্যের পাশাপাশি আরও একটা সত্য ধরা পড়েছিল। সে সত্য হচ্ছে,

'রাজছত্র ভেঙে পড়ে,
সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে,
রণডঙ্কা নীরব হয়ে যয়,
কিন্তু ওরা চিরকাল টানে দাঁড়,
ধরে থাকে হাল,
ওরা মাঠে মাঠে বীজ বোনে,
পাকা ধান কাটে,
ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তের।
দুঃখ-সুখ দিবস রজনী মন্দ্রিত করিয়া
তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে,
ওরা কাজ করে ॥'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মাটির পৃথিবী পানে তাকিয়ে যে বিপুল জনতার কলরব শুনতে পেয়েছিলেন, যাদের দাঁড় টানতে, হাল ধরতে, মাঠে মাঠে বীজ বুনতে, পাকা ধান কাটতে দেখেছিলেন, কলকল রবে পথ চলতে দেখেছিলেন, তাদেরই পূর্বসূরিদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)।[১৫৯] তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন ইসলামি জীবন ধারায় কি কি কাজ অবশ্য করণীয়, আর কি কি কাজ অবশ্য বাজর্নীয়। ফরজ বা অত্যাবশীয় কাজ করবার তাগিদ দিয়েছিলেন বলে তার আন্দোলন ইতিহাসে ফরায়েযী আন্দোলন নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

ফরায়েযী আন্দোলন ঐ সময়ে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে এনেছিল যার প্রাসঙ্গিকতা আজও সমান গুরুত্বহ। ভূমির মালিকানা, মানবিক মর্যাদা, সালিশি ব্যবস্থা, স্থানীয় শাসন, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ, এক কথায় একাধিক মহতী মূল্যবোধের সমন্বিত চর্চার উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)। যার নজির তার আগে বা পরে আর কেউ সৃষ্টি করতে পারেননি। তৃণমূল পর্যায়ে গড়ে উঠা এ আন্দোলন কেন প্রতিষ্ঠানিক চর্চা ও পরিচর্যার ভিতর দিয়ে তার বিপুল সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি তা নিয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, যোগ্য নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা থাকলে এ

১৫৯ সৈয়দ তোশারফ আলী, *হাজি শরিয়তুল্লাহ ফরায়েজী আন্দোলনের অবিস্মরণীয় নেতা*(ঢাকা : বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ২০১১), পৃ. ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন এতদিনে 'জীবনের মহামন্ত্রধ্বণি' মণ্ডিত করে তুলতে সক্ষম হত।[১৬০] অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঢুকে পড়ে। ইতিহসের রঙ্গমঞ্চে ঐ সময়টা ছিল ইউরোপীয় শক্তির উত্থানের সময়। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, উদ্ভাবনায় ও সামরিক শক্তিতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সবাই স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। রেনেসাঁ ও রিফর্মেশনের আলোকোজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা তাদের ভেতরে যেমন নতুন উদ্দিপনা ও অনুসন্ধিৎসা সঞ্চার করেছিল তেমনি তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল সমৃদ্ধ হওয়ার, সেরা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। লক্ষ্য অর্জনে তাদের ছলাকলা, কৌশল ও বলপ্রতিষ্ঠার পেছনে কোনো মহতি লক্ষ্য ছিল না, শোষণ ও লুণ্ঠন করবার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব নিয়ে তারা এসেছিল। খ্রিস্টীয় নীতি, মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হতে দেখা যায়নি তাদের। যদিও মিশনারিদের কাজ মিশনারিরা যথারীতি করেছিল।

নবুয়তী ঐতিহ্যের মধ্যে সত্য-মিথ্য, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পণ্য, হারাম-হালাল, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বিচারবোধ দেখা যায়। কিন্তু রেনেসাঁ কিংবা রিফির্মেশন পরবর্তী চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধের মধ্যে মানবিকতা, ব্যক্তি স্বতন্ত্র্যবোধ ইত্যাদি। ব্যাপারগুলো থাকলেও শোষণ, লুণ্ঠন কিংবা অবৈধ পথ ও পন্থা অবলম্বন ঠেকাবার ব্যাপারে অন্তরলোকে কোনো নৈতিক প্রতিরোধ ছিল, এমনটি দাবি করা যাবে না। শুধু বিবেকের তাড়না বলে বিছু থাকলেও থাকতে পারে। সত্যের খাতিরে একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, ধর্মের নামে, রাজনীতির নামেও হিংসা , হানাহনি, নিষ্ঠুরতা কম অনুষ্ঠিত হয়নি। আগেই বলেছি, বাংলা তথা ভারতবর্ষে যখন ইংরেজদের শাসনাধীনে যায় তখন তারা কিন্তু রাতারাতি সবকিছু বদলে ফেলেনি। তারা ভূতপূর্ব শাসকদের শাসনরীতি, ভূমিনীতি, রাজস্বনীতি, প্রশাসনিক পদ্ধতি, আইন-কানুন ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য বেশ কিছুটা সময় নিয়েছিল। বিজয়ী পক্ষ যেমন তার অর্জনকে সংহত করে ইংরেজরাও সে কাজ করেছিল।[১৬১] তারা যেহেতু শোষণ-লুণ্ঠন করার জন্য এসেছিল তাই তাদের বেশ সতর্কতার সঙ্গে এগুতে হয়েছিল। সহযোগী হিসেবে হিন্দু সম্প্রদায়ের অগ্রসর অংশকে পেতে তাদের মোটেও বেগ পেতে হয়নি।

মুসলিমগণের পক্ষে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার বেদনা সহজে ভুলতে পারার কথা ছিল না। বৃটিশ শাসনের কুফল ফলতে শুরু করলে প্রতিরোধ তৈরি হতে থাকে। বক্সারের যুদ্ধ, ফকির ও সন্ন্যাসি বিদ্রোহ, তিতুমীরের কৃষক আন্দোলন, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর ফরায়েযী আন্দোলন ও সিপাহী অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পর মুসলিমগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জেগে ওঠে। তাদের ভেতরে অনেক সংস্কারক জন্ম নেয়, যারা হিন্দু ধর্মের সংস্কারে এগিয়ে এলেন ইংরেজ সাহেবদের চোখ দিয়ে তারা তাদের ধর্মকে, তাদের ভাষাকে, তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে মূল্যায়ন করতে শিখলেন। দেশের মানুষ, দেশের প্রকৃতি, দেশের ভাষা, দেশের মনীষা নতুন অর্থ আর

---

১৬০ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
১৬১ সৈয়দ তোশারফ আলী, *হাজি শরিয়তুল্লাহ ফরায়েজী আন্দোলনের অবিস্মরণীয় নেতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

তাৎপর্য নিয়ে হাজির হলো তাদের কছে। তারা রাজনৈতিক দল গড়লেন। শাসকদের কাছে দাবি দাওয়া তুললেন, এক পর্যায়ে তারা অসহযোগ আন্দোলনে গেলেন এবং বৃটিশদের ভারত ছাড়ার শ্লোগান তোলেন, তাদের দেখাদেখি মুসলিমগণ ও দল গড়েন, দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন এবং শেষ পর্যন্ত ভারত ভাগ হয়, বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ হয় এবং ইংরেজরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্ত, অশ্রু-বেদনায় বিদীর্ণ পরিবেশে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেয়। রেখে যায় দীর্ঘ প্রায় দুই শতাব্দীর ঔপনিবেশিক শাসনের নানা স্মৃতি চিহ্ন ও কলঙ্ক।[১৬২]

অতীতকে আজ ফিরে দেখা যাবে, মুল্যায়নও করা যাবে কিন্তু অতীতকে আর বদলানো যাবে না। তবে ভুলগুলো যদি শনাক্ত করা যায়, সেগুলো যদি আমাদের নাড়া দেয় তবে তার পুনরাবৃত্তি হয়তো এড়ানো যাবে। এ দুষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর চরিত্রটিকে ও তার অবদানকে। মাদারিপুরের এক নিভৃত পল্লীতে থেকে নিজেকে অনেক উঁচুতে তুলেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ইসলামের যে কাজগুলোর উপর জোর দিয়েছে, ইসলামের নবী যে কাজগুলো করার তাগিদ দিয়েছেন, যে কাজগুলো করা হলেও তা নিছক আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে করা হচ্ছে, কাজগুলো তাৎপর্য উপলব্ধি করা হচ্ছে। তিনি আরও দেখতে পেলেন আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পরও বিশ্বাসীদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শ্রেণিভেদ দূর হচ্ছে না। এটা যে অন্যায়, ইসলাম সম্মত নয়; এ কথা তিনি জোর দিয়ে বললেন। এর ফল হলো সুদূরপ্রসারী। যে সব পেশার লোকেরা মুসলিম হয়েও আশরাফ মুসলিমগণের কাছ থেকে অবজ্ঞা, অবহেলা পেয়ে আসছিলেন তারা এসে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর ফরায়েযী আন্দোলনে সামিল হতে লাগলেন। জোলা, তেলি, জেলা প্রভৃতি পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলামি জীবনাদর্শের মাহাত্ম্য উপলব্ধির সুযোগ পেল। ইসলামের মূল্যবোধ ও শিক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে তার আন্দোলন অল্পসময়ে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করল।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর সময়ে গ্রাম বাংলায় জমিদারি ব্যবস্থার দাপট ছিল প্রবল। জমিদারদের অত্যাচার, অবিচার ও জবরদস্তিমূলকভাবে বিভিন্ন কর আদায়ের বিরুদ্ধে তিনি জনমত সংগঠিত করেছিলেন। তিনি ভূমি মালিকানা বিষয়ে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা কৃষকদের ভিতরে ব্যাপক আশা এবং জমিদার শ্রেণির ভিতরে ততোধিক ভীতির সঞ্চার করেছিল। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, ভারত বর্ষসহ পৃথিবীর বিশাল ভূখণ্ড মুসলিমগণ শাসন করার সুযোগ লাভ করেছিল এবং এখন অনেকগুলো দেশ মুসলিমগণ শাসন করেছে, কিন্তু অভিন্ন একটা ভূমিব্যবস্থা হড়ে তুলতে মুসলিম শাসকরা ব্যর্থ হয়েছে। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ভূমি মালিকানা নিয়ে যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার তাৎপর্যও উপলব্ধি করার চেষ্টা অতীতেও দেখা যায়নি, বর্তমানে দেখা যায় না।

---

১৬২ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*(কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৭৫), খ.৩, পৃ. ২২৫

Dhaka University Institutional Repository

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে শাসন ক্ষমতা থেকে হটিয়ে একদিকে চলতে থাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা সংহত করবার পরিকল্পনা অন্যদিকে সে পরিকল্পনা বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। এরকম এক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন ফকির ও সন্ন্যাসিরা। ফকির ও সন্ন্যাসিরা জাগতিক বিষয়ে সম্পৃক্ত ছিলেন না। তাদের স্বাধীনভাবে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেন। ইতিহাসে যা ফকির বিদ্রোহ নামে পরিচিত। ১৭৬০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে এ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে নবাব মীর কাসিম, ফকির-সন্ন্যাসিদের সাহায্য কামনা করেছিলেন। তারা তার ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধে মীর কাসিমের পরাজয় ঘটেছিল। কিন্তু ফকির-সন্ন্যাসিরা তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন।[১৬৩]

ইংরেজ শাসকদের চোখে এরা ছিলেন দস্যু। এদের কার্যক্রমের সঙ্গে স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসবাদী এবং এ যুগের জঙ্গীবাদী কার্যক্রমের  মিল দেখা যায়। ইংরেজদের কুঠি, জমিদারদের কাছারি, নায়েক-গোমস্তাদের বাড়ি আক্রমণ, কোম্পনির পণ্যবাহী নৌকা আক্রমণ, সৈন্যদের রসদ পরিবহনের বাধা সৃষ্টি আর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করা ছিল এদের আন্দোলনের কর্মকৌশল। মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক এ ফকীর ও সন্ন্যাসি বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৭৮৭ সালে ফকির মজনু শাহ মৃত্যুবরণ করলে ফকির বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে পড়ে। কোম্পানির উন্নততর অস্ত্র, রণকৌশল ও সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ফকির বিদ্রোহের অবসান হয়। স্মরণীয় ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস নবাবি আমলের পাঁচ-শালা দশ-শালা ভূমি বন্দোবস্তের বদলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কোম্পানি শাসনের ভিত মজবুত করার প্রায়াস পান। পূর্ব-বাংলায় হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) যখন মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করছিলেন তখন পশ্চিম বাংলায় মীর নিসার আলি তিতুমীর নামে যিনি বিখ্যাত, স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামের ঝাপিয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদের অনুসারি ও ওয়াহাবী আন্দোলনের সমর্থক। সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তিনিও কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করেন। উইলিয়াম হান্টারের মতে, বারাসাতের কৃষক বিদ্রোহে ৮৩ হাজার কৃষক কর্মী তিতুমীরের পক্ষে যোগদান করেছিলেন। ইংরেজদের কামানের গোলাবর্ষণে বারাসতের নারকেল বাড়িয়ায় গড়ে তোলা তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার পতন ঘটে। তিতুমীর ও তাঁর চল্লিশ জন সহচর শহীদ হন। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা প্রতিবাদী চেতনার উৎস হয়ে আছে।

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) সূচিত ফরায়েযী আন্দোলনের চরিত্র ছিল ভিন্নতর। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। এ দেশে ইসলামের চর্চা সঠিকভাবে করার জন্য তিনি অবশ্য করণীয় কাজগুলো যথাযথভাবে করার তাগিদ দেন মুসলিম সমাজকে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস, সালাত, যাকাত, রোজা, হজ্জ এ পাঁচটি মৌলিক কর্তব্য সম্পন্ন করার ওপর তিনি জোর

---

১৬৩ ড. এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* ১৭৫৭-১৯৪৭(ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪), পৃ. ৩৫

*Dhaka University Institutional Repository*

দেন। ধর্মীয় মূল্যবোধ বিশেষ  করে আল্লাহর একত্বে ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করার পর কথায় ও কাজে অন্য কোনো শক্তির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ যে শিরক একথা চেতনায় দীপ্যমান রেখে পথ চলার এবং চলার পথে এ বোধের স্বাক্ষর রাখার তাগিদ দিয়েছিলেন তিনি। শুধু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করলে যে মুসলিম চেহারা বদলানো যাবে না এ কথা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি ধর্মীয় কর্তব্যের সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনাকে যুক্ত করেছিলেন এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে মজবুত করবার উপদেশ দিয়েছেলেন। 'পীর-মুরিদ'-সম্পর্কে যাতে ইসলামি নৈতিকতার সীমানা লংঘন না করে, সে ব্যাপারেও সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন তিনি। ইসলামি শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার ফলে একদিকে যেমন নৈতিক উজ্জীবন ঘটেছিল অন্যদিকে তেমনি অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিলো। যা পরবর্তীকালে আর্থ-রাজনৈকিত আন্দোলনের উপর গভীর ছাপ রাখে।

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে এমন সব সামাজিক, সাংস্কৃতিক উপাদান মিশে গিয়েছিল যার সঙ্গে ইসলামি চিন্তা-চেতনার কোনো মিল ছিল না। ধর্মান্তরিত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপাদন সঙ্গে নিয়ে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছিল। এ হিন্দু সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। তিনি লিখেছেন, 'হিন্দু সংস্কৃতির দু'টি বিশেষত্ব আছে।[১৬৪]

**প্রথমত:** এটা ধর্মকেন্দ্রিক অর্থাৎ ধর্মকে কেন্দ্র করে এর সাহিত্য, সমাজ, শিল্প প্রভৃতি গড়ে উঠেছে।
**দ্বিতীয়ত:** প্রাচীন যুগের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা।

অতীতে যা ছিল তা সহসা বা সরাসরি অস্বীকার না করে যথাসম্ভব তার সঙ্গে অন্তত বাহ্যিক সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা।' এ চেষ্টা ধর্মান্তরিত হওয়ার পরও বহাল ছিল। এ দেশের মুসলিম মানস ও সংস্কৃতির মধ্যে অনেক হিন্দু, বৌদ্ধ উপাদান এখনও চোখে পড়ে। তবে ইসলাস ধর্ম হিসেবে নাস্তিকতা ছাড়া অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদানকে আত্মস্থ করার ব্যাপারে বরাবর অসীম উদারতা দেখিয়ে এসেছে। এ ব্যাপারে ধর্মীয় গোড়া পন্থিরা যা-ই বলুন না কেন। হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এর ফরায়েযী আন্দোলন করে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রকৃত চেহারা অনেকটা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। একথা মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের আবির্ভাব ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে ইসলাম আসেনি। এ দেশে ইসলাম এসেছে অনেক পরে, মধ্য এশিয়া ও পারস্য হয়ে। এখানে আসবার পর হিন্দু, বৌদ্ধ ও লোক-সংস্কৃতির সংস্পর্শে ইসলামের সাংস্কৃতিক চেহারায় কিছুটা বিকৃতি এসেছিল, যা হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) এবং আরও অনেকে দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। এ চেষ্টা করতে হিয়ে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) ও তাঁর অনুসারী অনুগামীদের আরও কিছু কর্মসূচি হাতে নিতে হয়েছিলো। ইসলামের সুমহান নীতি-আদর্শকে

১৬৪ দীনেস চন্দ্র সেন, *রায় বাহাদুর বাংলাভাষা ও সাহিত্য*(কলকাতা : অনুপম প্রকাশন, তা.বি.), পৃ. ১০৮

*Dhaka University Institutional Repository*

সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) তার সময়ের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে ইসলামের সংস্কার আন্দোলনকে সঠিকভাবে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই ব্যাপক জনসমর্থন পুষ্ট তার আন্দোলনকে মৌলবাদ, জঙ্গীবাদ বা সুবিধাবাদ বলে নিন্দা করার সুযোগ ছিল না। এ কারণে এ ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী কৃষক আন্দোলনের পুরোধা যদি কাউকে বলতে হয় তবে নিঃসন্দেহে সে মহান ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)।

ফরায়েযী আন্দোলনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অর্জনের সার সংক্ষেপ এখানে তুলে ধরা হলো:[১৬৫]

১. ফরায়েযীগণ আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) এর কর্মধারা উপলব্ধি করে হানাফি ইমামগণ নির্দেশিত পথে আমল করতেন বলে জানা যায়। সুফীবাদকে বিদ'আত বলে বর্জন করার উপদেশ তারা দিতো না বরং সুফিবাদের সাধনায় দিদারে এলাহি সম্ভব বলে তারা বিশ্বাস করতেন। এ ব্যাপারে তারা কাদেরিয়া তরিকার অনুসারী ছিল।

২. ফরায়েযীরা জীবন চর্চায় আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় ও ইসলাম ধর্মের বিশ্বজনীন ন্যায়নীতি ও জুলুমহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিল। তারা সমাজ থেকে শিরক, বিদ'আত ও দূর্নীতি দূর করার ব্যাপারে অঙ্গিকারবদ্ধ ছিলো।

৩. ফরায়েযীরা ফরয কাজগুলো আগে করার তাগিদ দিতেন, পরে নফল কাজ করার কথা বলতেন। অর্থাৎ আগে সালাত, যাকাত, সওম, তারপর ফাহিতা, ওয়াজ, মিলাদ।

৪. ফরায়েযীরা উর্দু, ফারসির বদলে বাংলা ভাষায় ইসলাম প্রচারের রীতি গ্রহণ করেন। তারা সরল বাংলা ভাষায় কালিমা, তাওবা, বাই'আত ইত্যাদি পাঠের রীতি চালু করেন। পীর-মুরিদ সম্পর্ককে তারা উস্তাদ-শাগরেদ সম্পর্কে রূপান্তরিত করেন।

৫. ফরায়েযীরা ধর্মকে মানুষের চিন্তা-ভাবনায় সহজবোধ্য করার প্রয়াস পান। দরিদ্রদের শুধু তিনটি ফরজ যথা কালিমা, নামায ও রোযার কথা বলেন। পক্ষান্তরে বিত্তবানদের জন্য এ তিনটির সঙ্গে আরো দু'টি ফরয যাকাত ও হজ্জ যোগ করেন।

৬. ফরায়েযীরা মৃতের সৎকারে ফাতিহা, মিলাদ, ওরস ইত্যাদি আয়োজনকে বিদ'আদ বলে গণ্যে করতেন এবং বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানে নাচ-গান, বাদ্য-বাজনা ও জাঁক-জমক অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেন। পূজায় চাঁদা দেয়া, পূজা উৎসবে যোগ দেয়া ও পূজার প্রসাদ খাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। মুহররমের সময় তাজিয়া মিছিল বের করা ও জারি গানের আসর বসানোকে বর্জন করতে বলেন।

৭. ফরায়েযীগণ ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিতেন। সকল পেশার লোককে শ্রদ্ধা করতে শেখাতেন। শ্রমলব্ধ উপার্জনকে তারা সম্মান জনক জীবনের ভিত্তি বলে প্রাচার করতেন। হালাল রুজিকে তারা ইবাদাতের পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করেন। তেলি, কাহার, কসাই, কামার, জোলা, জেলে ইত্যাদি পেশার লোকদের ঘৃণা করার বিরুদ্ধে তারা সোচ্ছার ছিলেন। তারা এসব পেশার লোকদের কারিগর উপাধি দেন। হিংসা-বিদ্বেষ ও ভেদনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ফলে তারা বিপুল জনসমর্থন লাভ করেন।

৮. তারা ভূমিতে জমিদারদের মলিকানা অস্বীকার কলেন। তারা কুরআনের বাণী উদ্ধৃত করে বলেন যে, ভুমির মালিকানা আল্লাহর। জমির ফসল আবাদকারীরই প্রাপ্য, তাতে জমিদারের কোনো অধিকার নেই। তারা জমিদার, জোতদার, পত্তনিদার

---

১৬৫ ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

*Dhaka University Institutional Repository*

শ্রেণির শোষণ, পীড়ন, অত্যচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। এ আহ্বানে তারা বিপুল সাড়াও পান।

৯. তারা পরাধীন দেশে 'ঈদ ও জুমু'আর নামায পড়া সমীচিন নয় বলে ফাত্ওয়া দেন। এ ফাত্ওয়া ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্খাকে জোরদার করে।

১০. ফরায়েযীরা সমাজ সংগঠনে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তারা কেন্দ্রিয়, আঞ্চলিক ও গ্রাম পর্যায়ে খিলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সকল ঝগড়া, বিবাদ, নালিশ, আবেদন নেতৃস্থানীয় লোকদের পরামর্শে সালিশের মাধ্যমে নিস্পত্তি করার ব্যবস্থা করেন। এ সালিশি ব্যবস্থা এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান নির্বিশেষে সকলে তাদের ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা সালিশের মাধ্যমে নিস্পত্তি করতে শুরু করেন। কোর্ট-কাছারির ঘুষ, দূর্নীতি, মিথ্যা স্বাক্ষী ইত্যাদি বন্ধ হয়। ফরায়েযীদের খিলাফতি পঞ্চায়েত ব্যবস্থা স্থানীয় শাসনের উদাহরণ সৃষ্টি করে।

১১. ফরায়েযীরা চাষিদের উপর জমিদার, জোতদার ও নীলকরদের লাঠিয়ল বাহিনীর মোকাবিলায় 'ফরায়েযী স্বেচছাসেবক বাহিনী' গঠন করেন। এ বহিনী প্রতিপক্ষকে সফলভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হওয়ায় চাষিদের উপর জমিদার শ্রেণির নিপীড়ন বন্ধ হয়ে যায়।

১২. তারা ফরায়েযী ভ্রাতৃসঙ্ঘ ও সাধারণ তহবিল গঠন করেন। আপদে-বিপদে পরস্পর সাহায্য করা এ ভ্রাতৃসংঘ পবিত্র কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কোর্ট কাছারিতে জমিদার-জোতদার শ্রেণির লোকেরা কোনো সাধারণ চাষিকে মামলা-মোকাদ্দমায় জড়ালে তারা তদের সাধারণ তহবিল থেকে সাহায্য করতো বলে জানা যায়। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে, জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে ফরায়েযী আন্দোলনের ঐতিহ্য সাহস ও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

### ৭.৩.৩ মজলুম জনতার বিপ্লবী নায়ক হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)

বাংলার মুসলিমগণকে সকল প্রকার কুসংস্কার পরিত্যাগ করে সত্যিকার ইসলাম অনুসরণ এবং সকল ধরনের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে সংগঠিত করার জন্য ১৭৮১-১৮৪০ সালে হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) 'ফরায়েযী আন্দোলন' শুরু করেছিলেন। ১৭০৩-১৭৬৩ সালে আরব বিশ্বের ধর্ম সংস্কারক আব্দুল ওয়াহাব নজদির ভাবাদর্শে প্রভাবিত পশ্চিম ভারতের সৈয়দ আহমদ বেরলভীর (১৭৮২-১৮৩১) 'তরিকা-ই-মুহাম্মদি' আন্দোলনের সঙ্গে ফরায়েযী আন্দোলনের সমসাময়িকতা ও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে সাযুজ্য পরিলক্ষিত হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্যের কথাও গবেষকরা উল্লেখ করেছেন।[১৬৬] এখানে উল্লেখ্য যে, মাত্র আঠারো বছর বয়সে ইসলাম শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) মক্কা গমন করেন এবং সেখানে প্রায় বিশ বছর শিক্ষালাভ শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সৈয়দ আহমদের মতো হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.)ও আরব ভূখণ্ডে প্রভাব বিস্তারকারী আব্দুল ওয়াহাবের ভাবাদর্শে এ সময় কমবেশি প্রভাবিত হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না।

তাঁর ফরায়েযী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল 'আত্ম-সংশোধন' প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে মুসলিমগণকে ইসলামের আদি ও বিশুদ্ধ ধারায় ফিরিয়ে নেয়া। এ সম্পর্কে ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান লিখেছেন,

১৬৬ ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সল, *উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৫০

*Dhaka University Institutional Repository*

> ‘The Term 'Faraidi' is derived from the Arabic word 'an obligatory duty' enjoined by Islam. The Faraidis are, therefore, those who aimed at enforcing the obligatory religious duties. They, however, interpreted the term 'Faraid' in a board sense to include all the religious duties injoined by God and the prophet irrespective of their importance though they laid emphasis on the observance of five fundamental institutions (;bins') of Islam ... The object of this emphasis on the fundamental institutions was to focus the attention of the masses to the importance of their observance, as the muslims of Bengal in their enthusiasm to celebrate various local cults, rites and ceremonies had become negligient to these fundamental duties.’[১৬৭]

ইসলাম কেবল একটি ধর্ম নয়; জীবন ব্যবস্থা হিসেবেই এর আবির্ভাব ঘটেছিল। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনের উপর ইসলাম সমগুরুত্বারোপ করে থাকে। ইসলাম মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদে বিশ্বাস করে না। তাত্ত্বিকভাবে এসব বক্তব্য সকল মুসলিমগণের নিকট গৃহীত হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কালক্রমে মুসলিম সমাজে জন্ম, বংশ, ধন, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্যজনিত বিভাজন স্পষ্ট হয়েছে। উপমহাদেশ ও বাংলাও এসব বিভক্তির বাইরে ছিলনা।

হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) ও ফরায়েযী আন্দোলনের ধর্মীয় বক্তব্য ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ঢাকাসহ সংলগ্ন অঞ্চলের ব্যাপক মুসলিমগণের নিকট গৃহীত হলেও (যদিও বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষকে ‘দারুল হরব’ বা ‘শত্রু কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চল’ ঘোষণা অনেক মুসলিম পণ্ডিত কর্তৃক সমর্থিত হয়নি) শ্রেণি স্বার্থজনিত কারণে ফরায়েযীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার কর্মসূচী প্রধানত পূর্ব বাংলার দরিদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠির নিকট বেশি সমাদৃত হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, পূর্ব বঙ্গের ফরায়েযী আন্দোলনের প্রায় সমকালে পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিয়েছিল মীর নিসার আলী তিতুমীরের নেতৃত্বে প্রায় সমমতাদর্শী আরেক বিপ্লবী সংস্কার ও গণমুক্তি আন্দোলন। ইসলাম ধর্মকে দরিদ্র বান্ধব এক সহজ সরল ধর্মবিশ্বাসরূপে প্রচারের কারণে মুসলিম কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণি হাজী শরী‘অতুল্লাহ, তাঁর উত্তরাধিকারী পুত্র মোহসিন উদ্দিন আহমদ দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬০) এবং ফরায়েযী আন্দোলনের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে এর বিরোধিতা শুরু করে। তাঁর এ সংস্কার কার্যের ফলে ইসলাম ধর্ম মুসলিম কৃষক ও শ্রমজীবী জনসাধারণের ধর্মে পরিণত হয় এবং ফরিদপুর ও ঢাকা জিলায় লক্ষ লক্ষ মুসলিম কৃষক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। হাজী শরী‘অতুল্লাহ কেবল ধর্মসংস্কার করে ক্ষ্যান্ত হননি। তিনি ধর্ম সংস্কারের সঙ্গে তাঁর শিষ্যগণকে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য শোষণ-উৎপীড়নের কবল হতে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। জমিদার ও নীলকরের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য তাঁর ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চলত। শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) এর ধর্ম সংস্কারের রক্ষণশীল ধনী মুসলিমগণ তাঁহার উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। প্রজাকল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে জমিদার ও নীলকরদের বিরোধিতার আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠলে হাজী শরী‘অতুল্লাহর মনে প্রজাবান্ধব একটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের ইচ্ছে জাগ্রত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। পিতার এ ইচ্ছা পুত্র মুহাম্মদ মোহসিন উদ্দীন আরও এগিয়ে নেন।

---

১৬৭ Muin Uddin Ahmad Khan, *History of the Foraidi Movement-Muslim Struggle for Freedom in Bengal*, Ibid, p. 85

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, মাত্র ৫৯ বছর বয়সে হাজী শরী'অতুল্লাহ মারা গেলে পিতার ন্যায় দীর্ঘকাল মক্কায় অবস্থান করে ধর্মীয় পাণ্ডিত্য লাভকারী পুত্র দুদু মিয়া ফরায়েযী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন।[১৬৮] দুদু মিয়া ঘোষণা করেন যে, সকল মানুষই আল্লাহর সৃষ্ট এবং সমান এবং এ পৃথিবীতে অন্যের উপর কর ধার্য করার অধিকার কারও নেই। দুদু মিয়ার এ অবস্থান তাঁকে ও ফরায়েযীদেরকে জমিদার, নীলকর ও তাদের পৃষ্ঠপোষক ইংরেজদেরকে মুখোমুখি অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দেয়। 'দুদু মিঞা সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে। এরা কেবল মুসলিম কৃষকের নহে, হিন্দু কৃষকেরও শত্রু। তাই হিন্দু কৃষকও দুদু মিঞার নেতৃত্বে এ সংগ্রামে যোগদান করেছিল। এ সংগ্রাম ক্রমশ ফরিদপুর, বিক্রমপুর, খুলনা, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলায় বিস্তার লাভ করে। দুদু মিঞার নেতৃত্বে অন্তত পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-মুসলিম কৃষক যে কোনো সময় জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে লাঠি হাতে লইয়া সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইস্তত করত না। দুদু মিয়া ফরায়েযী প্রভাবিত এলাকায় নিজস্ব প্রশাসন পরিচালনার জন্য প্রতিটি অঞ্চলে একজন প্রতিনিধি (খলিফা) নিয়োগ দেন। খলিফাগণ কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে আঞ্চলিক প্রশাসন পরিচালনা করতেন। দুদু মিয়া ও ফরায়েযীদের শক্তিবৃদ্ধি ও বিকল্প প্রশাসন গড়ে তোলার বিরুদ্ধে জমিদার, নীলকর, ইংরেজ ও স্বদেশি অন্যান্য কায়েমি স্বার্থবাদীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ শুরু করে। ১৮৩৮ সাল থেকে ১৮৬০ সাল অর্থাৎ দুদু মিয়ার পরলোকে গমন পর্যন্ত এ সংগ্রাম নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে চলছিল। পরবর্তীকালে শত্রু পক্ষের নানামুখী ষড়যন্ত্র ও আক্রমণের কারণে ফরায়েযী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। পশ্চিম ভারতের সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও পশ্চিম বঙ্গের মীর নিসার আলী তিতুমীরের আন্দোলনের ন্যায় পূর্ব বঙ্গের ফরায়েযী আন্দোলনও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন রূপে শুরু হলেও অচিরেই এটি শোষিত-নিপীড়িত শ্রেণির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। জনকল্যাণকর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাও একসময়ে ফরায়েযীসহ এসব আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মীয় কুসংস্কার হ্রাসকরণ, পশ্চাৎপদ শ্রেণির মুসলিম-হিন্দু ঐক্য প্রতিষ্ঠা, অবহেলিত প্রজা সাধারণের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, শোষক শ্রেণির ওপর চাপ সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফরায়েযী আন্দোলনের অসামান্য সাফল্য অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যে কাজ হাজী শরী'অতুল্লাহ ও দুদু মিয়া সূচনা করেছিলেন সেটিকে পূর্ণতায় নিয়ে টেকসই করার ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য নানা কারণে বিঘ্নিত, ক্ষতিগ্রস্ত ও চূড়ান্ত পর্যায়ে স্তিমিত হয়েছে।

**প্রথমত:** ওয়াহাবী আন্দোলনের ন্যায় ফরায়েযী আন্দোলনও হিন্দু-মুসলিম কৃষক জনসাধারণের পূর্ণ ঐক্য গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল।

**দ্বিতীয়ত:** আন্দোলনের নেতবৃন্দের অস্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনা, সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব এবং লক্ষ্য সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণাবশত: সংগ্রামও আরও উন্নত স্তরে আরোহণ করতে পারেনি।

**তৃতীয়ত:** সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দুদু মিয়া ব্যতীত অপর কোনো যোগ্য নায়কের আবির্ভাব ঘটেনি। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ও পূর্ণ চেতনাযুক্ত কোনো দলীয় সংগঠন সে যুগে অসম্ভব ছিল। তাই দুদু মিয়ার একক নেতৃত্বে পরিচালিত এ গণসংগ্রাম তাঁর দীর্ঘ কারাবাসের ফলে বার বার নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছিল। এ নেতৃত্বহীন অবস্থার সুযোগ নিয়েই ইংরেজ শাসকগণ, সৈন্য বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, জমিদার ও নীলকরগণের তীব্র আক্রমণে শেষ পর্যন্ত এ বিদ্রোহ পরাজিত হয়।

---

১৬৮ আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১১), পৃ. ২০২

*Dhaka University Institutional Repository*

পরিশেষে বলা যায়, এ কথা ঠিক যে, সকল আরাধ্য ক্ষেত্রে এ আন্দোলনের সাফল্য সমানভাবে অর্জিত হয়নি। কৃষকবান্ধব স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন ও কাজ ফরায়েযী আন্দোলন শুরু করেছিল সেটি সে সময়ে পূর্ণতায় না পৌঁছলেও পরবর্তীকালে এ আন্দোলন-সংগ্রামের প্রেরণার অন্যতম উৎসে পরিণত হয়েছিলেন হাজী শরী'অতুল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়া। কৃষক-প্রজার মুক্তির আকাঙ্খায় পরিচালিত পূর্ববাংলার পরবর্তীকালীন অন্যান্য গণসংগ্রাম বিশেষত মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলন পরোক্ষভাবে হলেও ফরায়েযী আন্দোলন থেকে প্রেরণা লাভ করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

# উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

# উপসংহার

১৭৫৭ সালে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের পর মীর জাফরকে হটিয়ে বৃটিশরা বাংলার মসনদে আসীন হয়েই ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠির সাথে গোপন আঁতাত করে এবং প্রায় ৫৫০ বছরের মুসলিম শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য একের পর এক রাজ্য দখল করে সমস্ত ভারতবর্ষ তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। পরবর্তীতে সরকারি উচ্চ পদ থেকে মুসলিমগণকে অপসারণ করে উচ্চবর্ণের হিন্দু, বৃটিশ সরকার কর্মচারী ও নব্যহিন্দু জমিদারগণ নানাভাবে মুসলিমগণকে নির্যাতন ও নিপীড়ন করতে থাকে। এমতাবস্থায় ১৭৫৯ সালের আগস্ট মাস থেকে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনে মুসলিম নেতৃবৃন্দ তথা উলামায়ে কিরাম ও মুসলিম দেওয়ানগণ অংশগ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭৬০ সাল থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারতে যথাক্রমে বালাকোট যুদ্ধ, বক্সার, ফটোয়া, গেরিয়া, উদয় নালার যুদ্ধ, ফকির বিদ্রোহ এবং ১৮১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারতে ফরায়েযী আন্দোলনের সূচনা হয়। পরবর্তীতে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। এ সময় তুরস্কে খিলাফত আন্দোলন শুরু হলে ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন দেয়। এতে বৃটিশ শাষকগোষ্ঠি ক্ষেপে গিয়ে মুসলিমগণের উপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তবুও ভারতবর্ষের তথা বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, মহারাষ্ট্র, দিল্লি-আগ্রা, সিন্ধুসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিরোধ আন্দোলন চালাতে থাকে। এ আন্দোলনকে দমন করতে না পেরে বৃটিশ শাষকগোষ্ঠি মুসলিমগণের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির পায়তারা শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় খিলাফত আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করে ওহাবী আন্দোলন সৃষ্টি করে। অপরদিকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মুসলিমগণের ধর্মীয় উপসনালয়, মসজিদ, মক্তবসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার পাঁয়তারা শুরু করে। এমনকি মুসলিম উত্তরাধিকারী আইন ধ্বংস করার লক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ’র বিধানের বিপরীতে নতুন নতুন আইন তৈরির মাধ্যমে নির্যাতন ও নিপীড়ন করে। ফলে ভূমিহীন, ধর্মহীনতা, অপসংস্কৃতির যাঁতাকলে পড়ে মুসলিমগণের স্বাধীন চেতনা হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়, তারা মানবেতর জীবন যাপনের প্রতি ধাবিত হতে থাকে।

এমতাবস্থায় নীলকর ও অত্যাচারী জমিদারদের নিপীড়নের মাত্রা আরো বেড়ে যাওয়ায় মুসলিম জনগোষ্ঠি ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অমানবিক নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়। এসব অবস্থা দেখে পশ্চিম বাংলায় তিতুমীর আন্দোলন গড়ে তোলেন। অপরদিকে হাজী শরী‘অতুল্লাহ পূর্ব বাংলার মানুষকে তথা মুসলিম জাতির মধ্যে কুরআনি ‘আইনকে বলবৎ রাখার জন্য ফরায়েযী আন্দোলনের সূচনা করেন। তার ডাকে সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলিমগণের মনে গভীর রেখাপাত করে। এরই আলোকে বৃটিশ খেদাও সুপ্ত আন্দোলন জাগ্রত হয়ে উঠে। কেননা হাজী শরী‘অতুল্লাহর পূর্বে বাংলার মুসলিমগণের অভিজাত শ্রেণির বিলুপ্তির ফলে তারা নেতৃত্বহারা হয়ে পড়ে। তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করে সে শূন্যতা পূরণ করেন। তিনি মুসলিমগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তনের চিন্তা নিয়ে শিল্প-কারখানা স্থাপন ও প্রচুর ফসল উৎপাদনের আহ্বান জানানোর সাথে সাথে ইংরেজদের উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী বর্জনের আহ্বান জানান।

হাজী শরী‘অতুল্লাহ সম্পত্তি বণ্টনের মুসলিম ‘আইন অনুযায়ী পুত্র-কন্যার অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করেন। তাকে এ আন্দোলনের জনক বলা হয়। ফরায়েযী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় স্বাধিকার আন্দোলন পরে বৃটিশ খেদাও আন্দোলনে পরিণত হয়। অবশেষে হাজী শরী‘অতুল্লাহ প্রণীত আন্দোলনটি স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ইসলামকে রক্ষা করার জন্য মহান

*Dhaka University Institutional Repository*

সৃষ্টিকর্তা যুগে যুগে সৃষ্টি করেন অগ্নিপুরুষ, যাদের ঈমানী শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা এবং সাহসিকতার কল্যাণে মিথ্যা শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দিতে উপমহাদেশে মুসলিম জাতি যখন বিজাতীয় শক্তির আধিপত্যের স্রোতে বন্যাকবলিত পত্রপল্লবে আশ্রিত পিঁপড়ার ন্যায় অজানা অন্ধকারের দিকে ভেসে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই উপমহাদেশের বুকে আশির্বাদ স্বরূপ আবির্ভূত হন এমন এক অগ্নি পুরুষ যার ঈমানী শক্তি, তেজদীপ্ত সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার কাছে মিথ্যা শক্তির পরাজয় ঘটে। এতে মুসলিম পুনঃজাগরণের সূচনা হয়।

কোনো দেশ বা জাতি তার স্বাধীনতা হারালে সে কেবল তার ধন-সম্পদই হারায় না, তার ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ধারণ করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। আর ভিনদেশী শক্তি কোনো দেশ দখল করলে প্রথমেই তার অর্থনৈতিক ভিত দুর্বল করার জন্য জনগণের সহায় সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয়। যার ফলে সে জাতি তার ধর্ম, সংস্কৃতি এবং শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি চারুকলার চর্চা করতে অপারগ হয়। ফলে অর্থনৈতিক জীবনে যেমন সে দরিদ্র হয়ে পড়ে তেমনি দরিদ্র হয় মনন ও চিন্তার জগতে। জাতি হিসেবে ক্রমে সে তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণে সে আত্মতুষ্টি লাভ করে। পলাশি যুদ্ধের পরাজয়ের পর উপমহাদেশের মুসলিমগণ যখন আর্থিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সর্বহারা হয়ে পড়ে তখন ত্রাণকর্তা হিসেবে হাজী শরী'অতুল্লাহর আবির্ভাব ঘটে। তিনি মুসলিমগণের ধর্মীয় 'আইনের সংস্কার সাধন করে সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। অপরদিকে মুসলিম সমাজ থেকে যাবতীয় শিরক, বিদ'আত ও অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটন করে প্রকৃত মুসলিম হওয়ার আন্দোলনকে তিনি বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হন।

হাজী শরী'অতুল্লাহ অষ্টদশ শতাব্দির শেষের দিকে বর্তমান বাংলাদেশের মাদারিপুর জেলার শিবচর থানাধীন মাসাইল গ্রামের বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম তালুকদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[১৬৯] অতি অল্প বয়সেই পিতামাতা হারিয়ে চাচার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। পারিবারিক পরিমণ্ডলে বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের জন্য কলকাতায় গমন করেন এবং তথায় মাওলানা বাশারত আলীর তত্ত্বাবধানে ও ব্যবস্থাপনায় অল্প সময়ে সহিহ-শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য দ্বীনি কিতাব শিক্ষাগ্রহণ করেন। পরে হুগলি জেলার ফুরফুরা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ইলমে দ্বীনের অনেক কিতাব আয়ত্ব করেন এবং উর্দু ও ফারসি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। এ সময়ে তিনি মুর্শিদাবাদে প্রধান বিচারপতির পদে দায়িত্বরত আপন চাচার সাথে সাক্ষাৎলাভে ধন্য হন এবং চাচার সান্নিধ্যে ইসলামি 'আইন শাস্ত্রে শিক্ষা অর্জন করেন। চাচার তত্ত্বাবধানে তিনি আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ইত্যবসরে চাচার সিদ্ধান্তক্রমে তারা সপরিবারে গ্রামের বাড়িতে ফেরার পথে গঙ্গা নদীতে এক নৌকা ডুবির দুর্ঘটনায় নিপতিত হয়ে হাজী শরী'অতুল্লাহ চাচা-চাচীকে হারান। এ দুর্ঘটনা তার মনে গভীর রেখাপাত করে। ফলে তিনি নিজ বাড়ি মাসাইলে না গিয়ে আবার কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং শিক্ষক মাওলানা বাশারত আলীর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সে সময়টা এমন ছিল যে, তখন অলিগলিতে হিন্দু সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট নানা অসামাজিক ও অনৈতিক কাজ বিস্তার লাভ করে। ফলে অনেক মুসলিম তার ঈমান আক্বিদা থেকে সরে পড়ে। এমতাবস্থায় কলকাতা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। তাই তিনি স্বীয় শিক্ষকের সাথে

---

১৬৯ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২)*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ৭৮

*Dhaka University Institutional Repository*

কলকাতা থেকে পবিত্র মক্কায় গমন করেন।[১৭০] সেখানে তারা মাওলানা মোঃ মুরাদের বাড়িতে অবস্থান করতেন। তার কাছে তিনি কিতাবি শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামি ব্যবহারিক ও ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন।

হাজী শরী'অতুল্লাহ দীর্ঘ বিশ বছর পবিত্র মক্কা ও মদিনায় বসবাস করেন। সেখানে অবস্থান কালে হানাফি মাযহাবের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফক্বিহ মাওলানা তাহির সোম্বলের সান্নিধ্যে থেকে আধ্যাত্মিকতা ও ইলমে তাসাউফের উপর উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন; সাথে সাথে বিভিন্ন মুসলিম বিশ্ব ভ্রমণ করেন।[১৭১] মক্কাতে তিনি শিক্ষকতার দায়িত্বও পালন করেন। দীর্ঘ বিশ বছর পর **১৮১৮** সালে তিনি তার পীর ও শিক্ষকের অনুমতিক্রমে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

দেশে ফিরে তিনি জরাগ্রস্ত মুসলিম সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তখনও তার চাচা আজীম তালুকদার জীবিত ছিলেন; কিন্তু শয্যাশায়ী। তিনি তার পিতৃতুল্য চাচার সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করেন। কয়েকদিন পর হঠাৎ চাচার ইন্তিকাল হয়। এরপর তিনি তালুকদার পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হন। তালুকদার পরিবারের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে তিনি তৎকালীন বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের দূরাবস্থার কথা চিন্তা করতেন। গ্রামের ৯৫% মানুষ কালিমা, নামায, রোযা, মাসআলা-মাসাইল জানে না। ইসলামের ফরয ইবাদতের পরিবর্তে অহেতুক বিদ'আত ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত মুসলিম সমাজকে উদ্ধারের পথ খুঁজতে থাকেন। কিন্তু প্রথমত তিনি এ ব্যাপারে সফলতা অর্জন করতে না পেরে আরও দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পুনরায় মক্কা গমন করেন। দ্বিতীয়বার মক্কা গমন করে দ্বীনের ব্যাপারে আরও পরিপূর্ণতা লাভ করে উস্তাদের অনুমতিক্রমে আবার দেশে ফিরে আসলেন। এবার তিনি উপলব্ধি করলেন, অভিজাত মুসলিমগণের বিদেশি সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি অতি অনুরাগই তাদের অধঃপতনের মূল কারণ। এছাড়া অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া ধর্ম-কর্ম সম্ভব নয়। তাই তিনি এর প্রতিকারের জন্য বাংলা ভাষাকে দ্বীন প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। দরিদ্র মানুষকে দ্বীন শিক্ষার বিনিময়ে নিজস্ব তহবিল থেকে তাদেরকে মজুরি প্রদান করতেন। এতে অনেক সুফল পাওয়া যায়।

মহান আল্লাহ প্রদত্ত ও রসূল সা. নির্দেশিত অপরিহার্য কর্তব্য ইসলামের মৌলিক পাঁচটি বিধিকে মূল কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে তিনি ফরায়েযী আন্দোলন নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হতে অমনোযোগী জনগণের মাঝে নিজেদের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিসহ ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এ ফরায়েযী আন্দোলনের সূত্রপাত। শান্তিপ্রিয় ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারমূলক এ সংগঠনটার কার্যক্রমে কায়েমি স্বার্থবাদী দূরদর্শি বৃটিশ বেনিয়া ও তাদের এ দেশিয় দোসর অত্যাচারী হিন্দু জমিদাররা ভাল চোখে দেখেনি কোনো সময়ই। অনিবার্য কারণে এ আন্দোলনের সাথে তাদের বারবার সংঘর্ষ হয়েছে। তিনি অনুভব করেছিলেন বৃটিশ শক্তির হাত হতে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। নীলকর বণিক ও অত্যাচারী জমিদারের যথেচ্ছা নির্যাতন ও

১৭০ আব্দুল লতীফ শরীফাবাদী, *পীর বাদশা মিঞা*(ঢাকা : ফেরদৌস পাবলিকেশন, ১৯৭৫), পৃ. ৪-৬

১৭১ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া(৬)*(ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১১১; নূর মোহাম্মদ আজমী, *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*(ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৬), পৃ. ২৬৪-২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

নিপীড়ন থেকে রক্ষা করতে হবে বাংলার মুসলিম সমাজকে। তাই তিনি এ দেশকে দারুল হারব বা বিধর্মী রাজ্য বলে ঘোষণা করেন এবং এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে সকলকে অসাম্প্রদায়িক আত্মবলে বলীয়ান হতে নির্দেশ দেন। এতে হিন্দু জমিদারগণ তার বিরুদ্ধাচরণ করলেও মুসলিমগণের মাঝে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়। সমাজ জীবনে গতিশীলতা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত সূচিত হয়।

ফরায়েযী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায়। সেখান থেকে আন্দোলন উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।[১৭২] এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব, খিলাফত আন্দোলন, স্বাধীকার আন্দোলন, অহিংস আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, সর্বশেষ রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমেই বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে ও বাঙালি জাতি একটা স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১৮৪০ সালের ১৮ জানুয়ারি হাজী শরী'অতুল্লাহ ইন্তিকাল করেন। পরবর্তীতে তাঁর সুযোগ্য বংশধরগণ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং স্ব স্ব সাংগঠনিক ক্ষমতাবলে এ শান্তিপ্রিয় ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক পর্যায়ে উন্নিত করেন। এতে অত্যাচারী জমিদার ও সরকারি আমলারা বিচলিত হয় এবং কৃষক ও মেহনতি জনতার দাবি-দাওয়ার প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়। ফলে কৃষককুল অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বলীয়ান হয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠে। এদেশের কৃষক শ্রমিক মেহনতি জনতা তখন নীলকর বণিক মাড়োয়ারি জমিদারদের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করছিল এমনকি বৃটিশ আদালতেও তারা কোনো ন্যায়বিচার পাচ্ছিল না। কারণ নীলকর বণিক, মাড়োয়ারিরা ছিল বৃটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষক ও মুসলিম বিদ্বেষী। তারা এদেশের ফসলি জমিতে জোর করে নীল চাষ করতে বাধ্য করত। আর কোনো মুসলিম এর প্রতিবাদ করলে তাকে অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন করা হত। শুধু তাই নয় মুসলিমগণ তখন ঠিকমত নামায, রোযা, 'ঈদ পালন ও কুরবানি করতে পারতেন না। তাইতো হাজী শরী'অতুল্লাহ রহ. তখন চিন্তা করেছিলেন এদেশের স্বাধীনতা ছাড়া মুসলিমগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আর কোনো উপায় নেই। তিনিই প্রথম উপমহাদেশে স্বাধীনতার ডাক দেন। তার ডাকে হাজার হাজার কৃষক, শ্রমিক, কারিগর ও পেশাজীবী মানুষ ফরায়েযী আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হয়ে বৃটিশ খেদাও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ফরায়েযী আন্দোলনের নামে হাজী শরী'অতুল্লাহ রহ. 'বৃটিশরা ভারত ছাড়ো' নীতি ঘোষণা করেন এবং ইংরেজদের উৎপাদিত যাবতীয় পণ্য-সামগ্রী ও তাদের বিচারিক আদালত বর্জনে মুসলিমগণের উৎসাহিত করেন। এ অঞ্চলে নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পাশাপাশি ধর্মীয় দা'ওয়াতের কার্যক্রমও চালিয়ে যান এবং আলাদা আদালত প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনভাবে প্রজাদের বিচারকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। ইংরেজ সরকার এজন্য তার বিরুদ্ধে বহু মামলা-মুকাদ্দামা দায়ের করে। কিন্তু কোনো কিছুতেই তিনি অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করেননি।

---

১৭২ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া(৬)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২; ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮; James Taylor, *A Sketch of The Topography and Statistics of Dacca*, Ibid, p. 250

*Dhaka University Institutional Repository*

ধর্মীয় এ মহান সংস্কারক ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের ইসলামের অবিসংবাদিত নেতা হাজী শরী‘অতুল্লাহ রহ. তাঁর সংগ্রামী জীবনের অবসান ঘটিয়ে সৃষ্টিকর্তার সুনির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ইহলোক ত্যাগ করেছেন ঠিকই; তবে তাঁর চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ রেখে গেছেন মুসলিম জাতিন জন্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য ইসলাম ধর্মের এ মহান সংস্কারক ও উপমহাদেশের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অকুতোভয় সংগ্রামী নেতা হাজী শরী‘অতুল্লাহ (রহ.) কে এদেশে আজ পর্যন্ত কোনোরূপ মূল্যায়ন করা হয়নি। এমনকি তাকে ইতিহাসের পাতায় যথাযথভাবে উপস্থাপনও করা হয়নি। তাই সময় এসেছে তাঁর জীবন ও কার্যক্রমের মূল্যায়ন করার এবং ইতিহাসের যথাস্থানে সুনির্দিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ আসনে তাকে সমাসীন করার।

*Dhaka University Institutional Repository*

# পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-১

# এ সেই মহান ধর্মীয় সংস্কারক ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রসেনানী

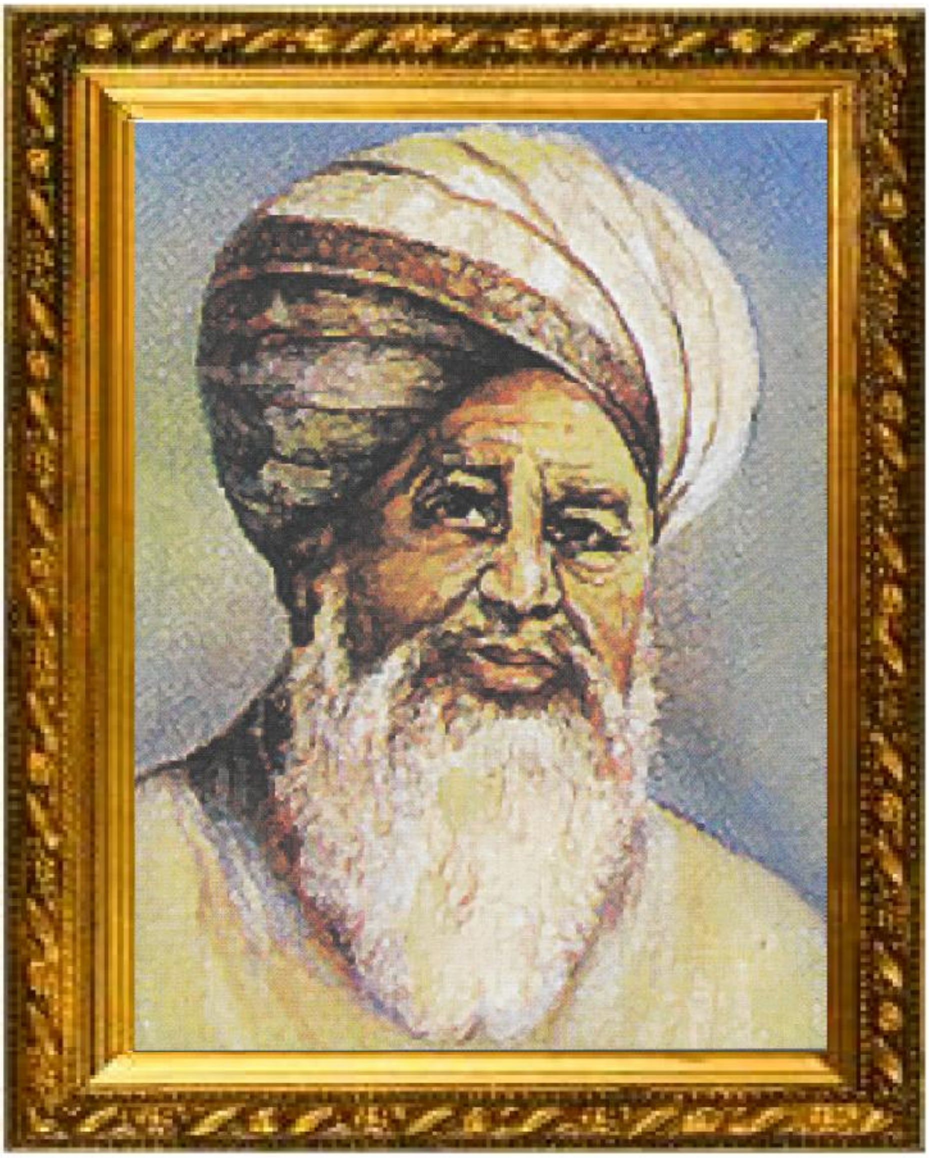

হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) (জন্ম : ১৭৮১, মৃত্যু : ১৮৪০ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-২

**হাজী শরী‘অতুল্লাহ রহ.**

এর কবরের উপর শিলাখণ্ডে খচিত তাঁর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ

চিত্র-৩

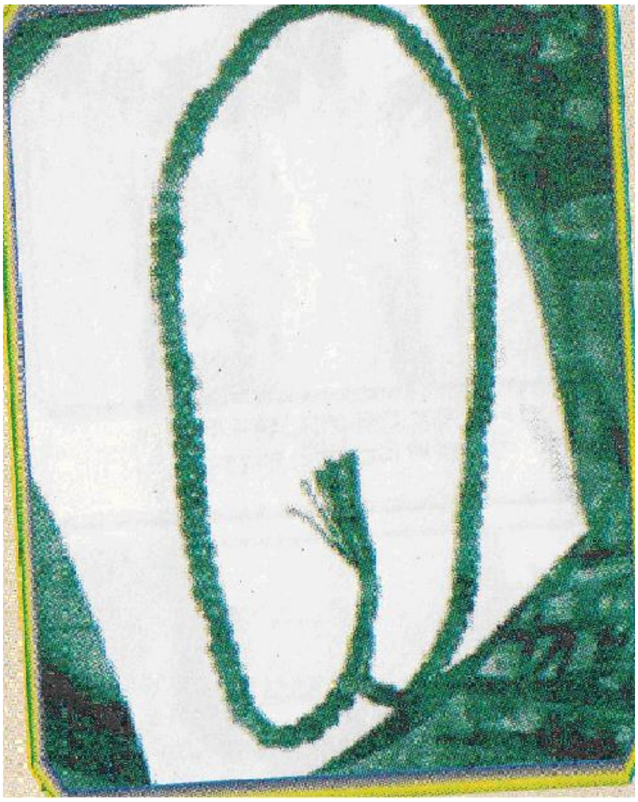

হাজী শরী‘অতুল্লাহ রহ. এর ৩য় পুরুষ

**খান বাহাদুর সাইজ উদ্দীন আহমদ এর ব্যবহৃত তাসবীহ।**

*Dhaka University Institutional Repository*

এ তাসবীহটি পীরজাদা হাজী জোনায়েদ আহমদও ব্যবহার করতেন।

*Dhaka University Institutional Repository*

চিত্র-৪

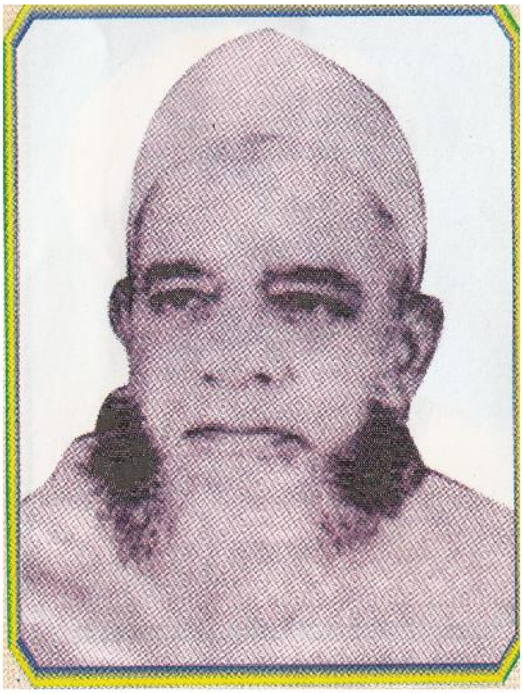

পাকিস্তানের এম.এন.এ ও পূর্ব পাকিস্তানের এম.এল.এ

**পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া রহ.**

(১৯১৭-১৯৯৭ খ্রি.)

চিত্র-৫

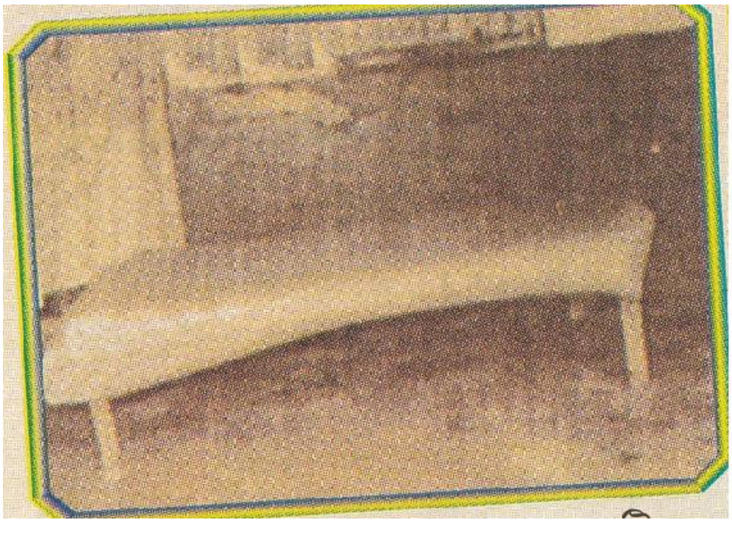

পীর দুদু মিয়া রহ. এর বিয়ের পাটি

*Dhaka University Institutional Repository*

চিত্র-৬

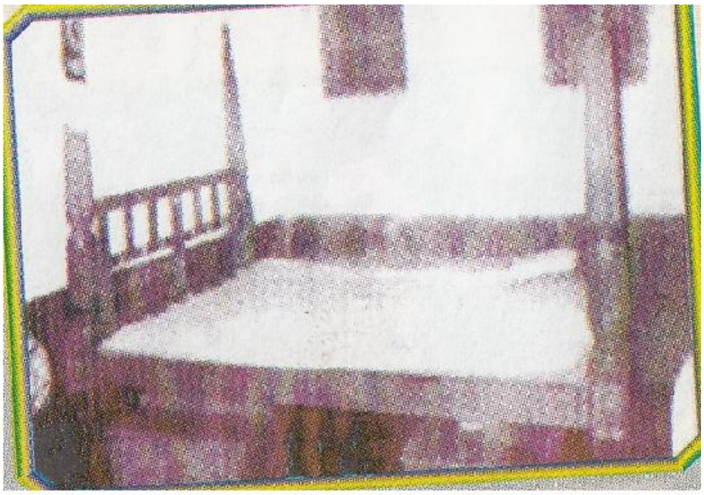

মোহসেন উদ্দীন দুদু মিয়া রহ. (১ম) এর ব্যবহৃত খাট।
এ খাটটি ভাঙ্গা থানার কালা মৃধা জমিদার তাঁকে উপহার দেন।

চিত্র-৭

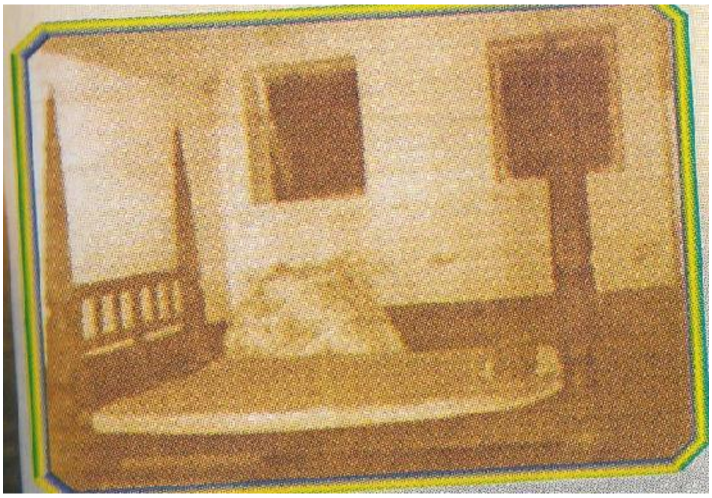

হাজী শরী'অতুল্লাহ রহ. এর নাতি
সাইদ উদ্দীন আহমদ রহ. এর ব্যবহৃত পালঙ্ক।

*Dhaka University Institutional Repository*

চিত্র-৮

১৯৫০ সালে হাজ্জ শেষে বিমান বন্দরে
পীর বাদশা মিয়া ভাষণ দিচ্ছেন।

চিত্র-৯

১৯৯৭ সালের ৮ আগস্ট হযরত পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ রহ. এর
২য় নামাযে জানাযার পূর্বে ভাষণ দিচ্ছেন পীর মহিউদ্দীন আহমদ দাদন মিয়া ছাহেব।

চিত্র-১০

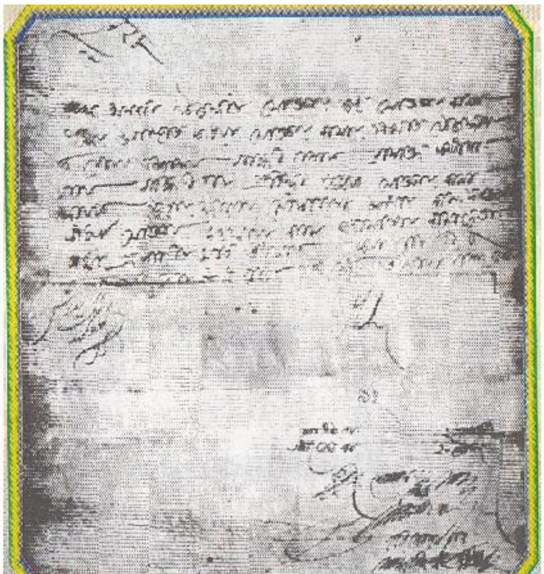

Dhaka University Institutional Repository

দুদু মিয়া রহ. মুন্সি ফায়েদ আল-দ্বীন এর
পাওয়ার অব এটর্নি হওয়ার দলিলের একাংশ

*Dhaka University Institutional Repository*

চিত্র-১১

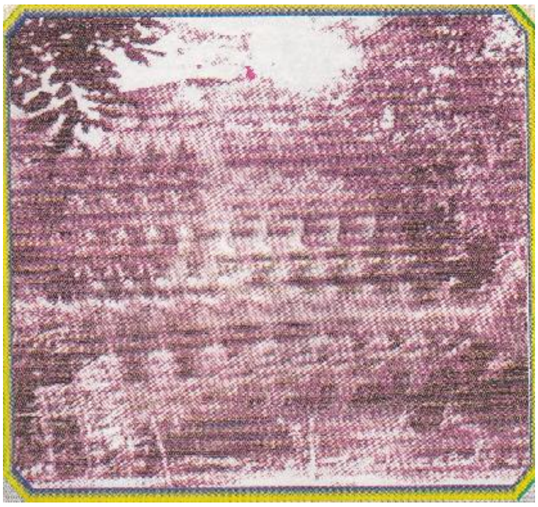

নীল চাষে অস্বীকারকারী কৃষকদের ধরে এনে ডানলপের এই
অভিশপ্ত ভবনে নির্মম অত্যাচার করা হত।

চিত্র-১২

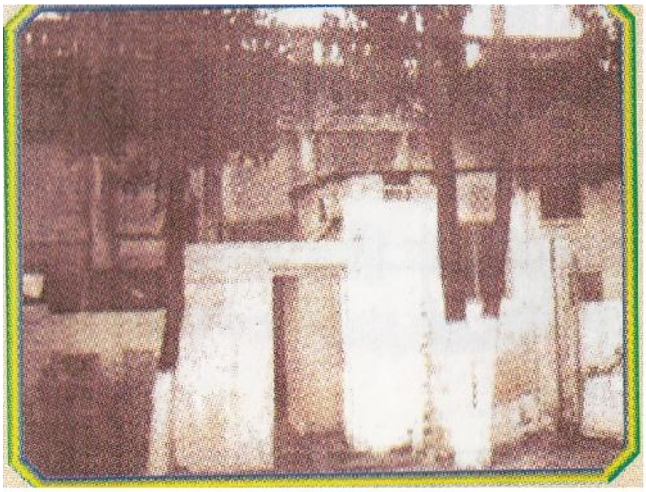

বৃটিশ সরকারের আতংক বীর মুজাহিদ
হযরত মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া রহ. এর বাস ভবন।

চিত্র-১৩

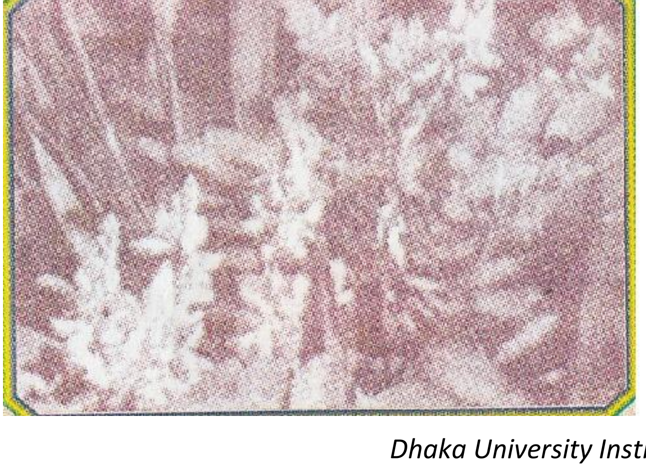

Dhaka University Institutional Repository

অভিশপ্ত নীল গাছ।

চিত্র-১৪

মাদারিপুরের বাহাদুরপুরস্থ মঞ্জিলের সম্মুখে অবস্থিত ঐতিহাসিক কবরস্থান।

চিত্র-১৫

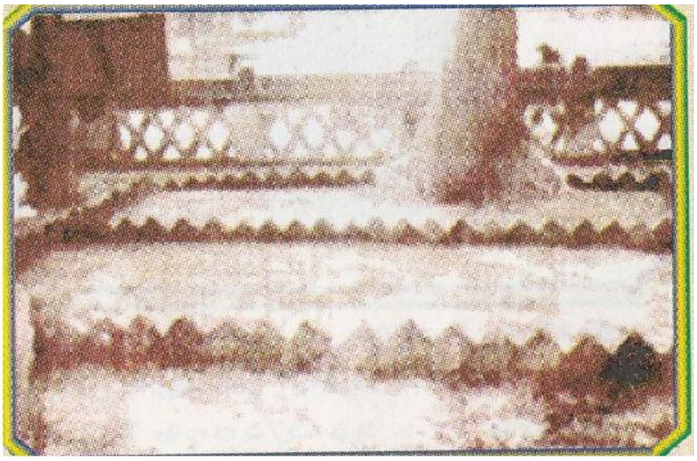

মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া রহ. (১ম) এর সন্তান
সাঈদ উদ্দীন আহমদ এর কবর (১৮৬৫-১৯০৬ খ্রি.)

চিত্র-১৬

Dhaka University Institutional Repository

২০০১ সালে ৬ আগস্ট ছিনতাইকারীদের হাতে নির্মমভাবে শহীদ প্রিন্সিপাল মোছলেহ উদ্দীন আহমদ আবু বকর মিয়া রহ. এর মরদেহ।

*Dhaka University Institutional Repository*

চিত্র-১৭

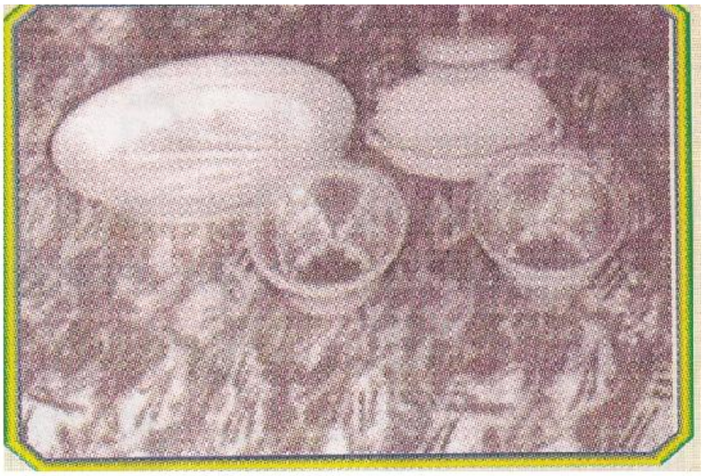

সাঈদ উদ্দীন আহমদ রহ. এর ব্যবহৃত তৈজষপত্র।

চিত্র-১৯

বাহাদুরপুর পীর মঞ্জিলের প্রধান ফটক।

চিত্র-২০

Dhaka University Institutional Repository

পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া রহ. এর নামাযে জানাযার পূর্বে শোকে বিহ্বল পীরজাদা হাজী জোনায়েদ আহমদ, মোসলেহ উদ্দীন আহমদ ও হাজী হাসিব উদ্দীন আহমদ শোয়েব মিয়া।

*Dhaka University Institutional Repository*

চিত্র-২১

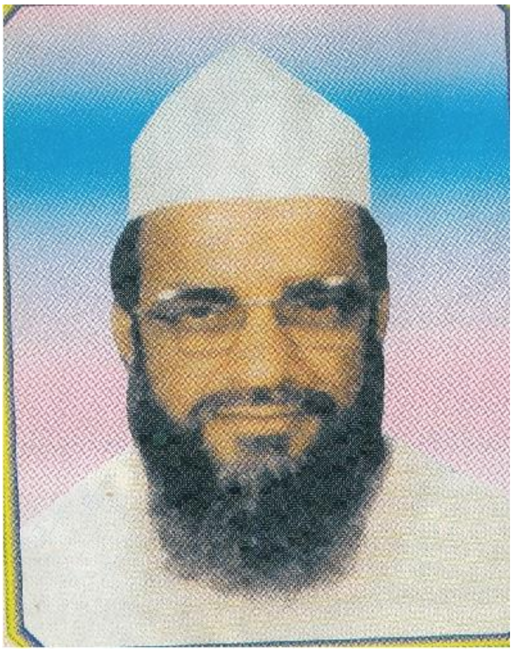

হাজী শরী'অতুল্লাহ রহ. এর বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র
আলহাজ্জ শারফুদ্দীন আহমদ জোনায়েদ মিয়া রহ.
(১৮৫৬ খ্রি.-২১.০২.২০০৬ খ্রি.)

চিত্র-২২

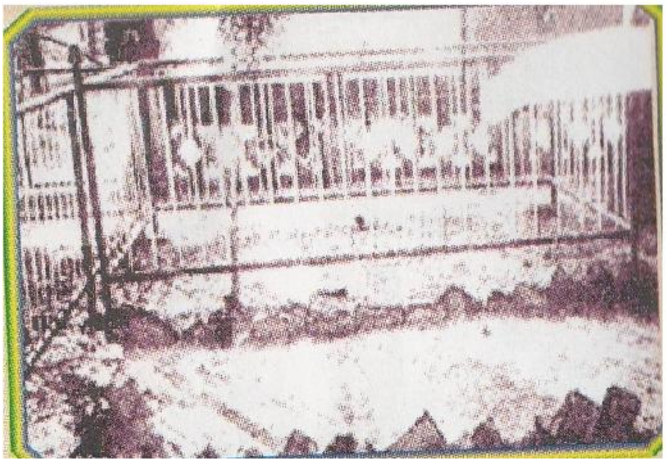

হাজী সাঈদ উদ্দীনের পুত্র পীর বাদশা মিয়া রহ. এর কবর
(১৮৮৪-১৯৫৯ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-২৩

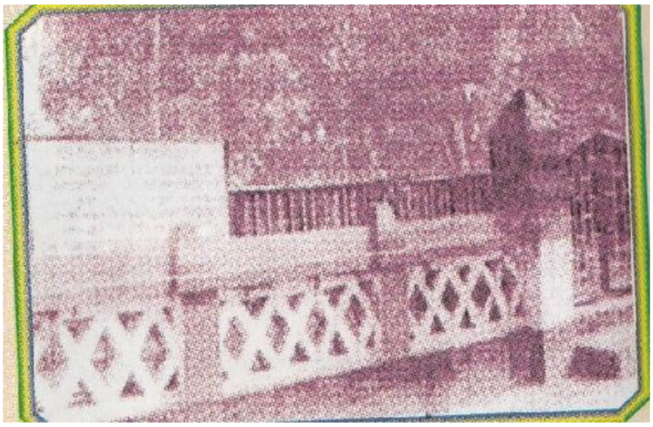

**বাহাদুরপুর কবরস্থান এখানে শায়িত আছেন**
হাজী আব্দুল গফুর নয়া মিয়া, হাজী সাঈদ উদ্দীন, পীর বাদশা মিয়া, মোহসেন উদ্দীন আহমদ, মোসলেহ উদ্দীন আহমদ আবু বকর মিয়াসহ হাজী শরী'অতুল্লাহ রহ. এর পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

চিত্র-২৪

১৯৬৯ সালে মাওলানা ভাসানীর সাথে একান্ত সাক্ষাতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য
**পীর মোহসেন উদ্দীন দুদু মিয়া।**

চিত্র-২৫

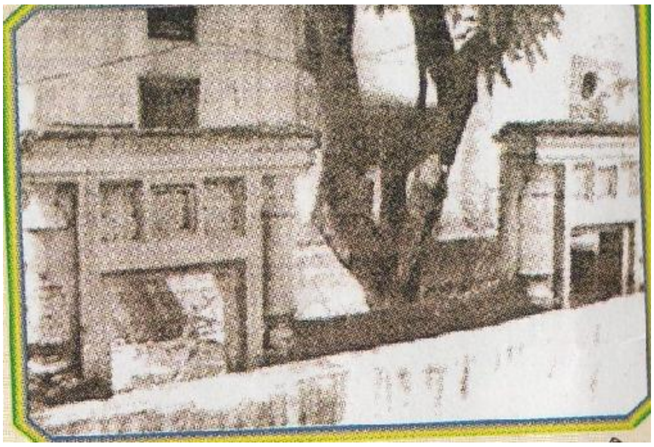

*Dhaka University Institutional Repository*

ঢাকার ১৩৭ নং বংশাল রোডস্থ বাহাদুর মঞ্জিল। এখানে শায়িত আছেন বৃটিশের আতংক উস্তাদ মোহসেন উদ্দীন দুদু মিয়া। এখান থেকে ১৩৯ জন ফারায়েযীকে ধরে নিয়ে ১৮৫৭ সালে বর্তমান ভিক্টোরিয়া পার্কে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়।

চিত্র-২৬

এতিহাসিক পুরানো দালান। এ দালানটি তৈরি করেছিলেন খান বাহাদুর সাঈদ উদ্দীন আহমদ রহ.।

চিত্র-২৭

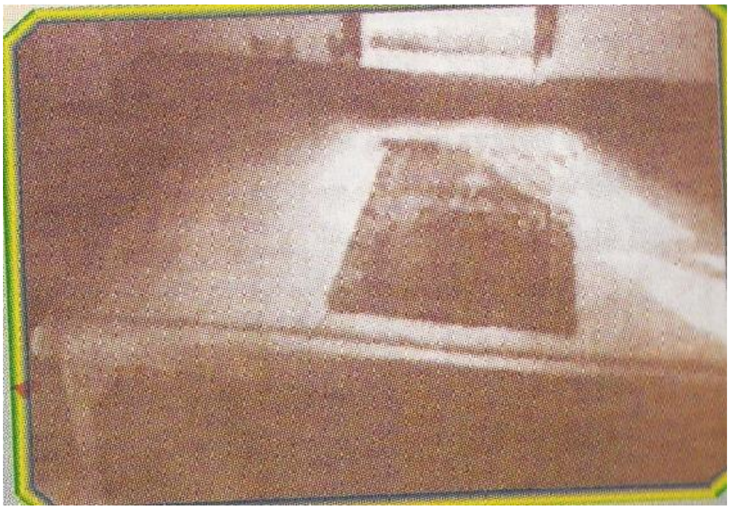

হাজী সাঈদ উদ্দীন আহমদ, পীর বাদশা মিয়া ও পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া রহ. এ কাঠের চৌকিতেই ইবাদত করতেন।[১৭৩]

১৭৩ ড. আহসান উল্লাহ ফয়সল, *হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম*(বরিশাল : শরীয়াতীয়া লাইব্রেরী, জানুয়ারি, ২০১০), পৃ. i-iv

Dhaka University Institutional Repository

# গ্রন্থপঞ্জি

*Dhaka University Institutional Repository*

# গ্রন্থপঞ্জি

## আরবি উৎস


১. القرآن الكريم

২. البخاري، محمد ابن اسماعيل : ابن : *الجامع الصحيح لبخاري*، دمشق : دار النوادر، الطبعة الأولى ১৪৩০هـ، ২০০৯م

৩. القشيري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج : *صحيح مسلم*، بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ১৪২৪هـ، ২০০৩م

৪. سابق، السيد : : *فقه السنة*، القاهرة : دار الحديث، الطبعة الأولى، ১৪২৫هـ

৫. الجزيري، عبد الرحمن : ، : *كتاب الفقه على المذاهب الأربعة*، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، ১৪২৪هـ

৬. الفيروزابادي، مجد الدين : ن : *القاموس المحيط*، القاهرة : دار الحديث، ১৪২৯هـ

৭. مدكور، الدكتور إبراهيم : : *المعجم الوجيز*، القاهرة : دار التحرير للطبع والنشر، مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، ১৯৮৯م

৮. شوقي ضيف، الأستاذ الدكتور : : *المعجم الوسيط*، القاهرة : مكتبة الشروق الدولية، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، الطبعة الرابعة، ১৪২৫هـ

৯. الهنائى، أبو الحسن علي بن الحسن : علي : *المنجد في اللغة*، القاهرة : عالم الكتب، الطبعة الثانية، ১৯৮৮م


## বাংলা উৎস

Dhaka University Institutional Repository

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১০. | আল কুরআন আল কারিম | : | |
| ১১. | আল্লামা আলুসী (রহ.) | : | *তাফসীরে রূহুল মা'য়ানী*, ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০০ |
| ১২. | আল-আযহারী, মুহাম্মদ আলাউদ্দীন | : | *আরবী বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৩ |
| ১৩. | রহমান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর | : | *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৮ |
| ১৪. | সম্পাদনা পরিষদ | : | *বাংলা পিডিয়া*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ-২০০৯ |
| ১৫. | সম্পাদনা পরিষদ | : | *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৪শ খন্ড (১ম ভাগ), ঢাকা : ইফাবা, আগস্ট, ১৯৯৮ |
| ১৬. | চৌধুরী, জামিল | : | *বাংলা একাডেমী বাংলা বানান-অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮ |
| ১৭. | সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত | : | *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ |
| ১৮. | সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত | : | *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ(২)*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ |
| ১৯. | সম্পাদনা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত | : | *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮০ |
| ২০. | গোলাম সাকলায়েন, ডক্টর | : | *বাংলাদেশের সূফি-সাধক*, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৩ |
| ২১. | ইবন কাসীর, আবুল ফিদা হাফিজ আদ-দামেশকী | : | *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, (১ম খণ্ড), অনূঃ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন, মাওলানা বোরহানউদ্দীন, মাওলানা আবু তাহের, ঢাকা : ইফাবা, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৭ |
| ২২. | ইবনে হিশাম, আবদুল মালেক | : | *সীরাতে ইবনে হিশাম*, অনূঃ আকরাম ফারুক, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ |
| ২৩. | ইবনে হিশাম, আবদুল মালেক | : | সীরাতুননবী (সা.), ১ম খণ্ড, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা : ইফাবা, আগস্ট ১৯৯৪ |
| ২৪. | ইবনে হিশাম, আবদুল মালেক | : | সীরাতুননবী (সা.), ২য় খণ্ড, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা : ইফাবা, ডিসেম্বর ১৯৯৪ |
| ২৫. | ইবনে হিশাম, আবদুল মালেক | : | সীরাতুননবী (সা.), ৩য় খণ্ড, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা : ইফাবা, জুন ১৯৯৫ |
| ২৬. | ইবনে হিশাম, আবদুল মালেক | : | সীরাতুননবী (সা.), ৪র্থ খণ্ড, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা : ইফাবা, জুন ১৯৯৬ |
| ২৭. | খান, ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ | | *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী ঢাকা, জুন ২০০৭ |
| ২৮. | নোমান, মাওলানা আব্দুল বাতেন | : | *হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন*, বরিশাল : শরীয়াতিয়া লাইব্রেরী, ২০০৫ |
| ২৯. | হোসেন, মোঃ আনোয়ার | : | *ইতিহাসের ইতিহাস*, ঢাকা : মৌলী প্রকাশনী, ২০১১ |
| ৩০. | হোসেন, মোঃ আনোয়ার সম্পাদিত | : | *আলোর দিশারী, হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) স্বর্ণ পদক-*২০০৭, ঢাকা : জাতীয় লেখক ফোরাম, ২০০৭ |
| ৩১. | হোসেন, মোঃ আনোয়ার সম্পাদিত | : | *হাজী শরী'অতুল্লাহ (রহ.) স্বর্ণ পদক-২০০৮*, ঢাকা : ঐতিহ্য ফাউন্ডেশন, ২০০৮ |
| ৩২. | রহমান, ফাহমিদ- উর সম্পাদিত | : | *ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ২০১১ |


*Dhaka University Institutional Repository*

৩৩. রহমান, ফাহমিদ- উর সম্পাদিত : *ফরায়েজী আন্দোলন এক বহুমাত্রিক মুক্তি সংগ্রাম*, ঢাকা : বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ২০১২

৩৪. খান, মোশাররফ হোসেন : *হাজী শরীয়তুল্লাহ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৫

৩৫. ফয়সাল, ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ : *হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন ইতিহাস ধর্মীয় দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম*, বরিশাল : শরীয়াতিয়া প্রকাশনী, ২০১০

৩৬. ফয়সাল, ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ : *উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দোলন*, কুষ্টিয়া : সেন্টার ফর ইসলামিক দা'ওয়াহ্ এন্ড কালচার, ফেব্রুয়ারি ২০১১

৩৭. হাসান, আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ : *তরীকুল জান্নাহ বা জান্নাতের পথ*, ঢাকা : প্রকাশক- আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান, ২০০৫

৩৮. রহমান, মাহবুবুর : *বাংলার ইতিহাস*(১২০০-১৯৭১খ্রি.), ঢাকা : বাড কম্প্রিট এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৯

৩৯. ভূঁইয়া, গোলাম মোস্তফা সম্পাদিত : *আলোর দিশারী*, ঢাকা : ভূমিকা প্রকাশ এন্ড এ্যাড মিডিয়া, ২০০৭

৪০. আলী, ওয়াজির : *মুসলিম রত্নহার*, পুঁথি

৪১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত : *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০

৪২. এম রেমন্ড অনূদিত : *সিয়ার আল মুতাখখেরিন*, কলিকাতা : কলিকাতা প্রকাশন, ১৮৯০

৪৩. কেরামত আলী, মাওলানা : *মাকাশিফাত ই রাহমাত*, কলিকাতা : অনুপম প্রকাশনী, ১৩৪৪ হি.

৪৪. কেরামত আলী, মাওলানা : *কওল আল ছাবিত*, কলিকাতা : অনুপম প্রকাশনী, ১৩৪৪ হি.

৪৫. রহীম, আব্দুর : *আল দূরার আল মানসুর ফি তারাজিম ই আহল ই সাদিকপুর*, ইলাহাবাদঃ পুথিঘর প্রকাশনী, ১৮৪৫

৪৬. আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত : *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা : ১৭ অক্টেবর ২০০৮

৪৭. রায়, সুপ্রকাশ : *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলিকাতা : বুক ওয়ার্ল্ড প্রকাশনী, ২০০০

৪৮. দে, ড. অমলেন্দু : *ফরায়েজী আন্দোলন : আত্মসত্তার রাজনীতি*, করকাতা : অনূলিপি প্রকাশনী, ১৯৭২

৪৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত : *সংবাদ পত্রে সেকালের কথা*, কলকাতা : ১৩৪২ বঙ্গাব্দ

৫০. বাকী, ড. মুহাম্মদ আবদুল : *বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও মতাদর্শ*, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০০৯

৫১. মামুন, মুনতাসির সম্পাদিত : *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি সমাজ*, ঢাকা : অনন্য প্রকাশন, ১৯৭৫

৫২. ওমর, বদরুদ্দীন : *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯২

৫৩. রহীম, ড. এম. এ. : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, ঢাকা : জামিল প্রকাশনী, ১৯৭৬

৫৪. দীনেস চন্দ্র সেন, : *রায় বাহাদুর বাংলাভাষা ও সাহিত্য*, কলকাতা : অনুপম প্রকাশন

৫৫. খান, আব্বাস আলী : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৭ম প্রকাশ, জুন ২০১১

৫৬. কবিরাজ, নরহরি : *অসমাপ্ত বিপ্লব অপূর্ণ আকাঙ্খা*, ঢাকা : বাণীপ্রকাশ, ১৯৯৭

৫৭. রহিম, এম. এ. : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : আহমদ


*Dhaka University Institutional Repository*

পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫৮. | আব্দুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ | : | *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬ |
| ৫৯. | আজমী, নূর মোহাম্মদ | : | *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৬ |
| ৬০ | রহমান, এ. এইচ. এম. শামসুর | : | *স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ৫ম সংস্করণ, রমযান ১৪১৬ হি. |
| ৬১. | সেন, নবীন চন্দ্র | : | *আমার জীবন*, কলিকাতা : হিন্দু পেট্রিয়ট, ৩য় খণ্ড ১৩১৭ বঙ্গাব্দ |
| ৬২. | মজুমদার, রমেশ চন্দ্র | : | *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৭৫ |
| ৬৩. | গোলাম সাকলায়েন, ড. | : | *বাংলাদেশের সূফি-সাধক*, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৩ |
| ৬৪. | হান্টার, ডব্লিউ. ডব্লিউ. | : | অনূঃ এম. আনিসুজ্জামান, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৪ |
| ৬৫. | আহমদ, আবুল মনসুর | : | *আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৩ |
| ৬৬. | মওদুদ, আবদুল | : | *ওহাবী আন্দোলন*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৮ম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৩ |


## ইংরেজি উৎস


| | | | |
|---|---|---|---|
| 67. | Ali, Wajir | : | *Muslim Ratnahar*, Puthi |
| 68. | Beveridge, Henry | : | *The District of Bakergonj its History and Statistics*, London : Trubner & Co.,1876 |
| 69. | Board of Editors | : | *Bangla Pedia*, Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 2002 |
| 70. | Board of Editors | : | *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1959 |
| 71. | Buckland, Charles Edward | : | *Bengal under the Lieutenant Governors,* West Bengal : S. K. Lahiri & Company, 1901 |
| 72. | Chopra, Pran Nath | : | *Role of Indian Muslims in the struggle for Freedom*, New Delhi : Light & Life Publishers, 1979 |
| 73. | Das, Abhay Charan | : | *The Indian Ryot*(Howrah : A C Dutt, 1881) |
| 74. | Dudu Miahn, Pir Mohsin Uddin Ahmad | : | *Faraizi Jamater Adarsha*, Barishal : Shariatia Library, 1994 |
| 75. | Faisal, Dr. Muhammad Ahsanullah | : | *Haji Shariatullah's Faraizi Movement History-Da'wah and Political Ideology*, Dhaka : Shariatia Prokashan, 2010 |
| 76. | Gastrell, J.E | : | *Geographical and Statistical Report of the Districts of Jessore, Fureedpore and Buckargong,* London : Trubner & Co., Ludgate Hill, 1876 |
| 77. | Hanif, Manzoor Ahmad | : | *A Short History of Muslim rule in Indo-Pakistan*(Michigan : Ideal Library, 1964), p. 430 |
| 78. | Holt, P.M. | : | *A Cambridge History of Islam*, London : 1970 |
| 79. | Hunter, W.W. | : | *The Indian Musalmans,* London : Trubner and Company, 1871 |
| 80. | Hunter, W.W. | : | *Imperial Gazetteer of India,* London : Trubner and Company, 1885 |
| 81. | Hussain, Md. Delwar | : | *A. Study of Nineteenth Century, Historical Works on Muslim Rule in Bengal*, Dhaka : Pritom Publishers, 1987 |
| 82. | James Wise | : | *Notes on the Races custes and trades of* |


*Dhaka University Institutional Repository*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | *Eastern Bengal*, London : 1884 |
| 83. | James Wise, Dr. | : | *Eastern Benal, Artical on Sariatullah and the Faraizis*, Dacca : Journal of the Royal Asiatic Society of Bengl, 1894 |
| 84. | Khan, Dr. Muin Uddin Ahmed | : | *History of the Faraidi Movement in Bengal,* Karachi : Pakistan Historical Society, 1965 |
| 85. | Khan, M. A | : | *History of the Foraidi Movement Muslim Struggle for Freedom in Bengal*, Dacca : 1961 |
| 86. | Mallick, Dr. A. R. | : | *British Policy & the Muslims of Bengal,* Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1966 |
| 87. | Murtuza, Gulam | : | *Chepe Rakha Itihas*, Calcutta : Bisha Bangio Prokashan, 1991 |
| 88. | Session Judge | : | *Trial of Dudu Miyan,* Calcutta : 1848 |
| 89. | Sharifabadi, Mawlana Abdul Latif | : | *Hajrat Pir Badsha Miyan*, Barishal : Sharatia Libary, 1958 |
| 90. | Taylor, James | : | *A Skectch of the Topography and Statistics of Dacca,* Calcutta : G.H. Huttmann, Military Orphan Press, 1840 |

## Website

91. www.alazhar.gov.eg visited on 24.12.2013
92. www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg visited on 02.10.2013
93. www.html-emergence-of-the-tariqa-muhammadiyya-movement/ visited on 18.12.2012
94. www.britannica.com/EBchecked/topic/523415/al-Sanusi visited on 15. 05. 2012
95. www.gamji.com/fulani4.htm visited on 06. 07. 2012

*Dhaka University Institutional Repository*